শিকড়ছেঁড়া জীবন

উদ্বাস্তু-দলিতের দলিল

যতীন বালা



শিকড়ছেঁড়া জীবন

উদ্বাস্তু-দলিতের দলিল

যতীন বালা

গাঙচিল

Shikarh Chhenrha Jiban: Utbastu-Daliter **Dalil**
Autobiography of Jatin Bala's **uprooted life by Jatin Bala**

দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০২২
প্রথম গাঙচিল প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০ ১১১
gangchiladhir@gmail.com
gangchil.books@gmail.com
www.facebook.com/gangchil

বিক্রয়কেন্দ্র
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (বর্ণপরিচয়, দোতলা) স্টল নং সি (পি) ৬
কলকাতা ৭০০ ০০৭ ফোন ৯৪৩২৯ ৯১৫৩০; ৯৪৩২৪ ০৭৬৬৫
০৩৩ ২২৪১ ০৪০৪ (দুপুর ১২ থেকে ৭টা)

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

ISBN 978-93-86443-68-7

দাম ৬০০ টাকা

বিষাক্ত ক্ষতে রক্ত ঝরে

আ...গু...ন...আ...গু...ন...আ...গু...ন...

বাঁ...চা...ও...বাঁ...চা...ও...বাঁ...চা...ও...

সন্ধ্যার মিহি-আঁধার ছিঁড়ে আচমকা ছুটে এল— চিৎকার-চেঁচামেচি আর বহু মানুষের শোরগোল...। বাতাসের বুকে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে ভয়ার্ত-মানুষের অবিরাম বুকফাটা কান্না, আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস...। নিস্তব্ধ বোলপোতা গ্রামের আকাশ-বাতাস যেন হঠাৎ শিউরে উঠল। ত্রাসে পাখিরা সব আকাশে উড়ে গ্রামের মাথার ওপর পাক খেয়ে পালিয়ে যেতেই ধোঁয়ায় ঢেকে গেল শূন্যটা। কালো ধোঁয়ার ভেতর আগুনের অন্তহীন লাল ফুলকি ছিটছে। গাঁয়ের গাছগাছালির মাথার ওপর লাফিয়ে উঠছে লাল আগুনের লেলিহান শিখা। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে বাঁশের গিঁট ফাটবার কর্কশ ফটফট শব্দ। রুক্ষ্ম কটু শব্দের মিছিল যেন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ধেয়ে আসছে উত্তর দিক থেকে। মারমার কাটকাট একটা দূরন্ত ঘূর্ণি উলটো-পালটা পাক খেয়ে, ক্রমশ প্রবল হয়ে ছুটে আসছে আমাদের পাড়ার দিকে আর আকাশ আগুনে ঝলসে উঠছে। তারই সঙ্গে গোটা বায়ুমণ্ডল কাঁপছে।

দিনটা ছিল বুধবার। স্থানীয় লক্ষ্মণপুরে তিনের হাট। বোলপোতা গ্রামের পুরুষরা অনেকেই গিয়েছিলেন হাট করতে। হিন্দুবাড়িতে সেই মুহূর্তে মা-মাসি-বউ-ঝিরা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ শাঁখ বাজাচ্ছিলেন। কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রামের উত্তর মাথায় তীব্র রব।

আ...গু...ন...আ...গু...ন...

বাঁ...চা...ও...

আমাদের মস্তবড় উঠোনে পাড়ার আমরা ক'জন— নিরা-হরি-পাঁচু-হারাণ-গণেশ-সুবল, কালী-পাঁচি-নেড়া-শোভা আর ময়না কুমির কুমির খেলা সবে শেষ করে যে-যার মতো ঘরমুখো পা বাড়িয়েছিলাম। পিসিমা তুলসিতলায় প্রদীপ রেখে জোড় হাতে প্রণাম করছিলেন...। তক্ষুনি শোরগোলটা তিরের মতো ছিটকে পড়ল বাতাসের বুকে আর সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার ছেলে অধীরদাদা উল্কার মতো ছুটে এসে উত্তেজিত হয়ে বললেন:

ও পিসিগো, গাঁয়ে মোল্লারা ঢুকে, ঘরে ঘরে আগুন লাগাচ্ছে...। ক্যাইজ্জা শুরু হয়ে গ্যাছে। আমাগো আর রক্ষে নেই...। পিসিগো, শিগ্‌গির পলাও, নালি মত্তি হবেনে, কলাম। পলাও, পলাও... বলতে বলতে সুধীরদাদা বিলমুখো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে, মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন...।

শক্তসমর্থ পিসিমা বায়ুবেগে ছুটে এসে আমার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে, গলায় শঙ্কা নিয়ে বললেন:

ছোটকোদা রে, বাবা, আমাগো আর বুঝি বাঁচন নেই রে বাছা, আয় দৌড়ে আয়, বাবা পালাই, আয় শিগ্‌গির দৌড়ে। বাবা, পালাই... আয়... পিসিমা আমার হাত শক্ত করে ধরে, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পুবমুখো ছুটে চললেন।

ঝড়ের বেগে ছুটে, মরিপড়ি পগারপার হয়ে সোনাকুঁড়ের নাবালের ঘন বেনাবন লক্ষ করে আমরা ছুটে পালাচ্ছি... আর ভয়-তরাসে পিছনে তাকাচ্ছি বারবার...। আমাদের আগে-পিছে বোলপোতা গ্রাম ভেঙে আতঙ্কিত-ভীত মানুষজন, নারীশিশু, বুড়োবুড়ি সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন। আর তাঁরা সব তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছেন:

ওরে বাবা রে, মা রে, কনে গিয়ি বাঁচবানে রে, আমাগো কী হবেনে রে, এ কী হলো রে, অ্যাহোনে, কেম্মে রে বাঁচপানে রে— হায়-হায়, আমার মণি কনে গেলো রে, তোরা কনে কেডা গেলি রে, আয় রে শিগ্‌গির পালাই, ও রে-ও রে-বাছা রে কনে গেলি রে...। সকলের ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একসঙ্গে মিলেমিশে শব্দের ঘূর্ণিঝড় ওঠে। ঝড়ের দাপটে তলিয়ে যায় অন্য সব আওয়াজ-আর্তনাদ-দীর্ঘশ্বাস-কান্না। বাংলার আকাশে আর বাতাসে কেবল জেগে থাকে,— অসহায় প্রাণভয়ে ভীরুসন্ত্রস্ত বহু মানুষের মিলিত হাহাকার, আর্তনাদ আর মর্মান্তিক বুকফাটা কান্না-দীর্ঘশ্বাস...।

বোলপোতা গ্রামের মাথার ওপর আঁধার আকাশ এখন রক্ত লাল আলোয় যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তারারা সব মিলিয়ে গেছে। জ্বলন্ত খড়ের অঙ্গার ছিটকে উঠে শূন্যে ফুলঝুরির মতো নিভে যাচ্ছে। এরই মাঝে হাউই বাজির

মতো জ্বলন্ত বাখারিগুলি সশব্দে বাঁশবাগানের মাথার ওপর ঠিক্‌রে পড়ছে। ধোঁয়া আর লেলিহান আগুন, শব্দ আর শোরগোল, মানুষের আর্তনাদ, হাহাকার আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস সব একসঙ্গে জড়িয়ে প্রলয়কাণ্ড যেন জলোচ্ছ্বাসের মতো বয়ে যাচ্ছে। সেই জলোচ্ছ্বাসের উথাল-পাথাল ঢেউয়ে আমরা সব শ্যাওলার মতো ভেসে চলেছি...।

গ্রামের উঁচু ভিটে ছেড়ে নাবাল ভুঁই পেরিয়ে যেতে যেতে দেখি— বেঁটেখাটো, টাকমাথা দেবেনখুড়ো আমাদের আগে আগে মরিপড়ি ছুটে পালাচ্ছেন। তার বাঁ দিক দিয়ে বন্দুকের গুলির মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন রোগাটে মুড়োঝাটা রতন ঢালি। তার পিছে পাতলা বেনাবন ভেঙে মিষ্টি কুমড়ো-ভরা বস্তার মতো মোটাসোটা বড়মামি প্রাণপণে ছুটছেন। পালাচ্ছেন ট্যারাচোখ সুনীলের বউদি, মহাদেবের মা, সুধামাসি, পুতুল বউদি, পা-টেনে-হাঁটা ননীমাসি আর মুখফোলা জগা মাঝি। পাতলা বেনাবনের ঝাড় ডানে-বাঁয়ে রেখে আমরাও দম ধরে ছুটে পালাচ্ছি আর ভয়তরাসে ঘন ঘন পিছনে তাকাচ্ছি— পাছে দাঙ্গাবাজরা ছুটে এসে আমাদের বেড় দিয়ে ধরে গলা কাটে। আমাদের বাঁ দিকে চষা ডেলাবন মাড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছেন আমার মেজবউদি আর দুই দিদি। তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেনাবনের আড়ালে ঢুকে গেলেন ঘাড়-বাঁকা সুধীর বাছাড়, সুবলসাধু মনোহর বাইন, হরষিত বালা আর রামকানাইরা...।

বোলপোতা গ্রামের মানুষজন যেদিকে পারছেন ছিটকে বেরিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন— নিরীহ গোবেচারি গৌর বিশ্বাস আর তার মা জটাবুড়ি। জটাবুড়ি ছুটছেন আর হাতের মুঠি নাড়িয়ে তীক্ষ্ণ সরু গলায় চিল চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছেন: ওরে হতভাগা গু-খেগোর ব্যাটারা তুগে জ্বালা আগুনি তোরা গুষ্টিসুদ্ধ পুড়ি মর। মর মর মর মর। তোরা মল্লি আমার হাড় জুড়ায়। মর তোরা ঝাড়েবংশে মর। তোরা মল্লি আমার হাড়ে বাতাস লাগে। মর শালারা মর। গুষ্টিসুদ্ধ মর। মর মর মর মর।

জটাবুড়ি দু'হাতের আঙুল মটমট করে ভাঙেন আর অবিরাম অভিসম্পাত দিয়ে চলেন এবং মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আকাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধিয়ে, পায়ের গোড়ালি ঠোকেন মাটিতে,— ক্ষোভে রাগে তিনি যেন জ্বলতে থাকেন দাউ দাউ আগুনের মতো।

একটা বড় বেনার ঝাড়কে পেরিয়ে যেতেই দেখি— সুপদর মা ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ধারালো মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সমানে কাতরাচ্ছেন: মল্লাম রে, গেলাম রে, আমার কেউ নেই রে। আমার অ্যাহোন কী হবেনে রে। আমার

সুপদ কনে গেল রে। হায় হায় আমার কী হবেনে রে।

চাপাস্বরে ক্ষীণ-হয়ে-আসা তাঁর বুকফাটা আর্তনাদে অর্ধনগ্ন শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাঁর বাঁ হাতে ধরাছিল সুপদ— তাকেও দেখি দূরে ছিটকে চিত হয়ে পড়ে আছে। তখনও সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে চলেছে। ওদের পিছনে ফেলেই আমরা প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছি,— পাছে বিপদ লাফ দিয়ে আমাদের ঘাড়ে পড়ে। পিসিমা কালবিলম্ব করতে রাজি না। তিনি আমাকে টেনে হিঁচড়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। পায়ের পাতার নীচে গোরুর খুরের খোঁড়লে শুকনো কাদার ধারালো মাটিতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে আমাদের পায়ের পাতা গোড়ালি আঙুল। তবু প্রাণভয়ে হুতাশে-ত্রাসে মরিপড়ি ছুটে পালাচ্ছি,— সোনাকুঁড়ের ঘন বেনাবন লক্ষ করে।

সোনাকুঁড়ের নাবালে নিবিড় ঘন বেনাবনে সন্ধ্যার আঁধার জড়িয়ে জমাট বেঁধে আছে। যেদিকেই তাকাই দেখি অন্তহীন বেনাঘাসের বড় বড় ঝাড়, অসংখ্য শিকড় ছড়িয়ে আকাশের নীচে আমার মাথা ছাড়িয়ে সজারুর তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়েগতরে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ বেনাঘাসগুলি কালো মাটির কঠিন বুক খামচে ধরে বংশবিস্তার করে চলেছে যেন কতকাল ধরে। বেনাঘাসের গুচ্ছের ভেতর মাথা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে রং-বেরঙের দু'-একটি কাশফুল আর লাল তারার মতো ফুটে আছে অজস্র সন্ধ্যামণি।

আমাদের আগেভাগে গ্রাম থেকে ছুটে পালিয়ে এসে বেনাঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন অনেকেই। তাদেরই একজন সরবউদি চাপাস্বরে ডেকে বললেন: পিসিগো ও পিসি আর কনে যাবা! অ্যাহানে আসো গো, পিসি বসি পড়ো— নালি দেখতি পাবেনে শালোরা, বসি পড়ো পিসি। অ্যাহানে লুকানোর মেলা জাগা। অ্যাসো অ্যাসো গুড়ি ম্যারি, অ্যাসো পিসি। নালি মাতা দেখতি পালি মত্তি হবেনে আমাগে। বসি পড়ো। নালি সক্কলডির মত্তি হবেনে কলাম। বও পিসি, অ্যাহনে বসো গো। কথা বলতে বলতে সরবউদি নিজের পাছা টেনে সরিয়ে নিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দেন, নাবালের আধশুকনো চেঁচোঘাস-ঘেচু শ্যাওলা-মুথকুরো ঘাসের ওপর।

পিসিমা থমকে দাঁড়িয়ে একমুহূর্তে কী যেন ভাবেন। তার পর দেরি না করে আমাকে দু'হাতে সাফটে ধরে জবরজং জাবড়ে বসে পড়েন বেনাঝাড়ের ঝোপের আড়ালে। মাঠ-বিল ভেঙে এতটা পথ একটানা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পিসিমার শ্বাস ঘন হয়ে গেছে। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস টানতে থাকেন। বুকটা তাঁর ঘন ঘন ওঠানামা করছে। ঠোঁট কাঁপছে। পিসিমাকে দেখে মনে হচ্ছে,—

কষ্টে-দুঃখে-ভয়ে-ভাবনায়-হতাশায় বুকের ভেতরটা বুঝি তাঁর ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। দাঙ্গাবাজরা যেন তাঁরই হৃদয় মনেপ্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলা ঘরপোড়া আগুনে তিনি যেন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন। যন্ত্রণার ব্যথায় বিপর্যয়ে কষ্টে-দুঃখে চোখের জলে তাঁর দু'গাল ভিজে স্রোত বয়ে চলেছে।

সরবউদি গভীর সমবেদনার গলায় এক বুক কান্না ঢেলে দিয়ে বললেন: পিসিগো, ভয় পালি আর কনে গিয়ে এ-জ্বালা জুড়াবানি কও তো পিসি। অ্যাহানেই ঘাপটি মারি বসি থায়ো পিসি। দ্যাহ কেষ্টর বাবা, সুরেন দাদু, শীতলের মামা, টেঁপির মা, সুজন বাড়ই, ননী মালাকার, নরেন ঢালি, সুবোধ বাইন, অঘোর গায়েন, যুগল সর্দার, টেপো মহলদারও এ্যাহানে লুকিয়ে আছে, দ্যাহ। এ্যাহানেই থায়ো গো পিসি। মত্তি হলি আমরা একসাথে এ্যাহানেই মরবানে। অ্যাসো পিসি। এটুসখানি সরি অ্যাসো গো পিসি। এ্যাহানে মেলা-আড়াল। এহ্যানে বসলি দাঙ্গাবাজরা দেখতি পাবেনে। অ্যাসো।

সরবউদি পাছা টেনে খানিক সরে গিয়ে লম্বা করে হাত বাড়িয়ে পিসিমাকে গায়ের কাছে জোরে টেনে নেয়। যেখানে শুকনো নাড়ার মতো চেঁচোঘাস-ঘেচু শ্যাওলা আর মুথকুরো ঘাসের ফাঁপা শরীর দলা পাকিয়ে স্তূপ হয়ে আছে। সেদিকে পিসিমা আমাকেও টেনে নেন কোলের কাছে।

আচমকা বদলে-যাওয়া ঘটনার স্রোতে ভেসে গিয়ে আমি দিশাহারা, বিহ্বল, স্থাণু হয়ে বসে রইলাম পিসিমার গা-ছুঁয়ে। কিন্তু মনের ভেতরটা আমার কষ্টে-দুঃখে-যন্ত্রণায় যেন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকল,— সূক্ষ্ম আগুনের তন্তু দিয়ে কেউ আমার হৃৎপিণ্ডটাকে শতছিন্ন করে দিচ্ছে। অথৈ ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে যেন ঢোক গিলে গিলে বেঁচে থাকছি। আর তাতেই আমার কপাল থেকে ফোঁটাফোঁটা রক্তের মতো ঘাম ঝরে পড়ছে। কী-এক অসহ্য যন্ত্রণায়-হতাশায়— যা প্রকাশ করার মতো ভাষা জ্ঞান বুদ্ধি চেতনাও আমার তখন ছিল না। কেবল একবুক ভয় আর আকাশ ছোঁয়া হতাশার আঁধারে বুড়ে রইলাম যেন কতকাল।

পিসিমা এক সময় বুক ভরে দম নিয়ে কুঁক ছেড়ে চাপা শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বললেন: সরো রে, মা রে, ক্যান আমরা এ্যাহানে মত্তি আলাম রে, এ্যাহানে কনে গিয়ি আমরা ক্যাম্মা রে বাঁচবানে? ক' মা ক'। ক্যাম্মারে পরানডারে বাঁচাবানে, ক' মা ক্যাম্মারে পরানডারে বাঁচাবানে, সরো মা রে, এ্যাহানে মত্তি আলাম। সরো মা রে, তুই কতি পারিস মা, আমাগে দশা কী হবে নে, ক' মা রে, সরো মা, আমরা বুঝি আর বাঁচতি পাল্লাম না রে মা। আমরা আর বাঁচতি পাল্লাম না রে।

পিসিমা হতাশার অথৈ জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খান আর হাতে বুক চাপড়ে, কপাল চাপড়ে হা-হুতাশ করেন, আর্তনাদ করেন। বোবা কান্নায় তাঁর বুক-পিঠের হাড়গোড় বুঝি ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়।

সরবউদির মনের আকাশটাও এলোমেলো কালো ভাবনার মেঘে আঁধার করে ছেয়ে ফেলেছে। মুখে তাঁর কথা জোগায় না। মনের ব্যথার এককোণে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদেন— কোনও কথারই উত্তর খুঁজে পান না। হতাশার অনিশ্চয়তার উদাস দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন ছেড়ে-আসা, পালিয়ে ফেলে-আসা বোলপোতা গ্রামের দিকে— চোখের জলে তার বুক ভিজতে থাকে।

বাঁ হাতের তালুর উলটোপিঠ দিয়ে দু'চোখ ডোলে বিষণ্ণ দৃষ্টি প্রাণপণে মেলে ধরে দূরে তাকাই, দেখি— মধুর মা হামাগুড়ি দিয়ে ডেলাবন ভেঙে আমাদের দিকেই আসছেন। ভয়ে-ভাবনায়-হতাশায় আর ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁর মেরুদণ্ড যেন বেঁকেই গেছে। দ্যাগড়া-দ্যাগড়া হাড়-বের-করা মুখখানা খানিক উঁচু করে চতুষ্পদ কুকুর বিড়ালের মতো চলেছেন। ছুটতে গিয়ে পরনের কাপড়খানা কাঁটা ঝোপে বিঁধে শতছিন্ন হয়ে গেছে। শরীরে লজ্জা ঢাকবার মতো তাঁর আর কিছুই নেই। ভয়ের কালো মেঘে গোটা মুখ-চোখই ঢেকে আছে। শরীরে নানা স্থানে ছিঁড়ে কেটে রক্ত ঝরে পড়ছে। পায়ের হাঁটু অবধি হাতের কনুই অবধি তাঁর ম্যাড়মেড়ে পচা কাদা মাখানো। অন্ধের মতো আঁধারে হাত-হাতড়ে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আকুল হয়ে এগিয়ে চলেছেন। নাবালের শুকনো ধারালো ভুঁইতে মরে-পড়ে-থাকা হলদে শুকনো চেঁচোঘাস, পেট-মোটা মুথকুরো ঘাস, ঘেচুশ্যাওলা আর শালুক-শাপলার ফানে হাত-পা জড়িয়ে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছেন আর উঠে মরিপড়ি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর কষ্টের দিকে তাকাতে পারি না, দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিই অন্যদিকে।

বেনাঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ফালি ফালি লোহার মতো শক্ত কালো এঁটেল মাটি আর তার খোঁড়লগুলি শুকিয়ে পাথরের মতো কালো হয়ে গেছে। টেপির মা, জটাবুড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন সেই শুকনো ধারালো শক্ত মাটির বুকের ওপর। তাঁর বুকের ভেতর কে যেন পাথর মেরে আগল ভেঙে দিয়েছে। হায় হায় করে ব্যথায় কুঁকড়ে কেঁদে ডুক্‌রে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন: ওরে দিদি রে, আমাগের টেপিডারে শালোরা ধরি নিয়ি গেছে রে, মা আমার, পালাতি পারিনি রে। ওরে, আমি কনে যাবো রে, কনে গিয়ি আমার টেপিরি পাবো রে, তারে আমি কনে তল্লাশ করি পাবানি। ওরে মারে,

তোরে আমি কনে তল্লাশ করবানি রে। ওরে সে বাছারে এতক্ষণ বাঁচায়ে রাহেনি রে, ব্যাটারা। আমার বাছা নেই। হায় হায় আমার কী হবেনে রে— ভেতরের অসহ্য জ্বালায় তার পাতলা ভুরু দুটোই তিরতির করে কাঁপতে থাকে আর তার বুকের খাঁচাখানা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে থাকে; তাতে যেন মড়মড় শব্দ ওঠে। টেপির মা ঠ্যাং দাপায়, মাথা ঠোকেন ধারালো মাটিতে। এক সময় পাগলের মতো বড় একটা বেনাঝাড়কে দু'হাতে বুকে প্রাণপণে সাফটে ধরে, কেঁদে কেঁদে মনের জ্বালা জুড়াতে থাকেন।

মেজো বউদি সেবাদাসী চাপাস্বরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন: হেই টেপির মা, এডা কী কত্তিছো এ্যাহেনে? আমরা ছুটি আলাম পরান বাঁচাতি আর তুমি বুড়িবিটি গলা ছাড়ি চিল্লায়ে কান্তিচো! চুপ থায়ো না, আমাগে বাঁচতি দাও কলাম। ক্রোধে-ক্ষোভে তাঁর মুখটাই যেন বেঁকে গেল। তিনি দু'হাতে বেনাঝাড় সাফটে ধরে গায়ের বলে ঝাঁকি দিয়ে টেপির মাকে চুপ করাতে চান। গলা খাঁকারি দিয়ে ফের বললেন, হেই টেপির মা, চুপ থায়ো কলাম, বাঁচতি দাও আমাগে। এ্যাহানে মত্তি এলে ক্যান শুনি! চুপ থায়ো কলাম। নালি, গলায় পা দিয়ি চুপ করাবোনে, সরো, এ্যাহান থেয়ি দূরি গিয়ি মরো গে যাও। মেজবউদি ক্ষোভে-দুঃখে-ঘৃণায় যেন মুখ ঘুরিয়ে নেন অন্যদিকে।

টেপির মা তখনও বেনাঝাড়কে বুকে সাফটে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছেন আর অস্ফূট স্বরে গোঙাতে গোঙাতে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে থাকেন— যার একবর্ণও আমি বুঝতে পারি না। কেবল হাঁ-করে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি তাঁর ভাঙাচোরা আর ভয়তরাসে শুকিয়ে-যাওয়া ধুলো-ওড়া মুখের দিকে। এ তো বুকফাটা হাহাকারের কান্না নয়— চাপা গলায় বোবাকান্না। চোখের নীল তারায় তারায় কী তাঁর বিকট ভয় আর আকাশচুম্বী অসহায়তার গভীর দীর্ঘ ক্ষত তৈরি করেছে! তাঁর আর্ত আর ভয়ার্ত আঁধারে ঢাকা মুখে যেন চাঁদ অস্ত গেছে।

বোলপোতা গ্রামের মানুষজন যাঁরা আচমকা আক্রমণে প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছুটে, ছিটকে পড়েছিলেন— লুকিয়েছিলেন এখানে-সেখানে— তাঁরা সব ক্রমশই আমাদের আশেপাশে ঘন বেনাবনের আড়ালে জড়ো হতে থাকলেন আর আশ্রয় নিতে লাগলেন নিবিড় ঘন বেনাবনের ঝোপের ভেতর। এদেরই কারও সঙ্গে এসেছিলেন পুলিনমামা, তালুইমশাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আর মাউই-মা'রা। মাউই-মা পিসিমাকে দেখতে পেয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

পিসিমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত চাপা গলায় বললেন: ও দিদি রে, এ্যাহোন কী হবেনে আমাগে? ক্যাম্মা রে আমরা এ্যাহানে বাঁচপানে? এ-পরানডারে কনে গিয়ি বাঁচাবোনে। কোলের ছেলেটাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে ফের ভাঙা গলায় চাপা স্বরে বলেন, বাছা রে কনে নিয়ি গিয়ি বাঁচাবোনে? দিদি রে এ্যাহানে ক্যান যে মত্তি আলাম, দ্যাহ দ্যাহ দিগিগো, দ্যাহ চাহি দ্যাহো— শালোরা ঘরগুলানরে ক্যাম্মারে পুড়িয়ে ছাই বানাচ্ছে গু-খেগোর ব্যাটারা, এট্টা ঘরও আস্ত রাখি যাবে না নে। সব শ্যাষ করি দিলো রে। ক্যান এ্যাহানে মত্তি আলাম রে, বাঁচতি আসি কোন্ মরণ গর্তে ঢুকি মরলাম রে। হায় হায় এ্যাহোন আমরা কনে গিয়ি বাঁচপানে— তাঁর কথা শেষ হয় না। হতাশায়, কান্নায় বেদনায় তাঁর দম বুঝি ফুরিয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর বুকের খাঁচা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে থাকেন আর নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন ধ্বংসের দিকে— দাউ দাউ করে জ্বলা ঘরপোড়া বোলপোতা গ্রামের দিকে।

ঘটে-যাওয়া ঘটনার স্বরূপটা আমার চেতনায় স্পষ্ট হতে থাকে আর উন্মুখ হয়ে ওঠে আমার প্রাণমন— আমি পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর সমস্ত শরীরের ভর রেখে ডিঙি মেরে বেনাঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে থাকি— বোলপোতা গ্রামের মাথার ওপরের আকাশটা আগুনলালে লাল হয়ে খাঁ খাঁ করছে। টকটকে লাল আগুনের জিভগুলি লকলক করে উঠছে আর হাওয়ার আদর-সোহাগ খেয়ে সমানে নেচে চলেছে। সন্ধ্যার আঁধার আর ঘরপোড়া কালো ধোঁয়ার ভেতর আগুনের ফুলকিরা সব শূন্যের বুকে অগুনতি ফুল ছড়াচ্ছে। গোটা আকাশটাই বুঝি রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

রাত বাড়ছে আর আমাদের চারপাশে ঝুপঝুপ করে আঁধার নামছে। ঝুঁঝকো-আঁধারে আমরা এখন প্রায় অদৃশ্য, বিষাদমগ্ন নদীর মতো অনবরত অনির্দিষ্ট ভাবনা স্রোতে চলেছি তো চলেছিই...। আশপাশ থেকে ফিসফিস মৃদু আওয়াজ। চাপা কথার গুঞ্জন, দীর্ঘশ্বাস, গোঙানি, আর হা-হুতাশের তিক্ত কঠিন শব্দরা, ঘুরে ফিরে আমাদের চেতনাকে পোড়াচ্ছে, হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। মনে হচ্ছিল দাঙ্গাবাজদের তাড়া-খাওয়া মানুষজনের হা-হুতাশ, গোঙানি, আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস আর নেমে-আসা আঁধার— সব মিলেমিশে জট পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। টুকরো টুকরো ছেঁড়া কথাবার্তা, হতাশার ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস আকাশের বুকে ধাক্কা খেয়ে মাটির পৃথিবীতে ছিটকে পড়ছে।

আমাদের পিছনে অদূরে, বেনাঝাড়ের আড়ালে আবছা-আঁধারে বুড়ে-থাকা মহাদেবের মা কুঁজোবুড়ি তখনও খ্যারখেরে সরু গলায় ভাঙা রেকর্ডটা বাজিয়েই

চলেছে: ওরে, হতভাগা শয়তানের ঝাঁড়েরা, তোরা গলায় দড়ি দিয়ি মত্তি পারিসনে! মর মর মর মর মর, তোরা মল্লি শেতলা মায়ের থানে দুধকলা দিবানে। হে মা শেতলা, ব্যাটাগে ঝাঁড়েবংশে শ্যাষ করে দাও মা। তোমার পা ধরি মা। ওই ব্যাটাগে নিঃবংশ করো মা...।

মহাদেবের মা কুঁজোবুড়ি দু'হাতের আঙুল মট মট করে ভাঙেন আর কাঁচাঘৃণা পচা কাদার মতো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারেন দাঙ্গাবাজদের উদ্দেশে। মাটিতে পায়ের গোড়ালি ঠুকে ঠুকে তীব্র নাচের ভঙ্গিতে একপাক ঘুরে উদাসীন দৃষ্টি শূন্য আকাশে বিঁধিয়ে, সমানে গালিগালাজ দিয়ে চলেছেন...।

রাতের আঁধারের বুক ছিঁড়েফেড়ে, আকাশে ছিটকে পড়ছে আগুনের অন্তহীন ফুলকি। বাতাসে ভাসছে দাঙ্গাবাজদের উল্লাস, শোরগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি। মশাল হাতে দাঙ্গাবাজরা গোটা গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছোটাছুটি করছে আর খোড়োঘরের শুকনো চালে একটার পর একটা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। বোলপোতা গ্রামের মানুষজন বেনাঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছেন সেই ধ্বংসকাণ্ড। আমরা অসহায় নিরুপায় দর্শক। হাত-পা কোলে করে পাথরের মতো শূন্যদৃষ্টি নিয়ে দেখেই চলেছি...। আমাদের কিছুই করার নেই, ইতিহাসের ভয়ংকর সেই খাদ যাঁরা দু'চোখ মেলে দেখেছেন। যাঁরা অনুভব করেছেন মৃত্যুর শীতল আঁধার। তাঁরা ছাড়া কারা বুঝতে পারবেন, সেই মহাঘটনার কী মর্মান্তিক জ্বালা-পোড়া, অসহায়তা? আমাদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বপ্ন-স্বাধীনতা, চোখের সামনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে উড়ছে— মাতৃভূমি দেশমাতার ক্ষতঅঙ্গের শ্মশানভূমিতে এখন কেবল ছাই উড়ছে, ঘর পুড়ছে, আগুন জ্বলছে, দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের শিখা— ভারতবর্ষের আকাশের রং পালটে দিচ্ছে,— আমাদের হৃৎপিণ্ডকে দগ্ধ করছে।

আমরা বোলপোতা গ্রামের মানুষজন গত ক'মাস ধরে বাতাসে প্রায়ই খবর পাচ্ছিলাম যে, হিন্দুস্থান থেকে তাড়া-খেয়ে-আসা বিহারি মুসলমানরা পাশের গ্রাম মনোহরপুরে জড়ো হচ্ছে এবং তারাই বোলপোতা গ্রামের হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে গ্রাম দখল করবে। এ-ব্যাপারে বোলপোতা গ্রামের হিন্দুরা মনোহরপুরের স্থানীয় মুসলমানদের কাছে সঠিক সংবাদ জানতে চাইলে তার উত্তরে তারা বললেন যে, হিন্দুস্থানে দাঙ্গায় তাড়া-খেয়ে-আসা বিহারি মুসলমানরা এ-অঞ্চলে কুমতলব নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আর তারা যে বোলপোতা গ্রামের হিন্দুদের আক্রমণ করবে না— এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। এই সংবাদ শোনবার পর থেকে বোলপোতা গ্রামের হিন্দুদের মনে ভয় ঢুকে যায়। গ্রামের সব মানুষ

সন্ধ্যায় আমাদের উঠোনে সভা ডেকে পরামর্শ করতে বসেন। সে-সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়, বোলপোতা গ্রামের দখল নিতে বিহারি মুসলমানরা প্রস্তুত হচ্ছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং বোলপোতা গ্রাম হিন্দুদের অবশ্যই ছাড়তে হবে। তার জন্য যে-যার মতো যত শীঘ্র সম্ভব নিজের নিজের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেবেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর ইতিমধ্যে কেউ কেউ তাঁদের ভারী মালপত্র— ট্রাঙ্ক-সুটকেস-বাক্স-বোঁচকাবুঁচকি পাশের হিন্দুপ্রধান গ্রাম বড় মান্দারতলায় রেখে আসতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গ্রামের অনেকেই স্বল্প সময়ের জন্য গুছিয়ে উঠতে পারেননি। এমন অবস্থায় আচমকাই বিহারি মুসলমানগণ বোলপোতা গ্রামের পশ্চিম মাথায় ঢুকে পড়ে, যখন ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে দাঙ্গার ত্রাসের শোরগোল তুলে দিল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে গুজব ছড়িয়ে দিতেও ছাড়ল না। বিহারি মুসলমানরা বোলপোতা গ্রামের তিনজন হিন্দুর মাথা কেটে নিয়ে গেছে। দু'জন যুবতী নারীকে ধর্ষণ করেছে। পাঁচজন হিন্দু নারীকে ধরে নিয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি...।

সত্য-মিথ্যা আর গুজব মিলে এমন একটা আতঙ্কের ও ত্রাসের পরিবেশ বোলপোতা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল— তাতে প্রাণভয়ে সব গ্রামবাসী মরিপড়ি ছুটে পালাল পুব মাঠের নাবাল জমির বেনাবনে। কারণ মাঠ-বিল ছাড়িয়ে খাল পার হলেই হিন্দুপ্রধান গ্রাম বড় মান্দারতলা। বিহারি মুসলমানরা পিছনে তাড়া করলে হিন্দুরা প্রাণহাতে নিয়ে ছুটে গিয়ে বড় মান্দারতলায় আপতকালীন আশ্রয় নিতে পারবে। কিন্তু ঘটনা ততদূর ঘটেনি। যদিও একরাতের ঘটনাতেই নিজ মাতৃভূমিতেই হিন্দুরা হলেন পরবাসী...।

মধ্যরাতেই বোলপোতা গ্রামের হিন্দু হাটুরেরা গণ্ডগোলের সঠিক সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁরা লণ্ঠন জ্বেলে মাঠের নাবালে, বেনাবনে হেঁটে এলেন। বেনাবন আর মাঠ টুঁড়ে টুঁড়ে গ্রামের মানুষজনকে সব খুঁজে উদ্ধার করলেন। সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল— বোলপোতা গ্রামের একজন বয়স্কপুরুষ সীতানাথ সমাদ্দার খুন হয়েছেন আর দু'জন হিন্দু যুবতীর উপর অত্যাচার করা হয়েছে। বোলপোতা গ্রামের গোয়ালঘরগুলি, ঢেঁকিঘরগুলি আর ভাঙাচোরা ঘরগুলিই দাঙ্গাবাজরা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে— যার আগুন এখনও ধিকিধিকে জ্বলছে। আমরা সকলে একসাথে এক জায়াগায় জড়ো হয়ে বোলপোতা গ্রামে ফিরে এলাম। সেই রাতেই আমাদের উঠোনে সকলে বসে সভা করলেন— পুলিনমামা, বিজয়মামা, বড়মামা, বনমালি মণ্ডল, পিসতুতো দাদা নরেন সরকার, তাউইমশাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আমার দুই দাদা এবং অন্যান্য যাঁরা ফিরে

এসেছেন হাট থেকে এবং তাঁরাই সঠিক খবর দিলেন। বিহারি মুসলমানগণ যারা হিন্দুস্থান থেকে দাঙ্গার তাড়া খেয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে, তারাই সব জড়ো হয়েছে মনোহরপুর গ্রামে। বোলপোতা গ্রাম থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়েই যে তারা বোলপোতা গ্রাম দখল করবে— সে সিদ্ধান্ত তাদের পাকা। বিহারি মুসলমানদের সঙ্গে আছে স্থানীয় কিছু মুসলমান, যারা আজ বোলপোতা গ্রামে ঘর পুড়িয়েছে, এক বৃদ্ধকে খুন করেছে এবং দু'জন হিন্দু যুবতীর উপর অত্যাচার করেছে। সমস্ত ঘটনাই ঘটানো হয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা মতো। যার উদ্দেশ্য পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের তাড়ানো। দেশ যখন ভাগই হয়ে গেছে, হিন্দুরা কেন পাকিস্তানে থাকবে? এই মোক্ষম যুক্তি দেখিয়ে মুসলমানরা সব এককাট্টা হয়েছে। আজ রাতেই মনোহরপুর গ্রামে মুসলমানরা সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে— বোলপোতা গ্রামের হিন্দুদের আগামিকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিয়েছে, যাতে তার মধ্যে বোলপোতা গ্রামের হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। এমনকী তারা হাট থেকে হিন্দুদের ডেকে এনে, সে সিদ্ধান্তের কথা বলেও দিয়েছে। সময়মতো হিন্দুরা বোলপোতা গ্রাম ছেড়ে না গেলে পরিণাম যে ভয়ংকর খারাপ হবে তাও তারা শুনিয়েছে।

আমাদের উঠোনে সভায় বসে বড়দাদা কিছু বলবার জন্য যখন নড়েচড়ে উঠলেন, তখন তা দেখে বয়স্ক ননী মালাকার আগেভাগে গলা বাড়িয়ে বললেন: এমনডা ঘটবে তা আমরা আগেই আঁচ করেছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা বুঝিনি। কথায় আছে না— 'মেলা আশা ডোলে ধরে না'— আমাগে হইচে সেই দশা। কী দরকার ছিল বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে এই মাঠে খাঁ খাঁ মুল্লকে সস্তায় বাড়িজমি কিনে ডেরা বাঁধা। আর মাত্তর দু'-তিনটি গ্রাম পেরিয়ে গেলেই তো হিন্দুস্থানের মুখ দেখতে পারতাম, বাড়ি করতাম, নিশ্চিন্তে থাকতাম— আজকে এই নারকীয় ঘটনার মুখোমুখি হতে হত না। সস্তায় জমি আর বাঁধা বাড়িঘরদোর আমাগে মাথা ঘুরিয়ে দিল। নালি হিন্দুগে ছেড়ে দেয়া বাড়িতি ফের কোনও হিন্দু বসবাস কত্তি ওঠে রে। এ-গাঁয়ের হিন্দুরা সহসা দেশ-গাঁ ছেড়ে হিন্দুস্থানে পালায়নি। কেন যে এই খাঁ খাঁ শ্মশানে মত্তি আলাম। ননী মালাকার ক্ষোভে দুঃখে হাতাশায় অস্থির হয়ে নিজের মাথার চুল নিজেই টেনে ছিঁড়তে থাকেন।

বড়দার দেহ অবসন্ন, মন বিবশ, তা সত্ত্বেও তিনি স্বগতোক্তির মতো শুকনো গলায় বলে চললেন:

সর্বনাশ ঘটে গেলেও পেটের ক্ষুধা মরে যায় না। আমাদের হাত-পা কোলে

নিয়ে বসে থাকলে, পুরনো কথার জাবর কাটলেও চলবে না। পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ফের আমাদের বাঁচবার সঠিক পথ আমাদেরই বাতলাতে হবে। ভূমিকম্প, বন্যা, রাষ্ট্র-বিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ— সবই ঘটে পৃথিবীতে। কিন্তু প্রকৃতি থেমে থাকে না। রোজ সূর্য ওঠে, নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়, ধানগাছের বুকে থোড় হয়— দুধ সঞ্চয় হয়। মাটিতে পড়া বীজে অঙ্কুর উদ্‌গম হয়। কিছুই থেমে থাকে না। আমাদেরও থামলে চলবে না। যা ঘটে গেছে, একটা প্রাণ চলে গেছে— এ দুঃখ রাখবার কোনও জায়গা নেই। দু'জন মহিলার ওপর অত্যাচার হয়েছে— সে ঘটনাও মর্মান্তিক। কিন্তু বাকি আমরা যারা এখন বেঁচে আছি, তাদের নিরাপদে রাখতে হবে আমাদেরই। বাঁচতেও হবে আমাদের। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এত ভয়ংকর খারাপ যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

দেশভাগের পর এত দ্রুত এত সব বিচিত্র ঘটনা ঘটছে যার সঙ্গে সমানতালে তাল মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারছি না। কিন্তু থামলে চলবে না। পুরনো ভুলগুলোকে নিয়ে ভাবতে বসলেও চলবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতেই হবে, না-হলে যে মারা পড়তে হবে সবাইকে। তাই আজই চলে যেতে হবে। বড়দাদা তার কথা শেষ করে চিন্তায় ডুবে গেলেন নতুন কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

চোখে জল নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পিসিমা ভীরু বেদনার্ত স্বরে বলেন: ভগবান আমাগে ডাক শুনেছে— তোরা নিরাপদে হাট থেকে ফিরি আলি। সবারই ধড়ে পরানডা আছে রে, এ্যাহোনো তোরা বাঁচনের মতো এট্টা কিছু কর রে বাবা। বিজয় জয় নরেন— তোরা এ্যাহানে আর এট্টি বেলাও থায়িসনে, বাবারা। এ জ্বালা আর সহ্যি হয় না। পরান বাঁচাতি মানের ভয়ে সকলই তো পালাতিছে রে। ধড়ে পরান থাকতি চ বাবা, পালাই। পালানোর চেষ্টা তুচ্ছ নয় রে। নিজি বাঁচলি বাবার নাম, বাঁচার বাড়া কী আছে রে এ সংসারে? তোরা আর দেরি করিসনে, দিন থাকতি রওনা দে। চ...।

পিসিমা কথা শেষ করতে পারলেন না। বুক ভেঙে তাঁর কান্না ছাপিয়ে গেল। পাঁজরার তলায় তাঁর হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সভা শেষ হতেই সকলে উঠে যে-যার ঘরে গেল শেষ সম্বলটুকু গুছিয়ে নিতে। কিন্তু ঘরে গিয়ে যা দেখল তাতে অনেকেরই মাথায় হাত। জিনিসপত্র প্রায় সবই লুট হয়ে গেছে। রান্নাঘরের এঁটো থালা, হাঁড়িকুড়ি হাতা-খুনতিই কেবল পড়ে আছে। গয়নাগাটি, কাপড়চোপড়, লেপতোশক, চাদর-বিছানা— কিছুই রেখে যায়নি মুসলমানরা। দা-বটি, খোনতাও তারা নিতে ছাড়েনি। সমস্ত

ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে যা যৎসামান্য শেষ সম্বল যে-যা পেলেন তাই গুছিয়ে ধামায় ভরে শিকে বাঁকে বাঁধিয়ে, অনেকেই রাত পোহানোর আগেই পথে নেমে হাঁটতে শুরু করলেন। কারণ হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দিয়ে তাঁদের দেশত্যাগে বাধ্য করানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবেই যেখানে আক্রমণ চালানো হয়েছে সেখানে যে কোনও মুহূর্তে হিন্দুরা আক্রান্ত হতে পারেন— এই ভয়েই অনেকেই রাত পোহানোর আগেই, বোলপোতা গ্রাম চিরদিনের মতো ছেড়ে, পথে নেমে আপনজন সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

আমাদের বাড়িঘরে কিছুই প্রায় ছিল না। সবই লুঠ করে নিয়ে গেছে দাঙ্গাবাজরা। থাকার মধ্যে ছিল হাঁড়ি-খুন্তি-হাতা-থালা-ঘটি, রান্নার কিছু সরঞ্জাম। গয়না-লেপতোশক, কাঁথা-কাপড় সবই লুঠ হয়ে গেছে। যা কিছু শেষ সম্বল পাওয়া গেল তাই গুছিয়ে ধামায় ভরে মেজদাদা শিকে বাঁক কাঁধে তুলে পথে নেমে পড়লেন।

আমরা আত্মীয়স্বজন সব মিলে মোট পাঁচটি পরিবারে সাতাশজন ছোট-বড় মানুষ একসঙ্গে মাঠের পথে নেমে হাঁটছি। প্রত্যেকের হাতে মাথায় ঘাড়ে বোঁকচা-বুঁকচি আর সাংসারিক নানা টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। মেজদাদা জয়হরির কাঁধে শিকে বাঁক, তার দু'দিকের ধামায় হাঁড়ি কড়াই থালাবাসন আর রান্নার নানা জিনিসে ঠাসা। শিকে বাঁক আছে পিসতুতো দাদা নরেন সরকারের কাঁধে, বড়মামা বনমালী মণ্ডলের কাঁধে আর আছে আমাদের তালুইমশাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কাঁধে। খুঁজে-পেতে যে সাতটি গোরু আমাদের পাওয়া গেছে। সেগুলিকে একদড়িতে ছান্দে বাঁধা। লম্বা দড়িটা ধরা আছে বড়দা বিজয়কৃষ্ণের হাতে। তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। তাঁর পিছনে আমার দুইদিদি, বউদিরা, পিসিমা, মাসিরা এবং অন্যান্য ছোটরা। আমি চলেছি, হাতে একটা বড় ফেরো ঘটি আর মাথায় ছোট্ট বোকচা নিয়ে। সবার পিছনে বড়মামা আর তালুইমশাই— তিনি শিকে বাঁক কাঁধে হেঁটে চলেছেন।

আমরা বোলপোতা গ্রাম থেকে বেরিয়ে মনোহরপুরের ভিতর দিয়ে যে কাঁচা রাস্তা গিয়েছে, সে-পথে না-গিয়ে সোনাকুঁড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে কোনাকুনি পায়ে চলা মেঠো পথ ধরে, দল বেঁধে হেঁটে চললাম পুবমুখো। প্রায় আড়াই বছরের বোলপোতার বাসস্থান স্মৃতি পড়ে রইল পিছনে। বোলপোতা গ্রাম থেকে চিরদিনের মতো বাস উঠিয়ে মানুষজন, গোরুবাছুর যা কিছু শেষসম্বল ছিল তাই সঙ্গে নিয়ে আমরা চলেছি। আমাদের পায়ের পাতার তলায় কখনও ভুঁইচাপা ফুল, সবুজ দুর্বাঘাস, ভাদলাঘাস, চাপড়িঘাস, বুড়িপানলতা আবার

কখনও শক্ত মাটি আর ধুলোময় পথ। পায়ে-চলা পথের দু'ধারে ঘন বেনাবন, কখনও চেঁচো ঘাস, মালিপোতা এবং অন্যান্য সব ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ সকলকে মাড়িয়ে, এড়িয়ে আমরা চলেছি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছি আমরা। খাড়া বুনোপথটা উঠে গেছে বাঁধানো কাঁচা রাস্তায় পারিঘোপ গ্রামে ঢুকবার মুখে খালের ওপর সেতুতে উঠতেই মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, বেঁটেখাটো মোটা মুগুরের মতো চেহারা, এক মধ্যবয়স্ক মুসলমান হলদে চোখ নাচিয়ে সামনে এসে কোমরে হাত বাঁধিয়ে ধমক দিয়ে কয়: হেই, তুমরা সব গোরুবাছুর মানুষজন মোটমাটালি নিয়ি কই যাও? হিন্দুর থান তো তোমাকে পিছি পড়ি রইল! বলি, ইদিক পানে ক্যান যাও? কনে যাতিছ তুমরা, কও দিনি। উশকোখুশকো দাড়ি নাড়িয়ে চোয়ালের মোটা হাড় ভাসিয়ে লোকটা আমার কপালে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রেখে কয় আর নিঃশ্বাসে বগবগ করে পচা পেঁয়াজের গন্ধ ছড়ায়। বাতাস কাঁপে তিরতির করে।

আমাদের সামনে হেঁটে-আসা তিনজনের আর একজন— খালি গা, বুকে লোম, কোমরে ডোরাকাটা গামছা গিঁট দিয়ে বাঁধা, মুখটা ছুঁচালো, মাথা বেঢপ, হাতের আঙুলগুলোর গিঁট মোটা, লম্বা পা বাড়িয়ে এসে চড়া সুরে শুধোয়: অ্যারে তুমরা ইদিকি ক্যান খালি খালি মত্তি অ্যালি? বাঁচতি হলি হিন্দুর থানে গিয়ি মরো, এ্যাহানে বাঁচন নাই। কতা যা কলাম, মনে রাখপা তুমরা, নালি মরবানে পতে গাটে, কলাম।

লোকটা কথা বলে আর চোখ গোল্লাগোল্লা করে তাকায়, মোচের তলে শুকনো হাসি হেসে মোড়লির বাহাদুরি দেখায়। লোকটা কালো হাতটা দিয়ে দাড়িতে বুলিয়ে নিয়ে ফের কয় কড়া ঝাঁঝে: এ-দেশটা দেখছি তুমাগো ভারী মিঠে লেগে গেছে— তাই না?

অন্যজন তার চওড়া কাঁধ লোমশ বপুটি গড়িয়ে নিয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করে মাথা চুলকোয় আর গুনগুনিয়ে কী-একটা সুর ভাঁজে... দিদি বউদির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটে বিশ্রী ভাবে।

লোকগুলোর কড়া কথার ঝাঁঝ আর পচা পাতার গন্ধ মিলে সকালের বাতাস গুলিয়ে উঠেছে। ভয়ে ভাবনায় আমার মাথা ঘোরে। এমনিতে দাড়িঅলা মুসলমানদের দেখলে আমি ভয় পাই। এখন এদের ভাবভঙ্গি দেখে প্রাণ আমার ধুকধুক করে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। দু'হাতের এক হাতে মাথার বোঁকচা সামলাই অন্য হাতে বড়দিদিকে জড়িয়ে ধরে বিস্ফারিত চোখে দেখি আর ভাবি এরাই কি সেই দাঙ্গাবাজ মুসলমানরা, যারা বোলপোতা গ্রামের ঘরবাড়ি সব

আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কাল রাতে?

গোরুবাছুর তাড়িয়ে নিতে নিতে বড়দা সহজসরল ভাবে বলেন, কী কও মিয়া ভাই? আমরা যাচ্ছি বড়মান্দারতলায় খালাতো ভাইয়ের বাড়ি।

বড়দার কথা শেষ না হতেই বুকে লোম, খালি গা, মুখে দাড়ি— চোখেমুখে দপ করে আগুন জ্বালিয়ে বড়দাদার সামনে রুখে এসে শুকনো মাটিতে জোরে জোরে গোড়ালি ঠুকে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে কয়: হেই, হিন্দুর বাচ্চা, কী কলি তুই? আরবার ক-দিনি, মাতা টানি ছিঁড়ি ফেলবানে— কথা তার শেষ হয় না। ভেতরে চিতাবাঘের মতো গর্জাতে থাকে। চোখে তার আগুনের দাউ দাউ হলকা ছুটতে থাকে। রাগে কোঁচকানো ভুরুদুটো বাঁকা চাঁদের আদল নেয়।

বড়দা ঘাবড়ান না। শান্ত ধীর গলায় আন্তরিকতা ঢেলে দিয়ে বলেন: ক্যান, কিছু কি ভুল কইলাম ভাই? এমন রাগো ক্যান ভাই? বড়দা চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।

মুখে দাড়ি, খালি গা, একটু যেন দম নেয়, কয়, মিঞা ভাই, কও ক্যান শুনি? আমরা কি মানুষ না, নাকি? রাগে গরগর করে ফের গর্জে ওঠে সে। ওর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি বড়দার মুখের ওপর যেন ধারালো ছুরির মতো বিঁধে থাকে। দাঁত বের করে জবারের অপেক্ষা করে সে।

ক্যান, আগে তো কইচি কত। তহন তো রাগোনি ভাই! বড়দা তাঁর ভুলটা বুঝতে পেরে নরম সুরে আরও বিনয়ী হয়ে বলেন, ভুল হলি মাপ চাইচি ভাই। আর এমন কথা কহোনো কবো না। যা কলি রাগো, তা খামোকা ক্যান কবো। কী ভাই, যা কলাম তা মানলে তো ভাই? বদলে-যাওয়া সময়ের সঙ্গে এ ভাবেই তাল মিলান বড়দা। ওদের সকলের মুখগুলোতে যে আজ কুড়লের ধার তা তিনি ভাল ভাবেই বোঝেন। হয়তো বাতাস শুঁকেও বিপদের গন্ধ টের পান। তাই ফের হাত দু'টি জোড় করে তিনি বলেন— মাপ করো ভাই, কঠিন বিপদে পড়ে মাথাও ঠিক নেই ভাই, কী কতি কী কলাম ভাই— এটুকু মানি নাও ভাই।

নীলের ছাপলাগা মুখের ভাব তার একটুও বদলায় না। পাতলা ঠোঁট দুটো তার মাঝে মাঝে কাঁপতে থাকে কীসের জ্বালায় যেন; পুরনো সব কতা ছাড়ান দ্যাও। দিনকাল পালটে গেছে কলাম। এহোনো আমাগে এই পাকিস্তানে বাস কত্তিছো তুমরা— বুজে শুনি কতা কবা। নালি গলার নলি টানি ছিঁড়ি নেবানে। যাও যাও মাঠ মারাও গে যাও। আর কহোনো এমন কতা কবা না কলাম। কথা বলতে বলতে রাস্তা থেকে নেমে গ্রামের একপেয়ে বুনোপথে ঢুকে গেল দ্রুত

পায়ে। কতই না বাহাদুরি তাদের চোখেমুখে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, যা তারা বাতাসের বুকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেন এ পৃথিবী কেবল তাদেরই। ধরাকে সরা জ্ঞান করা আর কাকে কয়— এদের না দেখলে তা জানতে পারতাম না। বুঝতেও পারতাম না কোনওদিন।

আমাদের মাথার উপর রোদ চড়চড় করে উঠতে থাকে। রাস্তার দু'ধারের বড় বড় গাছগাছালির তেলচিক্কন পাতায় চিকচিক করে পিছলে যায় রোদের কিরণ। বড়দাদা পা চালিয়ে কিছুদূর হেঁটেই ডান দিকে মোড় নিয়ে নতুন রাস্তা ধরলেন। এখানে রাস্তা মানে একটা পুরনো ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত ভাঙাড়, পায়ে-চলা ফুটকাটা মেঠো পথ, দু'পাশে ঘন ঝামটি গাছের ঝোপজঙ্গল হেরাঞ্চি, শিয়াকুল গাছেরা সব প্রাণের আনন্দে বেড়ে উঠেছে। ফুল-ফলে ছয়লাপ ঝামটিবন ভেঙেচুরে মাড়িয়ে আমাদের গোরুগুলি ছুটতে থাকে শব্দ করে। উড়তে থাকে বুনো পোকামাকড়, প্রতিবেশী প্রজাপতি আর মরা মাটির শুকনো ধুলো।

পাঁচপোতা গ্রামের পথে রশি দুই যেতে-না-যেতেই পথের ধারে কলাগাছে ঢাকা চাষিবাড়ি থেকে পিলপিল করে মানুষজন বেরিয়ে আসেন। তারা পায়ে-চলা পথের কোল ঘেঁষে দাঁড়ান। চোখ কপালে তারা আমাদের দেখেন আর পরস্পর ফিসফিস করে কী যেন বলেন— তার একটি কথাও শোনা যায় না। কিন্তু আমাদের চেহারাছবি যে ইতিমধ্যে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে তা সহজেই বোঝা যায়— পথের কষ্টে দুশ্চিন্তায় মুখগুলো সব নিষ্প্রভ। মাথাটা ভারী হয়ে বুকের ওপর এলিয়ে পড়তে চায় যেন সকলের। কষ্টে-দুঃখে-দুশ্চিন্তায় আমাদের চোখে বুঝি সর্ষেফুল ফুটতে থাকে অথচ হাঁটার বিরাম নেই হেঁটে চলি...।

পথে দুই চাষি উরোত পর্যন্ত হেটো ধুতি টেনে তুলে হাল-জোয়াল কাঁধে গোরু খেদিয়ে নিয়ে চলেছেন। বোঁকচাবুঁকচি নিয়ে আমাদের যেতে দেখে এক চাষি আর-এক চাষিকে ডেকে কয়:

মধু মোড়ল, বাতাসের মুখি শস্য ছাড়ি দিলি সেগুলি ভাসতি ভাসতি কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই মাটিতি পড়ে। বীজে অঙ্কুর গজায়। চারাগাছ পাতা ডাল মেলে দেয় আকাশে, শিকড় ছড়িয়ে দেয় মাটিতি। নতুন গাছে ফের ফুল-ফল ধরে। ফলের ভেতর বীজ হয়। এই মানুষগুলিও ভাসতি ভাসতি কোহানে যাবেনে, কোথায় যে থিতু হয়ি শেকড় গাড়বেনে। হায় হায়, দ্যাশ ভাগে মানুষের কী দশা চোখে দ্যাখা যায় না! কী যে হল দ্যাশের একেবারে খাঁ খাঁ করা শূন্য-গাঁ। কথা তার শেষ হয় না। ভেতরটা তার যেন গুমরে কাঁদে। প্রাণ আনচান করে।

অন্যজন চিন্তিত ভাবে চুপ করে শুনতে শুনতে হাঁটেন, আর বলেন, এই

হল জীবনের চেহারা। পরস্পরের ওপর মানুষের মন কী রকম বিশ্রী ভাবে বিষিয়ে আছে, মানুষ দেশ ছাড়তে চায় না, তবু ছাড়তে হয়— দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষতেই একজন আরেকজনকে অবিশ্বাসের অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। হায় হায়, হায় রে স্বাধীনতা, কী হল দ্যাশের!

কথা বলতে বলতে চাষিরা অন্য পথে নেমে যান। আর আমাদের চোখের জল শুকোয় না। আমাদের কষ্ট দেখে গাছের পাখিও কাঁদে, নদীর জল, ক্ষেতে ধানের গাছও বুঝি কাঁদে। গত পরশুদিনও যে মানুষের আকাশচুম্বী গুমোর ছিল, আজ তারাই পথের ভিখারি। কতটা অসহায় হলে মানুষজন তার শেষ সম্বলটুকু মাথায় তুলে নিয়ে পথে পা বাড়ায় তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। প্রাণভয়ে যারা পথে নেমে হাঁটছেন, তাদের যে সবার বুকে ঘরপোড়া আগুন জ্বলছে, দেশভাগে মানুষের চেহারাটা অবধি থেঁতলে বিকৃত করে দিয়ে গেছে। চোখেমুখে মাথায় ছাই উড়ছে, বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, দেশভাগে প্রাণ পুড়ছে।

বুকে যাদের আগুন জ্বলছে, মুখে তাদের কথা জোগায় না। খিদেয় পেটের নাড়িভুড়ি বুঝি ছিঁড়ে খাচ্ছে। অথচ হাঁটা ছাড়া গতি নেই। একদণ্ড গাছের ছায়ায় বিশ্রামেরও অবকাশ নেই। বিপদের মুখ থেকে প্রাণটুকু নিয়ে যেন পালাতে পারলেই আমরা বাঁচি। গ্রামের মধ্যে ভাগাড়ে শুকনো মাটির ধারালো পথ মরিয়া হয়ে হেঁটে চলেছি আর অনিশ্চয়তার আঁধারে কেবলই হাতড়ে চলেছি একফোঁটা আশ্রয়ের আস্তানা-ঠিকানা...

পাঁচপোতা গ্রাম ছাড়ালেই বড় মান্দারতলা গ্রাম। গ্রামের মধ্যিখান দিয়ে ভাগাড়ের মতো মেঠো ভুঁইতে এলোমেলো ঝোপঝাড়ে আর বুনো ঘাসে-ঢাকা পায়ে-চলা সরু একটি পথ। পায়ে চলা সরু পথটাই এঁকেবেঁকে চলে গেছে পশ্চিমমুখো গ্রামটাকে দু'দিকে চিরে ফেড়ে দু'ভাগে। ভাগাড়ের দু'ধারে মাটির দেওয়াল খোড়ো চালের ফাঁকা ফাঁকা মানুষশূন্য ঘরবাড়ি কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও মানুষজনের কোনও সাড়াশব্দ নেই। খাঁ খাঁ শূন্যতাকে মাথায় নিয়ে ঘরগুলো ধুঁকছে। একটু ঠেলে দিলেই বুঝি হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়বে। শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'-একখানা বাড়িঘরের মধ্যে ঘরবাড়ি পাহারা দেবার জন্যই বুড়োবুড়ির মৃদু চলাফেরার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে অথবা যে বুড়োবুড়ি বাপঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের মাটির মায়ার শিকড় কিছুতেই টেনে ছিঁড়তে পারেননি তাঁরাই স্মৃতির সুতো ধরে টিম টিম করে জ্বলা প্রদীপের মতো রয়ে গেছেন ছাড়া বাড়িঘরে। সেদিকে তাকালেই একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ফেটে বেরিয়ে

আসে। আর চেতনার কুল ছাপিয়ে আছড়ে পড়ে কান্নার অন্তহীন ঢেউ, হাহাকার...

নাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে পথের বুকে

সূর্যাস্তের এখনও অনেক বাকি। কিন্তু আমার মনের সূর্য অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। দেশভাগে বিদ্বেষের কালো বেনোজলের চোরাস্রোত ঢুকে গেছে মানুষের মনে, রক্তে। তা না হলে এমন হবে কেন? দেশভাগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশ্বাসের ভিতটাই নড়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে সরে গেছে মাটি— তাই তো এত ভয়, এত ত্রাস, এত আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে মনের ভেতরটা। প্রাণ নিয়ে, মান নিয়ে এত টানাটানি। পথে এত সব ঘটনা ঘটাতে আমার লোমকূপের তলায় হিমভয় ঢুকে গেছে। খাঁ খাঁ-করা খালি বাড়িগুলির দিকে তাকালেই ভয় ছুটে এসে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খেতে থাকে। পাথরের মতো ভারী-আড়ষ্ট পা-পাতা টেনে টেনে হাঁটি। হেঁটে একপেয়ে এলোমেলো পথ ধরে আমরা পৌঁছে যাই বড়মান্দারতলা গ্রামের পশ্চিম মাথায়। এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো ভাঙাচোরা পাঁচ-ছ'খানা খড়োঘরের বাড়ি খালি পড়ে আছে। যত্নের অভাবে কোনও বাড়িই আর বসবাসের যোগ্য নেই। এই সব খালি ঘরবাড়ির মানুষজন সর্বস্ব ফেলে রেখে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে গেছেন হিন্দুস্থানে।

অনেক খোঁজাখুঁজি আর ভাবনাচিন্তার পর একটি ভাঙাচোরা খালি বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। নোনাধরা, চলটা-ওঠা, মাটির পুরনো দেওয়াল— মেঝেটা এবড়ো-খেবড়ো। তার পরে আবার ইঁদুর গর্ত করে আস্তানা গেড়েছে। খড়ের পুরনো ছাউনিতে বর্ষায় জলচোয়ায়। মাটির ফাটা দেওয়ালে চোয়ানো জলের স্রোতের দাগ চকচক করছে। এ বাড়িতে সর্বমোট চারখানা খড়োঘর আর বাড়ির বাইরে খলেনের লাগোয়া ঘরটি গোয়ালঘর। ঘর ক'খানাতে উঠব বলেই আমরা উঠোনে সবাই জড়ো হলাম। মাদুর পেতে মালপত্র রেখে শরীরের সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সকলে হাত লাগালাম বাড়িটার ঘরগুলোকে বাসযোগ্য করে তুলতে। কেউ কেউ গেলেন রান্নার জোগাড় করতে। কেউ ছুটলেন গোরুবাছুরের ঘাস কাটতে। আমরা ক'জন ঘরের, বাড়ির কাজ কিছুটা সেরে গেলাম পাশের হিন্দুবাড়ির পুকুরে স্নান করতে। খেজুরগাছের গুঁড়ি হাত-তিনেক লম্বা করে কেটে, বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুকুরের কাঁচা ঘাট বাঁধানো— যাতে ডাঙা থেকে সহজে জলে নেমে যাওয়া যায়। ভয়ে ভয়ে ঘাট মাড়িয়ে

দু-তিনটি ডুব দিয়ে জল থেকে উঠে পড়লাম। ফিরে এলাম ঘরের নামে ইঁদুর-ছুঁচোর আর সাপপোকের আস্তানায়।

বাড়ির দক্ষিণে কলাবাগান। কলাগাছ থেকে সবুজ কলাপাতা কেটে উঠোনের অসমান মাটিতে বিছিয়ে 'পংক্তি ভোজে' বসে সবাই ফেনাভাত খেলাম। ক্ষুধার টানে এত ভাল খেলাম, প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। খাবার পর কষ্টে ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিল। বারান্দায় উঠে শুতে গিয়ে মনে হল ঠেংয়ো ঘরখানা ধুঁকছে। যে কোনও মুহূর্ততে ঘরটি মুখথুবড়ে পড়তে পারে। তবু সেই ঘরই আমাদের এখন পরম আশ্রয়স্থান। ঘরটার একটা দিক রাস্তামুখো— উত্তর দিশারি। সে দিকে টানা বারান্দায় পাতা মাদুরে আড়াআড়ি ভাবে আমরা সবাই গাদাগাদি হয়েই শুই। শুয়েই সবাই ঘুমে একেবারে কাদা। মাঝরাতে মশার অসহ্য কামড়ে ঘুম ভাঙতেই কুপির ম্লান আলোতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম— মাথার তলে বালিশ নেই, গায়ে কোনও কাঁথাই নেই, মেঝেয় ইঁদুর ঠেলা মাটিতে-ধুলোতে পাকা চালমুড়োর মতো গড়াগড়ি খাচ্ছি।

আমরা একসঙ্গে এতগুলো ছোট-বড় মানুষ, শোবার ঘর মাত্র তিনখানা। দু'খানা ঘরের কেবল বারান্দাই ব্যবহারযোগ্য। দুটো ঘরের মেঝে জুড়ে অসংখ্য ইঁদুরের গর্ত। গর্তের মুখে সাপের খোলস। প্রথম রাতটা কী ভাবে কেটেছে তা টেরই পায়নি অসহ্য ক্লান্তিতে আর নাড়িছেঁড়া ক্ষুধায়। দ্বিতীয় রাতে আমরা ভাইরা সব উঠোনে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম। পিসিমা, দিদিরা আর বউদিরা বারান্দায় টানা বিছানা পেতে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লেন। প্রত্যেক রাতে পালা করে সারারাত একজনকে জেগে থেকে পাহারা দিতে হয়— পাছে আবার কোনও বিপদ এসে ঘাড়ে পড়ে, সর্বনাশ না করে যায়! তাই সদাসর্বদা একজন পুরুষমানুষকে সারারাত জেগে থেকে লাঠি আর অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতে হয়।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা জেগে উঠেই বড়মান্দারতলা গ্রামের পরিস্থিতি শুনে, সকলের মনেপ্রাণে হৃদয়ে ভয় ঢুকে গেল। তিন মাইল লম্বা, আধমাইল চওড়া এত বড় গ্রাম অথচ কুড়িয়ে-কাছিয়ে মোট মানুষের সংখ্যা মাত্র ছাব্বিশজন। তাও আবার অধিকাংশ বাড়িতেই জীর্ণশীর্ণ বুড়োবুড়িরা ঘরবাড়ি জমিজমা চোদ্দোপুরুষের মায়ার শিকড় ছিঁড়তে না-পেরে আর ঘরবাড়ি পাহারা দিতে মাটি কামড়ে রয়ে গেছেন।

বড়মান্দারতলা গ্রামের তিনদিকেই মুসলমানপ্রধান গ্রাম। অন্যদিকে বিশাল সোনামোহর বিল। সারা বছর অথৈ জলে ভরা থাকে। ফলে গ্রামে যে ক'টি মানুষ আছেন, তারাও ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যে কোনও মুহূর্তে তাঁরাও মুসলমানদের

দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। ভীত চিন্তাক্লিষ্ট গ্রামবাসীরা যাঁরা আমাদের দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের জীবনে ঘটে-যাওয়া তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে গেলেন। দেশভাগের পর এ-গ্রামের মানুষজনও যে বার দুই মুসলমানদের তাড়া খেয়ে ঝোপজঙ্গল, বিলের নাবালে, বেনাবনে লুকিয়ে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন— সে কথাও তারা শুনিয়ে গেলেন। মুসলমানদের অত্যাচারে আর তাড়া খেয়েই এ গ্রামের হিন্দুরা সব তাদের ভিটেমাটি-স্মৃতিচিহ্ন, ঘরবাড়ি সহায়সম্পদ সর্বস্ব ফেলে রেখে হিন্দুস্থানে চলে গেছেন।

মাটির সস্নেহ আলিঙ্গনে যে জীবন বেড়ে ওঠে, বেঁচে থাকে, সমাজ-সংস্কৃতির নাড়িতে নাড়িতে ছড়িয়ে দেয় শিকড়, সে শিকড় খুব সহজে উপড়ে ফেলা যায় না। গোড়া থেকে মাটি সরে গেলেও মাটির মায়া আজন্ম নাড়ির বন্ধন, কিছুতেই ছিঁড়তে চায় না। তাই এ গ্রামের হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে ভিটেমাটি জমিজমা সব ছেড়ে চলে গেলেও চোদ্দোপুরুষের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারেননি। তাঁদের মা-বাবা, যাঁদের শিকড় সমাজ-সংস্কৃতির আরও গভীরে জড়িয়ে রয়েছে, তাঁরাই রয়ে গেছেন ভিটেমাটি আগলে।

বড়মান্দারতলা একেবারেই অজপাড়াগাঁ। গ্রামের উত্তর দিকে একটা মরা নদীর মাইল তিনেক বাঁক। গ্রামটাও ঠিক ততটাই লম্বা। বাঁকের একমুখে সোনামোহর বিল, অন্যমুখে মনোহরপুর গ্রাম— মুসলমান-প্রধান। মজা নদী হরিহর, গোটা নদীটাই কচুরিপানা, টোপাপানা। শ্যাওলা চেঁচো ঘেচুঘাস, চুনে শ্যাওলা, মুথকুরো ঘাস ও বিচিত্র সব জলজ উদ্ভিদে ভরা। নদীতীর বরাবর কাঁটানটে বাঁশবৈচির, নাটালতার বিচিত্র ঘন জঙ্গল একেবারে নিচু হয়ে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। গ্রামের উত্তর দিকটা তাই দুর্গম। পশ্চিম দিকে আড়ে দিঘে তিন-চার মাইল অথৈ জলভরা মোনামোহর বিল। দক্ষিণ দিক অগভীর বিলের খানিকটা চাষ হয়, বাকিটা বদ্ধ জলাঞ্চল। একমাত্র পুব দিকে সরু মতো ডাঙাভূমি— যার মুখ মনোহরপুর গ্রাম— যা মুসলমান-প্রধান। গ্রামে ঢুকতে বেরুতে হলে এই একমাত্র পায়ে-চলা পথ বা ভাঙাড়। গ্রাম তাই প্রথম থেকেই আমার মনে হল— একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এমন নির্জন জনশূন্য খাঁ খাঁ পাণ্ডববর্জিত গ্রামজীবন আর দ্বিতীয়টি আমি দেখিনি। খোলামাঠ, তাজা সবুজ গাছ-গাছালি ঘেরা, প্রাণপূর্ণ লোকালয়ে বেড়ে ওঠার পর, এই নিদারুণ বিষণ্ণ দ্বীপে এসে পড়ায়, মনটা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। বুক ভরে শ্বাস নিতেও কষ্ট হত। ভয়ে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল।

বড়মান্দারতলা গ্রামের পশ্চিমে শেষতম বাড়ির মালিক সুবল মাজি। মোটামুটি

তিনি সহৃদয় মানুষ। এই মানুষটার সঙ্গেই দাদারা যোগাযোগ করে এই গ্রামে এসেছেন এবং সাময়িক কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। লোকটা বেঁটেখাটো, বলিষ্ঠ চেহারা। একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চোখদু'টি সবুজ। তিনি হেসে হেসে সুন্দর কথা বলেন। বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু এখনও বেশ সতেজ প্রাণবন্ত আছেন। তাঁর স্ত্রী দয়াময়ীও বৃদ্ধা। মাথার চুলগুলি বকের পালকের মতো ধবধবে ফর্সা। কিন্তু চেহারায় বেশ শক্তসমর্থ। হাতে-কানে-গলায় তাঁর সোনার গয়না ঝিকমিক করে। হাতে আরও আছে রাঙাকাড়, রুপোর চুড়ি। গলায় সোনার বেলকুড়ি মালা। নাকে লবঙ্গ, কানে মাকড়ি। খয়েরি ফুলতোলা শাড়ির আঁচল মাথা থেকে কখনও পড়ে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কোনও কাজকর্ম করেন না। বাড়িতেই থাকেন। দুই ছেলে তাদের বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় সংসার। অবস্থা ভাল— ধনী পরিবার। ছেলেদের হাতেই সংসার।

বড় ছেলে ধীমান। ঈগলের মতো নাক, মাথায় লম্বা চুল আর মুখখানা হাসিখুশি। দেখলেই মনে হবে সত্যিই তিনি ভালমানুষ। মানুষকে তিনি দরদ দিয়েই ভালবাসেন। তাঁর ভাই বিমান ছিটছিটে দাগে ভরা লম্বাটে মুখ। ঠিক ঘোড়ার মতো। হাসলে তার লাল মাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। ওদের মা আমার পিসিমার বয়সি। কিন্তু ভীষণ দজ্জাল। আর তেমনই খিটখিটে। ছোট ছেলের বউটি সত্যিই সুন্দরী। জলজ উদ্ভিদের মতো সতেজ চেহারা। যেমন মিষ্টি তেমনই আকর্ষণীয়। মুখে মিষ্টিমধুর হাসি সবসময় লেগেই আছে। পরপর দুটি ছেলের মা হওয়ায় গর্বে তার বুক তিন হাত উঁচু হয়ে থাকে। তার বড় ছেলের বউয়ের চোখ দুটো খয়েরি। গায়ের রং এত সাদা আর এমন মোটাসোটা যেন একটা ময়দার ঠাসা বস্তা। তার পরপর চারটি মেয়ে। তারাও বেশ বড়। পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। কিত কিত খেলে। লুকিয়ে চুরিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ডাংগুলিও খেলে।

আমরা বড়মান্দারতলায় আশ্রয় নেবার পর ধীমান মাজি উঠোনে এসে হাজির— এ কথা, সে কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, দেশভাগের পর এ অঞ্চলের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। নানা স্থানে হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদের অপচ্ছায়া মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখানে সেখানে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠছিল। সত্যি সত্যি গুজব কি না জানি না— এ গ্রামের মানুষ আমাদের ভীত ও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বারতিনেক প্রাণ বাঁচাতে বিলে মাঠে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ-গাঁয়ের দু'-তিনখানা ঘরও পুড়িয়েছে মুসলমানরা। তার পরেই না এ-গ্রামের মানুষ বাড়িঘরদোর জমিজমা সব ফেলে রেখে হিন্দুস্থানে চলে গেছে। আমরাও এতদিন যেতাম, কিন্তু মা-বাবা পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে

যেতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পরিস্থিতি যা এ-গ্রাম ছেড়ে হয়তো একদিন যেতেও হবে। তোমরা গ্রামে এলে একটু তো সাহস হল আমাদের। তোমাদের বিপদে আমরা আছি। থাকো তোমরা যতদিন পারো। ধীমান মাজি ভরসা দিয়ে চলে গেছেন।

ধীমান মাজি যাই বলুক না কেন, এ গ্রামে মুসলমানদের আক্রমণের কথা শোনবার পর ভয়ে আমি আর উঠোনে শুতে পারি না। ভয় যেন আমার রক্তের স্রোতে ঢুকে গেছে। রাত কেন, দিনেও একা একা এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় ছায়া অবধি মাড়াই না। সন্ধ্যা হলেই বারান্দায় উঠে বসি। পেটভরা গু-মুত চেপে পিসিমার গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ি। পেচ্ছাবের বেশি বেগ পেলে এক-একদিন পিসিমাকেও ডাকতে ভয় করে— পাছে শব্দ শুনে মুসলমানরা ছুটে আসে, গলা কাটে। খুব বেশি বেগ পেলে পিসিমা বা দাদাদের কাউকে কুপি হাতে দাঁড়াতে বলি। চোখ-কান-মন সব সজাগ রেখে দৌড়ে গিয়ে কাজ সেরে মরিপড়ি ছুটে আসি।

এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য আমরা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সকলে একসঙ্গে বসে পরামর্শ করতাম। বিপদ মুক্তির— আসন্ন বিপদ মুক্তির পথ খুঁজতাম। এমনই এক পরামর্শ আর আলোচনার মাঝে বড়দা— বাবা মৃত্যুকালে যে-কথা বলেছিলেন এবং সেই মুহূর্তটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন— বাবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন— 'আমরা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছি। বাবা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কাকে যেন আরও কাছে পেতে চাইছিলেন। তিনি গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন— বাবা বিজয়রে, তুই কোথায় বাবা? তুই আমার হাতের নাগালে আয় বাবা। বাবার অস্থির হাত তখনও বড়দাকে খুঁজে চলেছে এদিক-ওদিক।

বড়দা দ্রুত সরে গিয়ে বাবার শিয়রে তাঁর হাতের নাগালে বসলেন এবং বাবার হাতটি নিজের দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বাবা বললেন, বাবা বিজয় রে, আমি তোগে নিয়ে হিন্দুস্থানে যেতে চেয়েছিলাম, তার জন্য এতটা দূর ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু আমি শেষ ইচ্ছাটা পুরণ করতে পারলাম না, বাবা। ঈশ্বর তা আমাকে কত্তি দিল না। বাবা বিজয রে, তোরা কিন্তুক বাবা, এই পাকিস্তানে থাকিসনে, বাবা, তোরা যত তাড়াতাড়ি পারিস হিন্দুস্থানে চলে যাস। এই পাকিস্তানে থাকিসনে, বাবা।

কথা বলতে বলতে বাবার গলা ধরে এল। তাঁর দু'চোখের ডালি ছাপিয়ে গাল বেয়ে অঝোরে অশ্রুধারা গড়িয়ে চলল। হঠাৎই মাথা একদিকে হেলে

পড়ল। সেই মুহূর্তে বাবা চিরদিনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বাবার বলা কথা ভেসে রইল বাতাসে— চেতনাময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়িতে। আজও আমি বাতাসে কান পাতলে স্পষ্ট শুনতে পাই বাবার সেই নির্দেশ, সেই আদেশ— 'তোরা পাকিস্তানে থাকিসনে, বাবা।'

এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বড়দা গলায় খেদ মিশিয়ে বললেন: এই পাকিস্তানে থেকে প্রতিদিন তিল তিল করে মরতে আর আমরা চাইনে। বাবা চিরদিনের মতো চলে যাওয়ার সময় যে-নির্দেশ, যে-আদেশ আমাদের দিয়ে গিয়েছেন, তা আরও আগেই আমাদের পালন করা উচিত ছিল। উচিত ছিল এই পাকিস্তান ছেড়ে, আরও আগে আমাদের হিন্দুস্থানে চলে যাওয়া।

এই আলোচনার পরদিনই আমার বড়দা বিজয়কৃষ্ণ বালা আর পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ সরকার ডাকঘরের মাধ্যমে ছাড়পত্র পাবার জন্য ঢাকার মাইগ্রেশন অফিসে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বড়দা ছিলেন আমাদের আদি বাসস্থান জন্মভূমি ছিয়ানব্বই অঞ্চলের কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী আর সংগঠকদের অন্যতম। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং যশোহর সেন্ট্রাল জেলে একনাগাড়ে নয়মাস বন্দি ছিলেন। ফলে দেশভাগের পর পাকিস্তানে মুসলিম লিগের কাছ থেকে তাঁর ভয়টা ছিল সব থেকে বেশি। সীমান্ত সংলগ্ন বোলপোতার পরিস্থিতি হঠাৎ অবনতি হওয়ায় তিনি আরও বেশি মুষড়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া সীমান্ত শহর নাবারন অঞ্চলের মুসলিম লিগের দৌরাত্ম্যের কথা অনেকের মুখেই শুনেছিলেন।

ছাড়পত্রের আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়ে বড়দা তার পরদিনই ছুটে গেলেন আমাদের মূল বাসস্থান বাপঠাকুরদার চরণধূলি-মাখা জন্মভূমি ছিয়ানব্বই অঞ্চলে। সেখানে বড়দা দশদিন ছিলেন এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ আলোচনা করলেন যাতে একসঙ্গে হিন্দুস্থানে যাওয়া যায়। পরামর্শ করে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে আনলেন সহমর্মী প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব সঙ্গীসাথীদের কাছ থেকে— যাতে ছাড়পত্র পেলেই একসঙ্গে একদিনেই সকলে সীমান্ত পার হতে পারি। বড়দা আশার আলো বুকে নিয়ে বড়মান্দারতালায় ফিরে এলেন।

আমরা অতি সত্বর হিন্দুস্থানে যাচ্ছি এবং ছিয়ানব্বই অঞ্চলের অন্তত বাইশটি পরিবার আমাদের সঙ্গেই পাকিস্তান সীমান্ত পার হবেন— এমন প্রতিশ্রুতিও বড়দা আনতে পেরেছিলেন।

বড়মান্দারতলা গ্রাম এবং তার আশপাশের গাঁ-গ্রামের অবস্থা প্রতিদিন অতিদ্রুত আরও খারাপের দিকে যেতে থাকল— ছোটমান্দারতলার পরান মণ্ডলের বাড়িতে ডাকাত বেশে মুসলমানরা প্রায় দিন-দুপুরে সর্বস্ব লুঠ করল। আর ফিরে যাওয়ার সময় দুজন হিন্দুকে খুন করে ফেলে রেখে গেল। ছোটমান্দারতলার লাগোয়া গ্রাম— বুঁচতলার শান্তি প্রামাণিকের যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। পারিঘোপ হাটে হিন্দু দোকানদারদের হাট থেকে মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিল। পাঁচপোতা গ্রামের সনাতন হাজরার যুবতী মেয়ে মালতীকে পুকুরঘাটে ফেলে তিনজন মুসলমান যুবক ধর্ষণ করল। আর পথেঘাটে হাটেমাঠে হিন্দুদের ওপর নিত্যদিন তো হামেশাই জুলুম-অত্যাচার হতে থাকল। এত সব খবর বাতাসের মুখে উড়ে উড়ে আসছিল আর আমরা ভয়ে-ভাবনায় চমকে চমকে উঠছিলাম। আমরা পাকিস্তান ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে যাওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া। অথচ ছাড়পত্র আসছে না। বড়দা প্রতি দু'-তিন দিন অন্তর ডাকঘরে ছাড়পত্রের খোঁজে ছুটে যান। আর প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে আসেন।

বড়মান্দারতলায় আমাদের প্রাণগুলোর আশু নিরাপত্তার জন্য সকলে মিলে গড়া হল 'জাঠা'— যারা সারারাত জেগে লাঠি-দা-ছোরা আর আলো নিয়ে গ্রামের মানুষদের পাহারা দেবেন, নিরাপদে রাখবেন। আসলে এই বড়মান্দারতলা গ্রাম ছেড়ে যে সব হিন্দুরা চলে গেছেন, তাঁরা তাঁদের চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়া দিয়ে আমাদের মনে যে নিরাপত্তার অভাববোধ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন, প্রতিদিনই আমরা চলতে ফিরতে, খেতে-পরতে হাসিকান্নার মধ্যেও নিরুদ্‌বিগ্ন জীবন খুঁজে পেতাম না। আমি তো ভয়ে কোথাও পা বাড়াতাম না। দুশ্চিন্তা আর ত্রাসে আমাদের দলের প্রতিটি মানুষের খাওয়া-ঘুম একদম কমে গিয়েছিল। বড়দা তো কোনও কোনও রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম না এলে কুপি জ্বালিয়ে বই পড়তেন, লিখতে বসতেন। আর তাতেও মন বসাতে না পারলে উঠোনে পায়চারি করে সারারাত কাটিয়ে দিতেন।

ছিয়ানব্বই অঞ্চল থেকে বারবার খবর আসতে থাকল— কবে আমরা একসঙ্গে পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুস্থানে পা রাখব। ছাড়পত্র না-পাওয়ার জন্য বড়দা কিছুতেই নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে পারছিলেন না। অথচ পাকিস্তান ছাড়তে আমরা কেবল প্রস্তুতই হচ্ছিলাম না— এক পা বাড়িয়েই দাঁড়িয়েছিলাম। পাছে দেরিতে প্রাণটাই হারাতে হয়। এই ভয়ে-ভাবনায় আমাদের রাতে ঘুম ছিল না, আহারে রুচি ছিল না।

সন্ধ্যার পর উঠোনে মাদুর পেতে সবাই ফের পরামর্শ আর আলোচনা করতে বসি। পাকিস্তানে যখন কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়, বিপদ আমাদের সামনে হাঁ করে ওতপেতে আছে— সুযোগ পেলেই খাবে। লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। আর আমরাও মনে মনে তো পাকিস্তান থেকে আমাদের শিকড় উপড়ে নিয়েছি। সুতরাং ছাড়পত্র সংগ্রহ করতেই হবে। হিন্দুস্থানে উড়ে যাওয়ার জন্য ডানা আমাদের প্রস্তুত হয়েই আছে। কেবল ছাড়পত্র না-পাওয়ার জন্য দুশ্চিন্তার ভারী পাথর বুকে চাপিয়ে নিয়ে, প্রতিটি দিন এবং রাত কাটাতে হচ্ছে।

পরিস্থিতি যখন এমন। এক সন্ধ্যায় আলোচনায় অংশ নিয়ে আমাদের বড়দা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, সঙ্গীসাথী সঙ্গে না-নিয়ে সীমান্ত পার হলে আমরা কোথায় ভেসে যাব তার কোনও ঠিকঠিকানা থাকবে না। তাই স্বজন-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়েই আমরা সীমান্ত পার হব। মরতে হয় একসঙ্গেই সবাই মরব। সে-মরণে সুখ পাব, শান্তিও পাব। এই জন্য আগামীকালই আমি ঢাকায় রওনা দেব। ঢাকা অফিস থেকে হাতে হাতে ছাড়পত্র নিয়ে আসব। না-না একমুহূর্ত দেরি করলে প্রাণগুলোই হয়তো আমাদের চলে যাবে। বড়দা ফের অথৈ চিন্তাস্রোতে ডুবে গেলেন।

মাদুরে বসেছিলেন আমাদের পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি গভীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে জোর দিয়ে বললেন, ভাইডি, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। এ ভাবে এখানে থাকা কিছুতেই ঠিক হবে না। আগামীকাল ভোরেই আমরা যাত্রা করব ভাই। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।

নয়দিনের মাথায় বড়দারা ফিরে এলেন বড়মান্দারতলায়। আমাদের বুকের মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠল— হয়তো বাঁচবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। যদিও মাতৃভূমি ত্যাগের উদ্বেগের কালো ছায়া পড়েছে মুখেচোখে, চেহারায়। এরই মধ্যে কারও কারও গায়-মাথায় যেন ধুলো উড়তে শুরু করেছে। ভেতরে ভেতরে নাড়ি ছেঁড়াবার অন্তহীন যন্ত্রণার তাপ-আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে, পুড়ছে হৃৎপিণ্ডও।

বাঁধাছাদা মালপত্তর সব জিনিস, গোছানোয় তিনটি দিন আর দু'টি রাত ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। মোটমাটালি বোঁচকা-বুচকি, পুঁটুলিপাট্‌লা সব বাঁধাই ছিল। বাকি ছিল তা কেবল মাথায় তুলে নেবার অপেক্ষায়।

শেষবারের মতো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমরা, জন্মভূমি যশোহর জেলার প্রিয়তর মাটি থেকে বিদায় নিয়ে, মোটমাটালি বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় তুলে নিতে যখন ব্যস্ত, তখন বড়দা কুঁকড়ে কেঁদে বললেন, ভাইডি রে, তোরা

সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নে রে, আমার শরীরে মনে হয় একবিন্দু বল নেই। আমি কেবল কাপড়ের খতিবাঁধা দলিলপত্র আর নতুন বস্ত্রে বাঁধা ভিটের পবিত্র মাটির যে বোঁচকাটি আছে, সেটি মাথায় তুলে হাঁটব। এ কথা বলে বড়দাদা সেই বোঁচকাটা দু'হাতে ধরে মাথায় তুলে নিলেন। দু'চোখে তাঁর অশ্রুজল টলমল করে উঠল। একটু নাড়া পড়লেই বুক ভাসিয়ে তা অঝোরে ঝরবে।

সোনাডাঙার ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যে মেঠো পায়ে-চলা পথটা ছোটমান্দারতলার মাথা ছুঁয়ে সোজা বুঁচতলা গ্রামে প্রায় তুড়িলাফ মেরে ঢুকে গেছে, আমরা সেই পথ ধরে আগুপিছু হাঁটছিলাম— যেন যাযাবররা এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে চলেছে।

মূল-শিকড়ের সন্ধানে

আমার শিকড় ছেঁড়া জীবন হচ্ছে সময় সত্যের বাস্তব ইতিহাস— ভারতবর্ষ ভাগে, বঙ্গদেশ ভাগে নমঃশূদ্র নৃগোষ্ঠী (Race) নয়, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর (Nation) বৃহত্তম ট্র্যাজেডি। একটা দেশ ভাগ হয়ে যাওয়া, একটি জনগোষ্ঠী ভাগ হয়ে যাওয়া মানে নিছক রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন নয়, ভাগ হয়েছে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি, বহুখণ্ডে খণ্ডিত হয়েছে— নমঃ শূদ্র জনগোষ্ঠীর তাঁদের ভাষা, আচার-আচরণ আর জীবনচেতনাও। বিভাজনের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছেন গোটা ভারতবর্ষ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁদের সংকট, সংগ্রাম, বেদনা-বিপর্যয়ের ইতিহাস-কাহিনি এ। এ-কাহিনি আমার সময়ের, আমার জন্মভূমি মায়ের অঙ্গচ্ছেদের আর আমার জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনচিত্র ও কাহিনি। এই জীবন-ইতিহাস আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ দেশভাগের সর্বনাশা উত্তরদায় এখনও বহন করে চলেছেন বঙ্গভঙ্গের বলি এই নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর অগণন আশ্রয়ছিন্ন মানুষজন।

গঙ্গানদীর প্রধান দুই ধারা— ভাগীরথী আর পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগ বঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থল। এই কেন্দ্রস্থলের মধ্যমণি যশোহর রাজ্য। এ-ভূমি গড়ে উঠেছে ভাগীরথী-পদ্মার পলিমাটিতে। তাই এ-ভূমিখণ্ড অত্যন্ত প্রাণময় আর শস্যশ্যামলা।

মৌর্যসম্রাট অশোক বিখ্যাত কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রাক্কালে দক্ষিণ ভারত থেকে বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই সৈনিকরা রক্ত-সম্পর্কে ছিলেন সম্রাট

অশোকেরই বংশের মানুষজন। কলিঙ্গ যুদ্ধে এত মানুষ মারা যায় যে, বর্তমানের বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় মানুষ শূন্য হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে জয়ী অশোকের সৈন্যগণ জ্ঞাতি-স্বজনগণ দক্ষিণ ভারতে আর ফিরে না-গিয়ে বঙ্গভূমির উর্বর ক্ষেত্রেই বসবাস করতে থাকেন। নৃতত্ত্বে ভারতবর্ষের এই মানুষজন দ্রাবিড় মূল নিবাসী।

বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় তথাকথিত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজাদের রাজত্বকালের শেষে, এ দেশে সেনবংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেন-রাজারা ছিলেন ঘোর ব্রাহ্মণ্যবাদী। আর কুখ্যাত বল্লাল সেন সিংহাসনে বসেই আদেশ দিলেন যে, তাঁর রাজত্বের অধীনস্থ বৌদ্ধরা হয় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম গ্রহণ করবে, তা না হলে মৃত্যুকে বরণ করবে। বল্লাল সেনের সৈন্যগণ অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত বৌদ্ধদের ধরে ধরে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন। এই মহাদুঃসময়ে বহু বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করে প্রাণরক্ষা করেন। বাকি বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে নতিস্বীকার না-করে কেউ কেউ যুদ্ধে প্রাণ দেন। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। যাঁরা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন, তাঁরা আশ্রয় নেন বর্তমানের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি নদীনালা-খালবিল আর নলখাগড়ার জঙ্গলপূর্ণ দুর্গম অঞ্চলে। অন্যরা পালিয়ে যান তিব্বতে-চিনে প্রাণরক্ষা করতে। আর তাঁদের ভাষা-সাহিত্য 'চর্যাপদ' কে রক্ষা করতে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশেষ ধর্মমত না হয়ে সর্বজাতীয় মানুষেরই সাধারণ মতবাদ ছিল। বাংলার শাসনকর্তা বল্লাল সেনের আমল থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধশূন্যবাদী শ্রমণদের উপর এমন অত্যাচার করেছিলেন যে, বুদ্ধের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে তাঁর গলা কাটা যেত। এদেশের ধ্বংস-উন্মুখ বৌদ্ধদের বাঁচাবার জন্য নতুন মত ও পথের সৃষ্টি করেন একদল মহামানব, মনীষীগণ। এই মনীষীদের একজনের নাম আনন্দ রায়, তিনিই 'বালা' বংশের পূর্বপুরুষ। পূর্ববঙ্গের দেউল বা চড়ক উৎসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধোৎসব। এই উৎসবের অধিকাংশ ক্রিয়াকর্মাদি বৌদ্ধমতমূলক। এই দেউল চড়ক বা শিবের নীলপূজার পুরোহিতকে বলা হয় 'বালা'। সমাজকে অমঙ্গল থেকে যাঁরা মঙ্গলে নিয়ে যান তাঁরাই 'বালা সন্ন্যাসী' প্রচ্ছন্ন শ্রমণই। বাংলা ভাষা শব্দভাণ্ডারে 'বালাই ষাট'— এই ক্রিয়াকর্ম থেকেই এসেছে। এই বালাসন্ন্যাসীগণ হাজার হাজার মানুষের সামনে আসরে দাঁড়িয়ে 'বালাই শ্লোক' মুখে মুখে রচনা করতেন। এই বালাই শ্লোককে সুর দিয়ে পায়ে মল বাজিয়ে বালাসন্ন্যাসীরা নেচে গেয়ে সমাজ-বিবেকের কাজটি করতেন— মানুষকে সচেতন করতেন। নীলপূজা চড়কপূজা, ধর্মপূজা, শিবপূজার আড়ালে বৌদ্ধ মত ও পথ, এই উৎসবেই আজও বেঁচে আছে।

আনন্দ রায় বর্তমান নদিয়া জেলার 'পোড়াবাড়ি' নামক স্থান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন, বর্তমান যশোহরের সন্নিকট মণিরামপুর থানার কাছে শুশুর নদীর দক্ষিণ পাড়ে। আনন্দ রায়ের না-পালিয়ে উপায় ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন 'বৌদ্ধজ্ঞানবাদী'। পুঁথিপত্র নিয়ে তিনি করতেন মুক্তজ্ঞানের চর্চা। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে সেটি ছিল মহা-অপরাধ। উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁকে খুন করতে চেয়েছিলেন। তাই রাতের অন্ধকারে তিনি পুঁথিপত্র সব বগলদাবা করে ছুটে পালিয়ে এসে যশোহরের শুশুর নদীর দক্ষিণ পাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নলখাগড়া আর বনজঙ্গল কেটে পত্তন করেন জনপদভূমির। এই জনপদভূমির প্রথম গ্রামের নাম রাখা হয় 'পাড়িয়ালি'। আর যেহেতু বালাবংশের মানুষ এই গ্রামের পত্তন করেছিলেন তাই এ অঞ্চলের সকল মানুষজন বালাদের বলে থাকেন 'কাঠিকাটা বালা'। তার পর থেকেই 'রায়' পদবি বদলে হয়ে গেল 'বালা'।

এই বালাবংশের চার সিঁড়ির পর ঈশ্বরচন্দ্র বালার জন্ম। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই ছেলে উমেশচন্দ্র আর সিদ্ধিরাম। উমেশচন্দ্রের চার ছেলে আর সিদ্ধিরামের একমাত্র ছেলে চটকচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র যতদিন বেঁচেছিলেন সংসারে টু শব্দটি ছিল না— দুই ভাই একসঙ্গেই ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বালাই শ্লোক রচনা করতেন, আসরে দাঁড়িয়ে সে-শ্লোকে সুর দিতেন, পায়ে মল বেঁধে নেচে নেচে গাইতেন। ছিয়ানব্বই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দেশের লোক তাঁকে একডাকে চিনতেন, ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর রচিত গান বালাই শ্লোক আজও নীলপূজা, চড়ক-উৎসবে আর দেউলযাত্রায় গাওয়া হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বালার ছোট ছেলে সিদ্ধিরাম বালা ধনী ছিলেন না। কিন্তু ছিয়ানব্বই এলাকার মানুষজনের কাছে ঈর্ষণীয় শ্রদ্ধাসম্মান আর অকৃত্রিম ভালবাসা পেতেন। সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, পাড়িয়ালি গ্রামের বালাবাড়ির ছোটকর্তা সিদ্ধিরাম বালা সালিশি বিচারে যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা অব্যর্থ, ন্যায়সম্মত। তিনি এত ভালমানুষ ছিলেন যে, দেশের মানুষ তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন— তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যই ব্রিটিশ আমলে মণিরামপুর থানার বড় দারোগা ডেকে নিয়ে গিয়ে থানার দফাদারের চাকরি দেন। সিদ্ধিরাম বালা মণিরামপুর থানার দফাদার হিসাবে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কিন্তু দেশের জন্য আর দেশের মানুষের জন্য ছোটাছুটির অন্ত ছিল না। দেশের মানুষদের দুঃখকষ্ট দেখলে কেঁদে বুক ভাসাতেন। তাঁর ছিল সহৃদয় ন্যায়পরপ্রাণ।

সিদ্ধিরামের কর্তব্যের শেষ নেই। কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন না। সবার

বিপদে-আপদে তিনি ছুটে বাড়ি গিয়ে টাকা দিয়ে আসেন। সিদ্ধিরাম দু'হাতে, পারলে তিনি চার হাতে দান করে বেড়ান। ধনীমানুষের কাছে টাকা ধার করে, এমনকী নিজের ফসলের জমি বিক্রি করেও মানুষকে সাহায্য করেন।

সিদ্ধিরামের এই সব কাজকর্ম দেখে কেউ কেউ বলেন— সিদ্ধিরাম বালা একটা আস্ত পাগল; না-হলি কী বাবাতে জমি বিক্রি করে মানুষকে টাকা ধার দেয়?

এ সব নিয়ে স্ত্রী গোলাপিসুন্দরীর সঙ্গে মন-কষাকষি চলে। মাঝেমধ্যে গণ্ডগোল হয়। কিন্তু তাতেও সিদ্ধিরাম বালার স্বভাব পালটায় না। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। গরিব-দুঃখী মানুষের কথা শুনলেই সিদ্ধিরাম রাতে ঘুমাতে পারেন না— যতক্ষণ-না তিনি সে দুঃখ-কষ্ট-বেদনা নিরাময় করতে পারছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষকে শাসনের নামে অন্তহীন শোষণ করে চলেছে। যেমন করে লেবু নিঙড়ায়, তেমনই করে ব্রিটিশ শাসক ভারতবাসীর বুকের রক্ত সব নিঙড়ে নিচ্ছে। বিদেশি শাসকরা নির্লজ্জ লোভী নিষ্ঠুর। একফোঁটা দয়ামায়া নেই ওদের। ওরা কেবল ভারতবাসীকে ঠকায়, শোষে আর পেষে। শিকলে-বাঁধা কুকুরের মতো ভারতবাসী থাকে ওদের হাতের মুঠোয়।

এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ভারতবাসী সংগ্রাম শুরু করেছিলেন ১৮৫৭ সাল থেকে। ভারতবাসীর জীবনে এত অত্যাচার, অবিচার আর সর্বনাশের কারণ জানবার জন্য সিদ্ধিরাম উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। মনের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। তিনি যেন অনেক কথাই শুনতে পান আর খোলামন নিয়ে প্রতিদিন ঘটে-চলা ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে যান।

১৯০২ সালে বাংলার ব্যারিস্টার পি মিত্র অনুশীলন সমিতি গঠন করেন। কলকাতায় গড়ে ওঠে যুগান্তর পার্টি। ভারতের আর বাংলার ছোট-বড় শহরের মতো এমনকী গ্রামেও গড়ে ওঠে এই সব সমিতির গুপ্ত শাখা-সংগঠন। সখারাম গণেশ দেউস্কর, পি মিত্র, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নানা তাত্ত্বিক এবং ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কে বিপ্লবী যুবকদের শিক্ষাদান-পর্ব চলে।

সে দিন এক উদ্ধত নিষ্ঠুর অশ্বারোহী ইংরেজ সার্জেন্ট ভারতবাসীর ওপর বিনা কারণে অত্যাচার করতে থাকে। তা দেখে ষোলো বছরের যুবক সুশীল সেন প্রতিবাদ করে। ফলে সুশীলের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল কলকাতার বিচারালয়ে। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বিচারে সুশীলকে প্রকাশ্যে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দেন। বালক সুশীলের অঙ্গে বেত

মারা হল। 'আর তাতেই বালক সুশীলের অঙ্গের এই বেত্রাঘাত যেন দেশবাসীর অঙ্গে আঘাত করিল।'

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তরুণ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকিকে দেওয়া হল দায়িত্ব। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। প্রফুল্ল চাকি নিজের গুলিতে জীবন বিসর্জন দেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করা হয় তার নায়ক ছিলেন বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসুর কর্মক্ষেত্র উত্তর ভারতে আর যতীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গদেশে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ তাঁরা ধরেননি। তাঁরা ধরেছিলেন সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ।

'দেশমাতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য'— আগে প্রাণ কে করিবে দান। পড়ে যায় কাড়াকাড়ি। বঙ্গদেশে যশোহর জেলার মণিরামপুর থানার সন্নিকটে বাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা বাণীকান্ত মল্লিকের ভাগ্নে রজত বিশ্বাস তাঁর বাড়িতেই থাকতেন। রজত বিশ্বাস বাণীকান্ত মল্লিকের বাড়িতে একটি বাংলা খড়োঘরে গুপ্ত সমিতির শাখা খোলেন।

রজত বিশ্বাস বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন বাঘাযতীনের কাছে। যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় যে গোপন বৈঠক করেন রজত বিশ্বাস সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে ঠিক হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মতো সৈন্যাধ্যক্ষ মনসা সিং সংকেত পেলেই ফোর্ট উইলিয়ামে সৈন্যরা বিপ্লবীদের পতাকা উড়িয়ে দেবেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। মহাযুদ্ধের জন্য বেশিরভাগ ইংরেজ সৈন্য ভারতের বাইরে চলে গিয়েছে। এই সুযোগে দেশি সৈন্যগণ বিদ্রোহ করে ভারতবর্ষে সফলভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবে। ওদিকে জার্মান জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্রাদিও এসে পড়বে। এ ইংরেজ সরকারের পক্ষে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ঢেউ সামলানো অসম্ভব হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র।

ইতিমধ্যে কুখ্যাত দু'জন ইংরেজকে হত্যা করে রজত বিশ্বাস আত্মগোপন করে থাকেন বাহাদুরপুর গ্রামে। বারে বারে কত নতুন নাম নিয়ে বহুরূপী সেজে ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। এ বার রজত বিশ্বাস মধুপুর গ্রামে এক কৃষক-পরিবারে মাহিন্দর হিসাবে থাকবার সময় ছদ্মবেশে দফাদার সিদ্ধিরামের সঙ্গে দেখা করেন কয়েকবার, মাতৃভূমির সেবা করবার

জন্য আলোচনা করেন, পরামর্শ নেন। দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপ্লবীদের প্রতি সিদ্ধিরাম ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

রজত বিশ্বাস গ্রামের যুবকদের নিয়ে যে দল গড়ে তুলেছিলেন তাদের লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার যুবশক্তিকে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। সতীর্থদের তিনি বলতেন, বিপ্লবের আলো জ্বললে তবেই যাঁরা আঁধারে আছেন, তাঁরা আমাদের দেখতে পাবেন, মুক্তির পথও খুঁজে পাবেন।

সিদ্ধিরাম বিপ্লবী হৃদয় নিয়েই তাঁর দেশের জনগণকে দেখতেন। তাঁদের জন্য তিনি চিন্তা করতেন। মুক্তির কথা ভাবতেন। সশস্ত্র লড়াই ছাড়া ভারতবর্ষের মুক্তির আর কোনও পথ নেই তিনি তা বিশ্বাস করতেন। বিপ্লবের ভাবধারা আদর্শ তাঁর চিত্ত থেকে ব্রিটিশ সরকারও উপড়ে ফেলতে পারেনি।

রজত বিশ্বাস আত্মগোপনে থাকাকালে সিদ্ধিরামের কাছে গোপন সংবাদ আসে ইংরেজ সরকারের পুলিশবাহিনী রজত বিশ্বাসকে ধরতে আসছে। ইংরেজ সরকারের পুলিশ ধরা মানেই রজত বিশ্বাসের ফাঁসি হবে।

ইংরেজ সরকারের পুলিশের খাতায় রজত বিশ্বাস সন্ত্রাসবাদী, খুনি, কুখ্যাত আসামি। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে, সিদ্ধিরামের হৃদয়ে রজত বিশ্বাস ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুক্তি-সংগ্রামে উৎসর্গীত প্রাণ, দেশপ্রেমিক। তাই তাঁর প্রাণরক্ষা করতে সিদ্ধিরাম ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও গোপনে সংবাদ দিয়ে নিরাপদে সরিয়ে দেন। সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে রজত বিশ্বাস বাঘা যতীনের দলে ভিড়বার জন্য ওড়িশার দিকে রওনা দেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে রজত বিশ্বাসের কাঁধে ছিল হাল জোয়াল, মাথায় কৃষকের টোকা, হাতে পাচন— খালি গা, খালি পা, হাঁটু অবধি খেটো ধুতি পরা। দড়িতে ছান্দা হালের দুটো গরু খেদিয়ে তিনি গ্রামের বাইরে সাহালের বিলে নেমে গেলেন। সেখান থেকে বুড়িবালমের সেই কর্মযজ্ঞে।

অনেক সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। রজত বিশ্বাসের ঘটনার সূত্র ধরে ইংরেজ সরকারের পুলিশ সিদ্ধিরামকে অপরাধীর কাঠগড়ায় উঠতে বাধ্য করলেন। মণিরামপুর থানার দফাদারি, দীর্ঘদিনের সরকারি চাকরি থেকে সিদ্ধিরামকে বরখাস্ত করা হল।

স্বদেশ জননীর চোখের জল মুছবার জন্য যাঁরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, তাঁদের জন্য সিদ্ধিরাম সরকারি চাকরি খুইয়েছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের শত্রু হয়েছিলেন।

থানার চাকরি চলে যাওয়ার পর এবং গুপ্তচরদের অন্তহীন চক্রান্তে সিদ্ধিরামের উদ্দীপনা-উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। সিদ্ধিরাম ক্ষোভে-দুঃখে-বেদনায় তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতা, উদ্যোগ দেশের মানুষের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেবার প্রবণতা যেন আস্তে আস্তে নিজের ভেতর গুটিয়ে নেন। তবু ব্রিটিশ সরকারের পোষা কুত্তারা তাঁর পিছু ছাড়ে না। তাঁর বেঁচে থাকা দুর্বিসহ করে তোলে। তিনি তাঁদের হাত থেকে বাঁচতে বসতভিটা পরিবর্তন করেন। পুরনো পাড়িয়ালির পৈতৃকভিটে ছেড়ে গ্রামের উত্তরে বিলের মধ্যে ডাঙ-পাড়িয়ালিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন। সেই বাড়িতে ছেলে-পুত্রবধূ-নাতিনাতনি আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় নেন— যাতে মন থেকে দুঃখের মেঘ কেটে যায়। ব্রিটিশের গুপ্তচর নিত্যদিন তাঁকে উক্ত্যক্ত করতে না পারে।

ডাঙপাড়িয়ালির নির্জন নিঃসঙ্গতায় এসেও সিদ্ধিরাম দেশের জন্য ভাবেন, দেশবাসীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। কিন্তু কিছুই করতে পারেন না, ভাঙা মন আর বয়সের অক্ষমতায় সিদ্ধিরামের হাত-পা বাঁধা। তাঁর সমস্ত শুভচেতনা যেন মরে যেতে থাকে দ্রুত মনের তলায় তার ছায়াটাই কেবল পড়ে থাকে। স্তব্ধ আর নির্জনতার আঁধারে তাঁর দিন কাটতে থাকল।

দেশসেবা আর দেশবাসীর কাজ পরিত্যাগ করতে হয়েছে বলে সিদ্ধিরামের মনের ভেতর এক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল— যার থেকে সারাক্ষণ রক্তপাত হয়ে চলত। ঠিক এই সময়ে আবার মৃত্যু এসে তাঁর প্রিয়জনদের একের পর এক ছিনিয়ে নিতে লাগল।

আচমকাই ছোট ছেলে ঘটকচন্দ্র জলে ডুবে মারা গেল। বালা-পরিবারের কাছে এ-ঘটনা অকল্পনীয় ছিল। গোটা গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল। পরিবারের মেয়েরা কাঁদছিল আর পুত্রশোকে গোলাপিসুন্দরী আচাড়ি-পাছাড়ি আর্তনাদ করছিলেন। সিদ্ধিরাম বারেবারে গামছায় অশ্রু মুছছিলেন। সে দিন স্বামী-স্ত্রী বুক চাপড়ে কেঁদেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না এবং এই বেদনার ক্ষত হৃদয়ে রয়ে গেল সারা জীবনের মতো।

সিদ্ধিরামের ছোট মেয়ে বুঁচি— অপূর্ব সুন্দরী। সিদ্ধিরাম সব থেকে বেশি ভালবাসেন তাকে। মণিরামপুর যাওয়ার পথের পাশে বাহাদুরপুর গ্রামে বারিদবরণ মল্লিকের বাড়ি। তাঁর একমাত্র পুত্র বাণীকান্ত। বুদ্ধিমান শিক্ষিত প্রচুর সম্পদের মালিক। তিনি বাড়িতে বসেই ডাক্তারি করেন। তিনি সমাজসেবক। নিজে জমি কিনে রাস্তার ধারে পাঠশালা খুলেছেন। এমন ভাল ছেলেকে জামাই হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বাণীকান্ত নিজে বুঁচিকে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করে

নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সুখের সংসার। মণিরামপুর যাওয়া-আসার পথে সিদ্ধিরাম প্রায়ই মেয়ের সঙ্গে দেখা করতেন। ভালমন্দ জিগ্যেস করতেন।

বুঁচিও বাবাকে প্রচণ্ড ভালবাসত। পথে চোখের দৃষ্টি পেতে রাখত কখন তার বাবা এ পথ দিয়ে যাবেন। বাবাকে দেখলেই বুঁচি দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডাকত, 'বাবা, বাবা, আসো। জল খেয়ে যাও। একটু জিরিয়ে যাও বাবা, সেই তো কখন বেরিয়েছ। আসো বাবা।'

সিদ্ধিরামও পথে যাওয়া-আসার সময় মেয়েকে দেখতে না পেলে বড়ই উতলা হয়ে উঠতেন। আচমকাই তিনি জামাইবাড়ি ঢুকে পড়তেন। বলতেন, কই গেলি মা, বুঁচি? দে মা, জল দে। কী আগুন রোদ, মাটি তেতে উঠেছে। বড় তেষ্টা পেয়েছে মা। সিদ্ধিরাম নিজেই আটচালা চৌরিঘরের বারান্দায় উঠে চাটকোল টেনে নিয়ে বসে পড়তেন। জল পান করে, জিরিয়ে, মেয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তবেই উঠতেন, আবার পথে নেমে হাঁটতেন।

সেই মেয়ে বুঁচির প্রথম ছেলে হল। সিদ্ধিরাম-গোলাপিসুন্দরীর বুকে আনন্দ ধরে না। সিদ্ধিরাম মেয়ের বাড়ি যাওয়া বাড়িয়ে দিলেন। আর জামাই বাণীকান্ত শ্বশুরকে এত শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসাতেন, গ্রামের মানুষ বলত এমন জামাই হয় না।

হঠাৎ একদিন সেই মেয়ে বুঁচির কাঠির ঘা (সাপে কামড়াল) হল। ঘরের মেঝেয় কাত হয়ে শুয়ে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল বুঁচি। সাপ মাটির মেঝে ফুঁড়ে উঠে বুঁচিকে কামড়াল। ওঝা-বদ্যি, ডাক্তার কবিরাজ— কেউই কিছু করতে পারলেন না । বুঁচি মারা গেল। কোলে ছেলে নিয়ে বাণীকান্ত চোখের জলে বুক ভাসালেন।

উঠোনে বুঁচির দেহ শোওয়ানো। ধবধবে সাদা কাপড়ে দেহের আপাদমস্তক ঢাকা। সিদ্ধিরাম পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মেয়ের মুখ থেকে ঢাকা কাপড় সরাতেই বুঁচির বিষে কালো নিথর শরীর দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষ সিদ্ধিরাম মেয়ের মৃত্যুশোকে শিশুর মতো চিৎকার করে বুক চাপড়ে কাঁদলেন। শোকের আগুনে কলজেটা তাঁর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে। শোকে পাথর ভারী মাথাটা যেন বুকের ওপর এলিয়ে পড়তে চায়।

বুঁচির মৃত্যুর দু'মাস বাদে সিদ্ধিরামের বড় জামাই নটবর বিশ্বাস দু'দিনের কলেরা রোগে মারা গেলেন। বড় মেয়ে রক্ষমালা বাবার সংসারে ছেলে কোলে আশ্রয় নিলেন। সিদ্ধিরাম শোকে দুঃখে বেদনায় যেন বধির হয়ে গেলেন। অনেক দেখেশুনে সিদ্ধিরাম গুণবান উপযুক্ত ছেলে নটবরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে

দিয়েছিলেন। সেই মেয়ের এই হল দশা? আড়াই মাসের একমাত্র পুত্রসন্তান কাঙালহরিকে কোলে নিয়ে বাপের ঘরে এসে উঠলেন রক্ষমালা।

না। সিদ্ধিরামের শোক-দুঃখ এখানেই শেষ হল না। ছ'মাস যেতে-না-যেতে সিদ্ধিরামের মেজ জামাই হাজরা সর্দার মাত্র তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন। দক্ষমালা একমাত্র ছেলে নরেনকে নিয়ে বিধবা হলেন। স্বামী-স্ত্রী কপাল ঠুকে কাঁদতে শুরু করলেন। পাড়া-পড়শি ছুটে এসে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েও কান্না থামাতে পারেন না। সংসারের শান্তি ভেঙে গেছে। হৃদয়ে তাঁদের বিরামহীন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শোকে-দুঃখে পুড়ে পুড়ে হৃদপিণ্ড যেন ঝামা হয়ে গেছে। প্রাণ জুড়ানোর কোনও জায়গাই আর অবশিষ্ট নেই। কঠিন ব্যথায় কুঁকড়ে-যাওয়া হৃৎপিণ্ড চেপে ধরে তাঁরা যেন বোবা হয়ে গেছেন আর তাঁদের গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়াতে থাকল ফোঁটা ফোঁটা চোখের নীল ঘোলা জল।

এত শোক, এত তাপ সিদ্ধিরাম আর সইতে চাইলেন না। ডাঙ-পাড়িয়ালির নতুন বাড়িতে আকাশ উপচে ঢেলে-পড়া জ্যোৎস্নার উঠোনে চিত হয়ে শুয়ে চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন। এ যেন এক ধরনের ইচ্ছামৃত্যুই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

সিদ্ধিরামের অকালমৃত্যুতে পুত্র চটকচন্দ্র আর বউমা অনুমতির মাথার ওপর থেকে বিশাল বটগাছের নিশ্চিন্ত ছায়া চিরদিনের মতো সরে গেল।

নতুন প্রাণবীজ জাগে

তার পর বহুদিন কেটে গেছে। চটকচন্দ্র-অনুমতির ছোট-বড় পাঁচটি সন্তান বেঁচে আছে। সংসারে আর আছে চটকচন্দ্রের মা, বড়দিদি রক্ষমালা আর তার ছেলে কাঙালহরি। এতগুলো মানুষের এত বড় সংসারের সব দায়দায়িত্ব এখন চটকচন্দ্রের ওপর। মাঠ-বিলে-আবাদে মেলা জমিভরা ফসল, অনেক গোরুবাছুর আর অসংখ্য আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে চটকচন্দ্র অন্তহীন ছোটাছুটি করেন। খাটিয়ে জোয়ান মানুষ। শরীরে যেন ক্লান্তি বলে কিছু নেই।

সে-বছর শ্রাবণ মাসে ভয়ংকর অতি বৃষ্টির বন্যায় ডাঙ-পাড়িয়ালি তলিয়ে গেল জলের তলায়। বাড়ির উঠোনেই কোমরের ওপর জল। সীমাহীন বিল-বোকড়ের সঙ্গে গোটা এলাকার জলাভূমি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এ-পাশে সাহালের বিল, ও-পাশে নোনাবিল, হাজির গাঙ, হরিহর নদী— সব

মিলেমিশে মস্ত একখানা গ্রামীণ সমুদ্র হয়ে গেছে। যে দিকে তাকাও কেবল জল আর জল— জল থই থই করছে, ঢেউ খেলছে। পুবমুখো, পশ্চিমুখো— যে দিকে তাকাও, তাকিয়ে চোখের পাতা ব্যথা করে ফেললেও গাঁ-গ্রামের ডাঙার কোনও চিহ্ন চোখে পড়বে না। জলরাশির মাঝে মাঝে দু-একটি নারকেল গাছ, অশ্বত্থগাছ আর তালগাছের একটু-আধটু সামান্য মাথা চোখে পড়ে। আর গেঁয়ো সমুদ্রের কূলের কাছে একটি-দু'টি তালের ডোঙা ধীরে ধীরে জলের ওপর এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে।

এই মহাবিপদে ডাঙ-পাড়িয়ালির ভিটেয় সব থেকে উঁচু পোতায় চারপাটি মজবুত দেওয়াল দেওয়া আটচালা চৌরীঘরের ভেতর চটকচন্দ্র তাঁর মা, স্ত্রী, দিদি ও আর ছেলেমেয়েদের সাবধানে রেখে উঁচু বারান্দার মেঝেয় ভাগ্নে কাঙালহরিকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে সতর্ক হয়ে বসে রইলেন। গোটা এলাকা জলের তলায়— প্রাণ বাঁচাতে ডাঙার খোঁজে, জলের ঢেউয়ে, সাঁতার কেটে ভেসে আসতে থাকল বিষধর সাপ। অসংখ্য সাপ আসতে থাকল আর চটকচন্দ্র খেজুর গাছকাটা গাছিদা দিয়ে সাপ কেটে গাদা দিতে থাকলেন। মামা আর ভাগ্নে মিলে সারারাত ধরে বিষাক্ত সাপ কেটে কেটে নিজেদের আর শিশু-মহিলাদের প্রাণ বাঁচালেন সেই ভয়ংকর রাতে।

রাত শেষ হলেই কপালের ঘাম মুছে তিক্ত স্বরে চটকচন্দ্র বললেন,

কোদা-কাঙাল, বাবা এখানে একবেলাও আর থাকা যাবে না। তোমার ভাইবোন, মা, দিদিমা, মামি— কাউকেও বাঁচাতে পারব না। এই বিলের মাঝে কাঁচা মাটির খোড়োঘরে কিছুতেই বাঁচা যাবে না। যে-কোনও মুহূর্তে জলের ঢেউয়ে বিষাক্ত সাপ উঠে এসে কামড়াতে পারে। সময় থাকতে বিপদ ঘটাবার আগেই চলো বাবা, পুরনো পাড়িয়ালি উঠে যাই। দেরি করলে বিপদ ঘটতে সময় নেবে না। কথা বলতে বলতে নির্ভীক চটকচন্দ্রর মুখে বিপদ আশঙ্কার কালোছায়া ঘনিয়ে আসে। তাঁর চেহারাও চোখা হয়ে ওঠে। আতঙ্ক ফুটে বেরোয়।

ঠিক বলেছ মামা। এখানে থাকলে আমরাও বাঁচব না। যেমন করে হোক দুপুরের আগেই পুরনো পাড়েলি সবাইকে নিয়ে যেতেই হবে। ওই দেহো মামা, পিঁপড়েরাও সব খুঁটি বেয়ে উপরে উঠে ঘরের মটকায় আশ্রয় নিতিছে। জল বাড়ছে। বিকাল হতি হতি জল ঘরের মেঝেতে উঠবে। তহন পুরনো পাড়িয়ালির পথও হারিয়ে ফেলব। কালবিলম্ব করলে গুষ্টিসুদ্ধ সব মারা পড়ব মামা। কথা বলতে বলতে কাঙালহরি বারান্দার খুঁটিতে বাঁধা ছোট তালের ডিঙিতে উঠে বসে। লগি খুঁচিয়ে মাঝ উঠানে ডিঙি দাঁড় করিয়ে আকাশ দেখে, দৃষ্টি নামিয়ে

জলের তোড় দেখে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। মেঘের বেড়ার ফাঁকফোকর গলিয়ে চিকচিক করছে ভোরের গায়ে রোদের আভা।

কাঙালহরির হাতে তখনও খেজুরগাছ ঝোড়া ধারালো দা-খানা। তাই নিয়েই সে পশ্চিম ঘরের পিছনে কলাবাগানে ঢুকে যায়। একটার পর একটা মোট মোটা কলাগাছ কেটে জলে ভাসাতে থাকে।

তার পর মামা আর ভাগ্নে মিলে তৈরি করলেন বিশাল এক কলাগাছের ভেলা। ভেলার চারকোণে উপুড় করে মুখ আটকে বেঁধে দিলেন চারটি বড় কোলা হাঁড়ি। ভেলার উপর বসালেন বাঁশের চালি। চালির ওপর হোগলার পাটি বিছিয়ে তার ওপর তুলেছিলেন তিনি ছেলেমেয়ে, মা, দিদি আর স্ত্রীকে। চটকচন্দ্র ছোট তালের ডিঙি সঙ্গে নিয়ে কাঙালহরিকে তুলে দিলেন ভেলায়, ভেলা চলল পুরনো পাড়িয়ালি লক্ষ করে সঙ্গে ডিঙি চলল তরতর।

গ্রামের সীমানা পার হয়ে কিছুদূর ভেসে এসে কাঙালহরি দেখতে পেলেন ডাঙ-পাড়িয়ালির উত্তম বিশ্বাস আর ভূষণ বাছাড়ও কলাগাছের ভেলায় বউ-ছেলেমেয়ে বসিয়ে পুরনো পাড়িয়ালির দিকে যাচ্ছে। একটু বড় হয়ে ওঠা ছেলেদের হাতেও চটকচন্দ্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাঁশের আগার লম্বা লগি সবাই মিলে লগি খুঁচিয়ে অনেক কষ্টে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অনেক ঢেউ পেরিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে তাঁরা দুপুর বেলায় পুরনো পাড়িয়ালির ডাঙায় এসে উঠলেন।

মা, স্ত্রী, দিদি আর ছেলেমেয়েকে নিরাপদে রেখে চটকচন্দ্র আর ভাগ্নে কাঙালহরিকে সঙ্গে নিয়ে ডিঙি আর ভেলা চালিয়ে ফের গেলেন ডাঙ-পাড়িয়ালি। নিত্যব্যবহারের জিনিসপত্র, কাঁথা মাদুর বোঁচকাবুঁচকি সংসারের যাবতীয় দ্রব্যসকল তুলে দিলেন ভেলার উপর, কটি বাছুর আর ছাগল হাঁসও তুলে দিলেন ভেলায়। গোরুগুলিকে জলে ছেড়ে দিলেন যাতে তারা সাঁতরে যেতে পারে। গোরুগুলি ভেলার পাশে পাশে সাঁতার কেটেই চলল। কিন্তু দুই পাড়িয়ালির মাঝে যে এড়ো খাল, তাতে ছিল প্রচণ্ড জলের স্রোত— সেই স্রোতে পড়ে দু'টি গাইগোরু ভেসে কোথায় হারিয়ে গেল শত চেষ্টাতেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডাঙ-পাড়িয়ালির সব ঘরবাড়ি বন্যার জলে ধুয়েমুছে গেল। মাটির পুরু দেওয়ালগুলির চিহ্নমাত্র রইল না। বন্যার জল ডাঙ-পাড়িয়ালি থেকে নেমে গেলও চটকচন্দ্র আর ফিরে গেলেন না ডাঙ-পাড়িয়ালির ভিটেয়। কিন্তু সাবেক পুরনো বাপঠাকুর্দার দক্ষিণ পাড়ার ভিটেয়ও ঘর বেঁধে উঠে গেলেন না। চটকচন্দ্রের বাবা সিদ্ধিরাম বালা গ্রামের অনেক মানুষকে জমি দান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সন্তোষ মণ্ডল। চটকচন্দ্র গ্রাম সম্পর্কে তাঁর মামা।

তিনি নিজেই চটকচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, মামা, আমি তো তুমাগে কাছে অনেক ঋণে ঋণী। এ বার ঋণ শোধের সুযোগটা দিলি, আমি খানিক ঋণমুক্তি হতি পারি মামা। গাঁয়ের উত্তরকোলের এই দেড়বিঘা জমিতি তুমি ঘরবাড়ি বান্দো। রাস্তার ধারের এই ভুঁই তোমারে দিলাম। আজ থেকি এই ভুঁই তোমার মামা। তুমি না কোরো না মামা। এহানে যুতমতো ঘর বান্দিলি মানুষ চাহি দেখি খাসা বলবি নে। তুমি এহানেই ঘরবাড়ি বান্দো মামা। না কোরো না।

গ্রামের গাঁ-ঘেঁষে দেড় বিঘে জমির ওপর চটকচন্দ্র বাড়ি করলেন। গ্রামের মানুষজন বেগার খেটে দিন পনেরোর মধ্যে বাড়িঘর সব তৈরি হয়ে গেল। দেড় বিঘা জমির মধ্যে গাছগাছালিও কম ছিল না। ছ'গণ্ডা খেজুরগাছ, তিনটি কাঁঠালগাছ, দুটি নারকেলগাছ, চারটি সুপারিগাছ, একটি পেয়ারাগাছ, একটি আমগাছ ছিল। চটকচন্দ্র বাড়ির কোলে আরও দশকাঠা নাবাল জমি কিনে পুকুর কেটে মাটি তুলে, কলাগাছ পুঁতে গোটা বাড়িকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলেন। পাশের রাস্তা দিয়ে মানুষজন যখন যেতেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়ে ঘরবাড়ি দেখতেন। উত্তর পোতায় আটচালা চৌরীঘরের আড়া, রুপো, রেলিং— সবই তালগাছ ফেড়ে তৈরি হয়েছে। পাকা বাঁশ আর বেতের অপূর্ব কাজ, ঘরের মটকায় ময়ূরপক্ষী নক্‌শা, অপূর্ব খড়-শণের কাজ যা মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নিত। সুখের সংসার ঝকঝক তকতক ছবির মতো পরিপাটি সাজানো-গোচানো— দেখলে মন কেড়ে নেয়। এত রূপ দু'চোখে ধরে না। যেন উপচে উপচে পড়ে।

বছর ঘুরতেই এই বাড়িতেই পশ্চিম পোতার আটচালা চৌরীঘরের উঁচু বারান্দা নতুন চাঁচ দিয়ে ঘিরে 'আঁতুড়ঘর' বানানো হল। এই আঁতুড় ঘরেই অনুমতি-চটকচন্দ্রের সপ্তম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

গ্রামের বিধবা ভজরানি সম্পর্কে চটকচন্দ্রের দিদি। তিনি এ-গ্রামের সমস্ত প্রসূতির প্রসব করান, তিনি দাই। সন্তান প্রসবের ব্যাপারে এ-তল্লাটে ভজরানির যোগ্যতা সর্বজনবিদিত। অনুমতির প্রসব-বেদনা উঠলে ভজরানিকেই ডেকে আনা হল। ধরণী ভজরানি এসে পরিবারের সকলের মনে আত্মবিশ্বাস আর শুশ্রূষার আলো জ্বেলে দিলেন। ভজরানি গোলাপিসুন্দরীকে ডেকে বললেন, ও খুড়ি, এ্যাহানে আসো, একদম ভাববে না। দ্যাহ খুড়ি বউদির পেটের যা গড়ন, বউদির ছেলে হবে এ বার। কোনও চিন্তা করতে হবে না। সব কিছুই ভালয়-ভালয় হয়ে যাবে। প্রসব-বেদনা উঠেছে, এক্ষুনি বাচ্চা হয়ে যাবে। কথা বলতে বলতেই ভজরানি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সহসা সমগ্র পরিবেশটা এক আনন্দিত নাচের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে

পৌঁছে গেল। ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া সদ্যোজাতের প্রথম কান্না যেন সেই অবিস্মরণীয় নৃত্যের তালে তালে মিশে বাজছিল— 'ছেলে হয়েছে', 'ছেলে হয়েছে' ভজরানির নরম আদরমাখা হাত তাকে পৃথিবীতে এনেছে। পুলক তার চোখেমুখে যেন ধরে না, উদ্দীপনায় তার গলার স্বরটাই পালটে গেল।

সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে হাতের তালুর ওপর রেখে ভজরানি ফের আবেগতাড়িত কণ্ঠে উদ্দীপনার শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে বলে চললেন, এ যে আমাগে কাকাই ফিরে এসেছে খুড়ি, সেই চোখ, সেই নাক, পায়ের পাতা, হাতের তালু, আঙুলগুলি অবধি সবই কাকার। এ যে সিদ্ধিরাম বালা ফিরে এসেছে খুড়ি। এ আমাগে সিদ্ধিরাম বালা। দ্যাহ, দ্যাহ খুড়ি কপালখানা দ্যাহ অবিকল সিদ্ধিরাম বালা— একচুল এদিক-ওদিক না। কথা তার শেষই হতে চায় না।

ধরণী দাই ভজরানি হাতের তালু থেকে সন্তানকে নামিয়ে রাখতেই দাই হরিমতি এসে সন্তানের নাড়ি কাটবার আগেই সমবেত বউ-ঝিরা পরপর তিনবার উলুধ্বনি দিলেন। রাত শেষে ঊষাকালে পাড়িয়ালি গ্রামের বালা বাড়িতে বউঝিদের সম্মিলিত কণ্ঠে উলুধ্বনি শুনতে পেয়েই পাড়ার বউ-ঝিরা সব জেগে উঠলেন। চোখের ঘুম তাড়াতে তাড়াতে তাঁরা ছুটে এলেন বালা-বাড়িতে সদ্যভূমিষ্ঠ ছেলে দেখতে।

বউ-ঝিরা আঁতুড়ঘরে যখন দেখলেন— মুসলমান দাইয়ের পরিবর্তে গ্রামের এক হিন্দু বিধবা হরিমতি সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি কাটছেন, তখন তাঁরা যারপরনাই বিস্মিত আর শঙ্কিত হলেন এবং আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন। প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত প্রথার বিরুদ্ধে এই অনিয়ম অবিচার সমাজকে অমান্য করা— কত বড় অনিষ্ট করবে— এই কথা ভেবে তাঁরা মুখে রা কাড়তে পারলেন না। আসন্ন অমঙ্গলের কালো মেঘে আগত বউ-ঝিদের মুখের চেহারাই পালটে গেল। গভীর ভাবনায় আর বিষাদের স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে কেউ কেউ তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন ঘরে।

যাঁরা দ্রুত ফিরে গেলেন ঘরে, তাঁদের মুখে মুখে এই খবর মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় মানুষজনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে মজলিশ বসে গেল। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী নাড়িকাটার ঘটনা গোটা ছিয়ানব্বই গ্রামে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল আর ছিয়ানব্বই অঞ্চলের মানুষজন যেন দুই বিপরীত দলে ভাগ হয়ে গেল। পথেঘাটে, মাঠে-হাটে এই ঘটনা নিয়ে চলল কানাঘুষো, গুঞ্জন আর আলোচনা— এমনকী বাদ-প্রতিবাদ এবং গণ্ডগোল চলতে থাকল এর পক্ষে এবং বিপক্ষে।

এই ঘটনা সংবাদ প্রবাদবাক্যের মতো মানুষের মুখে মুখে ছুটে চলল আর সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে দূর দূর গাঁ থেকেও মানুষজন সব ছুটে আসতে থাকল পাড়িয়ালি গ্রামে বালা-বাড়িতে ছেলে দেখতে, আশীর্বাদ করতে, সরেজমিনে তদন্ত করতে।

যশোহর জেলার ছিয়ানব্বইখান গ্রামে এবং তার আশপাশের অঞ্চলের দলিত নমঃশূদ্র সমাজে সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি কাটবার জন্য অশিক্ষিত মুসলমান দাই নিয়োগ করা হত— এইটাই প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত প্রথা। এই সব দাইগণ অনেক সময়েই বহু বিলম্বে সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি কাটতে হাজির হতেন এবং তাঁরা চক্রান্ত করে অনেক বেশি মজুরি দাবি করতেন। সেই দাবি যথাযথ ভাবে না মিটালে তাঁরা শিশুর নাড়ি কাটতেন না। এর ফলে তিক্ততার জন্ম হত। দেরি করে শিশুর নাড়ি কাটবার জন্য এবং ধাত্রীবিদ্যায় দাইয়ের অজ্ঞতার কারণে এবং বাঁশের চাঁচড়ি দিয়ে নাড়ি কাটবার ফলে বহু শিশু অকালে মারা যেত।

দূরদর্শী, জীবন-সচেতন চটকচন্দ্র পুরোনো অবৈজ্ঞানিক প্রথায় শিশুর নাড়ি কাটার ঘোরবিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাবা সিদ্ধিরাম এতদিন বেঁচে থাকবার জন্য এই অবৈজ্ঞানিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করতে পারেননি এবং নতুন প্রথায় চটকচন্দ্র শিশুসন্তানের নাড়িও কাটাতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর স্বাধীন-সচেতন ভাবে চটকচন্দ্র নিজ সন্তানের নাড়ি কাটালেন হিন্দু-বিধবা হরিমতিকে দিয়ে। হরিমতি পার্শ্ববর্তী নওয়াপাড়ায় কিছুদিন থেকে শিক্ষিত ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে হাতে-কলমে সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি কাটবার শিক্ষালাভ করেছিলেন।

উজ্জ্বল আকাশের কোলে সোনালি রোদমাখা ভোর। গাছের সবুজ পাতায়, চওড়া ঘাসের ডগায় খেলা করছে সূর্যের অমল আলো। খেজুরগাছে ঝুলে-থাকা রসের হাঁড়িতে জড়িয়ে আছে মিষ্টি রোদের ফালি। এরই মাঝে সদ্য আগত নতুন মানুষকে দেখতে আর শুভেচ্ছা জানাতে বালা-বাড়িতে মানুষজন আজ আর ধরছে না। ঘাসের ডগায় শিশিরে পা ভিজিয়ে আসা নগ্নপদের বউ-ঝিরা জড়ো হয়েছেন— গোলাপি, পাঁচি, টেপি, কালীতারা, সুবাঁশি, মিনতি, পার্বতী, তারা, শ্যামা, বিজলি, দয়াবতী, চন্দনা, মেনকা, প্রফুল্লমুখী, মার্দি, শিবানী, চঞ্চলা, ইছামতি আর সরলারা। বউ-ঝিরা আঁতুড়ঘর ঘিরে সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে আলাপ শুরু করেছেন।

হরিমতি দাই গলায় গর্বের সুর ঢেলে দিয়ে বললেন, দ্যাহলো, দ্যাহ, দ্যাহ রতন দ্যাহ। পরান ভরি দ্যাহ, ব্যাটা মানুষ দ্যাহ, সোনার চাংড়া দ্যাহ। হরিমতি

দাইয়ের চওড়া ফর্সা হাতের তালুর ওপর ছেলে তুলে দেখান। আর ছেলেও তেমনই নতুন সূর্যের লাল আলোর পরশে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে যেন মর্দানি দেখায়। হরিমতি দাই আবারও গলায় দ্বিগুণ পুলক ঢেলে বলেন, দ্যাহ লো বউ-ঝিরা তুমরা রতন দ্যাহ লো। সোনার চাংড়া দ্যাহ— গর্বে তাঁর বুক যেন একহাত উঁচু হয়ে ওঠে।

নাবি ছ্যাওয়ালের কী ত্যাজ দ্যাহনি, ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে দিল রে। দুই ছেলের মা সরলা বুকের আঁচল টেনে পিঠ ঢেকে ভারী বুক নাচিয়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে মশকরা করেন— দ্যাহিলো বাপের ব্যাটা দেহি। মিঠাই আনো গো, জোকার দিই। বড় সুন্দর মুখ লো, বড় সুন্দর মুখ। দ্যাখলি পরাণ জুড়ায় লো, পরাণ জুড়ায়। আঁতুড়ঘরের বদ্ধ বাতাসে তার কথাগুলো যেন ঝনঝন করে বাজে আর ওষ্ঠে তার লেগে থাকে একটুকরো মিষ্টিমধুর হাসি।

ও-পাশ থেকে মেনকাসুন্দরী ঝুঁকে পড়ে বলে, মণির চোখ কই? আমি চোখ দেখতিই আলাম যে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাঁচিদের বলে— আহা, আহা, বাবার আমার একমাথা চুল, কাকের পাখনা হার মানায়। রও না মাসি, স্বাদ মিটিয়ে দ্যাহি। দু'গাল বেয়ে পুলক তার যেন ছিটকে বেরোয়। কোমল দৃষ্টি নিয়ে মেনকা তাকিয়ে থাকে সদ্যোজাত সন্তানের পানে।

আঁতুড়ঘরের বাঁ-হাতে ছাঁচতলায় পাতলা ভিড়টা আস্তে দানাবেঁধে অস্ফুট ফিসফিস গুঞ্জন ওঠে। নিতাই বাছাড়ের বিধবা শালি প্রফুল্লমুখী সুধা ঢালির পায়ের ওপর পা দিয়ে গালটায়ে কয়, সত্যি নাহি— ওই ধলামাগি, ছ্যাওয়ালের জন্মনাড়ি কাটিছে?

চোখ কপালে তুলে সনাতনের বউ সুরি গলা লম্বা করে সুর চড়িয়ে বলে— সত্যি লো, সত্যি। একবিন্দু মিথ্যে কলাম না দিদি। ওই ফকফকে ধলামাগি এমন কাণ্ডটি কত্তি পরান ওর ডরালো না। ছিঃ ছিঃ সমাজের মুকি ন্যাংটো হয়ি পা দিয়ি মাড়াচ্ছে। এতডা অনিষ্টি ভগবানও সতি পারবেন না কলাম।

ওদিক থেকে নীল চোখের মাদি চাড়াল, মোটাসোটা মুথকরো গাছের মতো ঠোঁটে গুঞ্জন তুলে বলে— কী সর্ব্বনাশে কতা রে দিদি কব। বাবার আমার নাড়ি কাটল ওই ধলামাগি। ওয়াক থু! একদলা পচা ঘৃণা যেন নীল চোখ ছুড়ে মারে। চ চ ব্যাটাগে কই গিয়ে। এ-অনাচার ভগবান সইবে নারে। সে শূন্যে দু'হাত নেড়ে কাকে যেন অভিসম্পাত দেয়।

নাড়িকাটার বিপরীত খবর শুনে বালাবাড়ির উঠোনে হাজির হয়েছেন সুজন ঢালি, নিতাই বাছাড়, যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস, রতন সর্দার, সুরেশ দত্ত, জগদীশ বাগ,

সনাতন ঠাকুর, অবিনাশ কীর্তনীয়া, নিরাপদ গোঁসাই, অঘোর ঘরামি, পুলিন বাড়ই, কেশব হাওলাদার, শশী রায়, মুকুন্দ হাতি, ঘেচো কলু, ননী করাতি, হরষিত বাইন আর বিমল মল্লিকরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে এসেছেন, কেউ কেউ বিরোধীপক্ষ হয়ে এসেছেন। উঠোন জুড়ে বিপরীত দুই পক্ষ বাদ-প্রতিবাদে ব্যস্ত।

প্রসূতি-মা অনুমতি দেওয়াল-ঘেঁষে হাতের তালুর ওপর মাথার ভার রেখে কাপড়ের পুঁটলির মতো পা গুটিয়ে জড়োসড়ো শুয়ে আছেন। বুকের মধ্যে তাঁর একইসঙ্গে একটা জ্বালা আর আবছা একটা অচেনা মিষ্টি সুখ মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারছে। ওষ্ঠের স্নিগ্ধ হাসি তাঁর মুখের একাগ্রতা, তাঁর চোখের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত ভালবাসা। দুই ছেলের পর চার মেয়ে তার পর আবার এই পেট-পোছা ছেলে হওয়ায় যেন ভেতরের আনন্দ বাইরে মুখে সুখের রং লাগিয়েছে, উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে।

শিক্ষিত দাইকে দিয়ে সদ্যোজাত সন্তানের নাড়িকাটার ঘটনা একদিকে সামাজিক সংস্কার, পুনর্গঠন ও নতুন দিনের আগমনী সূচনা করল। সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন যুগের বাতাস বইতে শুরু করল। জাতীয় জীবনেও নতুন যুগের আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার কুসংস্কারের আঁধার ছিঁড়ে নতুন আলোর পথরেখা স্পষ্ট ফুটে উঠল। কিন্তু অন্যদিকে পিছনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন এই ঘটনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে বিরোধিতা করতে থাকল। দু'টি বিরুদ্ধ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উদ্ভব হল। ছিয়ানব্বইখান গ্রামের মানুষজন বিপরীত দুই দলে রাতারাতি ভাগ হয়ে গেলেন। চটকচন্দ্রের বিরুদ্ধপক্ষের মানুষজন তাদের দলভারী করবার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানা ফন্দি আর কুপরামর্শ করতে লাগলেন। ছিয়ানব্বই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বিরোধীপক্ষের মোড়লরা পাড়িয়ালি গ্রামের বালাবাড়ির আকাশচুম্বী ধারাবাহিক সামাজিক মর্যাদা কী করে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া যায় তার ফন্দিফিকির আঁটতে থাকলেন।

ছিয়ানব্বই অঞ্চলের কুলটিয়া, আলিপুর পোড়াডাঙা, ভুলবেড়িয়া, দোহাকুল, বাহাদুরপুর, মশিয়াকাটি, পাঁচকাটিয়া গ্রামের তরুণ মাতব্বরগণ চটকচন্দ্রকে পূর্ণ সমর্থন করলেন। এই সব সমাজহিতৈষী মাতব্বরগণ আগামিতে মুসলমান অশিক্ষিত দাইকে বাদ দিয়ে শিক্ষিত অভিজ্ঞ দাইকে দিয়ে সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি কাটাবেন— এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এর পক্ষে জনমত গঠন করতে সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু বাকি অংশের অধিকাংশ গ্রামগুলির মাতব্বরগণ আর মানুষজন বিরোধী

হয়ে উঠলেন। বিরোধী দলে ছিলেন— সুজাতপুরের শশী ঢালি, ইনায়েতপুরের নগরবাঁশি, কোড়ামারার শিশুবর মণ্ডল, ফুলগাতির শীতলচন্দ্র মল্লিক, খোনতাহালির নটবর দত্ত, গঙ্গানন্দপুরের জুড়োন সর্দার, হাটগাছার দশরথ গোলদার, পাজবাড়িয়ার দ্বিজবর হালদার, মহাদেবপুরের হারানচন্দ্র গুপ্ত, ডুমুরতলার রতিকান্ত দফাদার, কাঁটাকালির দামোদর মোহন্ত, চোঙরডাঙার শক্তিনাথ ঠাকুর, নলিনী গোঁসাই, বেড়ভিটার সুবল কীর্তনীয়া, বলাডাঙার অশ্বিনী পাড়ই, কুচলিয়ার নগেন বাইন, ডাঙামহিষাদাহের গোলক সাধু ও অন্যান্যরা।

চটকচন্দ্র অর্থাৎ উজ্জ্বল চাঁদ কিন্তু একটুও ম্লান হলেন না। তিনি দমলেন না। বরং নিজের চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন। পাড়িয়ালির মধুসূদন রায়, কোড়ামারার শালক সর্দার, পোড়াডাঙার হরিবর গোঁসাই, সাধন সুতার, লখাইডাঙার সুবল কীর্তনীয়া, বাগান বিশ্বাস, আলিপুরের দর্শন বিশ্বাস, সুধীর সাধু, পুলক গোঁসাই, কালিপদ গোলদার, হাটগাছার বাণীকান্ত বৈরাগী, সুধন্য বাচাড়, সুজাতপুরের দেবী ফকির, সমর মাধু, শশধর বালা, হরেন মণ্ডল, বিকাশ মোহন্তরায় প্রভৃতি তরুণ মাতব্বরগণকে সঙ্গে নিয়ে চটকচন্দ্র নমঃশূদ্র সমাজের নানা কুসংস্কার, অনাচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছিলেন— যার প্রাবল্যে এবং ব্যাপকতায় বিরোধীপক্ষ বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। চটকচন্দ্রের বিপ্লবী মন-মানসিকতা সহসা জেগে উঠে জীবনের যাত্রাপথের মোড় ঘুরিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি সমাজের পুরনো সমস্ত বাধা, কুসংস্কার ঠেলে ফেলে মুক্তির দিকে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিলেন।

নমঃশূদ্র সমাজ পুরনো আঁধার ঝেড়ে ফেলে নতুন আকাশ নির্মাণ করবে— এই বিশ্বাসই চটকচন্দ্রের বুকের তলা থেকে যেন উথলে উঠতে থাকে এবং নতুন বিশ্বাসের আলোর রেখা ধরে তিনি এগিয়ে চললেন। সমাজ বদলের এক নতুন মূল্যবোধের আগমন পুরনো আবর্জনা সব পুড়িয়ে ফেলছে। নতুন প্রাণ জন্ম নিচ্ছে নতুন বিশ্বাসে। কে নেভাবে সেই আগুন? কার সাধ্য আছে? মাটির বুক থেকে জীবনের মতো জ্বলে উঠেছে শিখা— এ জীবনেরই জয়— এ প্রাণেরই স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ।

পূর্বপাড়ার ভবসিন্ধু, রামকানাই, নটবর তরুণী আর সন্তোষরা চক্রান্ত করছেন, পেছনে টানছেন, সত্যকে বিকৃত করছেন, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ঘোষাণাও করেছেন— আজ থেকে বালাবাড়িকে ছিয়ানব্বই সমাজ থেকে একঘরে করা হল। সমাজের কোনও ক্রিয়াকর্মে বালাদের কাউকেও ডাকা হবে না। গ্রামের কেউ বালাবাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে উৎসবে যাবে না। সমস্ত রকম

সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পর্ক বালাদের থেকে ছিন্ন করা হল। পারলে অর্থনৈতিক ভাবেও তাদের অবরোধ করা হবে। স্বঘোষিত এই মাতব্বররা এই অবরোধ ঘোষণা করে তাঁরা যে পুরোনো কালকে, কুসংস্কারকে জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখতে চান— প্রগতির সমস্ত পথ রুদ্ধ করে, বন্ধ করে দিতে চান তা যেমন তাঁরা মুখে বলছেন, কাজেও তা দেখিয়ে চললেন।

চটকচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা কোনও ঘোষণাতেই কর্ণপাত করলেন না। তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। কালের চাকাকে উলটো দিকে কোনওদিনই ঘোরানো যায় না। চটকচন্দ্র আত্মবিশ্বাসে অনড় রইলেন। কালের চাকাকে উলটো দিকে ঘুরাতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটবেই। মুসলমান অশিক্ষিত দাইকে দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ি না কাটাতে দিয়ে বালাবাড়ি সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। একই লগ্নে যেন পাড়িয়ালি তথা ছিয়ানব্বই গ্রাম থেকে নমঃশূদ্র সমাজ থেকে পুরনো কাল বিদায়মুখী হল। আর নতুন কাল সমাজের দরজায় করাঘাত করতে থাকল। কেউ কেউ সে করাঘাত শুনতে পেলেন। যাঁরা শুনতে পেলেন, তাঁরা বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে নতুন সমাজ গড়ার শপথ নিলেন। জীবনকে ঢেলে সাজাতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলেন। চটকচন্দ্র সমাজকে স্বজাতি-স্বজনদের ঢেলে সাজাতে নিজেকে উৎসর্গ করলেন কেবল কথায় না, কাজেও।

গ্রামের গণ্যমান্য এবং ধনী উত্তম বিশ্বাস ছুটে এলেন বালাবাড়িতে— সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে আশীর্বাদ করতে, ছেলেকে দেখতে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বালামশাই এ অতি উত্তম কাজ করলেন আপনি। এ-সমাজের পথিকৃৎ হলেন। এ-ঘটনা ইতিহাসে স্থান পাবে। এ-ঘটনাকে দেশের, সমাজের সব মানুষ মান্য করবে। আপনার অনুগামীর অভাব হবে না।

চটকচন্দ্র নিজেকে আরও শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়ে বলেন: কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে কোনও কালকেই মাপা যায় না। নতুন কালকে, নতুন ঘটনাকে দিয়েই তো চিনে নিতে হয়। বুঝলেন না বিশ্বাসমশাই— এই হল সত্যি কথা। নতুন বসন্তের প্রথম দিনে মুক্ত স্বচ্ছ হাওয়ার মতো সত্য যেন তার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে দেয়।

অঙ্কুরের পাতা ও শিকড়

ছয় যষ্ঠীর দিন— অনুমতি পয়পরিষ্কার হয়ে আঁতুড়ঘর ছেড়ে উঠে আসেন বড়

আটচালা চৌরীঘরে— শোয়ার ঘরে। ভোরের গায় তখনও আঁধার জড়িয়ে আছে। গ্রাম উজাড় করে মানুষজন সব ছুটে আসছেন বালাবাড়িতে। যে ছেলের নাড়িকাটা নিয়ে দেশে, সমাজে, মানুষে-মানুষে এত কাণ্ড ঘটে গেছে তার ছয়ষষ্ঠীর উৎসবে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন আর ধরে না। বালাবাড়ির মস্ত উঠোনে গ্রামের বউ-ঝিদের খুশির ধুম পড়ে গেছে— শিশুর গালে কেউ চুমু খেয়ে আদর করেন, আহ্লাদ করেন— কেউ নাকে, কেউ মাথায়, কেউ হাতে, কেউ পায়ে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করেন। ভালবাসা জানান, দীর্ঘায়ু কামনা করেন। চটকচন্দ্র-অনুমতির আবার যখন ছেলে হয়েছে— এ কী চাট্টিখানি কথা। আর সে ছেলে আর কেউ নয়— দেশের-দশের আর মানুষের পরমপ্রিয় আপনজন সিদ্ধিরাম বালাই যে ফিরে এসেছেন— এই বিশ্বাসে সবাই বিশ্বাসী। কেউ কেউ তো নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লাগলেন। কেউ নির্ভুল হিসাব কষে বললেন, দেখো, তুমরা বিশ্বাস করো আর নাই-বা করো— সিদ্ধিরাম বালা মরার ঠিক দশমাস দশ দিন পরেই এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ ছেলে নির্ঘাত সিদ্ধিরাম বালা।

বয়স্করা, মাসি-পিসি, দিদিমা-ঠানদিরা ছেলেকে কোলে নিয়ে ছেলের মুখ দেখে যেন চমকে উঠছেন। নিরীক্ষ ধরে তাকিয়ে থেকে কী যেন পরীক্ষা করছেন। তার পর নিশ্চিন্তে ঘোষণা করেন— এ ছেলে সিদ্ধিরাম বালা না-হলেও সিদ্ধিরাম বালার সমস্ত লক্ষ্মণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। এ ছেলে বালাবংশের মুখ উজ্জ্বল করবেই। হরিমতি, যিনি সম্পর্কে ছেলের ঠানদি হন, তিনি মত প্রতিষ্ঠা করতে জোর দিয়ে বললেন, দ্যাখো, তোমরা দ্যাখো এ ছেলের মুখ দ্যাখো, চোখ দ্যাখো, পায়ের প্যাতা, হাতের আঙুলগুলি অবধি সিদ্ধিরাম বালা।

একুশ দিনের দিন, শিশুকে ঘিরে ফের শুরু হয় নতুন পর্ব। ভোর না-হতে উঠোনে চলছে গোবরঝাঁট, ঘর-বারান্দায় লেপা-পোঁছা। ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হল গোটা বাড়িটা। কাপড়-জামা, কাঁথা-বিছানা-মাদুর চলছে কাচাধোওয়া। একেবারে শুদ্ধ হয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করবে শিশু। হবে তার ভাগ্যলিখন, হবে তার নামকরণ। ফুলো বাঁশের ফুলো কঞ্চি কেটে বানানো হল কলম। কড়াইয়ের তলার কাচি চেঁচে তৈরি হল কালি। সে-কালি রাখা হল নতুন মাটির দোয়াতে। ছেলে যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয় তার জন্য তালগাছ থেকে কেটে আনা হল তালের পাতা। দোয়াতে কালি আর কলম শিশুর শিথানে রাখা হবে। দুই দাদা সকাল থেকে তাই নিয়ে মহাব্যস্ত।

আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শিদের খাওয়ানোর জন্য পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরা হল। বিশাল রান্নার জায়গা তৈরি করে চলেছে রান্না। রাতেও বহু

মানুষ খাবেন, তার জন্য কলার পাতা কাটা হচ্ছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিকাল হতেই উঠোনে শামিয়ানার নীচে বসে যায় মেয়েলি গানের আসর। গান গেয়ে এয়োরা সব পানগুয়া খেয়ে বসেন নামকরণ অনুষ্ঠানে। চৌরীঘরে নতুন শয্যায় শিশুকে শোয়ানো হয়। বয়স্ক পুরুষ নারীরা বসে বংশের আর সমাজ-সংসারের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখেন। মুখে মুখে যাঁর জানা ক্ষণজন্মা পুরুষ নারীর চরিত্র আলোচনা চলে। তাতেই উঠে আসে একটি নাম দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন নামে যিনি খ্যাত। তাঁর সম্মুখসমরে যুদ্ধ— বুড়িবালামের তীর-দেশের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ। আর তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে সিদ্ধিরাম বালার মণিরামপুর থানার দফাদারের চাকরিটা চলে যায়। বাঘাযতীনের নামে শিশুর রামকরণ করা হল যতীন। এ ছেলেও যেন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালা যে দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সে আদর্শও যাতে যতীনের জীবনে প্রতিফলিত হয় সমবেত মানুষজন সে কামনাই করেন।

দিন দিন ছেলে বড় হচ্ছে। অনুমতি ছেলে কোলে নিয়ে উনুনে রস জ্বালান। খড়ি গোঁজেন আগুনে, ধান সিদ্ধ করেন। ছেলে বসতে শিখেছে তাকে উঠোনে বসিয়ে অনুমতি গোরুর গোয়াল পরিষ্কার করতে যান, দুধ দুইতে যান। ছেলে তখন হিসির ওপর, ধুলোর ওপর— দু'হাতে মুখে পুরছে চাড়া— ইটের টুকরো। ধানের সঙ্গে বিল থেকে উঠে-আসা গয়ালঘাসের বিচি। দিদিরা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তুলে নেয় ভাইকে কোলে। মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনে— চাড়ার টুকরো, কুলের বিচি, গয়াল বিচি, ঢ্যাপের বিচি। ছোট ভাই আদর কুড়াতে কুড়াতে বড়দির কোল থেকে মেজদিদির কোল, মেজদির কোল ছেড়ে বড়দার কোল। কোলে কোলে শিশু ঘুরে বেড়ায়।

সে দিন দুপুরবেলা। বড়দি গৌরী ভাইকে কোলে নিয়ে পাড়ার সঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে শ্রীরাম মোড়লের পরিত্যক্ত ভাঙা দালানের সিঁড়ি বেয়ে ছাদের ওপর উঠে গেছে। ছাদের কার্নিসে দাঁড়িয়ে বড়দি গৌরী নীচে তাকিয়ে দেখছিল কত উপরে উঠে এসেছে। আকাশ ছুঁতে একহাত আকাশে তুলে তার কী আনন্দ।

মা অনুমতি এসেছেন তাঁর বড় জার কাছে বড়ি দেবার চালকুমড়ো নিতে। ফেরার পথে দেখে বড় মেয়ে গৌরী ছাদের কার্নিশে ভাইকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁতে হাত বাড়াচ্ছে। অনুমতি ভয়তরাসে ছুটে আসেন দালানবাড়ির উঠোনে। নীচে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় মেয়েকে লক্ষ করে ডাকেন,

নীচের উলে আয় মা গৌরী। ভাইকে সাবধানে ধরে নীচেয় উলে আয় না। শিগ্‌গির উলে আয় মা। অনুমতি বলে কয়ে মেয়ে গৌরীকে ছাদ থেকে নামাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেন। মেয়ে গৌরী সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখতেই অনুমতি দ্রুত হাত বাড়িয়ে মেয়ের চুলের মুঠি ধরতে যান। গৌরী বুঝতে পেরেই ছুটে পালায়। মায়ের হাতের নাগালের বাইরে। অনুমতিও ছাড়বার পাত্রী নন। তিনিও ছুটলেন মেয়ের পিছন পিছন। রাস্তা পেরিয়ে গৌরী ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে চষাখেতের ডেলাবন ভেঙে। অনুমতি চিৎকার করে রাগপ্রকাশ করে বলেন, ওরে হারামজাদি, এতবড় দুঃসাহস তোর ভাইকে কোলে নিয়ে ভাঙা ছাদের কার্নিশে উঠিস। দাঁড়া তোরে দেখাচ্ছি।

অনুমতি মরিয়া হয়ে ছুটছেন। দিদি গৌরী ভাইকে কোলে নিয়ে আর ছুটতে পারছে না। হাঁপিয়ে তার শ্বাস ঘন হয়ে আসে। মায়ের হাতের মার এড়াতে গৌরী কোলের ভাইকে ডেলাবনে ছুঁড়ে ফেলে ছুটে পালায়। ছেলে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আর মা-অনুমতি লাফ দিয়ে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ধুলো ঝেড়ে আঘাতের ব্যথাস্থানে হাত বুলাতে থাকেন আর ছেলের মুখে-চোখে-ঠোঁটে-গালে অসংখ্য চুমু খেতে খেতে বলেন, আহারে, আহারে-বাছারে আমার, কী লাগা লেগেছে, ডেলাবনে ছুড়ে ফেলল। আহারে। আহারে বাছারে আমার।

ছেলের আদর-মাখানো প্রাণময় মুখ, মিশকালো চুল, লাল গাল ভারী সুন্দর। নীল একজোড়া চোখ আর টিয়াপাখির মতো নাক। ছেলে দিন দিন নতুন মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। পর্বে পর্বে জড়িয়ে যেতে থাকে জীবনের শিকড়, কানায় কানায় জেগে উঠতে থাকে প্রাণ। প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ আর প্রকাশের বিচিত্র আনন্দ।

মা অনুমতি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে জ্যোৎস্না থই থই উঠোনে হেঁটে হেঁটে গানের তালে সুর করে ছড়া কেটে ঘুম পাড়াচ্ছেন—

আয় চাঁদ, আয় না
গড়িয়ে দেব গয়না
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
কালো গোরুর দুধ দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ, টিপ দিয়ে যা...।

মা অনুমতি উঠোনে পাটি বিছিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পা-দুটো ভাঁজ করে করে পায়ের পাতার ওপর ছেলে তুলে পা-দুটো একই সঙ্গে আগু-পিছু করতে করতে

মা ছড়া কাটেন—

ঘুঘুর সই— ঘু ঘু ময়না,
চাল ভাজা খায় না।
চালে পড়লে গুঁড়োগাড়া,
ময়না চলে হুড়োতাড়া।

মা সামান্য পা উঁচুতে তুলে ফের ছড়া কেটে বলেন— তুল্লই নাচন/বল কোদা বল/কোন্ ঘাটে পড়বি বল। ঘুমন্ত ছেলেকে মা দক্ষিণ পাশে শুইয়ে দেন।

ছেলের জন্মের কয়েক মাস পর মা অনুমতির সূতিকা হয়েছিল। জীর্ণশীর্ণ চেহারা। বুকে একফোঁটাও দুধ ছিল না। ছেলে দুধ খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করত। ছটফট করত।

মা অনুমতির সঙ্গে দক্ষিণ পাতার ফতেমাবিবির সই পাতানো ছিল। দুই সইয়ের হৃদয়ের মাখামাখি এত গভীরে ছিল যে, একজন একজনকে না দেখলে থাকতে পারতেন না। অনুমতির ছেলে হওয়ার একমাসের মাথায় ফতেমাবিবিরও ছেলে হয়। অনুমতির অসুখের সময় ফতেমাবিবি সইকে দেখতে আরও ঘনঘন ছুটে আসতেন। অনুমতিকে সাহায্য করতেন, আর বুকের কাপড় সরিয়ে তাঁর সুপুষ্ট দুধের বোঁটা ছেলের মুখে তুলে দিতেন। ছেলেও প্রাণভরে পেটপুরে দুধ খেত।

বেঁটেখাটো সুস্বাস্থ্যবতী ফতেমাবিবির বুক দুধের ভারে টনটন করে উঠত। তাঁর ছেলে মহিদুল সে দুধ খেয়ে পারত না। তাই সইকে দেখবার ছল করে সইয়ের বাড়িতে ছুটে আসতেন। সইয়ের ছেলেকে আদর করে দু'হাতে সাফটে ধরে কোলে তুলে নিতেন। পরম স্নেহে মমতায় বুকের দুধের বোঁটা সইয়ের ছেলের মুখে গুঁজে দিতেন। অফুরন্ত অমৃতসুধা পান করাতেন। দুধ খেতে খেতে সইয়ের ছেলে ফতেমাবিবির বুকেই কাদার দলার মতো ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়ত।

তখন ছেলে সবে দু'-একপা হাঁটতে শিখেছে। অনুমতিদের মস্ত উঠোনের কোণে ফতেমাবিবিকে আসতে দেখলেই অনুমতি উৎসাহ নিয়ে বলতেন, ছোটকোদা বাবা, ওই তো তোর ফতেমা আম্মা। যা বাবা ছুটে যা। আম্মাকে ধরে নিয়ে আয়, যা বাবা যা।

বুকভরা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ছেলে তক্ষুনি ছুটত। হাঁটি-হাঁটি, পা-পা, টালমাটাল খেতে খেতে ছেলে এগিয়ে যেত। খানিক এগিয়ে গিয়ে ঠিক টাল সামলাতে পারত না। ছেলে টাল খেয়ে পড়ার আগেই ফতেমাবিবি তাঁর সইয়ের

ছেলেকে চিলের মতো ছোঁ-মেরে দু'হাতে তুলে নিতেন কোলে। মুখে ঠোঁটে হাজারও চুমু খেয়ে ফতেমাবিবি প্রাণপণে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। আদর-সোহাগে-ভালবাসায় ছেলে ডুবে যেত স্নেহের অতলতলে, সে যে কী আদর-সোহাগ-ভালবাসা জগতের কোনও ভাষা দিয়েই তা প্রকাশ করা যায় না।

তার পর দুই সই মেতে উঠতেন ছেলে নিয়ে আর তাঁদের সংসার জীবন নিয়ে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়। দুই সইয়ের প্রাণের কথা, ভালবাসার কথা ফুরোয় না...।

চারাগাছে ঝড়

ছেলেবেলার একদিনের ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। আচমকা কখন যেন আমি মার ঘরে ঢুকে পড়েছি। পশ্চিম ঘরের মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে মা একা শুয়ে আছে। মা এত রোগা বিছানার সঙ্গে শরীরটা তার লেগে আছে। বুকটা বুঝি ধুকধুক করছে। আধবোজা খোলা দু'চোখ। হঠাৎ আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস নিয়ে মা তাকাল আমার দিকে। প্রাণঢালা দরদে-ভরা কী করুণ চাউনি মা'র যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়। আমার যা-কিছু সব গভীর মনোযোগ দিয়ে মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকেই দেখছে। তাঁর পেটের সন্তানকে মন-প্রাণ-হৃদয় ঢেলে দিয়ে দেখছে। এর আগে কোনওদিন মা যেন আমাকে দেখেনি। মা একটি কথাও বলছে না। নিবিড় চোখে নিরীক্ষ ধরে পড়ে আছে। তাঁর প্রাণময় দু'চোখের ডালি ছাপিয়ে বড় বড় বৃষ্টির জলের ফোঁটার মতো অশ্রুবিন্দু গাল বেয়ে অঝোরে ঝরে চলেছে।

আমি থ হয়ে একটা নিথর নিস্তব্ধতার ভেতর ঢুকে যেতে থাকি। বুকের মধ্যে পুরনো ঢেউ যেন উথলে ওঠে। ঠাকুরমা আমাকে মা'র কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। আমি যেন লুকিয়ে সন্তর্পণে মা'র ঘরের মধ্যে একেবারে মায়ের বুকের মধ্যে ওমের ভেতর ঢুকে পড়েছি। মা'র গাঢ় সুমিষ্ট সুগন্ধের ভেতর আমি অথৈ অতল তলে তলিয়ে গেছি।

দেখার মধ্যে আচমকা মা তাঁর রোগা হাত বাড়িয়ে খুব মিহি আর করুণ সুরে আমাকে ডাকল, ছোটকোদা, বাবাসোনা, আয় বাবা, আমার কাছে আয় বাবা। সোনামানিক কত বড় হয়ে গেছিস তুই। মানিক আমার কাছে আয় বাবা, আয় আয়...।

মা'র বলা প্রতিটি কথা আমি লোভীর মতো সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন পান করি। নড়তেও সাহস হয় না— পাছে দৃষ্টিসূত্র ছিঁড়ে যায়। আমি আমার চোখ দু'টির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মা'র মুখের ওপর বিঁধিয়ে রাখি। বিরাট বহ্নিজ্বালার মতো একটা বিপুল বেদনা-ভরা তীব্র আনন্দ মা'র হৃৎপিণ্ডটাকে যেন চিরে-ফেড়ে ফালিফালি করে দিচ্ছে। কিন্তু তা বোঝবার মতো ভাষা আর শক্তি মা খুঁজে পাচ্ছে না। কেবল অনন্ত স্নেহ উদ্বেগ তাঁর মাথা কুটছে অসহ্য যন্ত্রণায়।

মা সামান্য ক'টা কথা বলতেই ঘরের বাতাসে বুকভরা দরদের ঝড় বয়ে গেল। মমতা মাখানো শব্দগুলো আমাকে ঘিরে ধরল। মাটির মেঝেতে পা ডুবিয়ে আমি পাথর হয়ে যাচ্ছি। কষ্টে দুঃখে বেদনায় আমার গলা বুজে এল। আমি বোবা কালা হাবা হয়ে ভেসে রইলাম মা'র শরীরের সুগন্ধের ভালবাসার অথৈ সমুদ্রে।

মা'র বুকের মধ্যে বুঝি কফের ঘড়ঘড়ানি ওঠে। তা বন্ধ হয়ে হেঁচকি তোলার মতো মা হাঁপাতে থাকে। একটা পুরনো ব্যথা যেন গুমরে ওঠে মা'র ভেতর। কোন অতীতের আঁধার ঠেলে বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া বিষাক্ত ক্ষতটা নতুন করে কাঁচা হয়ে ওঠে। বিষণ্ণ ক্লান্ত অনুভূতিটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মা সুধোয়, ছোটকোদা, সোনামানিক, তুই আমার কাছে আসিসনে ক্যান রে? তোর ভয় করে বাবা? ভয় কীসের? এই দ্যাখ না, আমি একদম ভাল হয়ে গেছি! দ্যাখ বাবা, দ্যাখ আমার সব রোগ-ব্যাধি সেরে গেছে। আয় বাবা, কাছে আয়। আমার কাছে আয়, আয় বাবা। আশাশীল হাতখানা মা'র তখনও শূন্যে ঝুঁকে। স্নেহের অনন্ত সমুদ্র সাঁতরে মা প্রাণপণে হৃদয়ের উষ্ণতায় আমাকে ধরতে চাইছে। মা আকর্ষণ করছে আমাকে।

মা'র অধীর আগ্রহ আমার কলজের শিরা ধরে টানছে। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে বুকের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল তা শিখায় শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মা'র অমোঘ টান আমি এড়াতে পারলাম না। আমি নিজেই ছুটে গিয়ে মা'র কোমল আদর-মাখা হাতে ধরা দিই।

মা'র গা-ঘেঁষে বুকের কাছে আমি বসি। দু'হাতের নরম ঠাণ্ডা তালুর মধ্যে আমার মুখখানা আদরে আহ্লাদে ধরে গালে চুমু খেয়ে বুকের কাছে প্রাণের মধ্যে টেনে আমার মা আমাকে যেন শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিল এক অভূতপূর্ব অনন্ত উষ্ণতায়। আনন্দের অস্থিরতায় দুঃখ ও ব্যথায় তাঁর হৃদপিণ্ডটি বুঝি কুঁকড়ে-মুচড়ে যেতে থাকল। গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়াতে থাকল ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল চিরকাল বুঝি।

মা'র গা-টা ভিজে ভিজে। জলের তলার কাদার মতো শীতল। জলজ উদ্ভিদের নরম হাত-পা শরীর কোমল নির্জীব শুকনো চেঁচো ঘাসের মতো নেতানো। মুখকুরো শ্যাওলার মতো জবজবে বাসিফুলের পাপড়ির মতো ছেঁড়া তুলো তুলো নিশ্চল শান্ত।

মায়ের মনের সমস্ত তোলপাড় ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর পুত্রস্নেহ। মা'র একটি হাত আমার পিঠে জড়ানো লতার মতো, অন্য একটি হাত আদরে গলা জড়িয়ে মা আমাকে টেনে নিয়েছে বুকে। আস্তে আস্তে মা সোহাগে আহ্লাদে অস্পষ্ট স্বরে বলতে থাকে, ছোটকোদা, দ্যাখ তো বাবা, কতদিন তুই আমার বুকের দুধ খাসনি বাবা। নে বাবা, সোনামানিক। তুই একটু দুধ খা বাবা। কতদিন দুধ খাসনি। মার নিঃশ্বাসে যেন ফুলের সুগন্ধ ছড়ায়, ঘর ভরে যায়। আমি শ্বাস নিয়ে জেগে উঠতে থাকি।

ছোটকোদা, সোনামানিক একটু দুধ খা বাবা। আয় নে। এক ঢোক দুধ খা। বাবা আয় নে খা। মা'র দরদ-ভরা কথা, বুক-ভরা ভালবাসা, মা'র গা'র সুমিষ্ট সুগন্ধ আর মায়ের বুকের দুধ অনেকদিন না-খাওয়ার জন্যই হোক বা অনেকদিন মায়ের কাছে না-আসার জন্যই হোক— আমি আড়ষ্ট হয়ে থাকি। কাঁচা দুধের সুগন্ধে ভরতে থাকে ঘর। আমার সমস্ত সত্তায় কানায় কানায় টইটম্বুর ভরে উঠতে থাকে সেই স্বাদ-আহ্লাদ।

আমি ভয় পাচ্ছি— মা টের পায়। তাই মা তাঁর রোগা দুই হাতে আমাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দুধের বোঁটাটা জোর করে আমার মুখে গুঁজে দেয় গভীরতম প্রাণের আর্তিতে। বলে, ওরে বোকা, নে খা। একটা টান খা বাবা। একটু চুমুক খা। কতদিন খাসনে। নে বাবা।

মা'র কষ্ট দেখে আমার বুকে কষ্ট জেগে ওঠে। এত কষ্ট, এত ব্যথা আমার অন্তরাত্মা দিশাহারা হয়ে যায়। আমি যেন গলে গলে মা'র সঙ্গে মিশে যেতে থাকি। দিশাহারা আমি মায়ের বুকের দুধে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিই। দুধ খাই— পান করি অনন্ত অমৃত কণা। এক চুমুক দুধ পান করেই মুখ সরিয়ে নিই। তাতেই আমার মা আনন্দে আত্মহারা। আহ্লাদে তাঁর দু'চোখের ডালি বুজে আসে। আমার বুকে পিঠে মাথায় সারা শরীরে মা হাত বুলিয়ে চলে। মায়ের হাত আমার প্রতি রোমকূপের গোড়ায় আদর ঢেলে দিতে থাকে যেন অনন্তকাল। খুশিতে আনন্দে সোহাগে আহ্লাদে এক বিপুল কুলপ্লাবী আবেগের ঢল নামল। আর তার সীমাহীন উষ্ণ স্রোতে অথৈ আমি ডুবে যেতে থাকি। ডুবে যেতে থাকি মা'র সঙ্গে মিশে যেতে থাকি। বিশ্বমন্থন করা মায়ের অমৃত ধারায় আমি মা'র ভেতর হারিয়ে

যাই চিরকালের মতো।

তার পর যে ছবিটা আমার অন্তরাত্মায় জ্বলজ্বল করছে, সেটি আমাদের বাড়ি, ভোরবেলা নবজাত সূর্যের একটা লম্বা রশ্মি সোজা এসে বিঁধেছে, পশ্চিমঘরের উঁচু ভিতে ডোয়ায় বারান্দায়। মা বাইরে থেকে উঠে এল সেই বারান্দায়। মা'র আঁচলের খুঁট ধরে আমিও উঠে এসেছি। আমার বড়দা, রাতে যেখানে শুয়েছিলেন মা সেখানেই শুয়ে পড়ল। হঠাৎ মা'র শরীরটা যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠেছে। মা চিত হয়ে শুয়ে দু'খানা হাত শরীরের দু'পাশে। তাঁর লম্বা কালো চুলের রাশি এলোমেলো, লুটোপুটি খাচ্ছে। মা'র ফ্যাকাশে মুখটা নীলচে হয়ে উঠেছে। মা'র চোখে অনন্ত অস্থিরতা।

মা ব্যস্ত হয়ে বড়দাকে ডেকে বলল, বাবা বিজয় রে, আমি বাইরে গেলাম। আমার মনে হল আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বাবা বিজয় রে, তোর বাপ যেন আজ আর কোথায়ও না যায়। মা'র ক্ষীণ গলার স্বর চাপা, স্বাভাবিক থেকে চড়া। স্পষ্ট আর অন্তর্গূঢ় ধ্বনি। কী নিদারুণ আর্তি আর ব্যথা ঝরে পড়ে সেই সুরে শব্দে, যেন ত্রিভুবন কাঁপতে থাকে থরথর করে।

সহসা মা দু'হাতে আড়াআড়ি ভাবে বুক চেপে ধরে ফের বলল, বিজয় রে বাবা, আমার তো কিছুতেই ভাল ঠেকছে না, বাবা। যা তো বাবা, শিগ্‌গির যা বাবা। তোর ভজপিসিকে এক্ষুনি ডেকে আন বাবা। যা তাড়াতাড়ি যা বাবা। যাবি আর ডেকে নিয়ে আসবি। যা বাবা। ছুটে যা। মা'র গলার স্বর শেষে নিভে আসতে থাকে। কথা জড়িয়ে যেতে থাকে।

মা'র কথা শুনে মাকে দেখে বড়দা অস্থির হয়ে উঠলেন। কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত উঠোনে নেমে ঝড়ের বেগে উড়ে গেলেন পাড়ার ভজপিসিকে ডাকতে।

আমি হতভম্ব। মাটির দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ সেঁটে চোখেমুখে অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে আছি— মাকে দেখছি। মনে হল মা'র চোখে একটা নতুন আলো, অচেনা একটা জ্যোতি ঝিকমিক করছে। মা একটু একটু করে কাঁপছে। বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়িয়ে মা যেন অস্ফুটস্বরে কী বলছে। আমি তার একবিন্দুও বুঝতে পারছি না। কোন-এক অদৃশ্য যন্ত্রণায় অথবা তীব্র আনন্দে কুঁকড়ে যাচ্ছে মা'র শরীর। মা বদলে যাচ্ছে। মা'র চোখমুখ তীব্র উজ্জ্বল আলোয় ভরে যাচ্ছে। অশ্রুবিন্দু টলমল চোখে বিশ্বজুড়ে মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে চোখ রেখে আমাকে যেন দেখছে অনন্তকাল।

মা'র অসুখের সময় মা'র কাছে আমার যাওয়া বারণ ছিল। মায়ের দুধ খাওয়া

নিষেধ ছিল। ঠাকুরমা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন: খবরদার দাদুভাই, মা'র দুধ একদম খাবে না। খবরদার দাদুভাই মা'র ত্রিসীমায় যাবে না। তোমার মা'র চোখে বাও-বাতাস লেগেছে।

সে কথা এখন মনে পড়তেই ভয়ে-আতঙ্কে-ত্রাসে আমার বুক ধড়ফড় করে কাঁপছে। ভুরু দুটো টান মেরে কপালে উঠে গেছে। ঠোঁট-চোয়াল পাথরের মতো শক্ত। মা'র চোখের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। তেল ফুরিয়ে গেলে প্রতীপের সলতেটা যেমন চড়চড় করে শিখাটা কাঁপতে থাকে— তেমনি মা'র চোখের আলো থরথর করে কাঁপছে।

মা'র কষ্ট দেখে আমার কলজেটা দুমড়ে মুচড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে থাকে। অজানা অন্ধকার স্রোত থেকে চেতনাকে টেনে তুলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। ভয়ের দাবানলে পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেলাম। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম।

তার পর এক সময় চোখ খুলে দেখি আমি ঠাকুরমার কোলে। মাকে নামানো হয়েছে উঠোনে ছাঁচতলায়। তাঁর চারপাশ ঘিরে আছেন আত্মীয়স্বজন আর পাড়া-প্রতিবেশী। সবার চোখে জল। গোটা বাড়িটা মাথায় করে দিদিরা কাঁদছে। দুধ-সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মা'র শরীর। মনে হচ্ছে মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মা'র ঠিক মাথার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন ভজপিসি। তাঁর চেহারা একহারা। ফর্সা শরীর। মাথায় অল্প সাদা চুল। গালটা চাপা চাপা। নাক ছুঁচালো। চোখ দুটো গাঢ় নীল।

মা'র বিছানার অদূরে উঠোনের মাটিতে ঠ্যাং মেলে বসে আছেন আমার ঠাকুরমা। তাঁর তুলতুলে মোটা শরীর। গোলগাল ফর্সা চেহারা। মাথাটা একরাশ সাদা-কালো চুলে ঢাকা। তাঁর নরম-কোমল-দয়ালু শরীর নড়লেই ভাঁজ পড়ে।

আমি ঠাকুরমার কোলে গোঁজ হয়ে বসে। ঠাকুরমা আমাকে অনবরত ঠেলছেন মা'র দিকে আর বলছেন, যাও বাছা, মা'র কাছে একবারটি যাও। মা'র গা-র গন্ধ নাও। মাকে একবার জড়িয়ে ধরো। যাও বাছা। সারা জীবন আর কোনওদিন মাকে ছুঁতে পারবে না। যাও বাছা যাও। তোমার মা চিরদিনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাও বাছা যাও। মা'র কাছে যাও।

আজও আমি এর অর্থ বুঝি না। আগাগোড়া একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তালগোল পাকানো পরিবেশ। গোটা বাড়িটার মুখে একটা বিষাদ কালো ছাপ ছোপ ধরে আছে।

মা'র অসুখের সময় প্রথম দিকে যখনই মা'র ঘরে ঢুকে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছি মা ভয়ে শশব্যস্ত দূরে সরে গেছে— পাছে ছেলের অমঙ্গল হয়। বিষ বাতাসে মা জরজর। মা তাঁর পেটেরছেলেকে ছুঁতে পারছে না— কষ্টে মা'র কোমল চোখদুটো কঠিন হয়ে যেত। ঠোঁট ফুলে উঠত রাগে। করুণাময়ী মা আমার সন্তানস্নেহে খাপছাড়া অদ্ভুত চেহারায় অবিশ্বাস্য ভাব প্রকাশ করত। আর আমি ভয়ে বিস্ময়ে ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যেতাম।

আমার মা খুব সাদাসিধে। সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে। ঠাণ্ডা মেজাজ। হালকা শরীরের সবটুকুখানি দরদে ভরা। মা'র দোহারা চেহারা। মা'র মাথায় একঢাল চুল। তাঁর ডিমের মতো মুখ। আমার মাকে দেখতে কী সুন্দর! জগতে তার কোনও তুলনাই নেই।

আর এখন মনে হচ্ছে মাকে আমি কোনওদিনই দেখিনি। ঠাকুরমা অনবরত ঠেলছেন আর বলে চলেছেন, যাও বাছা, মা'র কাছে যাও। যাও...

আমি তবুও ঠাকুরমার কোলে অনড় স্থাণু হয়ে বসে থাকি। ঠাকুরমা শত চেষ্টা করেও আমাকে নড়াতে পারেন না। আমার জন্য ঠাকুরমা কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না। কে যেন তাঁর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে। ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছেন আর দম নিচ্ছেন বারবার।

বাঁশঝাড় থেকে একটা বড় বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। কাঁচা বাঁশ ফেড়ে তৈরি হল নতুন চালি। কলাগাছের বড় বড় গুঁড়ি কেটে করা হয়েছে চালিখাটের পায়া। বাঁশের চালির নতুন খাটে মা'র শরীর তোলা হল। আকাশের দিকে মুখ করে মাকে শোয়ানো হল।

আর দেরি ঠিক নয় এমন একটা ভাব নিয়ে চারজন শবযাত্রী মায়ের চালি কাঁধে তুলে নিল। ওই তো ওই তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চালির ডানকোণে আমার বড়দা কাঁধ দিয়েছেন। অন্য কোণে পিসতুতো দাদা কাঙালহরি। তার পিছনে জ্যেঠতুতো দাদা বলহরি। অন্য দিকে পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ। চারজন শবযাত্রী-সহ, বল হরি বোল, ধ্বনি দিতে দিতে শববাহকরা শব কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল— সঙ্গে চললেন কাঠুরিয়ারা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে।

পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হতেই গোটা পরিবেশটাই বদলে গেল। আর আমার গর্ভধারিণী মা চতুর্দোলায় চড়ে শাঁখাসিঁদুর সঙ্গে নিয়ে শ্মশানে চলল। তিনপাক ঘুরে মায়ের মাথা বাড়ির দিকে রেখে শবযাত্রীরা শববাহকরা চলতে শুর করলেন। কাঠুরিয়াদের পিছনে পিচনে গোবরছড়া ছিটাতে ছিটাতে চললেন শ্যামাবউদি আর আলো খই ছড়াচ্ছেন অন্য কেউ। বড় বড়

গোবরছড়ার ফোঁটা আর আলো খইয়ের চিহ্নগুলি পড়ে থাকল শবযাত্রীদের চলার পথে যেন পুষ্পবৃষ্টির ফুলগুলির মতো মুখ তুলে চেয়ে রইল আকাশের দিকে চিরকালের মতো।

শেষ মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল সেজেগুজে আমার মা চৌদোলায় চড়ে কোথায় চলেছে? সত্যই কি মা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে?

ক্লান্ত বাতাস। দীর্ঘশ্বাসে কাঁপছে চরাচর। নাড়ি ছেঁড়া ব্যথায় কান্নায় চারিদিক ভারী ভারী মনে হচ্ছিল— আমার মাথার উপর আকাশটাই তিরতির করে কাঁপছে, দুলছে, নাচছে চালুনির মতো। হালকা মেঘ পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। আর তারই ফাঁকফোকর গলিয়ে আলোর বর্শা যেন বিঁধে আছে উঠোনে— মুক্তার মতো সেই আলো জ্বলছে। ঝিকমিক ঝিকমিক যেন নদীর জলের স্রোতের মতো আলোর উজান ঢেউ স্রোত ব্যথায় ব্যথায় বয়ে চলেছে অন্তহীন।

হঠাৎ কোথা থেকে বাবা এসে ঠাকুরমার কোল থেকে আমাকে টেনে তুলে নিলেন নিজের কোলে। আর পায়ে পায়ে হেঁটে গেলেন বাড়ির বেড়ার পুব-উত্তর কোণে— যেখানে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা মাথি মোটা ধেড়ে খেজুরগাছ। এই গাছেরই নিজেল নলেন রস কতদিন মা আমাকে ঘটি ভরে খাইয়েছে। আর আজ কী করুণ তার চেহারা, পাণ্ডুর এবড়ো-খেবড়ো গা-গতর নিয়ে নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। বিকালের মরা আলোয় তার হালকা ধূসর ছায়াটা যেন ডিঙি মেরে মাটির রাস্তা পেরিয়ে ও-পাশের বাঁশবাগানের ঝোপঝাড়ের আঁধারে হারিয়ে গেছে।

খেজুরগাছের গা-ঘেঁষে বাবা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি মাকে শবযাত্রীরা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। চোখের সীমানা পার হয়ে শবযাত্রী দলটি আস্তে আস্তে বিন্দুমতো হতে হতে একসময় মাঠের দিগন্তে মিলিয়ে গেল। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে সেখানেই তখনও দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবার মুখে ক্লান্ত-বিষণ্ণ-উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। কিছুই বলছেন না। এমন অবস্থা আগে কোনও দিন দেখিনি। এমনিতে বাবা গম্ভীর মানুষ। বাড়তি কথা বলেন না। ধীরস্থির অবিচল। শক্ত চওড়া মানুষ। কালো কুচকুচে একমাথা কোঁকড়া চুল। ছোট্ট মুখটুকু ওষ্ঠদু'টি নিটোল, দিব্যি গোলগাল চকচকে চেহারা। অতি পরিষ্কার কণ্ঠ। ঘন নরম। অথচ বলিষ্ঠ চেহারা। নিটোল স্বাস্থ্য। পিটানো মজবুত শরীর। পাথরকুঁদে গড়া মূর্তির মতো। সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ। শক্তিতে ভরপুর শক্ত কবজি। মানুষের মতো মানুষ দেখলেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসে।

পরিবারে কেউ মারা যাওয়ার পর তথাকথিত নমঃশূদ্র সমাজের উপর

ব্রাহ্মণদের ছিল ভয়ংকর সব শোষণমূলক রীতি-নিয়ম, যুক্তিহীন প্রথা, আচার ও বিধি-নিষেধ, যা পালন না করলে সমাজে বাস করাই কঠিন হত। এমনিতে ব্রাহ্মণরা বর্ণগত ভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আভিজাত্য বজায় রাখতে নমঃশূদ্রদের ঘৃণা করতেন। কিন্তু শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান নেওয়ার বেলায় কোনও বাধা ছিল না। শুধু তাই নয়, পরলোকগত আত্মার পূর্ণ শান্তি, তৃপ্তি, স্বর্গপ্রাপ্তি এবং উৎসর্গের নামে নমঃশূদ্রদের সাধ্যাতীত ব্যয় করতে বাধ্য করত। অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নমঃশূদ্ররা চতুর, স্বার্থলোভী ব্রাহ্মণদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হতেন। আমার মা'র মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধোপলক্ষেও তেমনি ঘটেছিল।

পুরনো পাড়িয়ালির পাশের গ্রাম বাহাদুরপুরের শ্যামল চক্রবর্তী এবং তাঁর ছেলে শংকর আমার মায়ের শ্রাদ্ধকার্য করেছিলেন। ব্রাহ্মণের বিধানমতো মা মরার দিন থেকেই আমাদের অশৌচ শুরু হয়ে গেল। তিন ভাইকে পরতে হল ধড়া, গলায় বাঁধতে হল ন্যাকড়া ধড়া, মালসা পুড়িয়ে হবিষ্যি। সমাজের রীতি, রেওয়াজ, নিয়মকানুনের এত কড়াকড়ি শুরু হল, পালন করতে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত। তেরোদিন ধরে ব্রাহ্মণের দেওয়া বিধিনিষেধ পালন করতে গিয়ে গোটা বাড়িটাই শ্মশানে পরিণত হল।

বাবা কিন্তু এই সব রীতি রেওয়াজ আর নিয়মকানুনের প্রতি বিরক্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু সমাজের চাপে পড়ে আর নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণের বিধানে তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল অর্থহীন যতসব ধ্যানধারণাকে। যুগ যুগ ধরে এই অনাচার মানুষকে টেনে নীচে নামিয়েছে— যা, সেই সব কুসংস্কার।

তেরোদিনের দিন আমাদের মাথা কামানো হল। তার আগেই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ শ্যামল চক্রবর্তী এসে হাজির। গলায় পৈতা আর গায়ে নামাবলি ধূর্ত বামন। শ্রাদ্ধের নামে পরলোকগত আত্মার শান্তি তৃপ্তি কামনায় পাঁচ কাঠা জমি নিল। দুধ দেয় এমন একটি গোরু। একটি ফলন্ত আমগাছ নিল। এ ছাড়া খাট-পালং, ছাতি, থালাবাসন, সোনা-রূপা, জামাকাপড় এত সব কিছু দানসামগ্রী তাকে দিয়ে অশৌচ মুক্ত হতে হল এবং গোরুর গাড়িতে করে সে সব মালপত্র তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিতে হল।

ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা আর ধূর্ততা দেখে মাঝে মাঝেই বাবা খেপে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পুত্রদের অমঙ্গল চিন্তা করে সামলে নিচ্ছিলেন। সমাজের নিষ্ঠুরতা তাঁর গলা চেপে ধরেছিল।

পিণ্ডদানের মতো ভয়ংকর সব আচার-অনুষ্ঠান আমাদের মাথা পেতে মেনে নিতে হল। আর কাককে পিণ্ড খাওয়ানোর মতো কুসংস্কার সমাজের কত গভীরে

শিকড় গেঁড়ে বসে আছে তা দেখে বাবা শিউরে উঠলেন। বারবার বাবা বলতে লাগলেন, যুগ যুগ ধরে অজ্ঞ মানুষকে শোষণ করতেই এ সব অর্থহীন ক্রিয়াকর্ম পালন করানো হচ্ছে। এ বার যা হল আর দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে এ সব আমি ঢুকতে দেব না। আমার নিজের মা এখনও মরেনি। এই কুসংস্কারের রীতিনিয়ম রেওয়াজ আমি কিছুতেই মেনে নেব না। আমার এই ছোটকোদার উপর যে অবিচার করা হল তা চিরকাল মনে থাকবে আমার।

ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শোষণ অর্থহীন রীতি রেওয়াজ নিয়মকানুনের প্রতি আমার দাদাদেরও বিশ্বাস হারাল।

বড়দা প্রশ্নটা তুললেন, সে কী করে হয়, মা কাক হয়ে আসবে। যত সব আজগুবি ধ্যানধারণা। নোংরা হাবিযাবি খায় যে, সে কী করে মা হবে? অজ্ঞ মানুষকে ব্রাহ্মণরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই ভুল বুঝিয়েছে। এ অনাচার ও অবিচার, ভুল মিথ্যা।

মেজদাদা বামুনদের গালাগালি দিতে থাকে। আশা পূরণ করে সব নিয়ে গেল ওই বামুনরা। মানুষের বিপদের সুযোগ নিয়ে মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যায়। থু, এরা আবার মানুষ।

বড়দাদা ফের বললেন, সত্যিই কি পিণ্ডদান করলে মৃতব্যক্তির আত্মা স্বর্গে যায়? স্বর্গ-নরক কী তা কেউ কি দেখেছে কখনও?— মেজদাদার প্রশ্ন। যতসব আজেবাজে ধারণা। সব মিথ্যা, বুজরুকি! ছলচাতুরি, অর্থ-স্বার্থলোভী ব্রাহ্মণ ভুল বুঝিয়েছে।

নিমন্ত্রিত মানুষজন বাড়িতে তখন এসে গেছেন। মা'র মৃত্যুতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাবাও সাধ্যমতো ব্যয় করতে বাধ্য হলেন। ফলে ভেঙে-যাওয়া সংসারটা আরও নড়বড়ে হয়ে কোনওমতে টিকে রইল।

চারাগাছ ছড়ায় প্রাণের ডালপালা

এর মধ্যে ক'বছর কেটে গেছে— ঘটনাও ঘটে গেছে অনেক। বড়দি গৌরীর বিয়ে হয়ে গেল পাশের গাঁ আলিপুরে। দিদি চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। আর আমি পড়লাম জ্বরে। ঠাকুরমা বাবাকে ডেকে বললেন, কোদারে, বড়কুদির জন্যি ছোটকোদার হুতোশ করে গায় জ্বর আইছে কলাম। তা কোদা বড়কুদিরি নিয়ি আয়গে, দেহিস কেনে জ্বর ছাড়ি যাতি পথ পাবে না নে।

সত্যি তাই ঘটল। বিয়ের ক'দিন পর বড়দি জোড়ে ফিরে এলেন আর জ্বর কোথায় পালাল খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই থেকে বড়দি শ্বশুরবাড়ি রওনা দিলে ঠাকুমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে দিদির সঙ্গে হেঁটে যেতেন অনেক দূর। শেষ বিদায়ের মুহূর্তে বড়দি আমার ডান হাতটি টেনে নিয়ে কনিষ্ঠ আঙুলে কামড় দিয়ে ব্যথা দিয়ে যেতেন, যাতে আমার হুতোশ করে জ্বর না-আসে।

বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে মেজদি জপমালারও বিয়ে হয়ে গেল আলিপুরের পরের গ্রাম পোড়াডাঙায়। পাড়িয়ালি গ্রাম থেকে দু'খানা গ্রাম পেরিয়ে গেলেই কাঁচা রাস্তার খুব কাছে সেজদির শ্বশুরবাড়ি। মেজদি ছোটখাটো মানুষ। এ জন্য তার ডাকনাম ছিল ছোট্ট। বাবা ডাকতেন, 'ছোট্টমা'। মেজদির এত অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, মেজদি তার পরনের কাপড়খানাও পরতে পারত না। শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময় বাবা ডাকতেন, কই কনে গেলি ছোট্টমা। আয় দিনি মা, আয় শাড়ি পরিয়ে দিই। আয় মা। মেজদিকে শাড়ি পড়িয়ে সাজিয়েগুছিয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হত, তাকে একটি বড়সড় পুতুল বলেই মনে হত। মেজদিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শ্বশুরবাড়িতে রেখে বাবা পালিয়েই বাড়ি ফিরে আসতেন। আমাদের তালুই মহাশয় ছিলেন না। মাউইমা মেজদিকে ভুলিয়ে রাখতে নানারকম খেলা দিতেন, আদর করে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন। অককথা (রূপকথা) বলে ঘুম পাড়াতেন।

মাস না-ঘুরতেই মেজদিকে আনতে বাবার কাঁধে চড়ে আমিও যেতাম পোড়াডাঙায়। পাড়িয়ালি গ্রাম থেকে বেরুলেই পুবমুখো দিব্যবুড়ির কাঁচা রাস্তা ধরে ডাঙামহিষদাহ ছাড়িয়ে আলিপুর গ্রাম রেখে পোড়াডাঙা গ্রাম। রাস্তার গাঁ-ঘেঁষে বিশাল এক বটগাছ। বটগাছের তলায় একটি একপেয়ে হাঁটাপথ উঁচু ভিটা থেকে যেন লাফ মেরে ছায়ায় মুখ রেখেছে। হাঁটাপথে দু'পা হাঁটলেই মেজদির শ্বশুরবাড়ি। আমরা যখন মেজদির শ্বশুরবাড়ি উঠোনে পা রাখলাম তখন বেলা দুপুর। মেজদির একমাত্র দেওর কালা গামছা কাঁধে যাচ্ছিল স্নান করতে। সে উঠোনে কুটুম দেখে হইহই করে ছুটে এল, বলল, আসো আসো, তালুইমশাই। আরে এ যে বড় কুটুম আইচে। তোমরা ভাল আছো তো? বসো বসো, তালুইমশাই বসো। বলতে বলতেই কালা উঁচু বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে দিল। আমাদের মাউইমাকে ডেকে বললেন, কই কনে গেলি মা, ওমা, ওমা দ্যাহ দ্যাহ, পাড়েলি থেয়ি কারা এসেছে দ্যাহসে এসে। কালা ডাকতে ডাকতে বদনা হাতে পুকুরঘাটে গেল। ফিরে এসে বদনার জলে পা ধুতে বলল।

বাবা বদনা হাতে নিয়ে ছাচতলায় পা ধুয়ে বারান্দায় উঠলেন। গামছায় পা-হাত মুছে মাদুরে বসলেন।

কোথা থেকে মাউইমা ছুটে এসে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে মোটা গলায় বললেন, বেয়ানে সওয়ালে কুটুম পাখি ডাকি গেইল 'ইস্টকুটুম'। তখনই কলাম আজ কুটুম আসবেনে দেহিস কেনে। তা বেয়াই মশাই, বাড়ির সঞ্চলি ভাল আছে তো, তুমরা?

এই আছি, ভাল-মন্দ মিশিয়েই আছি বেয়ান। তোমরা সবাই ভাল আছো তো? দুই বেয়াই-বেয়ানের কথা আর ফুরায় না। জামাই ধীরেনের এক বোন এসেছে সে ছুটে এসে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করল। বলল, তালুই ভাত গোছানো হয়েছে, খাতি চলো! আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলল, আসো ভাইডি, খাতি চলো।

আমি হাত-পা গুটিয়ে বাবার পিছনে লুকাতে থাকি। তা দেখে মাউইমা বললেন, বেয়াই, পরের কতা, পরে হবেনে। এ্যাহোন দু'মুঠো খায়ি জিরিয়ে নাও। ছোটকোদা বাবা, আইসো। আমার কাছে আইসো বাবা। তুমি কতা কও না ক্যান, বাছা। দিদিবাড়ি আইচ, ওমন কল্লি হয় নাকি বাবা। আইসো কাছে আইসো। কুটুমবাড়ি আলি কতা কতি হয়, আইসো, আইসো। মাউইমা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে কোলে টেনে নেন। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন। আহা রে বাছা রে আমার, মা নেই, কত কষ্ট বাছার। আহা রে আহা রে, মাউইমা ঠোঁটে শব্দ করে চুমকুড়ি কাটেন। আর আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে চলেন।

আমাদের মাউইমা, ছোট্টখাট্টো দেখতে। কিষান মেয়ের মতো খুবই সাদাসিধে মানুষ। মুখটা থেলো, মাথাটা একটু লম্বাটে। একমাথা কাঁচাপাকা চুল। কাপড়ের কালো আমুট দিয়ে বাঁধা। সাদা ধবধবে থানকাপড় পরনে। তারই একটুকরো আঁচল মাথায় ঘোমটা দেওয়া। গায়ের রং কালো হলেও গড়নটা নিখুঁত। হাসলে লাল মাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। আমাকে আদর করতে গিয়ে তাঁর চোখদু'টি স্নেহে কোমল হয়ে ওঠে। ব্যথার মতো কী যেন একটা তরাশ তাঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। বারবার তিনি বলতে থাকেন, বাছা মনটন খারাপ কোরো না। কত বাচ্চাদের মা থাকে না তাতে কী হইছে! আদরে সোহাগে মাউইমা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান বারবার।

আনন্দে আহ্লাদে বুঝি আমারও চোখের কোণে জল জমে যায়। মাউইমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি আর তখনই আমার মনের আকাশে মায়ের মুখ উজ্জ্বল তারাটির মতো ফুটে ওঠে। আমার চেতনা ছেয়ে যায় অন্য এক আলোয়।

বাবা তখন গলা বাড়িয়ে ডাকতে থাকেন আমার মেজদিকে, কই, কনে গিলি মা ছোট্ট। কাছে আয় মা। তুই কনে গিলি মা। ও ছোট্টমা।

মেজদি রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয়। খাতি আসো বাবা। ভাত গুছাইছি। ভাইডিরি নিয়ে খাতি আসো। আগে খাও, পরে কথা কবানে। আসো, ভাইডির খিদে লেগেছে।

যাও বেয়াই। খাতি বসি কতা কওগে যাও। ছোটকোদা কহন খাইছে। বাছার আমার খিদে লেগেছে। যাও বাবা, যাও খাতি যাও। উপস্থিত মতো খাওয়া, বড়কোদা ন'পাড়ার হাটে গেছে। তখন ভাল মন্দ যা হোক একটা হবেনে। যাও বাছা, যাও খাতি যাও।

বাবার সঙ্গে উঠে আমিও খেতে গেলাম রান্নাঘরে। মাটির মেঝেতে আলো লালমাটিতে লেপা জায়গায় পিঁড়ে পেতে খেতে দিয়েছে। মাউইমা এসে বসলেন রান্নাঘরে তদারকি করতে। গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন, উপস্থিত মতো খাওয়া, কুটুমের জন্য নতুন করে রান্না করার ফুরসত হয়নি। যা হোক, পেট ভরে খাও বাছা। তোমার দাদাবাবু ন'পাড়ার হাটে গেছে, ইলিশের হালা তো আনবেনে। তখন ভালমন্দ রান্না হবেনে। খাও বাছা, পেট ভরে খাও। বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বেয়াইমশাই পেট ভরে খাবা, যা তোমার মেয়ে রান্না করেছে তাই দিয়ে।

দিদি তো একটার পর একটা দিয়ে চলেছে। ট্যাংরা মাছের সুক্তো, মাছের ঝোল দু'রকমের— মাগুরমাছ আর শোলমাছ। নিরামিষ দু'রকম তরকারি, কুসি ভাজা। খেতে মুখ ফেরে না। তার পর প্রকাণ্ড বাটিভর্তি ঘন দুধে চটের মতো সর তার সঙ্গে খেজুরের গুড় মিষ্টি আর রসখাঁজা কাঁঠাল।

দিদির চোখে তাকিয়ে দেখি চোখের তারায় তারায় কী অসহায়তা, কী বিরাট ভয়! যেন বুকের কষ্টে কথা বলতে পারছেন না। পাথরের মতো নির্জীব কাজ করে চলেছেন।

বাবা খেতে খেতে একবারের জন্য বললেন, ছোট্টমা, ভাল ছিলি তো?

মেজদি মাথা হেলাল। বুকের কষ্ট চেপে দিদি সরে গেলেন। বাবাও অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। ফিসফিস করে আমাকে বললেন, ছোটকোদা পেট খালি রেখে খা বাবা, জামাই বাবাজি ইলিশের হালা এনেছে বলে মন হল। রাতে জোর খাওয়া হবে। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম।

আসা অবধি ছোট্টমা মেয়ের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবার জন্য বাবা অনেকক্ষণ ধরে ছোঁক ছোঁক করছেন। উত্তর পোতার ঘরের বারান্দায় পাতা

খাটের ওপর বিছানায় শয্যা পেতে দিতে এসেছেন মেজদি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাবা বারান্দায় উঠতেই মেজদির চোখের জল আর বাঁধ মানল না। দু'গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়াতে থাকে।

বাবা আদরমাখা সুরে কোমল কণ্ঠে বললেন, কাঁদছিস ক্যান ছোট্টমা? এরা কি তোকে কষ্ট দেয় মা? ক'মা, আমাকে ক' মা। আমি এট্টা বিহিত করি যাই মা! ক'মা আমাকে ক'মা।

মেজদি কোনও কথাই বলতে পারল না। কেবল ঠোঁট কাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। তার বুকভরা যে অন্তহীন কষ্ট আর ভয়।

ক'মা কী হয়েছে। ক' ভেঙে ক' মা। না কলি আমি ক্যাম্মা রে বুঝি ক'মা। ক'দিনি মা। তোরে কি জামাইবাবাজি মারধোর করে মা? ক'দিনি মা, তুই না কলি আমি ক্যাম্মা রে বুঝি। বাবা বারবার মেজদিকে বলতে থাকেন, অনুযোগ করতে থাকেন।

মেজদি তার পরনের কাপড়ের তলা থেকে হাত দেড়েক লম্বা সরু দড়ি বের করে আনেন। দড়িটা হাতে ঝুলিয়ে দেখিয়ে বলেন, দ্যাহ দ্যাহ বাবা, আমি কত্তদিন এ বাড়িতি আইছি। আসবার সময় কলে, যা মা, সাতদিন বাদে আমি নিয়ি আসপানে, এ্যাহোন দ্যাহ না, কত্তদিন বাদে আলে! মেজদি একটা একটা করে দড়ির গিঁট গুনতে থাকেন। আর তার চোখ থেকে ঝরতে থাকে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। গিঁট গোনা শেষ করে দিদি বলেন, মাত্তর তিন দিন বাকি আছে একমাস হতি! আর কত্তদিন তোমরা আমারে এ্যাহানে ফেলি রাখবা কও? মেজদি গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেন। সে কান্না আর থামে না।

বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তা কলি কী হয় রে মা। তোর সংসার তোরে বুঝি নিতি হবে, মা। সারা জীবন যে মাটিতি থাকতি হবে— সেখানকার মাটিতি শিকড় না বসালি বাঁচবি কেম্মা রে মা! বাঁচতি হলি এ্যাহানেই শিকড় ছড়াতি হবে।

মেজদির কান্না দেখে আমারও চোখে জল ভরে আসে। মেজদি সরে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, কাঁদিসনে ভাইডি, ছোট থাকতি মা মল্লি তাগে দুঃখির শেষ থাকে না। কাঁদিসনে ভাইডি। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে মেজদি প্রসঙ্গ পালটে বলেন, বাবা আমি কিন্তু তোমাগে সাথে যাবানে কলাম। মেজদি কথা বলে আর চোখের জল মোছেন। কীসের যেন একটা কাঁটার ব্যথা খচখচ করে বিঁধে তার বুকে। তা প্রকাশ করার ভাষা দিদি খুঁজে পায় না। বুকের কষ্ট বুকে ছটফট করেন।

হ্যাঁ যাবি মা, বাপের বাড়িতি যাবিই তো। দ্যাহি, কতা কয়েনি তোর শাশুড়ির

কাছে। তোরে তো নিতিই আলাম। যাবি মা। নিতিই তো আলাম!

সন্ধ্যাবেলা উঠোনে মাদুর পেতে বসে বাবা মাউইমার কাছে কথা পাড়লেন:

বেয়ান, ছোট্টমারে তো নিতি আলাম! জামাই বাবাজিও ষষ্ঠীর দু'দিন আগেই যাবে। সংসার ফেলে তো এত আগে আমি নিতি চাই না, যাতিও কতি পারি না। বেয়ান, সংসারের কাজকম্ম গুছিয়ে বাবাজি যাবে, আর সকালে ছোট্টমাকে আমি সঙ্গে নিয়ি যাব। আম-কাঁঠালের দিন। ছোট্টমা আমার একটু ঘুরবে ফিরবে আম-কাঁঠাল খাবে। ছোটমানুষ এটুকু তো কত্তি দিতি হবে— না হলি চল্‌বে ক্যান? বাবা একটার পর একটা প্রসঙ্গ বলে চলেন।

বেশ তো, যাবে বউমা, ছেলেও যাবে। মাউইমা একেবারে গঙ্গাজল। যেন ভাজামাছটি উলটে খেতে জানেন না। একগাল হেসে ফের বলেন, কিন্তুক জামাইষষ্ঠীর পর দু'দিনির বেশি একবেলাও যেন না হয়, কলাম বেয়াইমশাই। বাবা নেই, ছেলের আমার এমন বয়স হয়নি, একার ঘাড়ে এত বড় সংসার— সব দিক সামলে তো চলতে হবে। নাকি কও বেয়াইমশাই। সত্যি কি না বলো দিকিন! বউমাকে নিয়ে যাও, সময়মতো রেখে যেও। স্থির নিশ্চল ভাবলেশহীন মুখটা মাউইমার যেন কীরকম অদ্ভুত চ্যাপটা লাগে। কেবল ছোট গোল চোখ দুটো অতল দৃষ্টির আঁধারে অস্থিরতার ঢেউ ভাসাচ্ছে।

তাই হবে বেয়ান। বাবাজিকে আমার এক্ষুনি যাতি কচ্ছি নে। জামাইষ্ঠীর আগের দিন গেলিই হবেনে। এমনি তো বাবাজি যাতি চায় না। জামাইষষ্ঠী না গেলি নয়, পাড়ার আরও দশটি জামাই আসবেনে। সেহানে আমার জামাই না গেলি মানষ্যি কী কয়! আর আমার মা তো নাতজামাই কতি অজ্ঞান— জষ্টিমাস পড়তি না পড়তি রাতদিন ঘ্যানোর ঘ্যানোর কত্তি আছে— যা কোদা, যা ছোট্টর বররে আনদিনি, যা কোদা যা। তার জন্যিই তো আসা। সওয়াল সওয়াল ছোট্টমারে নিতি আসা। নালি কী ফস্‌ করি আসি। দরদ-ভরা গলায় বাবা বলেন আর তাঁর উজ্জ্বল মুখখানা যেন আলো ছড়াতে থাকে।

তা করবেই তো, নাতজামাই বলে কতা। এ কথা বলে মাউইমা চুপ করে রইলেন মুহূর্তকাল। তার পর গভীর ভাবনা বুক থেকে ঢেলে সরিয়ে আদেশের সুরে মাউইমা বলেন: বউমারে বড়কোদার সাথে পাঠিয়ে দিও বেয়াইমশাই। অতি অবিশ্যিই পাঠিয়ে দিও। সে বারে তো পেট নেমেছিল, যা তা খায় না যেন এ বারে। এহ্যানেও তো ফকিরবদ্দি কবিরাজ আছে। আমাগে বউ আমাগে দায়। আমি বলি কী বেয়াই— যাগের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতি নারাজ, তো তাদের মেয়ে বিয়ে দেযা কী দরকার। ঘরের খুঁটি করি রাখলিই তো ল্যাঠা চুকে যায়!

নালি বিচন রাখলি পারে। লাউ-কুমড়োর মতো এট্টা দুটো যেমন রেখে দেয়। কণ্ঠস্বর একটু নরম করে মাউইমা ফের বলেন:

বউ বাপেরবাড়ি পড়ি থাকিত আমি ছেলে বিয়ে দিইনি বেয়াইমশাই। ঘরের বউ ঘরের লক্ষ্মী। কোনও গৃহস্থ লক্ষ্মীছাড়া হতি চায় না। বেয়াই, মেয়ে তোমার হতি পারে, কিন্তু বউ আমাগে গরের লক্ষ্মী। এটুকু তো খেয়াল রাখা দরকার বইকি! মাউইমা মুখ বেঁকিয়ে নিজের কথায় নিজেই সান্ত্বনা খোঁজেন।

মেজদির আর বড়দার একই দিনে, একই লগ্নে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বড়দার বিয়ে হল পরদিন গোধূলিলগ্নে। আর ঠিক-করা মেয়ের সঙ্গেও বিয়ে হল না। মা মরবার বছর না ঘুরতেই বড়দার বিয়ে ঠিক হয়েছিল কোড়ামারা গ্রামে। গাঁয়ের এক দুষ্টু মানুষ ভাঙানি দিয়ে বিয়ে ভেঙে দিল। সেই রাতেই অন্য মেয়ে দেখে পরদিন গোধূলিলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। পাঁচকাটিয়া গ্রামের গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে ধনিদাসীর সঙ্গে। বউ নিয়ে দাদা বাড়ি এলেন। কিন্তু বউ একবারে ছোট্ট মেয়ে, সবে সাতবছর ন'মাস বয়স। সে না-পারে কাপড় পরতে, না-পারে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাতে, না-পারে কলসি ভরে জল আনতে, না-পারে ঢেঁকিতে ধান ভানতে। যে জন্য ছেলে বিয়ে দেওয়া, সেটাই মাঠে মারা গেল। তবু বাবার আনন্দ ছেলে বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে এনেছেন। তাই দু'দিন ধরে উঠোনে 'লাঠি খেলা' হল। বিয়েতে গ্রাম-পরগনা ডেকে খাওয়ানো হল।

মা মারা গেছেন। গোটা সংসার বাবাই একা কাঁধে নিয়ে চলেছেন। ছোড়দি টুনিদি আর আমি দু' ভাই-বোন সারাদিন পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামের এদিক-ওদিক আর গাছের তলায় তলায় টো টো করে ঘুরে বেড়াই। ঠাকুরমা যত কাছে ডাকেন আমরা দু' ভাই-বোন ততটাই দূরে সরে গিয়ে ভীষণ মজা পাই।

যেদিকে তাকাই গাছে গাছে যেন বান ডেকে ফল ধরেছে। প্রকৃতিদেবী দু'হাতে অফুরন্ত ঢেলে দিয়েছেন। জামরুল গাছদুটো ফলের ভারে নির্ঘাত এবার ভেঙে পড়বে। গুঁড়ি ভেদ করে থোকা থোকা ফল ধরেছে। বৈঁচিগাছে বৈঁচি পেকে আছে। আমগাছে কী আম না ধরেছে! কে কত খাবে! অফুরন্ত খাবার। বৈঁচিবন থেকে টুনিদি কোঁচড় ভর্তি করে বৈঁচিফল নিয়ে এল। এসেই দিদি বৈঁচির মালা গাঁথতে থাকল। আমি সতৃষ্ণ নয়নে বসে বসে দিদির কাজ দেখছি। সহৃদয় হয়ে টুনিদি মাঝেমধ্যে দু-একটা পাকা লাল টকটকে ফল আমাকে ছিঁড়ে দিচ্ছে এবং নিজের গালেও ছুঁড়ে দিচ্ছে।

আঁড়-শ্যাওড়ার ফল। নাম তার মধুফল। দেখতে যেমন টকটকে লাল খেতেও

তেমনই মজা। গাবগাছে গাব পেকেছে, খেজুর গাছে খেজুর পেকেছে। সিঁদুরে আমগাছের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। গায়ে সিঁদুর মেখে কী অপরূপ। বেলতলি, খেজুরতলি, নারকেলতলি, জামতলি, বাদামতলি— আমের নামের কী বাহার।

টুনিদি আর আমি খুব বেশিদূর যেতে পারি না। খেজুরতলি তলায় দৌড়ে যাই। দিদির পায়ে ঘুঙুর বাজে ঝুমঝুম আর আমার কোমরে ঘাঘর বাজে রিমঝিম রিমঝিম। উঠোনের অদূরে বুড়িগাছটা আমাকে খুব চেনে। কাছে গেলে একটা-না-একটা পাকা আম ঠিক ফেলে দেবে সামনে। এত পাকা আর এত মিষ্টি খেতে মুখে লেগে থাকে।

ঝুঁকে-আসা ডালটায় একটা হলদে আম ঝুলছে, দুলছে বাতাসে। আহা, কী নাদুস-নুদুস চেহারা, পেকে মজে আছে। লোভী চোখে আকাশমুখো তাকিয়ে আছি লোভ দেখিয়ে কেবলই পাগল করছে, দুলছে— খেজুরতলি দুষ্টুমি করছে, ফেলছে না। খোসামুদি শুরু করি:

ও-গাছ খেজুরতলি, লক্ষ্মীসোনা— ও বুড়িমা দাও না, দাও না পাকা আমটা, পেকেই তো গেছে। পড়ে তো যাবেই। দাও না বুড়িমা। ও খেঝুরতলি দাও না। দাও না। দাও না।

টুনিদি ঘুরছে। ঘোরাঘুরি করছে। তক্কেতক্কে আছে পড়লেই আমটা ছোঁ মেরে নেবে। আমি পাব না। খেজুরতলি বুড়িমা দাও না, দাও না তোমার পা ধরছি। বুড়িমা দাও না। খেজুরতলির খসখসে গুঁড়িগা ধরে ঠেলা দিয়ে বলি, বুড়িমা, দাও না পাকা আমটা।

খেজুরতলি গাছ উদাসীন। একটি কথাও কানে নিচ্ছে না। ডালপাতা নাড়ছিল। এখন হাত ছুঁয়োতেই তাও বন্ধ করে দিল। আমও দুলছে না। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে হাত তুলে কড়ে আঙুল দেখিয়ে বলি:

আড়ি আড়ি আড়ি খেজুরতলি। আড়ি আড়ি আড়ি।

আমতলা ছেড়ে উঠোনে পা দিতেই একটা নয়, খেজুরতলি গাছ তিন তিনটে আম ফেলে দিয়েছে তলায়। যেমন মজা, তেমনি খাঁজা। শব্দ শুনে স্পষ্ট টের পাই।

মান, আড়ি সব জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে যাই আমতলায়। ঘাসবন মরে গিয়ে দক্ষিণ দিকটা ধবধবে সাদা পরিষ্কার হলে কী হবে খেজুরতলি গাছের বজ্জাতি এ-গাঁয়ের মানুষ সবাই জানে। মাথাকুটে মরে গেলেও পরিষ্কার জায়গায় আম ফেলবে না। কাঁটাঝিটকের ঝোপে পাওয়া গেল একটা । অন্য দু'টি আঁকশাটিবনে।

আম কুড়াতে গিয়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে দু'টি আঙুলে ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে।

আম পড়বার শব্দ শুনে ওদিক থেকে ছুটে এল পুঁটি, ট্যাংরা, বাঁশপাতা, কালোকুদি, টুনিদি, নিমাই, চেঁচান, হরি, টেপিরা সব।

খেজুরতলি গাছ যে ওদের দলে তা বোঝা গেল তিনটে-চারটে নয়, সাত-আটটা আম ঝপাঝপ তলায় ফেলে দিল গাছ ওদের হাতের নাগালে।

হাঁ করে খেজুরতলি গাছের দিকে তাকিয়ে। ক'দিন ধরে মেঘ মেঘ করছে। বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকেও আয়োজন গুরুতর। ঝড়ো কোণ মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। বেলা না মরতেই অন্ধকার হয়ে গেল। উড়ে-পালানো মেঘ না। বাতাস বইছে জোরে। ঝড় এল।

ঝিলিকে ঝিলিকে আকাশ চৌচির হচ্ছে। ঝড়ের তাণ্ডবে গাছ নুয়ে পড়ছে। আকাশের এ-মাথা ও-মাথা ফের বিদ্যুৎ চমকালো। বাজ পড়ল। চোখের পলকে ঝড় শুরু হল। প্রচণ্ড ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। ঢিবঢাব ঢিবঢাব খই ভাজার খোলায় যেমন খই ছিটকে পড়ে, তেমনই আম পড়ছে। উঠোন অবধি পাকা ডাসা কাঁচা আম ছিটকে আসছে, যে যেদিকে পারল চোঁচা দৌড়। আমিও ছুটছি চোঁ চোঁ।

ঠাকুরমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে উত্তরঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন। এ্যাই ছোটকোদা, এ্যাই ছোটকুদি, তোরা আমতলায় যাসনে কলাম, যাসনে। গাছগাছালি ভেঙে মাতায় পড়ব্যানে। ঝড় থামুক, যাসকেনে। বাতাস থামুক যাসকেনে।

মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল:

কলি হয় না ঠাম্মা। কতক্ষণ আর আমতলায় পড়ি থাকব্যানে আম। আমকুড়ানিরা ছুটি অ্যালো বলি। কুড়াতি থাকলি কারে ক'টা নিতি মানা করব্যানে কওদিনি। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মেজদা ধামা কাঁধে আমতলায় ছুটলেন।

মড়মড় করে জামরুল গাছের একটি মস্তমেনে ডাল ভেঙে পড়ল। পায়রাতলি আমগাছের ডাল ভেঙে ঝুলে রইল গাছে। যা বলেছিলেন ঠাকুরমা, তাই ঠিকঠিক ঘটল। আর ঠাকুরমা চিৎকার জুড়ে দিলেন:

ওরে ওরে তোরা যাসনে যাসনে ঘরের বাইরে। শিল পড়ব্যানে, ডাল ভাঙব্যানে, মাথায় পড়ব্যানে। আয় ঘরে আয়। আয়, ঘরে আয়। তোরা ঘরে আয় রে।

ঠাকুরমার মুখ থেকে কথা না বেরুতেই ঝোড়ো-হাওয়া তা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেমনই দাদা, তেমনই তার ভাইবোন— সব্বাই সমান। ভয়ডর নেই রে তোগে। অ্যাই মেজকোদা, পাঠা না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ি পাঠা। পাঠা না ঘরে।

অ্যাই জয় কী কতিতিছিস তুই। কলি কানে যায় না, না? কলাম না, কানে গ্যালো রে। অ্যাই জয় তোরা ঘরে আয়। ঘরে আয়, আমার মাথা খা। আমার মাথা খা রে তোরা। ঘরে আয়। উত্তরোত্তর ঠাকুরমার গলা চড়ছে— অস্থির হচ্ছেন। হাঁসফাঁস করছেন তিনি। ছাঁচের এ-মাথা থেকে ও-মাথা চষে ফেলছেন।

তুমুল ঝড়ে কাঁচা-পাকা পাতা ছোট ছোট ডালপালা ঘুর্ণিঝড়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে দলা পাকিয়ে আকাশে উঠে গেল। জামতলি গাছের উঁচুমাথা ছুঁয়ে পাতাপুতির দলা উড়ে গেল বাগানের দিকে। গাছগাছালির মাথা ভেঙে পড়ছে। চারটি সুপারিগাছ ইতিমধ্যে ধরাশায়ী। মোচাকাঁদি নিয়ে দুটো কলাগাছ পুকুরে যাওয়ার পথজুড়ে শুয়ে পড়েছে আড় হয়ে। তা দেখে বড়বউদি হাততালি দিয়ে উঠল, ঠাম্মা ঠাম্মা, কাল থোড়-মোচা খাবানে।

ঠাকুরমা রাগে-দুঃখে ঠিক ফোড়ন কাটলেন, খাসকেনে, চিত করে শুয়াইয়ে মোচার ঘোণ্টো খাওয়াবানে, ঠ্যাসে ঠ্যাসে খাওয়াবানে। কী সব্বোনাশ হচ্ছি তা নিয়ি একফোঁটা দুঃখ নেই। মোচার ঘোণ্টো খাতি লালা পড়ছে। থুঃ থুঃ...

এ দিকে আমরা দু'ভাই-বোন সুযোগ পেয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আনন্দে ভিজতে ভিজতে হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছি, ছড়া কাটছি—

'রোদ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে।
শ্যাল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে।'

এর মধ্যেই বৃষ্টির জল আর বিলের মধ্যে যে সরু নালা নতুন পুকুরে ঢুকেছে তার জল একাকার হয়ে গেছে। পুকুরের জল ছুটে চলেছে বিলে। ছাঁচতলা দিয়ে দ্রুত সোঁতায় গিয়ে পড়ছে। সোঁতা থেকে পথে রাস্তায়। রাস্তা থেকে পগারে। পগারের জল এঁকেবেঁকে শেষঅবধি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে পেতেই চট করে কাগজের নৌকো বানিয়ে স্রোতে ছেড়ে দিলাম। নৌকা চলল বিলমুখো। ফের ছড়া কাটি:

'আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেব মেপে...'

খলবল করে সোঁতার সামান্য জলে স্রোতের উজানে কইমাছ উঠছে। উজোইমাছ উঠোনে এসেছে— কেউ ঠাওর করেনি। বেশ বড়সড় একটা কইমাছ, বুক-হলুদ, কানকো দিয়ে হেঁটে হেঁটে ছাঁচতলার সামান্য আটকে-পড়া জলে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে কী ভাবল কে জানে। কইমাছ ফের ফিরে চলল। বিলমুখো এতগুলো মানুষের চোখের সামনে।

ওমা, ওমা এ কী! কইমাছ যে ফিরে চলল। ঠাম্মা, ও ঠাম্মা এতবড় একটা কইমাছ বৃষ্টির ফোঁটায় ঝিলিক মারছে। তেলভর্তি কইমাছের পিছলে-পড়া গা।

টুনিদি মাথায় বড়-একটা মানকচুর পাতা চাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও কচুপাতা মাথায় চাপিয়ে ছুটলাম সঙ্গে সঙ্গে।

জলের স্রোতের সঙ্গে কইমাছ পগারের দিকে মরিপড়ি ছুটছে। একবার পগারের জলে পড়তে পারলে কে ধরে তারে? টুনিদি একবার হাতে চেপে ধরেছিল। কাঁটা মেরে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর খেপে উঠল। ঝুড়ি আনতি পাল্লি নে। ধর, আঁচলটা ধরদিনি ভাইডি। শিগ্‌গির ধর। ধর ধর...।

দুই ভাই-বোন আঁচল বাগিয়ে ধরলাম। আয় দিনি বাছাধন এ বার আয় দিনি। আয় দিনি। টুনিদি মুখে বিচিত্র শব্দ করে কঠিন হয়ে গেল। হাতের সদ্যক্ষত অগ্রাহ্য করে টুনিদি কাপড়ের মুড়ো টানটান ধরে আছে। অতি সাবধানে কইমাছ যাতে কিছুতেই পালাতে না পারে। দু'জোড়া হাত সোঁতার জলে ডুবে আছে। আচমকাই আঁচলসুদ্ধ কইমাছ চেপে ধরল দিদি। আর কাঁটা মারবার জো নেই বাছাধনের।

টকটকে হলুদ বুক কইমাছের। পিঠ ঘনকালো। তেল গড়াচ্ছে সারা গায়ে যেন তেল তেলে। বিঘেতখানেক মাছটা তখনও পালানোর জন্য কানকো মারছে, ছটফট শব্দে লেজ মারছে। বৃষ্টিমাথায় নিয়ে আমরা দুই ভাই-বোন আনন্দে নাচছি, ভিজছি—

সমাজমাটির সুগভীরে জীবন-শিকড়

তিরিশে আশ্বিন সংক্রান্তির দিন। 'বেয়ানে সওয়ালে'— রাতের আঁধার তখনও ভোরের গায়ে জড়িয়ে— ঠাকুরমা ঘুম থেকে আমাকে টেনে তুললেন। বললেন:

ওরে ছোটকোদা, ওঠ ওঠ, ওঠ বাছা শিগ্‌গির করে ওঠ। ধানকে সাধ খাওয়াতে যাবি নে! ওঠ ওঠ শিগ্‌গির ওঠ। ওঠ ওঠ।

ঠাকুরমার ডাক শুনে ধড়ফড় করে উঠে পড়ি। কালো কাঠকয়লা দিয়ে পটাপট দাঁত মেজে পুকুরের জলে হাত-মুখ ধুয়ে, ক'টা ডুব দিয়ে স্নান করে এলাম। ততক্ষণে ঠাকুরমার সব কিছু গোছানো হয়ে গেছে। কাঁচা দুধ একঘটি। একছড়া পাকা কলা, আটটা তালের আঁটির ফোঁপল, গুড়, কলাগাছের হলদে মাইজ পাতা, তেল-সিঁদুর আর কলার পাতার ডাঁটায় কাজল-মাখানো, সদ্য জল ধোওয়া কুলোর ওপর সব সাজানো। কুলো মাথায় তুলে নিয়ে পুব বিলে ধানকে সাধ খাওয়াতে

চললাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমাও চললেন আমাকে শিখিয়ে দিতে।

অনন্ত আকাশের নীচে দুই বিঘে ভুঁই ধানক্ষেত নলডাঙার মাঠকে আলো করে জেগে আছে। অন্তহীন সবুজ সমুদ্রের ভেতর আলপথে বিলি কেটে বিলি কেটে, আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের সোনাফলা ধানক্ষেতের আলে। আলপথে ঘন কোমল ঘাস মখমলের মতো পুরু পা দিলে মনে হয় তুলোর স্তূপে পা পেতে হাঁটছি। গোটা বিল জুড়ে আমার মাথা ছাড়িয়ে গজিয়ে ওঠা বড় বড় গোছ, গলা-কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে সবুজ সমুদ্র যেন ঢেউ খেলছে। সবুজ প্রাণের এত রূপ অপরূপ দু'চোখে ধরে না, উপছে উপছে পড়ে। পোয়াতি হৃষ্টপুষ্ট বুকভরা থোড় ধানগাছের গোটা বিলটাকে যেন ঠেসে ভরে রেখেছে। আমাদের খেতের আলে গিয়ে মাথার কুলো নামিয়ে দাঁড়াই। সুগন্ধে সৌরভে অপরূপ সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে যায়। চওড়া আলের গা-ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা একটা মোটা গোছের হৃষ্টপুষ্ট থোড় ধানগাছকে বেছে নিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করাই, তেল মাখাই, সিঁদুর আর কাজল পরাই। ধানগাছের রূপ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। যেন রূপসী যুবতী শরীরকেও হার মানায়। তার পর পুবমুখো উদিত সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মন্ত্রের মতো চিৎকার করে গান ধরি—

'আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে।
ধান সাধ খায় রে হৈ...।'

সুরের ওপর সুর চড়িয়ে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে বারবার তিনবার গাইতে থাকি গান— 'আশ্বিন যায় কার্তিক আসে। মা লক্ষ্মী গর্বে বসে। ধান সাধ খায় রে হৈ...

গাঁ-গ্রামের শত শত মানুষ নেমে এসেছে মাঠে-বিলে ধানক্ষেতের আলে ধানকে সাধ খাওয়াচ্ছে। পোয়াতি বউকে, কন্যাকে মা-মাসি স্বজনরা যেমন সাধ খাওয়ানো অনন্ত উৎসবে মেতে ওঠেন। চাষির দুনিয়ায় আজকের দিনেও ধানকে সাধ খাওয়ানোতে উৎসবে সব মানুষ মেতে উঠেছেন। ধানগাছে ঘটিভর্তি দুধ ঢেলে দিই। মুঠো মুঠো বাতাসা ছড়িয়ে দিই ধানখেতে। ধানগাছকে মা বলে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই, আদর করি। সুর করে গান গাই— ধান সাধ খায় রে হৈ...।

দিগন্ত প্রসারিত বিশাল বোকড়ের বিলের কোলে তার পশ্চিম কান্দায় নলডাহার রোয়াখেতের আলে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি পুবমুখো অনন্ত সবুজ সমুদ্রে। অন্তহীন ঢেউ তার কোনও মুড়োদাড়া নেই। সবুজ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত মিলেমিশে গেছে অনন্ত আকাশের বুকে।

কুয়াশার নীলচে কেশরে লাল আলো ছড়িয়ে সূর্য উঠে আকাশ বাতাস মাঠ বিল মথিত করে। চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে মানুষের আনন্দের উৎসবের সীমাহীন আলোড়ন— 'ধান সাধ খায় রে হৈ'। ধান সাধ খায় রে হৈ। সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু উলুধ্বনি। চারদিক যেন অনন্ত প্রাণপ্রবাহে জেগে উঠছে, আলো ছড়াচ্ছে। প্রাণের ঢেউ খেলছে আর প্রথম সূর্যের সোনালি আলোর অনন্তদীপ্তিতে ঝলমল করে উঠছে সবুজ ধানক্ষেত, ধানগাছ। কুয়াশার আবরণ সরিয়ে নতুন এক পৃথিবী প্রকাশিত হতে থাকে— সবুজ সমুদ্র দিগন্তে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর আমার ছোট হৃদয়-মন জড়িয়ে যেতে থাকে আনন্দ লহরিতে। সবুজ ঘাসে ধানপাতায় নবোদিত সূর্যের আলোয়।

যতবার আমি মাঠে বিলে ধানকে সাধ খাওয়াতে গিয়েছি প্রত্যেকবারই আমার দু'চোখের সামনে জন্ম নিয়েছে নতুন এক পৃথিবী। মানুষ আর প্রকৃতি যেখানে ছড়িয়ে গেছে জড়িয়ে গেছে আষ্টেপৃষ্ঠে জন্মভূমির জলেস্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে।

পরের দিন ভোরবেলা ঠাকুরমা গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে ডাকছেন, ও রে ও ছোটকোদা। ওঠ ওঠ, বাছা শিগ্‌গির ওঠ রে। বলতে বলতে ঠাকুরমা ঢোকে রান্নাঘরে।

ঘুম-জড়ানো চোখে আমি মোড়া মেরে উঠে পড়ি। আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে টুনিদি। ঠাকুরমা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, ভুলি গেলি নাকি। ও রে ছোটকোদা, আজকে যে গাসির দিন রে। যা যা শিগ্‌গির চান করি আয় বাছা। অ্যাই ছোটকুদি, যা তো দিদি গোলাঘরের নীচে পাথরের বাটাটা আছে। যা বাটাটা আন গিয়ে।

টুনিদি ছুটে গিয়ে পাথরের বাটা নিয়ে আসে। বারান্দায় রেখে দিয়ে বলে, আয় ভাইডি, তোরে হলুদ নিমপাতা বাটা গায়ে মাখিয়ে দিই। আমি কাছে যেতেই টুনিদি সারা গায়ে নিম-হলুদ বাটা মাখিয়ে দেয়। নিম-হলুদ বাটা মাখা হতেই ছুটে পুকুরে স্নান করতে যাই। স্নান করে ফিরে এসে দেখি ঠাকুরমা উঠোনে পাতাপুতিতে আগুন ধরিয়ে দিতেই আগুনের লাল শিখা দাউ দাউ করে জ্বলেছে। গুনে গুনে সাতটা ডুব দিয়ে কেমন শীত শীত করছে।

ঠাকুরমা তারস্বরে ডাকছেন, কই কনে গেলি তোরা। শিগ্‌গির আয়, আগুনে হাত সেঁকে শরীর গরম করবি তোরা। কই কনে গেলি, আয় আগুনে সেঁকে নে রে। ঠাকুরমা নিজেও আগুনে জ্বলন্ত আগুনের শিখায় হাত সেঁকছেন, পা সেঁকছেন আর আমাদের ডেকেই চলেছেন।

আমরা দুই ভাইবোন তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। কাঁপন থামাতে হাত

মেলে আগুনে সেঁকতে থাকি।

এর মধ্যেই ঠাকুরমা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, নে ছোটকোদা ধর। হাতের মুঠোয় ধরে গালে ফেলে দে। একদমে চিবিয়ে গিলে খা। নে খা। এটা খাতি হয়। ফেলতি নেই। একফোঁটাও। সবাই খায় ছোটকোদা, নে খা।

ঠাকুরমার হাত থেকে হলুদ-নিমপাতা বাটা নিয়ে দমবন্ধ করে চিবিয়ে গিলে খাই। খাওয়া শেষ হতেই ঠাকুরমা একটা বড় করেঙ্গামালায় খেতে দেন নারকেলের নাড়ু, তালের আঁটির ফোঁপল। খেজুররসের অপূর্ব স্বাদগন্ধে ভরা চিনি, চিকন চালে রান্না করা পায়েস। গাঁয়ের প্রতিটি বাড়িতে তখন শুরু হয়ে গেছে গাসির উৎসব-আনন্দ।

গাসির উৎসব শেষ হতেই চলে আসে বহ্নি-উৎসব। বুড়ির ঘর পোড়ানো। সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় মশাল-বানানো, পাতাপুতি দিয়ে বুড়ির ঘর বানানো। মশাল বানাতে বাঁশবাগান থেকে কঞ্চি কেটে আনি, কুড়িয়ে আনি বাঁশের কোড়ার গা থেকে খসে-পড়া শুকনো খোসা আর খেজুরগাছের ফ্যেতরাফুতরি, নারকোলের শুকনো মালা আগুণা। বাঁশের কঞ্চির ডাণ্ডিতে সব ফুঁড়ে ফুঁড়ে গড়ে তুলি মশাল। পাড়ার আট-দশটি ছেলে মিলে উলুখড়ের মাঠে বানানো বুড়ির ঘরে কাঁচা মাটিতে বানানো বুড়ির মূর্তিটি বুড়ির ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিই। পাশে রাখা আট-দশটি নাটাফল, বেলফল ইত্যাদি।

সন্ধ্যাবেলা বুড়ির ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতেই শুকনো পাতাপুতি জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। আগুনের লাল শিখা যেন আকাশ ছুঁতে চায় আর তখনই বাজি ফোটার মতো ফাটতে থাকে নাটাফল, বেলফল, ফটফট দুড়ুম, দাড়াম শব্দে ফেটে ছিটিয়ে দেয় আগুনের গোলা। সেই আগুন থেকে আমরা মশাল ধরিয়ে নিই। জ্বলন্ত মশালগুলি আকাশে তুলে বনবন ঘুরাতে থাকি। আগুনের লাল নীল ফুলকি ছিটতে থাকে চারিদিকে ছররা বাজির মতো। আগুনের লাল শিখা জ্বলে ফুলকি ছোটে অন্ধকার রাতের আকাশ চিরে চিরে চলতে থাকে বহ্নি-উৎসব, অগ্নি-উৎসব— গোটা আকাশ আর এলাকা আলোয় আলোয় ভরে যায়।

বহ্নি-উৎসব দেখবার জন্য গাঁয়ের লোকজন কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। দেখতে থাকে বুড়ির ঘর পুড়ে যাওয়া। বুড়ির ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ যেন পুরাতনকে পুড়িয়ে নতুন প্রাণের মহোৎসব। তারই সুরে সুর মিলিয়ে আমরা মুখে মুখে ছড়া কাটি, নাচি আর বলি—

মশা মশা ঘর খসা, চিংড়ি মাছের দাড়ি।
সকল মশা চলে যাও কানু ঘোষের বাড়ি।।

উৎসব তাই উৎসবেই শেষ হয় না— একদিকে আনন্দ-উৎসব তার বিধান অন্যদিকে মশা নিধনও চলে। উৎসব শেষে চলে পুরস্কার বিতরণ-পর্ব। দক্ষ মশাল নির্মাণকারীকে তার মশাল পোড়ানোর কৌশলকে অভিনন্দন জানিয়ে শংসাপত্র আর পুরস্কার দেওয়া হয়। শেষে সবাইকে নারকেলের নাড়ু-খই-মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনেই চলে ধানগাছের আগকাটার উৎসব-পর্ব। নতুন ধানকে ঘরে গোলায় তোলবার জন্য ভোরে স্নান করে নতুন ছোট্ট ধুতিকাপড় পরে বাবার সঙ্গে দক্ষিণ মাঠের খেতে পাকাধান কাটতে গেলাম। তার আগে জোগাড় করা হয়েছে এঁটেলি, কলার খোল, কাশফুল, সুপারি, কোষ্টাপাটের বিচি, বেতের ডগা, জগডুমুরের ডালের ডগা— সব কিছু কলার খোলায় সাজিয়ে মুড়ে বেঁধে বাড়ির গোলাঘরে গোয়ালঘরে রান্নাঘরের খুঁটিতে বেঁধে দিতে হয়। তার পর কাস্তে হাতে ধানক্ষেতে ধান কাটতে যেতে হয়। আলে দাঁড়িয়ে বাবা বললেন:

ছোটকোদা, পুবমুখো মুখ করে দাঁড়াও বাবা। মনে মনে সূর্যদেবকে স্মরণ করে দশ-বারোটি ধানের শিষ খড়সুদ্ধ মুঠো করে ধরে কাঁচির একপোচে কেটে মাথায় তুলে নাও।

বাবার নির্দেশ মতো আমি দশ-বারোটি ধানের শিষ খড়সুদ্ধ এক মুঠোয় সাফটে ধরে কাঁচির একপোচে কেটে মাথায় তুলে নিলাম। ধানের শিষ মাথায় নিয়ে আলপথে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে দেখি গোটা উঠোনটা ইতিমধ্যে গোবরগোলায় লেপেপুছে তকতকে ঝকঝকে করে রেখেছে। গোলাঘরের সামনে আলোমাটিতে নিকানো উঠোনে ঠাকুরমার সঙ্গে পাড়ার বউঝিরা সব জড়ো হয়েছেন। কেউ আলপনা দিচ্ছেন, কেউ গোলায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ দিচ্ছেন। আমি ধান মাথায় উঠোনে পা দিতেই সমবেত বউঝিরা আনন্দে উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। শাঁক বাজানো হল। এয়োরা হাতের আঙুলে বিচিত্র সব মুদ্রা করে ধানকে বরণ করে চললেন আর বাবা ধানের শিষগুলি একসঙ্গে বেঁধে গোলার বাতায় ঝুলিয়ে দিলেন। সারা বছর ওই ধানশিষ ওইখানে ঝুলে থাকবে। বছর শেষে বীজধানের ডোলে বা আউড়িতে ওই ধান ছিটিয়ে দিয়ে সেই বীজধান চাষ করা ক্ষেতে ছিটিয়ে বোনা হবে।

ঘরে গোলায় নতুন ধান তুলতে না তুলতে নবান্নের উৎসব শুরু হয়ে যায় আমাদের গ্রামে। গ্রামের শেষ মাথায় একটা বহু পুরনো পুকুর। পুকুরপাড়ে মস্ত এক জিওলগাছতলাকে বলা হয় নুড়িতলা। পৌষপার্বণে নবান্নে গোটা গ্রামের

মানুষজন এই নুড়িতলায় হাজির হন নবান্ন খেতে। সে এক মহোৎসব। নতুন বাসমতি ধানের চিকন চালের পায়েস রান্না করা হয়। বিশাল বিশাল কড়াই ভরে তার সঙ্গে থাকে কাঁচিফোঁড়া সরাপিঠে, কুলিপিঠে, পাটিসাপটা, সলিপিঠের জাউ— কতরকম রসালো খাদ্যবস্তু সব রান্না করে সবাই জড়ো হয় নুড়িতলায়।

ঘাসের উপর খোলা আকাশের নীচে আসনপিঁড়ি হয়ে সারি দিয়ে বসে খাই সবাই আবাল বৃদ্ধ বনিতারা। মা মাসি কাকিমারা কলার পাতড়া বিছিয়ে দেন সামনে। নুড়িতলায় রান্নাকরা পায়েস আর নিজেদের ঘরের পিঠেপুলি খাদ্যসামগ্রী সবার পাতে দিয়ে চলেন। সে দেওয়া আর শেষ হয় না। কে কত খেতে পারে চলে তার প্রতিযোগিতা। কে কত দিতে পারেন চলে তারও প্রতিযোগিতা। তবুও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুরাতেই চায় না। কারণ যিনি যত ব্যয় করবেন খাওয়াবেন তাঁর খেতে ততই ফলবে, ততই গোলায় উঠবে। এই মিলনমেলায় মহোৎসবে নবান্নের সমারোহে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে মানুষকে আপন করে নেয়। এ এক ভিন্ন পৃথিবী যেখানে সবাই ঘরের মানুষ প্রাণের মানুষ হৃদয়ের আপনজনও।

গোটা অঞ্চল জুড়ে গোটা দেশ জুড়ে যেন উৎসব— আনন্দের শেষ নেই। নবান্ন উৎসব দিয়েই যেন শুরু। নবান্ন উৎসবের পরদিনই বালক-কিশোর-যুবকরা আকাশে উড়িয়ে দেয় শত শত ঘুড়ি। কত রকম ঘুড়ি— চিলেঘুড়ি, মানুষঘুড়ি, নৌকোঘুড়ি, লণ্ঠনঘুড়ি, ঝাঁপ ঘুড়ি ইত্যাদি। ঝাঁপঘুড়িতে পাতলা বেতের ধনুক জুড়ে দেওয়া হয়। বাতাসে বাঁশির টানা সুরে বাজতে থাকে। ঘুড়ি উড়তে থাকে। আকাশ জুড়ে শত শত লাল নীল রঙিন ঘুড়ি ওড়ে। মিষ্টিমধুর সুরে ঘুড়ির বাঁশি বেজে চলে। সে এক মহানন্দের উৎসব আনন্দ উৎসব প্রাণের উৎসব।

সে দিন দেড় প্রহর বেলা উত্তরপাড়ায় হঠাৎ ডুগডুগি বেজে উঠল। আমি আর টুনিদি নেলোর কানা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে। সামনে বাঁশবাগান তাই নজরে আসছে না। পথে চোখ পেতে তাকিয়ে আছি। এই পথ দিয়েই তো যাবে। ফাঁকায় আসতেই দেখা গেল টিন কেটে বানানো বেঢপ আকারের বাক্স মাথায় একজন মানুষ হেঁটে আসছেন। বাক্সের গায়ে রং-বেরঙের ফুল। চারটে গোলাকার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। ডুগডুগি বাজিয়ে লোকটা চেঁচাচ্ছেন, বাক্সকল, পেল্লায় পেল্লায় ছবি— বত্রিশ দফা। সস্তায় দেখতি পাবা। মাত্তর দুটি ফুটো পয়সা। চলে আইসো মনিরা— দু'পয়সায় বত্তিরিশ-দফা। আইসো আইসো ম্যাজিক দ্যাখো, জাদু দ্যাখো।

কানাপুকুর ছাড়িয়ে লোকটা বাক্স নামায় তেমাথায়। বাক্স নামাতেই দেখি লোকটার টাকমাথা। কান দু'টি যেন কুলোর মতো চ্যাটালো। বসন্তের দাগে ভরা কালো থেলো মুখখানায় বেশ মিষ্টি হাসি মাখানো। বাবরি চুল নাচিয়ে

যখন তিনি চেঁচাচ্ছেন তখন তার মুখের ঢং পালটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পায়ের মল বাজিয়ে তিনি একটু নেচেও নিচ্ছেন। পয়সার ভারে গায়ের ফতুয়ার পকেট ঝুনঝুন বেজে চলেছে। তিনখানা কাঠের ঠ্যাংয়ের ওপর বাক্স বসিয়ে লোকটা সুর করে চেঁচাচ্ছেন, কলকাত্তা শহর দ্যাহ, চিড়িয়াখানায় হাতি দ্যাহ, দ্যাহ হাজার ছবি দ্যাহ।

গানের নাচের শব্দ শুনে পাড়ার শিবু চেঁচান, হরেন, নিতাই, পুঁটি, কাশি, পাঁচি, নিবা, হরিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। হাতে পয়সা। কেউ কেউ উড়ে এসে হাজির। আমি টুনিদির হাত ধরে একছুটে বাড়ি আর ঠাকুরমার আঁচলের খুট খুলে পয়সা নিয়ে ফের ছুটে গিয়ে বাক্সর কাছে হাজির।

বাক্সকলের মানুষটার সঙ্গে এর মধ্যেই রতনখুড়ো দরদাম শুরু করে দিয়েছেন। আরে ভাই, ফুটো হোক, আস্ত হোক দু'পয়সা কম হল নাকি? চোদ্দোহাত মাটি খুঁড়ে দ্যাহ না, এট্টা ফুটো পয়সা পাও নাকি! পাবা না। কলি হয় না। যতই চেঁচাও আর ডুগডুগি বাজাও না ক্যান, দু'পয়সায় কেউ তোমার ছবি দেকপে না কলাম। কমসম হলি কও, মেলা খদ্দের পাবানে।

একপয়সাতেই রাজি হয়ে গেলেন মানুষটা। আর দেখতে দেখতে সারা পাড়া চাউর। ছেলেবুড়ো, ছুঁড়িবুড়ি— কেউ বাদ গেল না। পাড়া ভেঙে ছবি দেখতে হাজির। একপয়সাতে রফা হতেই মানুষটা ছবি দেখাতে শুরু করেন।

রঙিন লতাপাতা-আঁকা রহস্যময় বাক্সকলে পাশাপাশি চারটে ফুটোয় চোখ গেঁথে রেখে ছবি দেখছি আমরা চারজন— টুনিদি, কালোকুদি, বকুললতা আর শ্যামাপাখি। লোকটা হাতটা ঘুরাতেই ছবি দেখা গেল। লোকটা তখন জোরে জোরে চেঁচাচ্ছেন:

হাওড়ার পুল দেখ, লাটসাহেবের বাড়ি দেখ, গঙ্গায় জাহাজ দেখ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেখ, পরেশনাথের মন্দির দেখ, বালির ব্রিজ দেখ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখ, দেখ দেখ।

হাওড়ার পেল্লার পুল, লাটসাহেবের বিশাল বাড়ি, বড় বড় সব জিনিস ছোটবাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে লোকটা মজা দেখাচ্ছেন, মল বাজিয়ে গান করছেন, নাচ দেখাচ্ছেন।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা বাক্সকলে ছবি দেখে আনন্দ করতে করতে বাড়িমুখো হাঁটা দিল। আমি টুনিদির হাত ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। পুকুরপাড় ঘুরতেই বড় তেঁতুলগাছ তলায় মধ্য বয়সের একজন কালো রঙের মানুষ। মাথায় পাখির পালকের টুপি একহাতে সাতখানা নল, অন্য হাতে পাখিসুদ্ধ খাঁচা। মানুষটার

খালি গা, খালি পা রোদে পুড়ে পিঠটা চকচক করছে। ছোটখাটো ধুতি কাছা দিয়ে পরা। চওড়া বুকে কাঁচাপাকা লোমের অরণ্য। টুপির নীচে সোনালি লম্বা চুল বাবরি মতো ঝুলে আছে। ঘন ভুরুর নীচ দিয়ে ধূসর চোখে তাকিয়ে গাছের উঁচু ডালে, সেই পাকি ধরা আঙুলের ইশারা করে আমাদের থামতে বলে। মানুষটা প্রথমে একেবারে সরু নলটির মাথায় পোষা পাখির খাঁচাটি নিয়ে উপরে তুলতে থাকল। সামান্য মোটা নলটি লাগিয়ে খাঁচাটা তুলতে থাকল আর একটার পর একটা নল জুড়তে থাকল। একসময় খাঁচা উঠে গেল শেষ সীমায়। খাঁচার মধ্যে পোষা ঘুঘুপাখি বাখারির দাঁড়ের উপর। অতিথি পাখির জন্য বাইরে আরও একটি দাঁড়। লোকটা হাতে বিচিত্র শব্দ করতেই তালিম-দেওয়া পাখি ডাক শুরু করল— ঘু... ঘু উ... ঘু উ ঘু...।

ডাক শুনতে পেয়েই অতিথি পাখি সাড়া দিল বুঝি। স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি গাছে পাতা খাঁচায় দৃষ্টি বিঁধিয়ে। অতিথি পাখি উড়ে এসে খাঁচার দাঁড়ে বসে ঠোঁট ঢোকালে পোষা পাখির গায়ে। আর যায় কোথায় দাঁড়ে আঠা লাগানো ছিল। আঠায় পা আটকে বনের পাখি ধরা পড়ে গেল। পাখিধরা খাঁচা নামিয়ে আনল নীচে। বনের পাখি উড়ে পালাবে সে উপায় নেই। পাখি আটকে পড়েছে আঠায় আর ঝুলানো ফাঁসেও। বনের পাখি পাখিধরার হাতে ধরা পড়ল।

এখনও বৃষ্টিবাদলার দিনে পুরনো ক্ষতের বিষাক্ত ঘা-খানা আমার কাঁচা হয়ে ওঠে। রক্ত পুঁজ গড়ায়, ব্যথা টনটন করে ওঠে। তখন প্রতি হাটবারে বাবার সঙ্গে হাটে যেতে আমি বায়না ধরতাম। সে বায়না এমনই নাছোড়বান্দা বাবা আমাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হতেন। আমি যখন খুবই ছোট, মণিরামপুর হাটে হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তখনও বায়না ধরে বাবার কাঁধের শিকে বাঁকের ধামার মধ্যে বসেও মণিরামপুর হাটে গিয়েছি। তার পর হাঁটতে শিকলে তো কথাই নেই, রোজ হাটবারে বাবার সঙ্গে মণিরামপুর হাটে যেতাম।

সে দিনটা ছিল শুক্রবার। মণিরামপুরে তিনের হাট। দু'বাপ-বেটায় মণিরামপুর হাটের পথে নেমে হেঁটে চলেছি। চেনা পথ, তবু প্রতি হাটবার পথে পা রাখলেই মনে হয় নতুন পথে হাঁটছি। মাঠের মধ্য দিয়ে একপেয়ে চওড়া এবড়ো-খেবড়ো পথ। দু'ধারে আখশাটি গাছের জঙ্গল সবুজ আস্তরণ— যেন ঢেউ খেলে, ঢেউ খেলে অনন্ত আকাশের নীলে মিশে সুদূরে হারিয়ে গেছে। পথটা আমার আগে আগে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি যেন নতুন পৃথিবীতে পা রাখছি। পথের দু'ধারের বিপুল সৌন্দর্য দু'চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলতে গিলতে চলেছি আর বাবাকে অন্তহীন প্রশ্ন করে চলেছি।

—বাবা এ-পথটা কারা বানাল?

—মানুষ মাটিতে হাঁটলেই পথ হয় বাবা। এ ভাবেই হয়েছে এ পথটা।

—এ পথটার মুড়ো কোথায় বাবা?

—পথের কি কোনও মুড়ো হয় রে ছোটকোদা। পথ পথেই মিশে আরও দূরে চলে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা আকাশে তাকিয়ে বললেন, ছোটকোদা জোর হাঁট বাবা। আকাশে ঘনকালো মেঘ জমেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি এল বলে। হাঁট বাবা, জোরে হাঁট। মাঠটুকু না-পেরোলে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানো যাবে না। চ চ ছোটকোদা।

মরিপড়ি হেঁটেও বৃষ্টি থেকে রেহাই পেলাম না। গ্রামে ঢুকবার আগেই ঝমঝম করে জোরে বৃষ্টি নেমে এল! সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা করে শিলও পড়ছে। তখন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ি মাথা বাঁচাতে। বাড়িতে ঢুকেও বাবা থমকে থেমে উঠোনের পাশে শিউলিগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়েন। বাবাকে ধরে আমি দাঁড়াই। বাবা ঝুঁকে কুঁজো হয়ে বুকের ছাতির নীচে আমাকে আগলে রেখে খেদোক্তি করেন:

তাড়াহুড়োয় ভুল করে এ-কোথায় উঠলাম রে ছোটকোদা! এ তো বামুনবাড়ি, সুবল ভট্টাচার্যর বাড়ি, দাঁড়া, ছোটকোদা দাঁড়া বাবা। লোকটা মোটেও সুবিধের না।

আমি ছুটে উঠোন পেরোতে গেলেই বাবা আমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দেন। শিল পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি আমরা।

উত্তরপোতায় কাঁচামাটির চারপাটি দেওয়ালের খোড়ো আটচালা চৌরীঘর। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় একজন মধ্যবয়সি পুরুষ। বেঁটেখাটো চাঁচাছোলা চেহারা। টৌলপড়া নেড়ামাথা। লোকটার কোঁচকানো চোখের ধারালো দৃষ্টি বাবাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেখতে থাকে। নাকটা বঁড়শির মতো। চোয়ালের হাড়গুলো যেন ছুরির ফলা। পাশে বসা দু'জন মহিলা। তাদের কোলের কাছে দু'টি শিশু। মহিলা দু'জন ঘৃণাপূর্ণ চোখগুলোর ক্লেদাক্ত দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিঁধছে। তার ক্লিন্ন স্পর্শ যেন আমার বুকে মুখে কাঁধে বাহুতে লাগছে। আর আমি শিউরে শিউরে উঠছি।

আমাদের গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখেও কোনও সহানুভূতি, অনুকম্পা দেখাল না লোকগুলি। দয়া করুণাও না। বরং উলটে সুবল ভট্টাচার্য বাবার নামটা বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করে ঘৃণা উগরে দিয়ে বলল, এই চটকা

মত্তি এ্যাহানে আলি ক্যান? যা যা ভাগ। খালপাড়ে নমোবাড়ি যা। উঠোনটাই গোবর দিয়ে লেপতে হবে শেষবেলা। যা যা খালপাড়ে নমোবাড়ি যা। দ্যাখিস, ফুলগাছটা আবার ছুঁয়ে দিস না। এই অবেলায় গঙ্গা জলে ধুতে পারব না। যা যা কলাম তা কর গিয়ে। বলি কী মতলবে বামুন বাড়িতে ঢুকলি, কোনও শয়তানি ফন্দি আটিসনি তো, অ্যাই চটকা?

সুবল ভট্টাচার্যর এত বড় অপমানজনক কথায়ও বাবার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। চূড়ান্ত বিনয় আর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাবা বললেন, আমার এই ছোটকোদার জন্য বাবু, বৃষ্টি শিলা থেকে মাথাটা বাঁচাতেই ছুটে এসেছি। ক'দিন হল, খোকা আমার জ্বর থেকে উঠেছে, বৃষ্টিতে ভিজলে ফের অসুখ করতে পারে। ওকে একটু যদি ছাঁচতলায় মাথাটা বাঁচাতে দাঁড়াতে দেন। বাচ্চা মানুষ! বাবা অনুনয় বিনয় করতে থাকেন কাতর গলায় অসহায় মানুষের মতো।

সুবল ভট্টাচার্য আগুনে ঘি ঢালার মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন:

ও রে গোবদ নমো, বাচ্চামানুষ হলেও ও হচ্ছে ছোট, নিচুজাত, অচ্ছুত! কোন্ আক্কেলে তুই বামুনের বাড়ি ঢুকলি ক তো। আস্পর্দা তো তোর কম না। তুই জানিস এর কী শাস্তি হবে। কত জরিমানা হবে। তোর তো অচেনা না এ বাড়ি। তা হলি ঢুকলি ক্যান, ক? যা বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। এক্ষুনি যা। ওরে ছোট জাত, অচ্ছুৎ, তোদের তো দিন দিন স্পর্ধা বেড়েই চলেছে। বামুন শূদ্র বলে কোনও তফাত রাখতি চাইছিস না। কে কোথায় দেখতে পাবে। বামুনবাড়ি শূদ্র ঢুকেছে। কেলেঙ্কারি বাধাবেনে। যা খালপাড়ে নমোবাড়ি যা। লোকটার হুংকার, হম্বিতম্বি শেষ হয় না। চোখে রাগের আগুন ছিটাতে থাকে।

লোকটার ক্রুদ্ধ-নিষ্ঠুর কথা শুনে, ভঙ্গি দেখে আমি তো ভয়ে বাঁচিনে। আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অপরাধটা আর উচ্চারিত জ্বালা ধরা শব্দ তিরের মতো ছুটে এসে আমার মর্মে বিঁধছে। লোকটার ফোলা ঠোঁটদুটো বিশ্রী ভাবে নেড়ে নেড়ে বিষপূর্ণ শব্দগুলি ছুড়ে মারতে থাকল। আমার মনে হল লোকটার বিদ্বেষ আর ঘৃণাপূর্ণ কথাটা একটা নিষ্ঠুর চড়ের মতো বাবার গালে এসে লাগল। কথাগুলোর স্থূল আক্রোশের ছোবলে বাবার দৈহিক কষ্ট হতে থাকল। বাবা একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওদের বিদ্বেষ হিংসা নিষ্ঠুরতার পিচ্ছিল স্বরের ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন। লোকটা সমানে হম্বিতম্বি করছে, পারলে যেন লাঠি নিয়ে আমাদের তাড়া করে আর কী! ফের বাবা গলায় আরও বিনয় শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়ে বলেন:

ঠাকুরমশাই, এই বাচ্চা ছেলেটার জন্যই তো তাড়াহুড়ো করে ভুল করেই ঢুকে পড়েছি। যা করেছি ভুল করেই করেছি। ঠাকুরমশাই, এবারকার মতো মাপ করে দেন। ক্ষমা চাইছি। বৃষ্টি ধরলেই চলে যাব।

বাবা কোমরের গাছছা খুলে ভাঁজ করে আমার মাথা ঢেকে দেন।

লোকটার মন কোনও বিনয়ে শ্রদ্ধায় অনুরোধে ভিজল না। আরও বেশি বিদ্রুপ আরও ঘৃণা মিশিয়ে বললেন:

রাখ তোর ও সব বস্তাপচা কথা। ও সব কথায় আমায় তুই ভুলাতে পারবিনে। আমি ভাল করে চিনি তোরে। তুই তো সেই সিদ্ধিরামের ছেলে। দফাদারের ছেলে বলে কথা। কানে আসছে তোরা লেখাপড়া শিখছিস। সমান অধিকার দাবি করছিস। তোদের আমাদের মধ্যে কোনও তফাত রাখতে চাসছিস না। তোরা সমান হতে চাইছিস। তোগে বাঁচতে দেওয়া মানেই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনা। যা যা আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা, যা যা, মরগে যা। জাহান্নামে যা।

আশ্চর্য ব্যাপার, সুবল ভট্টাচার্যর এত নিষ্ঠুর আক্রমণেও বাবার মধ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং দেখলাম বাবা আরও একটু মাথা নিচু করে বলছেন: এ কী কথা বলছেন, বামুনমশাই, সমান হওয়ার স্পর্ধা দেখাইনি তো।

ফের বাবা কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। বলেন, ঠাকুরমশাই, খোকাটার মাথাটা বাঁচাতে আপনার গোয়ালঘরের ছাঁচতলায় একটু দাঁড়াতে দ্যান। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিজব। আমার ছোটকোদারে একটু বাঁচান! বাবার মাথা যেন আরও নত হয়ে গেল।

না, না তা হতে পারে না। তোরা জাত-বর্ণ ভেদ তুলে দিতে চাইছিস! সমান অধিকার দাবি করছিস! তোদের কোনও সহযোগিতা করলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। শুনতে পাচ্ছি, সংবিধান চালু হলে তোরা সরকারি চাকরি পাবি। তোদের বাবাসাহেব রাজ-ক্ষমতার ছুড়ায় তোদের বসাবে। দেশটাকে তোরাই শেষ করে দিবি। তোদের প্রতি করুণা করাও পাপ। যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। সুবল ভট্টাচার্য কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন। তোরা নমোরা আমাদের একনম্বর শত্রু। দলিতদের তোরাই ক্ষেপাচ্ছিস। তোদের যোগেন মণ্ডল, ওরে ওই যোগেন আলি মোল্লা, তোদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। মুসলমানদের সঙ্গে মিলে দেশটাকেই দু'টুকরো করেছে। তোরা জাহান্নামে যা। তোরা মর না, ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মর। একটা বাজ পড়ে না তোদের

মাথায়! তোরা উকিল, মন্ত্রী হলেও নমো নমোই থাকবি। মনে রাখিস দেশের মন্ত্রী হলেও নমো বামুন হয়ে যায় না। দূর হ আমার সামনে থেকে, মর তোরা! তোকে বলে দিচ্ছি তোদের নিজের জায়গা, তোদের জানা দরকার। বামুনবাড়ি ভুল করেও ঢুকবি না, কলাম। তোদের ওই যোগেন আলি মোল্লা সব বামুনদের খেপিয়ে দিয়েছে। যা মরগে যা। নমো পাড়ায় গিয়ে মর তোরা। যা বেরিয়ে যা। জাত-বর্ণ স্বয়ং ভগবানের তৈরি। তোদের কী সাধ্য আছে তা নড়ানোর। তোদের মরাই ভাল।

ক্ষমতা, অধিকার, কায়েমি স্বার্থ রাখবার জন্য লোকটা অন্ধ নেশায় মত্ত। প্রতিটি কথার স্বর চাপা ক্রোধের আগুনে ভরা। এই লোকটাকে দেখলেই জাত-বর্ণবিদ্বেষে পূর্ণ ভারতবর্ষকে স্পষ্ট দেখা যাবে। দলিত মানুষের টুঁটি টিপে এমন অকথ্য অবিচার অন্যায় জুলুম নিষ্ঠুরতা দুনিয়ায় নেই। সুযোগ পেলে এরাই ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের তীব্র বিষ ছড়াবার কৌশল ছাড়ে না। ওদের পশুবৃত্তি বেআব্রু হয়ে ওঠে। মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে সমাজ সংসার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

বাবা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। একটি কথাও নেই মুখে। একটা অদৃশ্য গুরুভার যেন চেপে বসে তাঁর বুকে, তাঁর চেতনাকে অবশ করে দিচ্ছে, অনড় করছে ভাবনাকেও। জাত-বর্ণের শত শতাব্দীর জগদ্দল পাথরটাই বুঝি তার বুক চেপে ধরেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর রোধ করে আছে।

স্বপ্নের মতো ঘোর লাগে আমার চেতনায়। গত ক'বছরের ঘটা ঘটনা নদীর স্রোতের মতো বয়ে যায় স্মরণের কুল ছাপিয়ে। জীবনে ঘটা, শোনা, জানা প্রত্যেকটি ঘটনা জড়িয়ে মনপ্রাণ শুকিয়ে যেতে থাকে! কী ছিল জীবন, কী ঘটল, কতটুকু সময়, এর মধ্যে জীবনের কঠিন কশাঘাতে আমার জ্ঞানের, বোধের দরজাই যেন খুলে গেল। আমার বাবা, মানুষের জন্য যাঁর এত ভালবাসা। মানুষ যাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, সেই মানুষকে এতটা হেনেস্থা করতে পারে কোনও লোক— ভাবতেই আমার ছোট প্রাণটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। বাবা অসহায় নিরুপায় গামছা নিঙড়ে আমার মাথা গা মুছিয়ে দিতে থাকেন আর আপন মনে অস্ফুট স্বরে কী যেন বলতে থাকেন। তার একবর্ণও আমার কানে ঢোকে না। আমি অবাক বিস্ময় নিয়ে বারান্দায় বসা লোকগুলির দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকি। কথা বলার প্রতিবাদ করার ভাষা খুঁজে পাই না। শীতে শিলাবৃষ্টিতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি, ভিজতে থাকি বৃষ্টিতে। বাবার অবস্থা দেখে আমার কান্না পায়। কষ্টে-দুঃখে-বেদনায় দু'চোখের ডালি ছাপিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে।

বারান্দায় বসা মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে নাক-মুখ কুঁচকে ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকেন। থুথু ছিটাতে থাকেন। মাঝে মাঝে পুরুষটাকে উস্‌কে দিতে থাকেন।

বৃষ্টিটা ধরলেই চলে যাব ঠাকুরমশাই। ধারে কাছে আর তো কোনও গাছগাছালি নেই। বৃষ্টি ধরলেই চলে যাব... বাবার গলায় যেন স্বর সরে না। তাঁর অনুনয় বিনয় তবু শেষ হয় না।

এ বার টের পাচ্ছ বাছাধন, বৃষ্টির দেবতাও তোদের ওপর ক্ষেপা। না-হলে কী এমন অকাল বর্ষণ হয়! তোরা ধর্ম-বর্ণ, জাতপাত মানছিস না— এ সবই বৃষ্টি দেবতাকে রাগিয়ে দিয়েছে। এমন শিলাবৃষ্টি এখন হওয়ার কারণটাই তোরা। এ ছাড়া এই অকাল বর্ষণের কী কারণ থাকতে পারে!

সুবল ভট্টাচার্যের সৃষ্টিছাড়া কথা অন্যায় অবিচার শুনে আমার শিশু মনপ্রাণও বিদ্রোহ করে উঠল। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। ভেতরটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। আমি সামান্য প্রতিবাদ করলাম।

আমার প্রতিবাদী কথা শেষ হওয়ার আগেই সুবলঠাকুর একেবারে খেপে উঠলেন। আগুনে ঘি পড়ল। আমি তার কথায় অন্যায় ধরেছি। মুখে মুখে জবাব দিয়েছি। তিনি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। হিংস্র হয়ে রাগে কাঁপতে থাকলেন ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন:

এই, তুই তোর ওই বেজন্মাটারে নিয়ে সরবি না দু'ঘা খাবি? নাক দিয়ে যার পোটা পড়ে, মুখে দুধের গন্ধ যায়নি, তার এতবড় স্পর্ধা যা দূর হ আমার সামনে থেকে।

ব্রাহ্মণ সুবল ভট্টাচার্যর হিংস্র রাগ দেখে বাবা আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন। প্রচণ্ড রেগে গেলে বামুনরা মানুষও খুন করেন। বাবা তা জানতেন বলেই বাবা হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বললেন: এটা আমার মা-মরা ছোট ছেলে, জীবনের কিছুই জানে না। এর কথায় রাগ করবেন না ঠাকুরমশাই। ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা এক্ষুনি এখান থেকে সরে যাচ্ছি। কাকে কী বলতে হয় ও তো জানে না, ওকে ক্ষমা করে দিন ঠাকুরমশাই।! কিন্তু বামুনের পাষাণ হৃদয় বিন্দুমাত্র গলল না। আমার প্রতিবাদে সুবল ভট্টাচার্য ফেটে পড়ে হুংকার দিয়ে বললেন:

দ্যাখ ছোঁড়া, যা বলেছি, সব বামুনরাই তোদের বলতে পারে। জাত-বর্ণ এখনও সমাজ থেকে উঠে যায়নি, মুছেও যায়নি। জন্মেছ নমোর বাচ্চা হয়ে, নিচু ছোট জাতের মতোই থেকো, নমো কখনও পায়ের তলা থেকে মাথায় ওঠে না। অচ্ছুত অচ্ছুতই, তার আবার ন্যায় অন্যায়, যা যা।

আমি তখনও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে হয়রান হচ্ছি। ঘৃণা অপমান আর বিদ্বেষের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার কচি প্রাণও সত্যকে ন্যায়কে সাফটে ধরে জ্বলে উঠে বলে:

আমরাও রক্তমাংসে তৈরি, আপনাদের মতো মানুষ। মাতৃগর্ভ থেকে আমরাও আপনাদের মতো এসেছি। জাত-বর্ণ আপনারাই সৃষ্টি করেছেন! বুকের ভেতর প্রতিবাদের ভাষা যেন আপনি হয়ে উঠতে থাকে।

বাবা তাঁর বুকের ভেতর অস্বস্তিকর অনুভূতিটা চাপতে চেষ্টা করেন, কিন্তু চাপবে কী সেটাই যেন তাঁর কলজেটাকে ধীরে ধীরে শক্ত করে তোলে। তাঁকে প্রতিবাদী করে তুলতে চায়। অথচ নিজেকে সংযত করে ছুটে পালাতে চান নিজের কাছ থেকে, ছেলের কাছ থেকে, জীবনে যত অন্যায় অবিচার অত্যাচার তিনি সয়েছেন তার থেকে, মনুষ্যত্বের এ অপমান অবমাননা তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ সমাজ এত নিষ্ঠুর বিরোধী, এত শক্তিধর তাঁর যেন করার কিছুই নেই। তাঁর রগের শিরাগুলি ফুলে দপদপ করছে। রাগে মাথার চুল, খাড়া হয়ে গেছে আর মাথার চুলের গোড়া থেকে ছুটছে আগুন।

জীবনের এমন বীভৎস রূপ চোখের পলকে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। নতুন অনুভূতিটা আমার হৃদপিণ্ডটাকে যেন দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেল। কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেল, ঠাহর করতে পারি না। কাঁটার মতো খচখচ করে ব্যথা বিঁধতে থাকে বুকের ভেতর।

সেই শিলাবৃষ্টি মাথায় বাবা আমাকে বুক দিয়ে আগলে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। আজকের দিনটা মস্তবড় একটা দুঃস্বপ্ন। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাই না। চেতনা মাথা কুটে মরে। অন্যায় অবিচারের জ্বালায় বুক টনটন করে। ক্লিষ্ট ঘৃণ্য অনুভূতিটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিই সে শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বুকে পাঁজরার তলায় হৃৎপিণ্ড যেন নতুন কথা শোনাচ্ছে এমনই একটা ভাব নিয়ে বাবা আমার হাত ধরলেন। খানিক আগে যা ঘটে গেল তার স্মৃতি কুয়াশার জালের মতো চেতনা ছেয়ে আছে বুঝি। চোখে হাতের আড়াল দিয়ে গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বলেন:

ছোটকোদা বৃষ্টি ধরে আসছে, চল। চল ছোটকোদা, গ্রামটা ছাড়ালেই হাট পাব। চ চ বাছা চ। সত্যি দেখতে দেখতে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। আমরাও হাটে চলে গেলাম নির্বিঘ্নে। কিন্তু উত্তপ্ত মাথার ভেতর কত রকম ভাবনা টগবগ করে ফুটতে থাকল।

হাট থেকে ফেরার পথে ধীরে সুস্থে বাবা কথা শুরু করলেন।

এই হল জীবনের চেহারা ছোটকোদা। যা আজ ঘটতে দেখলি! পরস্পরের ওপর মানুষ কেমন হিংস্র হয়ে আছে, মানুষের মন কী বিশ্রী রকম বিষিয়ে আছে। জাত-বর্ণ আর ধর্মের জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাদের রক্তচোষারা, সুবল ভট্টাচার্যরা, ওরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না। বামুন বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে চলতে পারি না। জুতো পায় দিয়ে হাঁটতে পারি না। জাত-বর্ণ-ধর্মের নামে হাত-পা বেঁধে জাঁতাকলে পিষছে, আমাদের রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে। স্রেফ নিজেদের স্বার্থে। কায়েমি স্বার্থ অটুট রাখতেই জাত বর্ণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ভয়ংকর অন্যায় অবিচার সব বুঝি রে ছোটকোদা। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। এক জাতকে শত সহস্র জাত-বর্ণে ভাগ করে বামুনরা তাদের শাসন-শোষণ-অত্যাচার-অবিচার-ঘৃণা-বিদ্বেষ অটুট রাখতে পেরেছে।

এর থেকে কি বেরোতে আমরা পারব না কোনওদিন। ভেতর থেকে আমার কথা যেন ফুটে উঠতে থাকে। আমি তা থামাতে পারি না।

বাবা স্বগতোক্তি করেন:

একদিন-না-একদিন এই অত্যাচারিত মানুষ বামুনদের দূরভিসন্ধি বুঝতে পারবে। অবশ্যই বুঝতে পারবে। শত সহস্র জাত-বর্ণ মুছে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হবে। সে দিনই অন্যায় অবিচার অত্যাচার আর ঘৃণার প্রতিবাদ করতে পারবে। মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে।

সামনে এলোমেলো অন্ধকার। আমরা আঁধার ঠেলে ঠেলে সামনে এগোচ্ছি। হাট ফেরত মানুষজন তখন হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে। আমরা দুই বাপবেটা তখন পথে হাঁটছি, কথা বলছি। কথায় কথায় আঁধারের নির্জনতাকে হটাতে হটাতে হাঁটছি। চাপা মৃদু আর উজ্জ্বল সব শব্দ কথা। সবই জীবন বেদ, জগতের সমাজের সত্য সব কথা। শুনতে শুনতে আমার চোখে জল ভরে যায়। চেতনার আকাশে ফুটে উঠেছে যে সূর্য তার নতুন স্বাদ আলোয় যেন জীবনের পথটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চিনতে পারছি উজ্জ্বল সত্যটা।

বাবা তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাকে জাগিয়ে বললেন:

ছোটকোদা জাতবর্ণ মুক্ত মানুষদের আসা অবধি আমি হয়তো বাঁচব না। তাই ছোটকোদা আমি আর কীই-বা বলতে পারি। তবু বলে যাই বাবা, আমাদের এ সমাজে এই জাতবর্ণ-ব্যবস্থা বহু পুরনো, পচা শ্যাওলা ধরা। এ যতদিন সমাজ শরীরে আছে মুক্তি হবে না আমাদের, এর থেকে বেরিয়ে আসাও। তার জন্য

যত দূর পারো লেখাপড়া শিখো। আর এই জাতবর্ণ-ব্যবস্থা 'মানব না' বললেই চলবে না। তার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। অমান্য করার ক্ষমতা ধরে এমন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ অর্জন করতে হবে। তার জন্য শিক্ষায় চেতনার আলো জ্বালাতে হবে।

বাবার কথা শুনি আর পথ হাঁটি। যে কথা জীবন গড়ে, প্রাণে, চেতনার আলো জ্বালে পৃথিবীর মানবসমাজকে এক নাড়িতে বেঁধে দেয়— সে কথা শুনি। বাবার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি শব্দ কথা আমি গোগ্রাসে গিলে চলি, আমি হাঁটি...।

অখণ্ড আকাশের নীচে

পাড়িয়ালি গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় আমাদের মেজদার প্রাণের বন্ধু ছিলেন নাসিরউদ্দিন মণ্ডল। আমাদের বাড়ি নাসিরউদ্দিনদা হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হত। আমার মা বেঁচে থাকতেই নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে মেজদার বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব যে কত আন্তরিক আর গভীর ছিল তা তাঁর ব্যবহারেই প্রকাশ পেত। নাসিরদা উঠোনে পা দিয়েই প্রাণকাড়া ডাক দিতেন:

কই কনে গেলি ছোট্টভাইডি। এই দ্যাখ তোর জন্যি কী পাঠিয়েছে। সবে আম পাকতে শুরু করেছে, তারই দু'টি পাকা আম সযত্নে পকেটে করে নিয়ে এসেছে। কেবল আমাদের ডেকেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। কই কনে গেলি বুনডি। তোর জন্যি মা দেখ কী পাঠিয়েছে। নাসিরদা আম, জাম, কদবেল, লিচু, ডালিম— কত কিছু হাতে করে নিয়ে এসে আমাদের খাওয়াত।

মা, ঠাকুরমা, দাদা, দিদি আমরা দলবেঁধে এক-একদিন দক্ষিণপাড়ায় নাসিরদাদাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হতাম। চাচা-চাচি আমাদের নিয়ে কী আনন্দ-উৎসব করত। নাসিরদা মা-বোন-বাবাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতেও আসত। সফিউদ্দিন চাচা আমাকে হাতের কাছে পেলেই থুতনি ধরে আদর করে কদমবুসি করতেন। বলতেন, এই যে ছোটকোদা, চল আমাদের বাড়ি। চাচি তোমার জন্যি আম পেড়ে রেখেছে। চাচা আমাকে কাঁধে চড়িয়ে হাঁটা দিলেন। আমি যেতে না চাইলেও জোর করে ধরে নিয়ে যেতেন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। আমাকে উঠোনে নামিয়ে দিয়ে সফিচাচা গলা বাড়িয়ে বলতেন, কই কনে গেলে আয়েশার মা, দ্যাহসে কেডা আইছে। ও আয়েশার মা, ছোটকোদারে খাতি

দাও। মুড়ি দাও ছোটকোদারে। কালকে যে আমডা রাহিলে, কনে থুলে সেডা।

চাচি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন। বলেন:

এই যে ছোটকোদা কেমন আছো বাবা। হাত বাড়িয়ে চাচি বুকে টেনে নেন। থুতনি ধরে চুমু খান। গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বলেন— আয় বাছা আয়। তোর জন্যি এট্টা পাকা আম রাহিলাম। মুড়ি দিয়ে খাবি। আয় বাছা, ঘরে আয়।

আমি গড়িমসি করি। ঘরে যেতে দ্বিধা করি। আমি যত আড়ষ্ট হতে থাকি, চাচি ততই উতলা হন দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরেন বুকের সঙ্গে, মাতৃস্নেহের তীব্র আকর্ষণে আমাকে বুকের মধ্যে সাফটে ধরেন। তাঁর অকৃত্রিম আদর সোহাগ উষ্ণতার আলিঙ্গনে আমার গর্ভধারিণী মায়ের সান্নিধ্য এনে দেয়। আমি হাবাবোবা হয়ে চাচির স্নেহের অতলতলে তলিয়ে যাই। মাকে খুঁজে পাই চাচির বুকের ভেতর।

চাচি আমাকে জয় করতে পেরে পরম তৃপ্তি পান। পেটপোছা মেয়ে আয়েশাদি তো অনেক বড়। সেই তুলনায় আমি অনেক ছোট। বাচ্চা শিশু। বহুদিন চাচির কোলে কোনও সন্তান নেই। তাই সন্তান স্নেহ তাঁর যেন উতলে ওঠে। নিজের পেটের সন্তানের মতো মা-হারা শিশুকে মাতৃস্নেহ দেয়। চাচি আমাকে টেনে নিয়ে যান রান্নাঘরে। আসন পিঁড়িতে বসিয়ে হাতে ধরিয়ে দেন একবাটি ভর্তি মুড়ি। সঙ্গে খেজুরের পাটালি।

আমাকে ঘিরে ধরে আনন্দে আহ্লাদে মেতে ওঠেন সাইদা খালা, আয়নামণিদি, আয়শাদি— কেউ গালটিপে আদর করেন, কেউ নাক মলে দিয়ে ভালবাসা জানান। কেউ গলা ধরে চুমু খান। মুহূর্তে সবাই আমার খেলার সঙ্গী হয়ে যান।

আমার মা নেই এ-বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ তা স্পষ্ট করে অনুভব করেন। তাই তাদের আদরে সোহাগে ভালবাসার বন্যায় আমাকে ভাসিয়ে রাখেন। নাজিরা চাচি তো পুরোপুরি আমার মায়ের ভূমিকা নিয়ে নেন। প্রাণের তৃপ্তি নিয়ে আমাকে এটা ওটা খাওয়াতে থাকেন। আর মনের সমস্ত তোলপাড় ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর পুত্রস্নেহ। মায়ের বুক গর্বে বাৎসল্যে উথলে ওঠে। মৃদু আনন্দে পুত্র চিন্তায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। একটা পুরনো ব্যথা যেন ছটফট করে ওঠে তাঁর স্নেহের নীরে।

একদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুম থেকে উঠেই বাবার সঙ্গে গিয়েছি নাসিরদাদাদের বাড়ি। যেতে যেতেই বাবা বললেন:

তোর চাচারা 'বেগার' ডেকেছেন, জমির ধান কেটে বাড়ি তুলে আনবেন। ছোটকোদা, তুই তোর চাচির কাছেই থাকবি সারাদিন।

বাবার কথা শুনে আনন্দ তো আমার বুকে ধরে না। আমি লাফাতে লাফাতে বাবার সঙ্গে চাচিদের উঠোনে গিয়ে হাজির।

সফিউদ্দিন চাচা উঠোনেই ছিলেন। আমাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে থুতুনিতে চুমু খেলেন। বললেন, এই যে ছোটকোদা, ভাল আছো তো?

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাই, হ্যাঁ, ভাল আছি।

চাচা গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, কই কনে গেলে আয়েশার মা, দ্যাহ দ্যাহ কেডা আইচে।

চাচি আঁচলে হাত মুছেতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গালে চুমু খেলেন। বললেন, আয় বাবা, ঘরে আয়। তোর জন্যি মুড়ি ভেজে রেখেছি। এ্যাহন মুড়ি খাবি বাবা, আয়। চাচি আমাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মেঝেতে তিন-চারখানা তালের পাতায় বোনা চাটকোল পাতা। তার একটা চাটকোলে আমাকে চাচি বসিয়ে বাটিভর্তি মুড়ি খেতে দিলেন। মুড়ির সঙ্গে একটুকরো খেজুরের পাটালি গুড়।

চাচি গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন, নে মুড়ি খা, ছোটকোদা। চাচি চাটকোল টেনে নিয়ে আমার গাঁ-ঘেঁষে বসে মাথার এলোমেলো চুলগুলি পরিপাটি করে দিতে থাকলেন পরম স্নেহ-মমতায়। আহা রে, বাছার আমার মা নেই, কত কষ্ট।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

চাচি উঠে দাঁড়ালেন। মুখ বাড়িয়ে দরজার বাইরে তাকালেন। বললেন, আয় শর্মিলা, ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। ছোটখাটো দেখতে চাষি ঘরের মেয়ের মতো সাধাসিধে মুখ। চুলের রাশি একটা মোটা বেনিতে বাঁধা।

আমাকে দেখে অবাক হলেন। কিন্তু কথা বলল অন্য, দেরি হয়ে গেছে বুঝি আমার।

দরজার বাইরে আয়েশাদি দাঁড়িয়ে। সে বলল, আরে না না, হেঁটে এসেছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ হেঁটেই এলাম। এই খোকা নিশ্চয়ই নাসিরের বন্ধুর ভাই! ছোটকোদা।

ঠিক ধরেছ মাসি। আমাদের ছোট ভাইডি তোকে দেখিনি তো কোনওদিন, তাই লজ্জা পাচ্ছে খেতে।

আরে আমি তো মাসি, খালা, ছোট খালা। শর্মিলামাসি হাসিমুখে বলেন আর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ছোটকোদা খা বাবা, মুড়ি খা। তোর সঙ্গে দেখা করব বলেই না সেই কোন ভোরে উঠিছি। পোয়াতে তারা তখন আকাশে।

নে খা, বাবা। শর্মিলামাসি পিঠে স্নেহের হাত রাখেন।

অতি পরিষ্কার কণ্ঠ। ঘন নরম। ছোট্ট মুখটুকু, ওষ্ঠ দুটি নিটোল। দিব্যি গোলগাল চকচকে মিষ্টি চেহারা। শাড়ির আঁচল পিঠ থেকে টেনে সামনে আনেন। আঁচল দিয়ে আমার কপাল গাল মুছে দিতে থাকেন ঘসে ঘসে ময়লা তোলেন। এই তো কী সুন্দর গোলাপি গাল! আমার গাল টিপে চুমু খেলেন মাসি।

শর্মিলামাসি যেন কত কালের চেনা আপনজন। মায়ের প্রাণের সমস্ত দরদটুকু আমার প্রতি ঢেলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। হাসিমুখে আমাকে বারবার আদর করতে থাকেন।

শর্মিলামাসির উৎসাহ উদ্দীপনা আর আপন হয়ে ওঠার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখছি আর অবাক হচ্ছি। তাঁর প্রাণকাড়া কথাবার্তা শুনেই চলেছি।

শর্মিলামাসি ফের আদর করে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, ও রে বোকা খোকা, আমি যে তোর চাচির বোন। মার বোনমাসি। মাসি আরও ঘনিষ্ঠ প্রাণময় হয়ে ওঠেন। আমার গায়ে মাথায় দরদের স্নেহের সোহাগের হাত বুলাতে থাকেন আর নানা প্রসঙ্গ টেনে আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। মাসি নিচুগলায় বলেন, কী অভাগা ছেলে! দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মাসির। একটা ছেলেকে জন্ম দেয়া সহজ ব্যাপার নয়, মানুষ করা আরও কঠিন!

তোর ছেলেটা বেঁচে থাকলে সেও তো এতবড়টা হত আজ, কী কপাল তোর রে শর্মিলা। কী আর করবি বল। চাচি তার বোনকে প্রবোধ দেন। আমাকে তাঁর আদরযত্ন দেখে মুগ্ধ হয়ে যান চাচি। তাঁর যেন ভারী ইচ্ছা করে বোনকে আদর করে আরও দু'টি কথা বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন নাসিরদাদা। ঢুকেই আমাকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়লেন, আরে আরে ছোট্ট ভাইডি যে, কখন আলি ভাই?

আমার হয়ে উত্তর দেন মাসি। এই তো খানিকক্ষণ হল এল!

নাসিরদা অবাক হয়ে জিগ্যেসা করে, খালা তুমি? সোনামণি! মিঠে করে বলল।

হ্যাঁ আমিও এই আলাম। খুশিতে মন ভরে যায় তাঁর। বোনপোর জন্য কী যে করবে ঠিক পয় না মাসি। শুধোয়, মুড়ি খাবি নাসির?

না খালা, সোনামণি। আমি মাঠের খেতে যাব। ধান কাটছে বিশজন বেগারে। তাঁদের জন্য নাস্তা নিতেই তো আলাম। তুমি বরং সেটাই আমাকে চটপট গুছিয়ে দ্যাও সোনামণি।

নাসিরদাদার সঙ্গে মাসিও চলে গেলেন রান্নাঘরে আর ঘরে এসে ঢোকেন

সাইদাখালা, আয়নামণিদি আর আয়েশাদি। তারা কেউ গালটিপে আদর করে, কেউ নাক মলে দিয়ে ভালবাসে, কেউ-বা গালে চুমু খেয়ে সোহাগ করে। মুহূর্তে ওরাই আমার খেলার সঙ্গী হয়ে যায়, আমরা নানা খেলায় মেতে উঠি।

এক সময় আমাদের ডাক পড়ল রান্নাঘরে। চাচি, আমি, সইদা খালা, শর্মিলা খালা, আয়নামণিদি আর আয়েশাদি— আমরা সবাই পিঁড়ি পেতে খেতে বসলাম। মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল। রুইমাছের ঝোল, পটলভাজা আর তেঁতুলের চাটনি দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম। এ বাড়িতে এসে এর আগে কোনওদিন তো রান্নাঘরে বসে ভাত-মাছ খাইনি। খুবই আনন্দ করে খেলাম। চাচি মাসিরা আদর করে খাওয়ালেন। খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম।

বিকালে রোদ না সরতেই বাবা এলেন মাঠ থেকে চাচাবাড়ি। কী ব্যাপার! বেগারেরা কেউ এলেন না কেন? বাবা কেন একা এলেন? এ প্রশ্নগুলি বারবারই আমার মনটাকে পোড়াতে থাকল! মাসিদের কাছে শুধাই এমন সাহস হল না। বাবাকেও একা ফাঁকা পাচ্ছিনে। গোপন প্রশ্ন বুকে ছটফট করছি, কখন বাবাকে জিগ্যেস করে মনকে শান্ত করব।

বাবা তখন রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত। দেখি উঠোনের পুব-উত্তর কোণে নতুন উনুন গড়া হয়েছে। মাটির নতুন হাঁড়ি সরা, পাঁচ-ছ'টি জোগাড় হয়ে গেছে।

বড় বড় দুটো মোরগ আয়েশাদি বাবার হাতে দিলেন। বাবা এক এক কোপে মোরগদু'টির গলা কেটে মারলেন। মাংস রান্না হবে। ফের ধন্ধ এসে আমার মনের গলা যেন টিপে ধরল। সকালে দেখেছি চাচা মোরগ কাটলেন গলার নলি কেটে যাকে বলে জবাই। আর আমার বাবা মোরগের গলা এককোপে কেটে দু'ভাগ করেছিলেন। উঠোনের এককোণে বসে মোরগের মাংস প্রস্তুত করা হল রান্নার জন্য। সেখানেই উঠোনের এককোণে নতুন উনুন গড়া হয়েছে। তার চারপাশ আলো মাটি দিয়ে লেপেপুঁছে তকতক, ঝকঝক করা হয়েছে। নতুন হাঁড়িতে ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, মাংস আর চাটনি রান্না করে বাবা সবই নতুন হাঁড়িগুলিতে রেখেছেন। সেই হাঁড়িগুলি চাচিদের রান্নাঘরেও তোলা হল না।

কেন এমন হচ্ছে ব্যাপারটা তখনও আমি বুঝিনি। বুঝলাম সেই খাবার আগে সন্ধ্যাবেলায়।

সন্ধ্যা হলেও আকাশে বেশ গোল চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় সব কিছুই স্পষ্ট। উঠোনে আমাদের পাড়ার বেগারদের খাবার জায়গা প্রস্তুত হল। বিচুলিখড়ের ওপর বসে সবাই খাবেন। উঠোনে যেখানে রান্নাবান্না হয়েছে

সেখানে সবাই খেতে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও খেতে বসলাম।

সব মানুষগুলিই তো একই খেতে একই ধান কেটেছেন, আঁটি বেঁধে একই ধান তো বাড়িতে বয়ে এনেছেন একই সঙ্গে। এক চাল রান্না হল দু'জায়গায়। কারও সঙ্গে কারও যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। আমাদের রান্না হল উঠোনে, নতুন উনুন গড়ে, নতুন হাঁড়িতে আর দক্ষিণ পাড়ার বেগারদের রান্না হল চাচিদের রান্নাঘরে পুরনো হাঁড়ি-কড়াইতে।

একই মানুষ সারাদিন একসঙ্গেই খেটেছেন, কাজ করেছেন। পাত্র আলাদা হলেও একই জল তাঁরা পান করেছেন, একই আলো-বাতাসে তাঁরা বেঁচে থেকেছেন। একই মোরগ ভিন্ন ভাবে কেটে, ভিন্ন জায়গায় রান্না করে, ভিন্ন জায়গায় খেতে বসেছেন। এ কেমন হল? আমার চেতনায় এই প্রশ্ন বারবার আঘাত করে চলল। কিন্তু বাবাকে জিগ্যেস করব এমন সুযোগই পাচ্ছিনে। সেই প্রশ্ন আরও বদ্ধমূল হল খেতে বসবার আগেই। বাবাকে ফাঁকা একা পেতেই আমি জিগ্যেস করলাম, বাবা, আমরা কেন আলাদা রান্না করে খাচ্ছি?

আমরা হিন্দু, আর তোর চাচিরা মুসলমান। মুসলমানদের রান্না করা খাবার হিন্দুদের খেতে নেই। এই জন্য আমরা আলাদা ভাবে নতুন হাঁড়িতে রান্না করে খাচ্ছি।

তখনই ভয়টা আমার বুকের ভেতর দাপাদাপি শুরু করল। কিন্তু সাহস করে বাবাকে বলতে পারলাম না যে দুপুরবেলা আমি রান্নাঘরে বসে চাচির হাতে রান্না ভাত, মাছ, ডাল খেয়েছি। আমি মুসলমানের ভাত খেয়েছি।

ফের বুকের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠল: যে চাচি আমাকে মায়ের মতো প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তিনি মুসলমান তাই তাঁর হাতের রান্না খাওয়া যাবে না— এ কেমন বিচার? মুড়ি তো চাচিই ভাজেন, চিড়ে তো চাচিই তৈরি করেন, খেজুরগুড়ের পাটালি তাও তো চাচি গড়েন— সবই তো আমরা দ্বিধাহীন খাই, কেবল রান্না করা খাবার ভাত-মাছ-মাংস-তরকারি খাওয়া যাবে না— এ কেমন উদ্‌ঘট ব্যাপার? মন আমার কিছুতেই এই বিধানকে মেনে নিতে চাইল না। প্রতিবাদের আগুন কিছুতেই নিভছে না।

ভয়ে, ভয়ের আশঙ্কা, তখনও রক্তের ভেতর দলা পাকাচ্ছে। ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। অথচ না বলতে পারলে মনেপ্রাণে স্বস্তিও পাচ্ছিনে। কতবার বলবার জন্য বাবার পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করেছি। এক সময় বাবাকে একা ফাঁকা পেয়ে বললাম: বাবা, তুমি যে বললে চাচিদের রান্না করা খাবার আমাদের খাতি নেই। দুপুরে আমি তো চাচিদের রান্নাঘরে বসে চাচির হাতে রান্না করা খাবার

ভাত-ডাল-মাছ খেয়েছি— বাবা আমি মুসলমানের ভাত খেয়েছি। আমার কী হবে বাবা? মহা অপরাধ করেছি— এমন অবস্থায় বিস্ময়ের চোখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা কী বলে তাই শোনার জন্য।

তুই ছোটমানুষ ছোটকোদা। তোর কোনও দোষ হয় না। ও সব মনে করিস নে বাবা। ওরাও আমাদের মতো মানুষ। ধর্ম দিয়ে, বর্ণ দিয়ে, জাত দিয়ে মানুষকে ভাগ করা মহা অন্যায়। মানুষ মানুষ। তবু আর কাউকে কিছু, বলতে হবে না। ছোটকোদা বুঝলি না বাবা। তুই ছোটমানুষ, তোর খালি কোনও দোষ হয় না। কিচ্ছু হবে না বাবা। বাবা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সব ভয়, দোষ, অপরাধ যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। আমার মনের ঘোলা কেটে গেল। কিন্তু দ্বন্দ্বটা ঘুচল না— হিন্দু-মুসলমান একই খাবার আলাদা কেন খাবে?

পাড়িয়ালি গ্রামের দু'টি পাড়া উত্তর এবং দক্ষিণ। উত্তরপাড়ায় সব হিন্দুরা বাস করেন আর দক্ষিণপাড়ায় মুসলমানরা বাস করেন। দুই পাড়ার মাঝখানে বিশাল এক তেঁতুলগাছ যেন দুই পাড়ার মস্ত প্রহরী। দু'টি পাড়ার সীমারেখা। কিন্তু ওই বিশাল তেঁতুলগাছের ছায়ায় গাছতলায় আমরা ছোটরা যখন একসঙ্গে খেলতাম, ধর্মের ভেদরেখাটি একেবারেই মুছে যেত। হিন্দু আর মুসলমান— এই বোধটাই কারও মধ্যে থাকত না। আমরা সবাই খেলার সঙ্গী। এই পরিচয়টাই বড় হয়ে উঠত। আমরা ছিলাম পরস্পর আপন-স্বজন সব। এক মন, এক প্রাণ।

মহিদুল আমার থেকে দু-একমাস ছোটই হবে। তবু তার সঙ্গেই আমার মাখামাখিটাই বেশি গভীর ছিল। তেঁতুলতলায় খেলার মাঠে মহিদুলকে পেলে আমরা মানিকজোড় হয়ে যেতাম। গলায় গলায় ভাব জমে যেত। মহিদুলের মা'র সঙ্গে আমার মা যে সই পাতিয়েছিল এটা আমরা দু'জনেই জানতাম। মহিদুল আর আমি একসঙ্গে ধানখেতে রঙিন ফড়িং ধরতাম, গয়লাঘাসের বিচি সংগ্রহ করতাম, মরা শ্রী নদীর পাড়ে গাছে চড়ে পাখির ডিম পাড়তাম, কানামাছি আর গোল্লাছুট খেলতাম। এ সবই এখন অস্পষ্ট ছবি। কিন্তু একদিনের বিকালের ঘটনা চিরকালের মতো হৃদয়ে দাগ কেটে বসে আছে।

দিনগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। আর তখন আমরা যত ছোটই থাকি বাতাস শুঁকে টের পেতাম, দেশের বাতাসে দু'টি ভয়ংকর শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে— দেশভাগ আর স্বাধীনতা। সেই দু'টি শব্দের হাত ধরে সমাজের বাতাসে তাপ ছড়াচ্ছিল 'দাঙ্গা' নামক আরও একটি মারাত্মক শব্দ। আর দাঙ্গা মানেই দাবানল, আগুন ছড়ায় একমানুষ থেকে আরেক মানুষে। তাতে হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পুড়ে মরছে এবং তার জন্যই দেশভাগ, দাঙ্গা। অথচ যুগ যুগ

ধরে হিন্দু আর মুসলমান এ দেশে পাশাপাশি গলাগলি হয়ে বাস করছেন। পাড়িয়ালি গ্রামে তাঁদের মধ্যে কোনও অশান্তি, অবিশ্বাস ছিল না। পরস্পর পরস্পরের আপন-স্বজন বলেই জানতেন। কিন্তু বাতাসে যখন বিষবাষ্প ছড়ায় মানুষের নিঃশ্বাসে তা ঢুকে যায়। বিষের ক্রিয়ায় স্বাভাবিক মানুষও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। মানুষ মানুষকে খুন করেও সুখ পায়, স্ফূর্তি করে।

মুসলমানদের কী-একটা পর্ব চলছিল উৎসবের। তেঁতুলতলায় খেলা শেষ হতেই মহিদুল বলল, ছোটকোদা চল না আমাগে বাড়ি। আম্মা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চ চ, আমাদের বাড়ি চ। মহিদুল গভীর আন্তরিকতায় আমার হাত ধরে টেনে নেয়। আমরা গলা ধরাধরি করে হাঁটতে থাকি মহিদুলদের বাড়ির দিকে দক্ষিণপাড়ায়।

তেঁতুলতলা ছাড়িয়ে দু-একটা বাড়ি পেরিয়ে আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে মহিদুলদের বাড়ি ঢুকি। দেখি উঠোনের পুবকোণে খেজুর বাল্লে মাটিতে পুঁতে ঘেরা হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকারে। অর্ধগোলাকার সেই ঘেরার মধ্যে মাটির উনুনে ফতেমা আম্মা কাঁচিফুড়া পিঠে গড়ছেন। দু'খোলা ইতিমধ্যে নামানো হয়েছে। হাতে গরম পিঠে নিয়ে মহিদুল ছুটে এল আমার কাছে। সে প্রাণমন খুলে বলে, ছোটকোদা নে খা। নে ছোটকোদা খা। খেয়ে দ্যাখ দু'খানা অপূর্ব হয়েছে। নে খা। মহিদুল বারবার আমাকে অনুরোধ করতে থাকে। হাতে পিঠে তুলে ধরে আমার মুখের সামনে আনে।

আমি পিছনে পিছু হেঁটে সরতে সরতে ফতেমা আম্মার পিঠের খুব কাছে চলে যাই। তবু হাত বাড়িয়ে পিঠে ধরি না। মহিদুল তবু সদ্যগড়া কাঁচিফুড়া পিঠে আমাকে খাওয়াবেই— এমন একটা কঠিন জেদ ধরে সে আমার দিকে সরে আসতে থাকে। তার প্রাণময় নির্মল আন্তরিকতা আমাকে নিরুপায় অসহায় করে তোলে। অধৈর্য আর তীব্রতম বিরক্তিতে আমি কঠিন হয়ে বলি, না না, আমি খাব না। ক্যান খাব তোরা তো মুসলমান। আমি খাব না। তুই খা মহিদুল। তোদের কোনও রান্না করা খাবার আমাদের খেতে নেই। আমরা হিন্দু আর তোরা মুসলমান।

এই নতুন বোধটা কোথা থেকে যে আমার ভেতর ঢুকেছিল তখন তা ভাববার মতো অবকাশ আমার ছিল না। কথা বলেই আমি বুঝি তাকিয়েছি— ফতেমা আম্মার মুখের দিকে। ফতেমা আম্মাও তাকিয়েছেন আমার মুখের দিকে। জীবন মন্থন করা সে দৃষ্টি, বড় অসহায় সে চাউনি। সহসা পৃথিবীর রংটাই পালটে গেল। উভয়ের হৃদয়ে বুঝি রক্তক্ষরণ হতে থাকল। ফতেমা আম্মা বহু কষ্টে

তাঁর ভেতরের আগুনে পোড়া মুখখানা বাড়িয়ে গলায় হৃদপিণ্ড ছেঁড়া খেদ মিশিয়ে বললেন, ছোটকোদারে আজ আমার হাতে কাঁচিফোড়া পিঠে খেতে তোর বাধছে— আমরা মুসলমান বলে। তুই জানিসনে বাবা, এই আমার বুকের দুধ খেয়ে একদিন তুই বেঁচেছিলি। আর আজ তুই বলতে পারলি, মহিদুল তোরা মুসলমান, পিঠে খাব না। বাবা ছোটকোদারে, তুই যে আমার বুকের দুধ খেয়ে বেঁচেছিস। ফতেমা আম্মার গলায় বুঝি আর স্বর বেরোয় না। কষ্টে-দুঃখে অসহ্য বেদনায় তাঁর দু'চোখের ডালি ছাপিয়ে অশ্রুধারা নামে। বুক তাঁর ভেসে যায় আর আমাকেও অথৈ ভাসিয়ে নিয়ে যায়— আত্মগ্লানি আর ব্যথার খরস্রোতে।

আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারি না। বুক ভেঙে যেতে থাকে। আম্মার কান্না দেখে বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে। আত্মগ্লানিতে পুড়তে থাকি। অপরাধবোধে মাথা নত হয়। আমি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকি। লজ্জা ভয় বেদনায় নিজের উপর ঘৃণায় নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকি। আর তখনই আমার মনে হল চারপাশের গাঢ় ঘন আঁধার আমাকে ঘিরে ধরেছে। সারা শরীর যেন থরথর করে কাঁপছে। মনের মধ্যে এলোমেলো শব্দ সব আগুনের ফুলকি হয়ে ছুটছে। আমার হৃৎপিণ্ডকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি বাড়ির দিকে ছুট দি। আমি থামি না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকি। আমার কান্নাও থামে না। পিছনে তাকাতেও ভয় পাচ্ছি, ছুটছি।

পিছনে শুনতে পাচ্ছি। দরদি গলায় ফতেমা আম্মা চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন। দূর থেকে প্রাণময় স্নেহের গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ও রে ছোটকোদা রে, বাবা তুই একা যেতে পারবি না, ভয় পাবি। ফিরে আয় বাবা, ওরে ছোটকোদা যাসনে। ফিরে আয় ছোটকোদা। যাসনে নে বাবা, ফিরে আয়।

আঁধারে শব্দরা সব আলোর বর্শা হয়ে আমার বুকে আমূল বিঁধে যাচ্ছে— আত্মগ্লানির বিষের জ্বালায় আমি জ্বলছি, আমি পুড়ছি, হৃদয়ে আমার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দরদি গলার স্নেহময় ডাক আমাকে চুম্বকের মতো পিছনে টানছে। আমার নাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছে অথচ আমি ফিরতে পারছি না। একটা বিপুল বেদনাভরা খেদ যেন আমাকে চিরে ফেড়ে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। ভেতরে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে কিন্তু তা বোঝবার, প্রকাশ করবার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বোবা ব্যথার, কষ্টের তীক্ষ্ণ শেল আমাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিচ্ছে। প্রাণপণে তবু আমি ছুটছি, যেন অনন্তকাল।

আমি টের পাচ্ছি আমার পিছনে ছুটতে ছুটতে আর দরদি গলায় ডাকতে ডাকতে ফতেমা আম্মা টেপো মহলদারের বাঁশতলা অবধি ছুটে আসছেন। আমি

জানি না, তবু কেন আমি পিছনে ফিরতে পারছি না, তাকাতেও পারছি না, আমি ছুটছি।

রাতের অন্তহীন আঁধার মাড়িয়ে আমাদের মস্ত উঠোন পেরিয়ে আমি দিশাহারা ছুটে গিয়ে চৌকাঠে পা বেধে মুখ থুবড়ে পড়ি। আর অনন্ত বিষাদসিন্ধুতে যেন হাবুডুবু খেতে থাকি চিরকাল।

চেতনায় আলোকের কান্না

আমার জীবনে প্রাণের প্রথম চেতনা কোথা থেকে যে শুরু আজ আর তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু আলোর বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পথ প্রথম খুঁজেছিল পুরনো পাঠশালায়। এই পাঠশালায় পড়তেন আমার দুই দিদি— জপমালা আর হেমলতা। দিদিদের সঙ্গে একদিন আমি গিয়েছিলাম সেই পাঠশালায়। আমার ঠাকুরদার তৈরি করা সেই পাঠশালাগৃহটি স্থান পরিবর্তন করে উঠে এসেছিল পাড়িয়ালি আর ডাঙামহিষদহ দুই গ্রামের মাঝখানে কাঁচা রাস্তার ধারে। পার্থিব শিক্ষার উপাদান বলতে এক বাণ্ডিল পাততাড়ি, তালপাতার গোছা। যা পুকুরের জলের তলায় পাঁক কাদায় পচিয়ে রোদে শুকিয়ে তেলচিক্কন করা হয়েছে। সঙ্গে বাঁশ-কঞ্চির কলম আর ভুষোকালিতে ভরা একটি মাটির দোয়াত। পাততাড়ির তালপাতায় বাঁশ-কঞ্চির কলম দিয়ে ভুষোকালিতে লেখা— পার্থিব বর্ণমালায় সেই আমার প্রথম চোখ রাখা। কল্পনার চোখ দিয়ে আজ যখন সে দিনের দিকে তাকাই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই দু'দিকে উঁচু ঢাল, মাঝে পায়ে-দলা শুকনো ঝুরঝুরে ঘাসে ঢাকা পথটার শেষে কাঁচা রাস্তার ধারের সেই পাঠশালাগৃহটি। বাঁশের খুঁটির ওপর উলুখড়ের ছাওয়া দোচালা বাংলা ঘরখানা। চাঁচের বেড়া, মাটির উঁচু-নিচু মেঝে, পাল্লাহীন দরজা। মাটির মেঝেতে তালপাতার চাটকোল পেতে আমরা ছাত্রছাত্রীরা বসে পাততাড়ির তালপাতায় লিখছি। পণ্ডিতমশাই সুর করে প্রতিটি বর্ণমালা পড়াচ্ছেন। আমি তখনও লেখা শিখিনি। তাই আঁক-কষার ওপর কঞ্চির কলম বুলিয়ে অক্ষরের ছাঁদ রপ্ত করে চলি— অ-য়ে অজগর, আ-য়ে আম, হ্রস্ব-ইয়ে ইঁদুর। দীর্ঘ-ঈয়ে ঈগল।

ক'মাস এই পাঠশালায় যেতে-না-যেতে অকালে মা মারা গেলেন। গোটা সংসারটা গেল ভেঙে। নড়বড়ে সংসারের হালটা ধরে রইলেন আমার বুড়ি ঠাকুরমা। সংসারে আমরা ছয়টি ভাইবোন, তাদের নিয়ে বুড়ি ঠাকুরমা যেন

অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। বাবা তখন আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে ডাঙপাড়িয়ালির ভিটেয় চলে যেতে বাধ্য হলেন। পাঠশালায় যাওয়া আমার বন্ধ হল।

আমার বাবা, আমার ঠাকুরদার মতো লেখাপড়া শিখে দেশ এবং দশের একজন হতে পারেননি। এই বেদনা তাঁর চেতনায় সারা জীবনই জেগেই ছিল। তাই বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করার শপথ নিয়েছিলেন। এত ভাঙাগড়ার মধ্যেও বাবা তাঁর বন্ধু খানপুর গ্রামের মজিদ মিঞার তালগাছ থেকে তালের পাতা কেটে আনলেন। সেই তালপাতার প্রতিটি ফলককে আলাদা করে পরপর সাজিয়ে পুকুরের জলের তলায় পাঁককাদার ভেতর জাগ দিয়ে রাখলেন পাঁচদিন। তার পর জাগ থেকে তালপাতা তুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে তেলচিক্কন করলেন। হাতদুই আড়াই বিশখানা তালপাতা পাততাড়ি বেঁধে সঙ্গে কঞ্চির কলম আর মাটির দোয়াতে ভুষোকালি ভরে দিয়ে বাবা আমাকে অক্ষয় পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠালেন।

ডাঙপাড়িয়ালির দক্ষিণে শেষ মাথায় মাটি কেটে উঁচু টিলা বাঁধা হয়েছিল বহুকাল আগে। সেই টিলার ওপরে বেড়ে-ওঠা ঝাঁকড়ামাথা বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছটিই তার সাক্ষী। অক্ষয় পণ্ডিত বেঁটেখাটো মানুষটি, মাথাটা ছিল নিগ্রোদের মতো, ঘন কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট আর চকচকে সাদা দাঁত। অক্ষয় পণ্ডিত সেই গাছতলায় আট-দশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে শিক্ষা দেন— তালপাতায় বর্ণমালা লেখা আর সুর করে পড়া— আঁকুরে-'ক', মাথায় পাগড়ি-'ঙ', পৈঠাবাঁধা-'দ', ছেলে-কাঁকলে-'ঝ', বোঁকচা পিঠে-'ঞ'। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুর করে পড়ি।

মাস শেষ হওয়ার আগেই চাষের 'গোণ' পড়ায় অক্ষয় পণ্ডিত মাঠে খেতের চাষে মন দিলেন, পাঠশালা আর বসে না। পাঠশালা বন্ধ তো লেখাপড়া বন্ধ হল আমাদের।

ডাঙপাড়িয়ালি গ্রাম থেকে পুরনো পাড়িয়ালি গ্রামে বিদ্যালয়ে যায় বিন্দুভূষণ বিশ্বাস আর দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁরা দু'জন উঁচু ক্লাসে পড়ে। ভাল লেখাপড়া শিখছে। বাবা তাদের সঙ্গে দেখা করে— অঙ্গদ বিশ্বাস আর আমাকে পুরনো পাড়িয়ালির 'ডাঙামহিষদা-পাড়িয়ালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। অঙ্গদ আর আমি তাঁদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে গেলাম।

পাড়িয়ালি গ্রামের উলটো দিকে যে মরা জোলাটা মরতে মরতে ভরাট হতে হতে পুবের চাষের মাঠে হারিয়ে গেছে— তারই পায়ের গোড়ায় উঁচু টিলার

ওপর আমাদের পুরনো পাঠশালা বাড়িটি এখন নতুন করে গড়ে উঠেছে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়'। দেশভাগ আর স্বাধীনতার পর আমার ঠাকুরদার গড়া পাঠশালাটির নাম আর চেহারা পালটে ফেলা হয়েছে। আড়াআড়ি পুব-পশ্চিমে লম্বা— বাঁশ আর কাঠের খুঁটির ওপর পুরনো ঢেউটিনের চৌচালা ঘরখানা কতকাল আগে যেন তৈরি। বিশাল বাঁশঝাড় আর সবুজ গাছগাছালির ঝোপঝাড় পিছনে রেখে ছাই-রঙা জং-ধরা পাঠশালা বাড়িটি আকাশের নীচে একপায়ে দাঁড়িয়ে।

এমনিতে বাড়িটি নির্জনতায় ডুবে থাকে। কিন্তু যখন পাঠশালা বসে, তখন শোরগোল, হইচই আর কচিকাঁচাদের কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। গোটা পরিবেশটাই বদলে যায়। জীবনের অস্ফুট ঢেউ আছড়ে পড়ে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। বিন্দু আর দেবেন অঙ্গদ আর আমাকে নিয়ে আনারআলি প্রধান শিক্ষকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, মাস্টার সাহেব, এই দু'জন ছেলে আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছে। এরা এখানে পড়াশোনা করবে। এদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিন স্যার।

পঞ্চান্ন বছর আগে পূর্ববঙ্গে গ্রামদেশে পাঠশালা বিদ্যালয়ে ছাত্র জুটত না। একসঙ্গে দু'জন ছাত্রকে বিনা পরিশ্রমে একেবারে বিদ্যালয় গৃহে পেয়ে যাওয়ায় দু'জন শিক্ষকেরই আনন্দ আর ধরে না। প্রধান শিক্ষক আনারআলি স্যার তক্ষুনি কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে নাম, বাবার নাম, বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাও কাঁটাসেজি গাছের আঠা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। তোমাদের তালপাতায় বর্ণমালার 'আঁককষি' করে দেওয়া হবে, বাড়িতে যাতে বারবার রপ্ত করতে পারো। যাও অঙ্গদ-যতীন, তোমরা কাঁটাসেজির আঠা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো।

বাঁশের কোড়ের খোলায় আমরা কাঁটাসেজির আঠা সংগ্রহ করে আনলাম। আনারআলি স্যার লিখেও দিলেন। আনারআলি স্যার মধ্যবয়সি, খুবই মজার মানুষ। একমাথা ঘনকালো চুল। সুচালো দাড়ি, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। ট্যারা দুটো চোখ, ঠোঁটের ওপর বড় বড় দুটো ফাঁকা দাঁত। সাদা ধবধবে দাঁতে এত মসৃণতা যেন প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আর ছিল তাঁর অদ্ভুত ভুরু জোড়া। মুখের ওপর ওই ভুরু জোড়ার ভঙ্গি দেখে আমার খুব হাসি পেত। আমার মতো কচিকাঁচারা তো কেউ কেউ হাসি থামাতে না পেরে বিদ্যালয়গৃহের বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে হাসি হেসে আসত। তাতেও অনেক সময় কারও কারও হো হো হাসি মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর কথা বলার আর পড়ানোর অনায়াস

ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কোমল সুর ঝরে পড়ত— শুনলেই মনে হত তিনি আদর করছেন, ভালবাসার অকৃত্রিম দরদ ঢেলে দিচ্ছেন।

পাঠকক্ষে আনারআলি স্যার ঢুকেই লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, এই যে যতীন, দেখি তোর লেখা আর না-লেখা পাতাদু'টি। কই, দে দেখি— লম্বা হাতে তিন-চারজন ছাত্রছাত্রীর মাথার ওপর দিয়ে বাড়িয়েই থাকতেন তিনি যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছেন পাতা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আনসারআলি স্যারের হাতে ধরিয়ে দিতাম তালপাতা দু'টি— লেখা আর না-লেখা। তাকিয়ে থাকতাম নিরীখ ধরে। স্যারের চোখের দৃষ্টির দিকে।

আনারআলি স্যার তালপাতা দু'টি হাতে নিয়ে তার ওপর চোখ রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি বর্ণগুলির হৃৎপিণ্ড অবধি দৃষ্টি চালিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, বল তো, যতীন, এটা কী? এটা কী? তাঁর বলার ধরনটা এত স্বচ্ছ এত সরল-স্বাভাবিক আর বাস্তবানুগ যা একমাত্র তাঁর সুললিত উচ্চারণের মধ্যেই আমি শুনেছি এবং তা হৃদয় দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইতাম।

ডাঙামহিষদহ-পাড়িয়ালি বিদ্যালয়ে আর একজন শিক্ষক ছিলেন আলম মৌলবি। এক মাথা সাদা ধবধবে চুল। এক মুখ ঘন সাদা ধবধবে লম্বা দাড়ি। চোখ দু'টি সবুজ, নাকটি তিল ফুলের মতো। পরনে থাকত লম্বা ফতুয়া আর পাজামা— সবই দুধের মতো সাদা ফকফকে। এমন দরদি প্রাণখোলা হৃদয়বান মানুষ জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। প্রায়ই আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলতেন, তোমাকে শিখতেই হবে, এই বর্ণগুলি দেখছ— অ, আ, ক, খ— কোটি কোটি বই এই বর্ণগুলি পাশাপাশি রেখেই সৃষ্টি হয়েছে— এগুলিই শব্দের বীজ। এই বীজের বই হয় যেমন ফলের বীজে গাছ হয়— হয়ে ওঠে মহামহীরুহ, যার ডালে আরও কত জীবন আশ্রয় পায়, বেঁচে থাকে। বলতে বলতে আলম মৌলবি স্যার কেমন হারিয়ে যেতেন। সেখান থেকে ফিরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, সুর করে বর্ণমালা শেখাতেন। তাঁর বর্ণমালা শেখানোর অসাধারণ কৌশলেই বর্ণগুলির প্রতি আমার আকর্ষণ চিরকালের মতো হৃদয়ে গেঁথে গেল।

কিন্তু বেশিদিন ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বর্ষাকাল চলে এল। বিদ্যালয় কিছুদিন বন্ধ ছিল। এরপর পুরনো পাড়িয়ালি আর ডাঙপাড়িয়ালির মাঝখানে যে ছোট বিল তা জলে ভরে আমাদের মাথা ছাড়িয়ে গেল। ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হল। যতদিন না বিল শুকিয়ে যাচ্ছে

ততদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনও পথই থাকল না আর।

লেখাপড়া শিখতেই হবে। তাই বাবা আমাকে তালের ডিঙিতে চড়িয়ে নিয়ে গেলেন আমার মেজপিসির বাড়ি পোড়াডাঙায়। আমার পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ সরকার আমাকে পোড়াডাঙা রাইচরণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। বাবা আমাকে রেখে বাড়ি চলে এলেন। আমি রোজ স্কুলে যাই চিত্তরঞ্জন সরকার আর সুভাষ সরকারের সঙ্গে। এরাও আমার সম্পর্কে পিসতুতো দাদা। বিদ্যালয়ে বর্ণমালা শিখি। কিন্তু বাবার জন্য ভীষণ 'পরান পোড়ে'— ঠাকুরমার জন্য মন খারাপ হয়। আমি পিসির বাড়িতে কিছুই খেতে পারি না। তিন মাসে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে অর্ধেক হয়ে গেল।

বাবা পিসির বাড়িতে আমাকে দেখতে এসেছেন— আমি কেমন আছি। আমি স্কুল থেকে পিসির বাড়িতে ফিরতেই বাবাকে দেখে হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকলাম।

বাবা আমাকে বুকের কাছে আদরে ডেকে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকলেন: ছোটকোদা, কাঁদিস নে বাবা, আমি তোকে নিতেই তো এসেছি বাবা, কাঁদিস নে বাবা। তোর ঠাম্মাই আমাকে পাঠিয়েছে তোকে নিয়ে যেতে। ভাত খেয়ে নে। আমি তোকে আজই বাড়ি নিয়ে যাব।

পিসিকে ডেকে বললেন, বুনডি ক তো, ছোটকোদার চেহারা এতটা খারাপ হল কী করে! তুই কি খেতে দিসনে বোন! মা-মরা ছেলে আমার, তার চেহারা তো কোনওদিনও এমন হয়নি! তিন মাসে কী করেই বা এমন অবস্থা হল?

বাবার সঙ্গে আমি ডাঙপাড়িয়ালির বাড়িতে চলে এলাম। একমাস পরে বাবা আমাকে পাশের গ্রাম ভুলবাড়িয়ার রাজেনবাবুর কাছে পাঠালেন। রাজেন বিশ্বাস গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। লম্বা ফর্সা চেহারা। স্বর্ণবর্ণ দু'টি চোখ দিয়ে তিনি সব কিছু দেখেন তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা নিয়ে। কথা খুব কম বলেন। রাজেনবাবু স্কুল খুলেছেন তাঁর দালানঘরের বারান্দায়। শিক্ষক রাজেনবাবু নিজে আর তাঁর ভাগ্নে ইতবর বাইন। মাস দুই রাজেনবাবুর বারান্দায় আমাদের শিক্ষানবিশি চলল। ইতবর স্যার একেবারে গোবেচারি মানুষ। আস্তে আস্তে কথা বলেন। মাথাটা ফুটবলের মতো গোল, চোখ দু'টি ভাসা ভাসা। হাসলে সামনের দাঁতগুলি বেরিয়ে যায়। মুখটা থ্যাবড়া আর কটকটে। মুখের রংটা তামার মতো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে সবুজ একটা আস্তরণ পড়েছে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মুখের যে জিনিসটা দেখে সবচেয়ে বেশি গা ঘিনঘিন করে তা হচ্ছে তার ভাসা ভাসা খুদে চোখদুটো। সারা মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই চোখ দুটোর যেন এতটুকু সঙ্গতি নেই। আর এই

চোখ দুটো সারাক্ষণ আমার মুখের ওপরে এঁটে আছে। তখন এমন একটা অবস্থা হয় যে ইচ্ছা হতে থাকে হাত দিয়ে আমার মুখটা মুছে নিই।

তা সত্ত্বেও প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। বারান্দায় বসবার জায়গা, দাঁড়ানোর মতো জায়গা আমাদের থাকল না। তখন রাজেনবাবু পাশের বাড়ি কালিচরণ বিশ্বাসের গোয়ালঘরে স্কুল বসালেন।

কালিচরণের গোয়ালঘরের স্কুল ক'দিন চলল, লেখাপড়া কিছুই হল না। স্কুল আবার গেল কালিচরণের পুকুরপাড়ে বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের খোলা দু'চালা ঘরে। এখানে লেখাপড়ার থেকে খেলাই বেশি চলল। বর্ণমালা আর শেখা হল না।

দেশভাগ আর স্বাধীনতার নতুন হাওয়ায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় গড়ার একটা ধুম পড়ে গেল। আমাদের ডাঙপাড়িয়ালিতেও নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বাবা মুখ্য ভূমিকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সাহায্যের জন্য ছোটছুটি করতে থাকলেন। ডাঙপাড়িয়ালির পুবডাঙ্গি থাকেন ভাগ্যধর বালা— এ অঞ্চলের সব থেকে ধনী ব্যক্তি। তিনি সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হন। বাবা গেলেন তাঁর কাছে। বললেন, কাকা গ্রামে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলব তোমাকে জমি দিতে হবে। বিলপাড়ে ওই উঁচু ভিটেতে বিদ্যালয় বাড়ি হবে আর পাশের ভুঁইতে খেলার মাঠ তৈরি করব। তুমি না কোরো না কাকা। আমাদের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ভাগ্যধর বালা এক কথাতেই জমি দিতে রাজি হলেন। দু'মাসের মধ্যে বিদ্যালয় বাড়ি, খেলার মাঠ গড়ে তোলা হল। প্রথম শিক্ষক হয়ে এলেন তুলবাড়িয়া গ্রামের সন্তোষ বিশ্বাস। বেঁটেখাটো ফর্সা, নাদুসনুদুস চেহারা। মাথার চুলগুলি চূড়া করে আঁচড়ানো। চোখদু'টি ঘন, মাথাটা একটু বাঁ দিকে বাঁকা। ডান কানটা তাই একটু উঁচুতে, কথা বলেন চেঁচিয়ে। পড়ান কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে।

আমাদের বাড়ির উঠোনের পুব-উত্তর কোনায় দাঁড়ালে নতুন বিদ্যালয় বাড়িটির চূড়াটি স্পষ্ট দেখা যায়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগের দিন বাবা ভোরে উঠেই আমাকে ডেকে তুলে বললেন, ওই দ্যাখ ছোটকোদা, ওই দ্যাখ বিদ্যালয় ঘরখানা গড়া হয়েছে, ওর পাশে খেলবার মাঠটাও তৈরি করা হয়েছে। এ বার বিদ্যালয়ে যেতে তোর আর জলজঙ্গল ভেঙে কষ্ট করতে হবে না। বর্ষাকালেও তুই বিদ্যালয়ে যেতে পারবি।

বিলবোকড়ের কান্দায় উঁচু পাড়ের গা-ঘেঁষেই খেলার মাঠটা আর তার দক্ষিণ দিকে বড় তেঁতুলগাছটার আড়ালে ছায়ায় বিদ্যালয় ঘরখানা পুব-পশ্চিমে লম্বা

ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যালয়বাড়িটি এত চমৎকার, এত উদার, এত উন্মুক্ত আলোভরা মনোরম জায়গায় যেন এতদিন নজরেই আসেনি। বিদ্যালয়-চত্তরটা দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

সন্তোষ বিশ্বাস কথা বলেন মিষ্টি মিষ্টি করে। আমাদের উঠোনের গা-ঘেঁষে যে পায়ে চলা পথটি ছুটে গেছে এড়োখালের নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে, সেই পথ ধরেই তিনি নতুন বিদ্যালয়ে যেতেন। আগে থাকতেই আমাকে চিনতেন। সেই চেনাজানার সুতো ধরেই প্রথম দিন তিনি পড়ানো শুরু করলেন, জ-য়ে—জীবন, ম-য়ে মাটি—।

সন্তোষ স্যার প্রায়ই বলতেন, কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারে না। নিজেকেই শিখতে হয়। সুশিক্ষিত মানুষমাত্রই স্বশিক্ষিত। বই পড়ে মানুষ তার বাইরেটাই পরিষ্কার করে। জ্ঞান, চেতনা— তা তো তার ভেতর থেকেই উঠে আসে। বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুরের মতো ফুটে ওঠে, গাছ হয়ে পাতা মেলে ডালপালা ছড়িয়ে দেয়, ফুল ফোটায়। আর এই কথাটা তিনি যে আমার বাবার কাছ থেকে জেনেছেন, শিখেছেন— সে কথাটাও জানাতে একটু দ্বিধা করতেন না এবং আমার বাবার প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতায় মাথাটাই যেন শ্রদ্ধায় নত হয়ে যেত এমন ভাবে তিনি কথা বলতেন।

এই নতুন বিদ্যালয়ে আমার প্রথম কাগজে লেখা শুরু হয়। প্রথম কাগজে লেখারও যে একটি উৎসব-পর্ব আছে, যার নাম 'কাগজ ধরা' তা আমাকে দিয়েই এই নতুন বিদ্যালয়ে শুরু হল। 'কাগজ ধরা' বা 'খাতা ধরা' উৎসব-পর্বের দ্বারা আমার পড়বার শ্রেণিরও যেমন পরিবর্তন হল আবার আমার কাগজে লেখবারও শুরু সেই দিন থেকে।

আমি খাতা ধরার দিন একটি 'ফুলস্কেপ' কাগজ নিয়ে বিদ্যালয়ে সকলের আগেই হাজির হলাম। সঙ্গে ধামায় ভরে নিতে হল চিড়ে খই মুড়ি গুড় বাতাসা দই আর নারকেল-কোরা। 'খাতা ধরা' অনুষ্ঠান-পর্বের পর সহপাঠীদের সকলকে যে মিষ্টিমুখ করাতে হবে!

অনুষ্ঠানের শুরুতে সন্তোষ স্যার আমার ফুলস্কেপ কাগজে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি সুন্দর করে লিখে দিলেন। কাচের দোয়াতে কেনা নীল বড়ির কালিতে কাঠের কলমের পিতলের নিব ডুবিয়ে গোটা কাগজখানায় সেই পঙ্‌ক্তিটি লিখে ভর্তি করে ফেললাম। কাগজে শুকনো মাটির ডেলা রাখা হল। শুকনো মাটির ডেলাটা মোড়া হল কাগজখানা দিয়ে। ভাল করে সুতলি পেঁচিয়ে কষে বাঁধা হল একটি হাতবোমার মতো। সেই মোড়কটা নিয়ে গেলাম জলভরা বিল পাড়ে— সঙ্গে

রইল আরও ক'জন ছাত্রছাত্রী। বিলের দিকে পিছন ফিরে, চোখ বন্ধ করে, সেই ডেলার মোড়কটি ছুড়ে দিলাম অথৈ জলে।

অথৈ জলে যদি ওই মোড়কটি না ডুবে যায় তা হলেই নাকি সর্বনাশ। কারণ বিদ্যা হবে না। যত গভীরে মোড়ক ডুববে, জ্ঞান ততই গভীর হবে। আমার কাগজ-ধরা ডেলার মোড়কটি নাকি গভীর জলে ডুবে গিয়ে বুড়বুড়ি তুলেছিল জলের ওপরে। আমার সহযাত্রী ছাত্রছাত্রীরা যা দেখেছিল সেদিন, তারাই ফিরে এসে সন্তোষ স্যারকে বলেছিল।

'খাতা ধরা' অনুষ্ঠানের পর চিড়ে খই মুড়ি গুড় বাতাসা দই আর নারকোল-কোরা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে বিতরণ করা হল বিদ্যালয়গৃহে। সন্তোষ স্যারও পেটভরে খেলেন। খুশি হয়ে সকলে আনন্দ করল। সন্তোষ স্যার আশীর্বাদ করলেন, তাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হল ষোলোআনা অর্থাৎ একটাকা। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, জীবনে অনেক বড় হবে, সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, দেশে দশের মাঝে নাম রেখে যাবে এই আশীর্বাদ করি। এই আশাই রাখি। আজ থেকে তুমি এই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির ছাত্র হলে।

দেশভাগ-দেশত্যাগ: রক্তপাতের শব্দ

ভারতবর্ষ ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবার পর দেশজননীর অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছলেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন প্রথমেই তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, 'দেশভাগের কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।'

কত দিনের মধ্যে স্যার? সিরিল র‍্যাডক্লিফ জিজ্ঞাসা করলেন।

মাউন্টব্যাটেন বললেন, পাঁচ সপ্তাহ।

ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী নেহরু জুড়ে দিলেন, 'স্যার আরও আগে হলে খুবই ভাল হয়। মহঃ জিন্নাহরও তাই ইচ্ছা। তিনি বললেন: 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা ভাল স্যার।'

গান্ধি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। সে দিন তাঁর মৌন দিবস। ঘরে ঢুকলেন গান্ধি মুখে আঙুল দিয়ে। দেশভাগের কোনও সোচ্চার বিরোধিতা তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল না।

বাংলা আর পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য আলাদা ভাবে দু'টি কমিশন

হল, বাউণ্ডারি কমিশন। র‍্যাডক্লিফ পদাধিকার বলে দু'টি কমিশনেরই চেয়ারম্যান থাকলেন। বাংলা কমিশনের সদস্য হলেন— বিজন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম এ রহমান এবং এম এম আকবর। পাঞ্জাবের জন্যে মেহের চাঁদ মহাজন, তেজা সিং, দীন মহম্মদ এবং মহম্মদ মুনির— এঁরা সকলেই ছিলেন আইনজ্ঞ লোক।

মাউন্টব্যাটেন আর তাঁর সঙ্গে নেহরু, জিন্নাহর তাড়া দেখে র‍্যাডক্লিফ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিস্ময় আরও বাড়ল কমিশনে কাজ করতে গিয়ে। ক'টি বৈঠকের পর সদস্যরা বুঝিয়ে দিলেন মীমাংসায় পৌঁছানো খুবই কঠিন। অতএব চেয়ারম্যান যা ঠিক করবেন তাঁরা তাই মেনে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে নেতারা অনুরোধ করলেন, পনেরোই আগস্টের মধ্যেই যেন কাজটা শেষ করে ফেলা হয়। পার্টিশন কাউন্সিল জানিয়ে দিয়েছে— কমিশনের রোয়েদাদ যাই হোক না কেন, তাই মেনে নেওয়া হবে।

পাঁচ সপ্তাহ পুরো লাগল না। বাংলার জন্য রোয়েদাদ তৈরি হয়ে গেল। হল পাঞ্জাবের জন্যও। র‍্যাডক্লিফ স্বদেশে ফিরলেন। যাবার আগে কমিশনের সদস্যদের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। 'অদ্ভুত লোক এঁরা। বাড়ি থেকে একটু পড়াশুনাও করে আসে না। আশ্চর্য, দেশের প্রতি দরদও নেই।'

ভাগ-বাঁটোয়ারা হিসেব নিকেশ যখন চলছে, সেই সময় বাংলা আর পাঞ্জাবের অবস্থা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং বিস্ফোরক। প্রতিটি অঞ্চলে, শহরে ও গ্রামে ক্রমাগত গুজব ও আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলায় লোকের মুখে মুখে তখন একটাই কথা, 'কমিশন'। কোন এলাকা কার ভাগে পড়বে। হাটুরে আর চাষিরা তো ভয় পেয়ে তখনই দেশ ছাড়তে চায়। পুলিশ পাহারা দিয়ে হিন্দুর বাড়ি ডাকাতি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ঘরপোড়ার কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে যাচ্ছে। হিন্দুপ্রধান প্রতাপকাটিতে ডাকাতি হয়ে গেল। বাহাদুরপুরে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে মাঠে ফেলে রেখে গেল। স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাব ওঠার পর প্রতিদিন কলকাতায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটছে। স্বাধীনতার দিন যত এগিয়ে আসছে বাংলা আর পাঞ্জাবের অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে।

প্রথম থেকেই লিগ গায়ের জোরেই পাকিস্তান দখল নেবে বলে হুমকি দিচ্ছিল। লিগ যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারল না, তখন তারা পাঞ্জাবে দাঙ্গা শুরু করে দেয়। অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর আর মুলতানে। লিগের লক্ষ্য ছিল, অ-মুসলিম সম্প্রদায়কে পাঞ্জাব থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। মুসলমানদের বাড়িতে সাদা পতাকা লাগিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল।

তার পর বেছে বেছে শিখ হিন্দুর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। নারীহরণ, নারী-ধর্ষণের হাজার হাজার ঘটনা ঘটে চলল। লিগ বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের পর শিখ আর হিন্দুরাও নিষ্ক্রিয় থাকেনি। প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় শিখ আর হিন্দু পালটা আক্রমণ করলে পাঞ্জাবের অবস্থা নরক হয়ে যায়। ফলে দু'দিক থেকে আরম্ভ হল ভীত বিপন্ন নরনারীর দেশত্যাগের মিছিল। এক-এক মিছিলে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ নরনারী-শিশু-বৃদ্ধ শত শত মাইল ধরে পোঁটলাপুঁটলি, বাক্স সঙ্গে নিয়ে রাত-দিন পথ চলতে লাগল। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। পথে কত বিপদ ঘটল, কত শত নরনারী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কত নারী ধর্ষিতা হল, অপহরণ হল, কত সম্পত্তি লুঠ হল— কোনও ইতিহাস সে খোঁজ রাখতে পারেনি।

ভারতবর্ষের অবস্থা যে ক্রমশ ভীষণ খারাপের দিকে যাচ্ছে মাউন্টব্যাটেন তা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্বাধীনতার দিন এক বছর আগেই নিয়ে আসলেন।

কাগজ-কলমে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল দু'টি রাষ্ট্রে— ইতিহাস দেশজননীর অঙ্গ খণ্ডিত করে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল, সময়ের প্রলেপে তার যন্ত্রণা ও বেদনার উপশম না হয়ে বরং বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত হয়ে প্রতিদিন আরও বিস্তৃত ও দুঃসহ হয়ে ওঠে। খণ্ডিত স্বদেশ বিষাক্ত ক্ষত নিয়ে, বুক ভরা কান্না নিয়েই দাঙ্গার রক্তে পায়ের পাতা ডুবিয়ে মানুষ স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দিলেন। চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতার সনদ পেল আর ১৪ আগস্ট মধ্য রাতে ভারত স্বাধীনতার সনদ পেল। দিল্লির পরিষদ ভবনে স্বাধীনতার উদ্বোধন করলেন জওহরলাল নেহরু।

দিল্লিতে যখন স্বাধীনতার উৎসব চলছে, পূর্ববঙ্গে যশোহরের খুব কাছে প্রতাপকাটি গ্রামে তখন হিন্দুদের ঘরে মুসলমানরা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, সব কিছু লুঠ করছে, হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করছে— পুলিশের চোখের সামনে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি, বরং যারা আগুন নেভাতে গেছে পুলিশ তাদের দিকে গুলি করেছে।

প্রতিদিন হিন্দুর ওপর আক্রমণের খবর আসছে— ঘরবাড়ি জ্বালানো, সম্পত্তি লুণ্ঠন আর নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ, দাঙ্গায় মানুষের মৃত্যু...।

পাঞ্জাবে তখন ঘটে যাচ্ছিল এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড, স্বাধীনতার শঙ্খ যখন বাজছে পাঞ্জাব পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে।

স্বাধীনতার দিন সেখানে বোমা ফাটছে, মেশিনগান চলছে, ফুলঝুরির মতো

গুলি ঝরছে স্টেনগান থেকে। আকাশ ঝলসে উঠছে, দীপাবলির রাতেও এত আলো হয় না আকাশে। হিন্দু আর শিখরা মুসলমানদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে আর মুসলমানরা ঘরের ভেতর থেকে মেশিনগান চালাচ্ছে, বোমা ছুড়ছে। অমৃতসর জ্বলছে। লাহোর জ্বলছে, পুড়ছে।

দেশভাগে কেবল ভূগোলটাই বদলায় না, দেশের মানচিত্রটাই ভাগ হয় না— ভাগ হয় মানুষের মন, ভেঙে টুকরো হয়ে যায় একটা জাতির হৃদয়। রাজনীতিতে যা দেশভাগ, 'পার্টিশন'— দেশের মানুষের কাছে তাই হল চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া, শিকড় ছিন্ন হওয়া, চেনা আপন প্রতিবেশীও পর হয়ে যাওয়া, স্বজনবন্ধুর চোখে নিজেই সন্ধিহান হয়ে পড়া, অবিশ্বাসী হওয়া। একটা দেশ, একটা জাতির ইতিহাস সভ্যতা সংস্কৃতিতে এর থেকে কঠিনতম অভিজ্ঞতা, এর থেকে বড় বেদনা-বিচ্ছেদ আর কিছুই হতে পারে না। এ যে কী বেদনা, কী যন্ত্রণা, কী অসহায়তা— ভুক্তভোগী ছাড়া তার মর্মজ্বালা কেউ বোঝে না। কেউ বুঝতে পারে না। এমনই এক মহাসংকটময় ঘটনার আমি প্রতক্ষদর্শী আর অবিচ্ছেদ্য এক শরিক।

দেশের এমনই একটি ভয়ংকর বিপদসংকুল সময়ে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যাওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমার জন্ম। তখন ভাগ হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের দু'টি দেশে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে নিজস্ব সংবিধান চালু হয়নি। সীমান্তপার হতে পাশপোর্ট ভিসাও চালু হয়নি। দেশভাগের জন্মভূমিভাগের মধ্যবর্তী সময়ে এক মহাসন্ধিক্ষণে, ইতিহাসের, ভারত ইতিহাসের মহাক্রান্তিকালে আমার জন্ম।

আমার জন্মের ছয়দিন আগে বাবা মণিরামপুর হাটে গিয়েছিলেন হাট করতে। মণিরামপুর থানার সামনে হাট বসত। যে মণিরামপুর থানায় আমার ঠাকুরদা দফাদার ছিলেন, সেই হাটখোলায় বাবার চোখের সামনে মধুপুর গ্রামের শশি পোদ্দারকে মুসলমানরা দালানের দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে খুন করল। তার অপরাধ, সোনার গহনায় সে খাদ একটু বেশি দিয়েছিল।

অনেক অশ্রু, অনেক রক্তপাতের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল মানুষের কাছে। দেশভাগ হয়েছে, স্বাধীনতা এসেছে, অথচ দাঙ্গা, রক্তপাত, ধর্ষণ, নিধনের বিরাম নেই। বাতাসে প্রতিদিনই খবর ভেসে আসছে— আজ আলিপুর গ্রামে দীননাথ মণ্ডলের যুবতী মেয়েকে জোর করে এক মুসলমান যুবক বিয়ে করেছে। পাঁচকাটিয়া গ্রামের তিনটি যুবতীকে মুসলমানরা গণধর্ষণ করেছে।

আমার জন্মের পর তিনটি বছরে রক্তপাতহীন দিন বাংলায় খুব বেশি পাওয়া

যায়নি। আর রক্তপাত ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়— নিষ্ঠুর ভ্রাতৃহত্যার, স্বজন আপনজন হত্যার নির্মম রক্তপাত। দেশভাগের পর থেকেই দেশের মানুষদের মনে স্থায়ী ভাবে গেড়ে বসেছে হিন্দু আর মুসলমান দুই-ই আলাদা। দেশভাগই মানুষদের মনে ফাটল ধরিয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ মানুষের মনকে বিষাক্ত করেছে— বিভেদের জন্ম দিয়েছে। নোয়াখালির দাঙ্গা, কলকাতার দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যের বিশ্বাসটাকেই টেনে উপড়ে ফেলেছে। হিন্দু-মুসলমানের সাতশত বছরের আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা— দেশভাগেই ছিন্ন হয়ে গেল। আপনস্বজন প্রতিবেশী হয়ে গেল শত্রু। দেশভাগের পর থেকেই প্রতিবেশী মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন পাকিস্তান রাষ্ট্রে।

আমার ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালা, স্থানীয় দশ-বিশখানা গ্রামের মোড়ল মাতব্বর ছিলেন। তিনি আবার মণিরামপুর থানার দফাদারও ছিলেন। গ্রামগাঁয়ে মানুষ অপরাধ করলে ঠাকুরদা বিচার করতেন। বহু ন্যায্য বিচার তিনি করেছিলেন— সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ন্যায়পর বিচারকের ভূমিকা নিয়ে। অন্যায়কারীকে তিনি শাস্তিও দিয়েছিলেন তাঁর সময়ে। সেই দুষ্টু মানুষগুলি যারা ধর্মে মুসলমান, দেশভাগের পরপরই তারা এবং তাদের পরিবারের লোকজনের মানসিকতা বদলে যায়। আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। দেশভাগের পর বাবা কেন পাকিস্তানে থাকছেন, কেন হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছেন না। তার জন্য বাবার ওপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন— যাতে বাবা দ্রুত হিন্দুস্থানে চলে যান।

বড়দা বিজয়কৃষ্ণ বালা জাতীয় কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কেবল তাই নয়, বড়দাদা স্বাধীনতা সংগ্রামের জঙ্গিকর্মীও ছিলেন। আমাদের পাড়িয়ালি গ্রামে এবং পাশের গ্রাম দহকুলায় কংগ্রেস দলের প্রায়ই সভা হত। সেই সব সভায় অমূল্য কর, বিষ্ণু রায়, শরৎচন্দ্র-সহ বহুকংগ্রেসি নেতা উপস্থিত থাকতেন। সভাতে অনেক সময় ব্রিটিশের পুলিশ হানা দিত। আমার বড়দা প্রায়শই জেলে যেতেন। তাঁর একটি স্যুটকেসও সর্বদা গোছানো থাকত জেলে যাওয়ার প্রয়োজনে। এক সময় বড়দা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবী দলের সভাপতিও হয়েছিলেন। বিয়াল্লিশ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ডাঃ জীবনরতন ধর-সহ গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং একটানা ছয় মাসের অধিক সময় যশোহর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি ছিলেন। এত সব কারণে মুসলিম লিগের সদস্যরা বড়দাদার ওপর ক্ষেপে ছিলেন।

দেশভাগের পর মুসলিম লিগের জঙ্গিকর্মীরা বড়দার ওপর উত্তরোত্তর ক্ষেপে উঠতে থাকল এবং দেশভাগের পরও বড়দা কেন পাকিস্তানে থাকছেন, নিশ্চয়ই

কোনও গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্যই পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছেন— এই অভিযোগ খাড়া করে। লিগের কর্মীরা তাই বড়দাকে শত্রু বলেই জানতেন। পথেঘাটে বাজারে বড়দার সঙ্গে লিগের কর্মীরা কুৎসিত মন্তব্য করত। লিগের কর্মীরা আলিগড়ি পায়জামা শেরোমণি ও তুর্কি টুপি পরে— যার ওপর চাঁদতারা আঁকা থাকত, বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুলমানদের কাছে মুসলিম লিগ আর কংগ্রেসের মধ্যে তফাতটা কোথায় তা বোঝাত। তারা বলত, কংগ্রেস যে মুসলমানদের শত্রু তা তারা হাতে-কলমে প্রমাণ করত। এর ফলে স্থানীয় অনেক মুসলমানও বড়দার পাকিস্তানে থাকা মেনে নিতে পারত না। দেশভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুদের মনের মধ্যে ভয়ের ব্যাধি কেবল সংক্রামিতই হচ্ছিল না, স্থায়ী ভাবে গেড়ে বসেছিল দিনের পর দিন। দেশভাগের পরও মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে হিন্দুরা কেন থাকছে তা নিয়ে মুসলমানরা নানা টিটকিরি, কুৎসা, অভিযোগ যখন হিন্দুরা শুনতেন তখন তাদের প্রাণে জীবনের আলো একেবারেই কমে আসত। পাকিস্তানে হিন্দুরা এই নতুন বিরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারতেন না। পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাস করা দুর্বিসহ যন্ত্রণাময় হয়ে উঠেছিল।

আমার ঠাকুরদার আমল থেকে এবং বড়দাদা যেহেতু কংগ্রেসকর্মী তার জন্য গ্রামের ভয়ার্ত মানুষজন তার আত্মীয়স্বজন দেশে ঘটা নানা বিরূপ ঘটনার খবর নিয়ে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। কবে, কোথায় কতজন হিন্দু খুন হয়েছেন, কোন গ্রামে কার যুবতী কন্যাকে মুসলমানরা তুলে নিয়ে গিয়েছে, কতজন হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছেন, মানুষজন সংবাদ নিয়ে আমাদের বাড়ি আসতেন। তার পর তারা পরামর্শ করতে বসতেন— এখন হিন্দুদের কী করা উচিত, কোন গ্রামে কতজন হিন্দু এর মধ্যে হিন্দুস্থানে চলে গেছেন— সে তথ্যও ভয়ার্ত হিন্দুরা বাবা এবং বড়দার কাছে দাখিল করতেন। হিন্দুরা প্রতিদিন অসহায়তায় ভুগতেন এবং প্রাণে বল পেতেন না। কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে— সেটাও জানতে চাইতেন তারা।

আমাদের গ্রামের আর আশপাশের গ্রামের ভয়ার্ত হিন্দুরা ছুটে এসে বলতেন, বাল্যমশাই, দেশে আর কিছুতেই থাকা যাবে না। এখানে থাকলে জান-মান কিছুই থাকবে না। সবাই বলতেন পাকিস্তানে থাকা যাবে না।

কিন্তু কোথায় কত দূরে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারতেন না। কেবল ত্রাস আর হতাশায় প্রত্যেক মানুষের মুখের চেহারাই পালটে যেত। অথৈ ভাবনায় কেবলই হাবুডুবু খেতেন। চোখের

জল ফেলতেন।

এই রকম সময়ে একদিন বাবা এবং আমি মণিরামপুরহাটে যাচ্ছিলাম। বাংলার মানুষের মনেপ্রাণে তখন সন্দেহ, অবিশ্বাস আর উদ্বেগ-আশংকা ঢুকে গেছে। হাটে-বাজারে হিন্দুরা সকাল সকাল গিয়ে, দিন থাকতেই ফিরে আসেন। আমরাও মণিরামপুর হাটে দুপুরে রওনা দিয়েছিলাম।

মণিরামপুর বহু পুরনো পথ। কাঁচা রাস্তা মাইল তিনেক হবে। প্রায় একশত বছর আগে এই পথেই আমার ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালা দফাদারের কাজে হেঁটেই মণিরামপুর যাতায়াত করতেন। মাথায় বাঁধা থাকত লাল পাগড়ি, হাতে বর্শা, কোমরে পিতলের চাকতিঅলা বেল্ট বাঁধা থাকত। তাঁকে দেখে পথের গাঁয়ের মানুষ ভয়ে কাঁপত। সেই পথে বাবাও চলেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর। যাতায়াতের পথের দু'ধারের গাঁ-গ্রামের মানুষজন হিন্দু-মুসলমান বেশির ভাগ লোকই বাবাকে চেনেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু দেশভাগের পর সেই মানুষগুলিই যেন প্রতিদিনই হারিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের গ্রাম ছাড়িয়ে দহকুলার ভেতর দিয়ে বাগডাঙায় উঠলাম এবং দেছেড় মোড়লের বাড়ি পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে যুববান মোল্লার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন যুববান মোল্লার ঘর থেকেই ভেসে এল, কেডা যায়? কেডা? কার এত সাহস এ-পথে যায়? শব্দ শুনে বাবা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আমি দাঁড়াই বাবার গা-ঘেষে। দাঁড়াতেই শুনতে পেলাম, আরে হাটে যাতিছে সিদ্ধিরামের বেটা, দফাদারের ছেলে— কে যেন বলল গলা বাড়িয়ে।

ওডা এাহোনো এ দ্যাশের হাটে হাট কত্তি যাতিছে? সাহস তো কম না। কে যেন ফোড়ন কাটল। তাড়া না খালি ওরা কি নড়বি এ দ্যাশ থেকে! দু-একটা জবাই দিলি ছুটতি পথ পাবে না, কে যেন হুম্‌কির সুরে কঠিন হয়ে বলল।

দুর থেকেও মনে হল যুববান মোল্লার ঘরে অপরিচিত গুণ্ডারাও আছে— যারা কোনও দুষ্ঠু কাজের কুপরামর্শে রত। ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজও পাওয়া গেল। এমনকী আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে যে হুমকি দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল।

দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদ হতে পারে এমন একটা আভাস পেতেই এবং আশঙ্কা করেই বাবা দ্রুত হাটমুখো পা বাড়িয়ে হাঁটতে থাকেন। দু'রশি পথ যেতেই বাবার পরিচিত আর বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ তোফাজেল আলিকে রাস্তায় পেয়ে গেলাম আমরা। বাবাকে দ্রুত হাঁটতে দেখে তোফাজেলচাচাই দাঁড়িয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে হাটে যাবেন বলে। কাছে যেতেই তিনি বললেন

আসো, বালা ভাই, চলো একসঙ্গে যাই। কথা বলতে বলতে গেলে পথচলার ক্লেশ টের পাওয়া যায় না। চলো, আলিভাই একসঙ্গেই যাই। বাবা আমাকে সামনে হাঁটতে বলে নিজেও হাঁটতে শুরু করেন। গলায় আন্তরিকতা ঢেলে দিয়ে বললেন তা ভাই, সব এলাকায় এত উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে কেন? স্বাধীনতার পর এত বছর পরেও দেশের মানুষের চৈতন্য হল না। এমনটা কেন হয় ভাই? বাবা শুধোলেন আলিচাচাকে।

তোফাজেলচাচা বললেন, দেখুন ভাই, সবাই দাঙ্গা চায় না। কিছু মানুষ নিজের স্বার্থ আর সুবিধার জন্য দাঙ্গার পরিবেশ ইচ্ছা করে গড়ে তুলে দাঙ্গা করতে চায় আর উত্তেজনাও ধরে রাখতে চায়।

কিন্তু যারা শান্তি চায় তাদের দায়িত্ব হল এগিয়ে এসে সেই সব স্বার্থকামীদের মুখোশ খুলে দেওয়া । না-হলে তো এটা এমন একটা ছোঁয়াচে রোগ যে, ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে গিয়ে সারা দেশকে ফোপরা করে ছাড়বে। বাবা হাঁটতে হাঁটতে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন।

তা ভাই যা বললে খুবই সত্যি কথা। কিন্তু যখন পরিস্থিতি তেমন জায়গায় পৌঁছয়, তখন আর ভালমন্দের কোনও ভেদই থাকে না। সবাই এক রঙে ছুপে যায়, তাই আগে থাকতেই পরিস্থিতির বাইরে থাকবার চেষ্টা করতে হয়। যদিও তা সব সময় সম্ভব হয় না। তোফাজেলচাচাও হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকেন আর মনের গভীরে যেন ডুবে যেতে থাকেন।

দেখো না ভাই, দাঙ্গা হচ্ছে ভারতের কোন আসানসোলে রাজস্থানে— সেটা তো খারাপই, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া এখানে কেন? সে দাঙ্গায় যে কেউই দোষী হোক না কেন এখানকার হিন্দু-মুসলমানদের তো কোনও দোষ নেই। তা হলে ভাই, তারা বিপথে নামছে কেন? বাবা ধীরে ধীরে বললেন।

হিন্দুরা তো আনন্দেই আছে, যখন চায় হিন্দুস্থানে চলে যায়। হিন্দুদের পালানোর জায়গা আছে। আমরা ভয়ে কোথায় পালাব? আমরা তো এখানেই থাকব, এখানেই মরব— তোফাজেলচাচা বেশ জোর দিয়েই বলেন।

হিন্দুদেরও এখানেই মরতে হবে। হিন্দুস্থান হয়েছে বলে পালাচ্ছে। না-হলে কোথায় যেত? দেশভাগ আমাদের সর্বনাশের মূল। সাতশো বছর আমরা একসঙ্গে বাস করিনি? বাবা বলেন আর তোফাজেলচাচার মুখের দিকে তাকান আর হাঁটতে থাকেন।

ভাই, মানুষের মনে বিভেদ সৃষ্টি করতেই, বিদ্বেষ জন্ম দিতেই, দেশটাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। দেশভাগই মানুষের মনটাকে ভাগ করে

দিয়েছে। আমরা তো কেউ চাইনি দেশভাগ হোক। স্বার্থবাদী ক'জন মানুষের জন্য গোটা দেশের লোক মরছে। তোফাজেলচাচা থামতেই চান না। অথচ হাটের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। লোকজন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে বলে, একটু একটু চাপা সুরে কথা বলছেন, সবার সামনে তো সব কথা বলা যায় না।

তার জন্য আমি এবং তোমার মতো মানুষদের বলি হতে হবে। সেটা হবে জন্মভূমি, মাতৃভূমির পরম আহ্বান— যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, অবহেলা করতে পারি না। চলি ভাই, আবার দেখা হবে। ভাল থেকো।

আমিও আসি ভাই, আবার দেখা হবে। ভাল থেকো। কথা বলতে বলতে তোফাজেলচাচা হাটের মানুষের সঙ্গে মিশে গেলেন।

আমরাও হাটের মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাড়াতাড়ি হাট করে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। ফেরার পথে বাবা মাঠের ভেতর আলপথ ধরে যুববান মোল্লার বাড়ি বাঁ হাতে রেখে ফের রাস্তায় এসে উঠলেন। বাড়ি ঢুকতেই দেখলাম, উঠোনে মাদুর পেতে বড়দা তার সতীর্থদের নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি গিয়ে বসলাম সেই মানুষদের একপাশে। হাটের বোঝা নামিয়ে রেখে জলচৌকি টেনে নিয়ে বাবাও বসলেন তার কাছাকাছি। যাঁরা মাদুরে বসে আছেন তাঁরা সবাই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক, বাবার পরিচিত।

বাবা গামছা দিয়ে মুখ মুছে, ভাঁজ-করা গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে যেন ভেবে চলেছেন। হাটের পথে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে তাঁর চিন্তাগুলি বুঝি কেঁপে কেঁপে ভাসতে লাগল। তারই আবেশে কতক্ষণ যে বাবা বসে রইলেন আনমনে গেলাসের ঠাণ্ডা জলের দিকে তাকিয়ে তার ঠিক নেই। ভারী ইচ্ছা হতে লাগল, কোনও সহজ সরল জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে বসে যদি দুটো কথা বলতে পারতেন, মনপ্রাণের জ্বালা জুড়াত তাঁর।

বাবার প্রবল ইচ্ছার টানেই বুঝি বড়দা চিন্তাকুল ভাবে বলেন, হাটে কোনও ঘটনা কি ঘটেছে বাবা? ভারতে যে দাঙ্গা হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়ায় খানপুরে দু'টি হিন্দুবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে মুসলমানরা। দেশের মানুষের জন্য বড় কষ্ট হয়। মানুষ কী করে মানুষের বুকে ছোরা মারছে, খুন করছে ভাইকে। বড়দাদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, ব্যথায় বুক ভরে যায় তাঁর।

চিন্তিত ভাবে বললেন বাবা, তাঁর মন্থর চাপা কণ্ঠ যেন অতীত থেকে ভেসে আসে: হাটের পথে যা ঘটল তাতে এই পরিমণ্ডলে থাকা বুঝি আর কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমার বাবা সিদ্ধিরাম বালা, মণিরামপুর থানার দফাদার ছিলেন।

স্থানীয় দশখানা গ্রামের জনপ্রিয় মোড়ল-মাতব্বরও ছিলেন। গাঁ-গ্রামে কেউ অপরাধ করলে বিচারের জন্য বাবাকেই ডেকে নিয়ে যেতেন গ্রামের মানুষ। নিরপেক্ষ বিচার করে অন্যায়ের জন্য তিনি শাস্তি দিতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।

আর আজ দেশভাগ হয়েছে। স্বাধীনতাও লাভ করেছে মানুষ। এ রাষ্ট্রটা পাকিস্তান তাই মুসলমানরা মনে করছেন এটা তাদেরই দেশে। হিন্দুর কোনও অধিকার নেই। অতীত দিনে কোনও মুসলমানকে ধান চুরি করার জন্য বাবা শাস্তি দিয়েছিলেন। এতদিন পরে সেই মুসলমান পরিবার তার বদলা নিতে চাইছে। চেনা মুখগুলি ভেসে ওঠে বাবার চোখের সামনে।

বড়দাদারাও তাঁদের আলোচনা আর চালাতে পারলেন না। যে যার মতো উঠে নিঃশব্দে বাড়ি চলে গেলেন। বাকি সময়টা বাবা আর কোনও কথাই বললেন না। খানিক আগেই যা ঘটে গেছে, স্মৃতি কুয়াশার জালের মতো হয়তো তাঁর চেতনায় ছেয়ে রইল। মনের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই শব্দকটি। 'ওডা এ্যাহোনো এ দ্যাশের হাটে হাট কত্তি যাতিছে? সাহস তো কম না।' বাবা গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়ে কী যেন একটা খোঁজেন। ঢকঢক করে এক ঘটি জল পান করেন। তবু যেন তৃষ্ণা মেটে না, বুকের আগুনও বুঝি নেভে না।

বাবা শুতে গিয়েও একবার উঠে বসলেন। ফের শুয়ে পড়লেন আমার পাশে তিনি। এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকেন, চোখের ঘুম তাঁর যেন কেড়ে নিয়েছে কারা।

রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই পাশে হাত দিয়ে দেখি বাবা পাশে শুয়ে নেই। নিঃশ্বাস চেপে নিঃশব্দে শুনতে পেলাম, বাবা উঠোনে খড়ম পায়ে হাঁটছেন। তাঁর খড়মের সেই শব্দ নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফালাফালা করছে। আর উঠোনের পাশে ঝিঁঝি পোকার অন্তহীন কান্নার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে...।

বটবৃক্ষও উপড়ে ছিটকে পড়ল

দেশভাগের পর গোটা ভারত উপমহাদেশের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ এই দুই রাজনৈতিক শিবিরে মানুষ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দেশের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের বিভেদের অপচ্ছায়া মানুষদের

মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেশভাগের আগে ও পরে পাঞ্জাব ও বাংলার বহু এলাকায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে— সে কথা এখানে খুব আলোচনা হতে লাগল।

আমার বাবার কাছে বাতাসে ভেসে, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অগ্নি-সংযোগের খবর আসতেই লাগল। প্রতিটি মুহূর্তে অগ্নি-সংযোগের, নারীহরণের, নারী ধর্ষণের আর মানুষ খুনের ঘটনা ঘটছে। শত শত মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ আহত হচ্ছে এবং বাস্তুহারা হচ্ছে। দলে দলে লোক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছুটে পালাচ্ছে। বাবা তো সারারাত জেগে উঠোনে পায়চারি করতে লাগলেন। ছিয়ানব্বই অঞ্চলে তাঁর যে সব সঙ্গীসাথীরা ছিলেন, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগলেন। মানপ্রাণ রক্ষা করবার জন্য নানা আলোচনা আর পরামর্শ করতে থাকলেন।

এ-অবস্থায় কংগ্রেসকর্মীরাও বসেছিলেন না, তাঁরা ঘুরে ঘুরে মানুষদের মিলেমিশে থাকার কথা প্রচার করতে লাগলেন। বড়দা সেই কাজে যোগ দেবেন বলে সকালবেলা উঠোনে নেমে এলেন।

বাবা বড়দাদাকে দেখেতে পেয়ে কাছে ডাকলেন: বিজয়, শুনলাম তুমি যশোরে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ বাবা, অনেক কাজ আছে ওখানে। যাওয়া বিশেষ দরকার। দাদা বাবাকে খুব অনুনয় করে বললেন।

চারিদিকে এত মারদাঙ্গা হচ্ছে আর তুমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাচ্ছ, খুব সাবধান। দিনকাল ভাল নয়, যদি না-যেয়ে পারো তবে যেও না। ঘরে থাকো। বাবা বললেন, খুব চিন্তিত হয়ে।

মারদাঙ্গা এ দিকে হচ্ছে না বাবা। বিহার, ঢাকা, নোয়াখালি, রাজশাহী, রাজস্থান, গুজরাটে হচ্ছে। এখানকার মানুষ খামোখা ভয় পাচ্ছে— বড়দা বললেন।

কে, কাকে বিশ্বাস করবে, দেশভাগে মানুষে মানুষে বিশ্বাসটাই যে ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। শুনেছি, এখানেও দাঙ্গাহাঙ্গামার তোড়জোড় চলছে। তুমি না-বেরুলেই ভাল করতে। বাবা কথা বলতে বলতে ভাবনার ভেতর ডুবে গেলেন।

বাবা, আমি যাব আর আসব...। তুমি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছ এ রকম তো বহুদিন ধরেই আসছে। আমি যাব আর আসব, — বড়দা বেরিয়ে গেলেন।

তার পর রাত দ্বিতীয় প্রহর গড়িয়ে গেছে। বাবা বাইরে পায়াচরি করে এসে

কেবল শুয়েছেন, এমন সময়ে নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে বড়দাদার গলা শোনা গেল: ও ঠাম্মা, ও ঠাম্মা, ও ঠাম্মা...।

ঠাকুরমার মোটা থলথলে শরীর, আবার কোমর ভাঙা— নড়তে চড়তেও সময় নেন। তবু ব্যস্তসমস্ত ধড়ফড় করে উঠে কুপি জ্বেলে উঁচু করে তুলে ধরে বড়দাদাকে নিরীক্ষণ করেন, বড়দাদার চুল উশকো-খুশকো, চোখ কোঠরগত। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। ঠাকুরমা অস্থির হয় বলেন, হ্যাঁ রে বড়কোদা, কী হল তোর? তুই ফিরি আলি এতোডা রাত্তিরে? অ্যাঁ, কী হল রে! বল তো দাদা!

ঠাকুরমার চেঁচামেচিতে আমরাও উঠে বসি। বাবা ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে বলেন, ওরে বড়কোদা, তোরে এত শুকনো দেখাচ্ছে ক্যান? চোখমুখির কী অবস্থা হয়েছে, ওরে বড়কোদা, খুলি বল তো, খুলি বল। ক বাবা, শিগ্‌গির ক তো বাবা। এতোডা রাত্তিরি ক্যান ফিরি আলি? বাবা অস্থির হতে থাকেন আরও বেশি করে।

বড়দা উঠে আসেন বারান্দায়। বিধ্বস্ত চেহারা। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে টেনে নিয়ে, দম ধরে বলেন, যশোরে যাবার পথে প্রতাপকাটি গিয়েছিলাম। গিয়ে তো মাথায় বাজ পড়ল। শোভামাসিরা সব হিন্দুস্থানে চলে গেছে। গোটা প্রতাপকাটি গ্রামের হিন্দুরা বিনিময় করে চলে গেছেন। গোটা গ্রামটাই এখন মুসলমান গ্রাম। দু-এক ঘর হিন্দু যাঁরা আছেন, তাঁরা মরা গরিব। তাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভাবলাম, মাসিরবাড়ি রাতটুকু কাটিয়ে সকালে যশোরে যাব। কিন্তু তা আর হল না। দেশভাগে সব সর্বনাশ হয়ে গেল। বলতে বলতে বড়দার বুক দুমড়ে-মুচড়ে যেতে থাকল।

গভীর হতাশা চাপতে চাপতে বাবা বললেন, 'এমন যে হবে বড়কোদা তা আমি টের পেয়েছি সেদিন খানপুর গিয়ে। কেবলই মুসলমানদের মর্জির ওপর নির্ভর করি বাঁচি থাকা আর কদ্দিন চলতি পারে। দাঙ্গা এখানে এখনও হয়নি, কিন্তু হতি কতক্ষণ। হিন্দুস্থান থেকে যে ভাবে মুসলমানরা চলে আসছে তাতে যহন-তহন একটা কিছু ঘটি যাতি পারে। তখন বুক চাপড়িয়ে মরে গেলেও কেউ দেখতি আসবে না। আর এ তল্লাটে আমাগে অবস্থা আরও সঙ্গিন। এ তল্লাটে যদি কেউ আক্রান্ত হয়, তা হলি আমরাই প্রথম আক্রান্ত হব। আমার বাবা সিদ্ধিরাম বালা রজত বিশ্বাসকে বাঁচাতে চাকরি খুইয়েছেন। তা ছাড়া তুই কংগ্রেস করে জেল খেটেছিস। মুসলিম লিগের কোপটা প্রথম আমাদের ঘাড়েই পড়বে। এ দেশে কিছুতেই থাকা যাবে না রে বড়কোদা। এ দেশে থাকা যাবে

না। গভীর বিষাদে মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে হাতদুটো শিথিল ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিয়ে বাবা বলেন, বুকটা খুলে দেখাবার মতো কথা যদি থাকত... হায়...।

বাবা বারান্দায় উঠে আসেন। প্রচণ্ড একটা শক্তি বুকের ভেতরকার আক্রোশের ব্যথার কষ্টের কথাগুলোকে যেন ঠেলে বের করে দিচ্ছে। মেলা দিনের কথা, তা হলেও তালের গোঁজের মতো আমূল বিঁধে আছে হৃৎপিণ্ডে। মণিরামপুর হাটে দেশভাগের পর একজন হিন্দুকে— দালানের কঠিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে খুন করছিল মুসলমানরা। ওই মণিরামপুর থানায় আমার বাবা সিদ্ধিরাম বালা দফাদার ছিলেন। সেই সাহস নিয়েই গিয়েছিলাম, সামনে মুসলমানরা আমাকে পাত্তাই দিল না, কাছে ঘেষতেই দিল না, উলটে তারা আমাকে ধমকের সুরেই বলল, কত্তা, এ্যাহন দ্যাশটা পাকিস্তান হয়ে গেছে। আমরা আর সেই আগের মতো ছোট নই। আগের কথা সব ছাড়ান দ্যাও কত্তা। এ্যাহেন দ্যাশটা আমাগে, রাজত্ব আমাগে, যাও এ্যাহনে মাতব্বরি কত্তি আসতি হবে না। যাও, নালি...। কথার কী জোর, মুখ উঁচু করে চোখে চোখে তাকিয়ে ওরা এখন কথা কয়। বাবার মাথা বুঝি ঘুরে ওঠে, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর বুক চিরে।

এ দেশে এখন থাকা মানেই বুকের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। দেশের স্বাধীনতার জন্য জেল খাটলাম। দেশ স্বাধীন হল আমরা তার শরিক হলাম না। স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আমার ঠাকুরদা, সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। কই সে কথা তো কেউ আজ আর বলে না। আমার ঠাকুরদা দেশের জন্য যা করেছিলেন, আমি আমার জীবনে যা করলাম, তার কোনও মুল্যই রইল না। পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আমি তো ওদের গলায় গলা মিলিয়ে বলতে পারব না। কে বুঝবে এই দগ্ধ মরমের ব্যথা। এখন তো দেশের ওরাই সব। এখন আমরাই জন্মভূমিতে পরবাসী। প্রতিটি কথা বড়দা উচ্চারণ করেন আর তাঁর হৃদপিণ্ড যেন কুঁকড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

একদা কোনও এক মুসলমান, জমি থেকে পাকা ধান কেটে নিয়ে গিয়েছিল, আমার বাবা এলাকার মোড়ল, বিচার করে পিটিয়েছিলেন। এখন সেই মুসলমানরা পুরনো শাস্তির জের টেনে তার শোধ নেবেই। বাবা বেঁচে নেই, কিন্তু আমি তো আছি, আমাকে ওরা ছাড়বে না। বড়কোদা দেশে হিন্দুদের হৃদয় ভেঙে গেছে, বিশ্বাস ভেঙে গেছে। কত-না স্বপ্ন নিয়ে জীবন শুরু হয়েছিল— এই তার পরিণাম? এমন যে হবে, কেউ কী তা ভেবেছিল! না ভাবতি পারে। কথা বলতে বলতে বাবার মুখের চেহারা পালটে যেতে থাকে। ভাবনাচিন্তাহীন ভাবে

কী-একটা যেন খোঁজেন। ঢকঢক করে জল খান, না-মেটে তৃষ্ণা, না-নেভে বুকের আগুন। কে যেন তাঁর মুখের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ করে শুষে নিয়ে গেছে। এখন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। আর সেই শূন্যতার মধ্যে হাহাকারের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে প্রশ্নটা, এরপর কী হবে? এরপর আমাদের কী হবে? পাকিস্তানে হিন্দুদের কী হবে?

গাঁ উজাড় করে হিন্দুরা সব হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছে। প্রতাপকাটির মতো লেবুগাতি কাটাখালি, পাঁচকাটিয়া, কোড়ামারা, হাজরাইল, দেগঙ্গা, হরিদাসকাটি কুচলিয়া, নাউলি, মহাদেবপুর, গাবুখালি, কামিনীডাঙা, বাহাদুরপুর, ভুলবাড়িয়া, দোহাকুলা, পোড়াডাঙা, আলিপুর, লখাইডাহা, সুজাতপুর, হাটগাছা, পাঁচবেড়িয়া, ভবানীপুর, কুশখালি, পাঁচকড়ি, চাঁপাকোনা, কোদলা, বলাডাঙা, রূপদিয়া, খালাপোতা, খরিচাডাঙা, পুড়টালি, আড়পোতা, চোমরডাঙা প্রভৃতি ছিয়ানব্বই গ্রামের মানুষের মন উড়ু উড়ু— একটা সুযোগ পেলেই তারা এ দেশ ছাড়বেই। বাতাসে শীতের গন্ধ পেয়ে পর্ণমোচী গাছ যেমন পাতাশূন্য হয়ে যায়, হিন্দুদের গাঁ-গুলি ঠিক তেমনি ভাবে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। বাবার প্রাণ যেন হায়হায় করে ওঠে চোখে জল ভরে যায়।

ক'দিন আগে বাবা গিয়েছিলেন মালিডাঙায় জরুরি কাজে। গ্রামে একঘর হিন্দুকেও খুঁজে পেলেন না। সজ্জন ক'জন মুসলমান এগিয়ে এসে বলেন, ভাই কী যে কব, হিন্দুদের যে কী হল, পথ রোধ করেও তাদের রাখা গেল না এ দেশে। সবাই একসঙ্গে দলবেঁধে হিন্দুস্থানে চলে গেলেন। গাঁ উজাড় হয়ে গেল ভাই। দেশভাগের বিষ বাতাসে, সব শেষ হয়ে গেল।

দেশের অবস্থা যে এমন ভয়াবহ হবে, বাবা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। দেশের অবস্থা প্রতিদিন গভীরতর খারাপের দিকে যাচ্ছে। যা কল্পনা করতে পারেননি, প্রতিদিন চোখে তাই দেখছেন আর শিউরে শিউরে উঠছেন সময়ের এই মহানির্মম নিষ্ঠুর ছোবল থেকে, পরিস্থিতি থেকে কী করে বেরিয়ে আসবেন, সেই উপায় বের করবার জন্য সারারাত জেগে থেকে, খড়ম পায়ে উঠোনে পায়চারি করেন বাবা।

এমন দুর্যোগের সময়, অসুখও হয়নি, অসুখ চিকিৎসার সুযোগও মেলেনি— প্রায় আশি বছর বয়সে আমার ঠাকুরমা হঠাৎ মারা গেলেন। গোটা বাড়ি শুধু নয়, গোটা পাড়াতেই কান্নার রোল পড়ে গেল। কারও কিছু বুঝবার উপায় ছিল না। গ্রামের সবার প্রিয় রাঙাবুড়ি কী ভাবে আটচালা চৌরীঘরের উঁচু বারান্দা থেকে নীচে পড়ে মারা গেলেন!

বাবার তখন এমন অবস্থা চরকিবাজির মতো গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন— দেশভাগ যখন পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছে, তখন একটা তো কিছু করতেই হবে। না-হলে বাঁচার কোনও পথই নেই। বাঁচতে হবে, স্বজনবান্ধবদেরও বাঁচাতে হবে।

অকালে আমার মা মারা যাওয়ায় বাবার কাঁধে ছোটবড় ছ'টি ছেলেমেয়ের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। মা-মরা ছ'টি সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে বাবা দেশের কাজ মনমতো করতে পারেননি। এই জন্য তিনি বড় ছেলে বিজয়কৃষ্ণকে দেশের স্বাধীনতার জন্য পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিলেন।

আজকালের ঝঞ্ঝার মুখোমুখি দেশ এবং তার স্বজাতিস্বজন এবং বাবা নিজেই পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এই মহাসংকটে দেশের মানুষকে ফেলে তিনি কিছুতেই দেশ ত্যাগ করতে পারবেন না। যদিও ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালার ছেলে হিসেবে তাঁর ওপর আঘাতটা ভিন্ন ভাবে কঠিন ভাবে আসছে। দূরদর্শী মানুষ হিসেবেই বাবা বন্ধুত্ব করেছিলেন খানপুরের নুরুল আমিনের সঙ্গে। নিজের মেজ ছেলে জয়হরির সঙ্গে বন্দুত্ব পাতিয়ে দিয়েছিলেন পাড়িয়ালি গ্রামের নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে অথচ ইতিহাসের এক ভয়ংকর অশুভ পরিস্থিতি তাঁর সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে— এ অবস্থা থেকে বেরুবার উপায় বের করবার চেষ্টা তিনি প্রাণপণ করে চলেছেন। তার জন্য দেশভাগের পর থেকেই বাবা অস্থির হয়ে ছিয়ানব্বই অঞ্চলের বিশিষ্ট মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটে বেড়াচ্ছেন। মত বিনিময় করছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর আর বি আর আম্বেদকরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাবা চলেছেন সারা জীবন।

ঈশ্বর বালার প্রপৌত্র হিসেবে সিদ্ধিরাম বালার পুত্র হিসাবে দেশের মানুষের ওপর বাবার বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল। অঞ্চলের অবস্থা, পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক তাঁর পরিবারের ওপর অত্যাচার নেমে আসবে না। কিন্তু গত তিন-চার বছরের ঘটনাপ্রবাহ বাবার সেই বিশ্বাস, আস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে গেছে। যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর একসঙ্গে বসবাস করে এসেছেন, খাওয়াদাওয়া করে এসেছেন, কথাবার্তা বলে এসেছেন, সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছেন— হয়তো তাঁদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, তো তাতে কী, তাঁরা তো আত্মীয়ের বাড়া। অথচ সময়ের অভিঘাতে তাঁরাই পরম শত্রু হয়ে দেখা দিল— এ এক ঘোর ট্রাজেডি।

এলাকায় দাঙ্গা হচ্ছে না। কেউ হুমকি দিচ্ছে না। অথচ প্রতিদিন এক-দু'জন

করে হিন্দুদের খুন করা হচ্ছে। প্রতিদিন হিন্দুনারী অপহরণ হচ্ছেন ধর্ষিতা হচ্ছেন। হিন্দুদের বাড়িঘর আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছাই করা হচ্ছে। সমস্ত সম্পদ লুঠ করা হচ্ছে। হিন্দুদের জমির পাকা ধান মুসলমানরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বিচারে গেলেও হিন্দুরাই হেরে যাচ্ছেন। ছিয়ানব্বই অঞ্চলে এ এক নতুন ধরনের দাঙ্গা— যা খেদাই না, উঠোন চষি।

এমন যখন ঘোরতর পরিস্থিতি বাবা নিজেই ছিয়ানব্বই গ্রামের পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখতে গেলেন। কথা বললেন মানুষজনের সঙ্গে। পরামর্শ করলেন। মতামত দিলেন এবং নিলেন— পোড়াডাঙা গ্রামের শরৎচন্দ্র মজুমদার, সুন্দলীর দ্বারিকানাথ বিশ্বাস, লখাইডাঙার শিশুবর বিশ্বাস, সুজাতপুরের উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কুলটিয়ার উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, গঙ্গানন্দপুরের অবিনাশ সরকার, পাঁচাকড়ির সন্তোষকুমার মল্লিক, আড়পাড়ার যাদবচন্দ্র অধিকারী, আড়ুয়ার দশরথ গোলদার, চলশিয়ার সন্তোষকুমার রায়, ডুমুরতলার সুধারাম বিশ্বাস, রূপরামপুরের পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, রাজেকুলটিয়ার প্রফুল্লকুমার মণ্ডল, হাটগাছার রজনীকান্ত বৈরাগী, বিহারকুলের নিবারণচন্দ্র মণ্ডল, গাবুখালির দ্বিজবর মণ্ডল, চোমরডাঙার রামশশী বৈরাগী। এই সব গ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাবা যা দেখলেন তার থেকে অনেক বেশি জ্ঞান হল। ছিয়ানব্বই অঞ্চলের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেতরে ভেতরে বারুদ স্তূপীকৃত হচ্ছে— শুধু একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায়। প্রতিটি মুসলমান-প্রধান গ্রামে বিহারি মুসলমানরা আশ্রয় নিয়ে আছে। সংকেত পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ছিয়ানব্বই অঞ্চলে বাস করেন নিম্নবর্গের সব শ্রমজীবী মানুষ। অধিকাংশই চাষি— যাঁদের ব্যবসা নেই, চাকরি নেই, যাঁদের আছে জমি, চাষের জমিতে ফসল উৎপাদন করেন। আছে বাগবাগিচা— যেখানে নানা অর্থকরী ফলের চাষ হয়। কৃষকের জমির প্রতি ভালবাসা তাই শিকড় গেড়ে আছে। সেই জমি থেকে তাঁদের উপড়ে নিতে গেলে তাঁদের হৃৎপিণ্ডই ছিঁড়ে নেওয়া হবে। জমি তাঁদের কাছে গর্ভধারিণী মায়ের মতোই। তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না।

রাজনীতিতে ধর্ম আর জাতপাত ঢুকে যাওয়ায় দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা কেউ ভাবে না। কোনও নেতা-নেত্রীর মাথা ব্যথা নেই। উচ্চবর্গরা এতদিন তাদের ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে— মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আজ সেই নিম্নবর্গের মহাসংকটে উচ্চবর্গ দেশভাগের আগেই পশ্চিমবঙ্গে জমিজমা কিনে বাড়িঘরদোর করে চাকরিবাকরি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ক্ষমতা,

অধিকার, সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখতেই তো বঙ্গদেশকে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। এ বড় গভীরতম চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, আমার বাবা এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। উচ্চবর্গরা তাই বাবার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উস্‌কে দিয়েছে। কবে, কোন কালে কার জমির ধান লুঠ করে নিয়েছিল, কোন মুসলমান তার বিচার করেছিলেন সিদ্ধিরাম বালা। শাস্তি দিয়েছিলেন তাকে। তাকেই সেই ঘটনাকেই ইতিহাসের পাতা থেকে টেনে তুলে এনে মুসলমানদের খেপিয়ে তোলা হয়েছে। কী হিংস্র, নৃশংস কায়েমি স্বার্থবাদী মন!

নিম্নবর্গের মানুষ কেউ দেশভাগ চাননি। কেউ বাংলা ভাগ চাননি। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, দশরথ গোলদার, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, শরৎচন্দ্র মজুমদার, বাণীকান্ত বৈরাগী, সন্তোষকুমার মল্লিক, বাণীকান্ত মল্লিক প্রমুখ দলিত নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাগ চাননি। অভিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষাদীক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধিতে অসহিষ্ণু হয়ে উচ্চবর্গের হিন্দুরা ঈর্ষায় নমঃশূদ্রদের দুর্বল করার জন্যই বাংলাকে ভাগ করেছে। আমার বাবা উচ্চবর্গের এই দুরভিসন্ধি, বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে তারা মুসলমানদের দিয়ে লেলিয়ে সরে পড়েছিলেন। যেমন উচ্চবর্গরা মুসলমানদের শায়েস্তা করতে লেলিয়ে দেয়— নমঃশূদ্রদের তথা নিম্নবর্গের মানুষদের। ইতিহাসের এই গূঢ় সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন হাতেনাতে। তার জন্য উচ্চবর্গ আমার বাবার ওপর খ্যাপা তথা ক্ষুব্ধ ছিল, আর বাবাই আমাকে সে সব কথা বলেছিলেন।

ছিয়ানব্বই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে বাবা দারুণ দোটানায় পড়েছিলেন। তখন দাঙ্গার আগুন খুলনার আশপাশের গ্রামে দাউদাউ করে জ্বলছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে সারা গ্রামকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। যারা জমির মায়া কাটাতে পেরেছিলেন, সাহস করে ঝাঁপ দিতে পেরেছিলেন, তাঁরা হিন্দুস্থানে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ছিয়ানব্বই গ্রামের অনেক মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বাপ-ঠাকুরদার সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন। জমি আঁকড়ে যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদের অনেকেই নিজেদের বাড়িপোড়া আগুনে পুড়ে মরতে হল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়া সব সময় চলতেই থাকে। ঘরপোড়া, নারীহরণ, নারী-ধর্ষণ আর সাধারণ মানুষকে খুন ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকে। ছিয়ানব্বই অঞ্চলের হিন্দুদের মনেপ্রাণে চাপা উত্তেজনা ছিলই— ছিল গভীর উদ্বেগ আর আশংকা। মহাদেবপুর গ্রামের নগেন সরকার বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের জমিজমা, ভিটেমাটি সর্বস্ব ছেড়ে চোখের জল

ফেলতে ফেলতে হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে অনিশ্চয়তার প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেন।

প্রত্যক্ষ হিংসাত্মক আক্রমণের আঘাত না থাকলেও হিন্দুরা দলে দলে চলে যাচ্ছিলেন হিন্দুস্থানে। কখনও হুমকির চাপে, কখনও আতঙ্কের থেকে, কখনও-বা নিরাপত্তার সন্ধানে, কখনও জানপ্রাণ বাঁচাতে, নারীর মানসম্মান বাঁচাতে দেশত্যাগ করছিলেন।

ছিয়ানব্বই অঞ্চলের মানুষ জমিজমা, ভিটেমাটি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন প্রধানত আতঙ্কের জন্য। কিন্তু সে আতঙ্ক নিছক কাল্পনিক নয়, রটানো গুজবও নয়। প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন তাঁরা নানা ভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। বড় আকারের দাঙ্গাহাঙ্গামা বা সংগঠিত কোনও আক্রমণ ছিয়ানব্বই অঞ্চলে না থাকলেও হিন্দুদের প্রতিদিনের জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের ঘটনা ধারাবাহিক ঘটে চলছিল। তাঁরা বিশেষ করে ভয় পাচ্ছিলেন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। পথেঘাটে মেয়েদের লক্ষ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ছড়াকাটা বাড়িতে ঢুকে চুরি-ডাকাতি এমনকী নারী অপহরণের আর নারী-ধর্ষনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছিলই।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমানদের হামলা, অত্যাচার ধারাবাহিক ভাবে ঘটছিল। ছিয়ানব্বই অঞ্চলে জন্মাষ্টমীর মিছিলের ওপর হাঙ্গামা হয়েছিল। সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন শোভাযাত্রার ওপর হামলা হয়েছিল। রথের মেলা মুসলমানরা করতেই দিল না। এমনকী বিজয়া দশমীর দিন বহু হিন্দুর ঘরবাড়িতে মুসলমানরা আগুন ধরিয়ে দিল। খেতের ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এই সব ঘটনায় প্রত্যক্ষ সরকারি মদত না থাকলেও পুলিশের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় অথবা পক্ষপাতদুষ্ট।

আশ্বিন মাসের সাংক্রান্তির দিন, বাহাদুরপুরে, আমার ছোট পিসেমশাই বাণীকান্ত মল্লিক ছুটে এলেন। তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন তাঁদের গ্রামের নগর ঢালির গলাকাটা মুণ্ড শনাক্ত হওয়ার পর মানুষ ছুটল লোকটার ধড়টা খুঁজতে।

পিসেমশাইকে কাছে পেয়ে বাবা তাঁর দুশ্চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। বললেন, বাণীকান্ত, দেশভাগের পর গত পাঁচ বছর ঘটনা যে ভাবে ঘটছে তাতে এ তল্লাটে আমাদের থাকা কিছুতেই নিরাপদ নয়। ভারতভূমিতে আমরা জন্মেছি। বাপ-ঠাকুরদার জন্মভূমি এই দেশ। এর প্রতিটি ধূলিকণা তাঁদের পদস্পর্শে পবিত্র। কিন্তু দেশভাগে আমাদের মনের বলটুকু সব শেষ হয়ে গেছে। এখানে হিন্দুদের

মানসম্মান, ধনপ্রাণ নিয়ে কিছুতেই বাঁচা সম্ভব নয়। এ দেশ এখন আমাদের হিন্দুদের কাছে বিদেশই।

পিসেমশাই ডাক্তারমানুষ। প্রতিদিন তাঁর কাছে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান রোগযন্ত্রণা নিয়ে আসেন। সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত। দশখানা যাত্রাপালার নাটক লিখেছেন। নিজের বাপ-ঠাকুরদার জমির ওপর পাঠশালা গড়েছেন। ছিয়ানব্বই অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির নাড়ির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তিনি জড়িয়ে আছেন। বাবার কথা মন দিয়ে শুনে ধীরে সুস্থে তিনি বললেন, দাদা, জন্মভূমি, জন্মদাতা, দেশজননী রাতারাতি অন্যের দেশ হতে পারে না। আর যদি তা ঘটনাচক্রে কখনও হয়ও, তা কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? এই মাতৃভূমি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় কোথায় পাব দাদা? কথা বলতে বলতে পিসেমশাইয়ের চোখে অনিশ্চয়তার ঘন গাঢ় আঁধার নেমে আসে।

অথৈ চিন্তা বাবার বুকের মধ্য তোলপাড় করে ওঠে। বিরাট বহ্নিজ্বালার মতো দেশভাগের আঘাত তাঁকে চিরে ফেড়ে ফালি ফালি করতে থাকে। কিন্তু তা বোঝবার মতো ভাষা তিনি খুঁজে পান না। হাত নেড়ে তাই তিনি বোবা ব্যথায় তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ভরা দৃষ্টিতে পিসেমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন যেন-বা অনন্তকাল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ দাদা, আমি বুঝতে পারছি। আমি ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না। আমাদের চিন্তা তোমার চিন্তা হয়ে উঠবে না। কিন্তু আজকে সব ভাবনা পালটে গেল। দেশভাগের ক্ষেত্রে ওই ব্রাহ্মণ্যবাদী আর সৈয়দ মুসলমানরা এক হয়েই বাংলাকে ভাগ করল ওদের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষা করতে। পিসেমশাই সত্যকে বুঝতে পেরে নিজেকে বদলে নিতে থাকেন সচেতন ভাবনায়।

আজকের পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আজলফ', তারা ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গের হিন্দুরাই। তারা মনেপ্রাণে বাংলা ভাগ চায়নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে সেই ধর্মান্তরিত আজলফরাও ক্ষমতায় যেতে পারল না। ক্ষমতায় গেলে 'আসরফরা'— সেই উচ্চবর্গের মুসলমানরা। হনুমানের পিঠে ভাগের মতো আমার মাতৃভূমিকে ভাগ করে নিল দুষ্ঠু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আর আসরফরা। আজলফরা আর নিম্নবর্গের মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে— কী ভয়ংকর চক্রান্তের শিকার তারা, কী দারুণ অত্যাচার অবিচার অন্যায় উচ্চবর্গ ব্রাহ্মণ্যবাদী আর সৈয়দরা-আসরফরা করছে, সে দিন আবার খণ্ডিত দুই বাংলা এক হতে বাধ্য হবে— ইতিহাসের এ মহা সত্য মিথ্যা হতে পারে না। সময়ের সঠিক স্পন্দন তিনি স্পর্শ করতে পারছেন এমন একটি চেতনার আলোয় নিজেকে আবিষ্কার

করলেন। আর সেই আনন্দে তাঁর মুখখানা আলোয় ভরে গেল। পিসেমশাই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য অনেক কিছুই অনুভব করতে থাকলেন। সমাজ বিবেকের প্রাণটি যেন তাঁর সহসা জেগে উঠল নিদারুণ পরিস্থিতিতে।

রক্তের সম্পর্ক হারায় না, বাণীকান্ত, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তো অবিচ্ছেদ্য রক্তের সম্পর্ক আছেই— তার বাইরে গেলে ভাষা তো পালটে যাবে, সাংস্কৃতিক বন্ধন শিথিল হবে, নতুন মাটিতে প্রাণের রস খুঁজে পাব না, উপড়ে তোলা গাছকে তার জন্ম মাটির বাইরে অন্য ধরনের মাটিতে রোপণ করলে সে বাঁচে না। কলম বাঁধা চারাগাছের গোড়ায় তাই জন্মমাটি জড়িয়ে রাখতে হয়। না-হলে উপড়ে তোলা গাছ বাঁচানো যায় না। আমাদেরও স্বভূমি থেকে শিকড় উপড়ে তুলে এমন জায়গায় শিকড় বসাতে হবে— যেখানে জন্মমাটিকে পাই, মাটির রস ও প্রাণবায়ু পাই। তা হলেই বাঁচব। তাই নাভারণ থানার অধীন বোলপোতা গ্রামে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই জায়গাটা আমাদের জন্মভূমি পরিমণ্ডলের মধ্যেই। এ মাটিতে রস ও প্রাণবায়ু পাব বাঁচতে পারব কথা বলতে বলতে যেন অদূরে আশার আলোর পথ দেখতে পান বাবা এবং সে ভাবেই তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন চেতনার আলোয়।

হ্যাঁ, তা যাওয়া যেতে পারে দাদা, আর এ পর্যন্ত গেলে তো জন্মভূমির পরিমণ্ডলেই থাকতে পারলে। হুজুগ কেটে গেলে জন্মভূমি গ্রামে ফিরেও আসতে পারবে। আর যদি মুসলমানদের অত্যাচার সীমা ছাড়ায়, সীমান্ত ডিঙিয়ে হিন্দুস্থানেও সরে পড়তে পারবে। আজকে যারা হুজুগে পড়ে পাকিস্তানি হল, তারা কেউ আরবের মুসলমান না। বাঙালি মুসলমান চেতনায় হিন্দুই। কয়েক পুরুষ পূর্বে তারা যে সব নিম্ন বর্গের মানুষ ছিল তা তাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় দৃঢ় ভাবে এখনও জ্বলজ্বল করছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অমানবিক অত্যাচার সইতে না পেরে এরা সব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হুজুগ কেটে গেলে এরা যে বাঙালি হয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোমার কথাই সত্য দাদা, রক্তের সম্পর্ক হারায় না। মুসলমান সমাজে এরা চিরকালই আজলফ হয়েই থাকবে। এ ভারতবর্ষ এমনই ধর্ম পালটালেও জাত-বর্ণ পালটে যায় না।

বিহারি মুসলমান যারা নিজেদের আসরফ মনে করে তাদের একটি শরণার্থী দল পাড়িয়ালি গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় ঢুকেছে। বাঙালি মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি তারা আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের কুপরামর্শে, প্রতিবেশীও তোমার শত্রু হয়ে যাচ্ছে। শত্রুর মাঝে দুশ্চিন্তা নিয়ে বাঁচা যায় না দাদা। যত দিন থাকো, সাবধানে থেকো। এই জরুরি কথাটা বলতেই ছুটে এলাম। পিসেমশাই কথা বলে শরীরের ভার

ডান পা থেকে বাঁ পায়ে সরিয়ে নেন। তাঁর চোখের নীলাভ সাদা মণির ওপর ভেসে ওঠে সূক্ষ্ম লাল শিরা যেন কতকাল তিনি ঘুমাননি।

ভুরু কুঁচকে ভেতরের উত্তেজনা যথাসাধ্য চেপে রেখে, রুক্ষ্ম মোটা গলায় বাবা ফের বলেন, সহনশীলতা ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়ে আছে। সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি গোপনে সংগঠিত হচ্ছে। বিহারি মুসলমানরা প্রতিশোধ নেবার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তোড়জোড় করছে। কেবল সময়ের অপেক্ষা বাণীকান্ত। ভারত ভূখণ্ড থেকে যারা টুকরো একটি রাষ্ট্র ছিঁড়ে নিয়েছে, তারা সেখানে হিন্দুদের কিছুতেই থাকতে দেবে না। দেবে না তারা থাকতে।

বাঁচার থেকে বড় কিছুই নেই বাণীকান্ত। প্রাণ বাঁচানোর জন্যই মায়ের মতো জমি, বাপ-ঠাকুরদার পদরেণু পূর্ণ ভিটেমাটি সর্বস্ব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। কিছুই করার নেই বাণীকান্ত। দুর্বিসহ চিন্তা থেকে যদি মুক্তি পাই। পাকিস্তানে হিন্দুরা শারীরিক মানসিক আর হৃদয়ের কষ্টে জর্জরিত হচ্ছেন। বাবার চোখদুটোয় শান্ত কঠোর দৃষ্টি, আশা ভঙ্গে কলজেটা যেন তাঁর দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে। তিনি কথা হারিয়ে ফেলেন।

চিন্তাকুল মুখ কুঞ্চিত কপাল যেন বুক থেকে ভীষণ ভারী বোঝা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাবা ফের বলতে থাকেন, সময়ের এই মহাসংকটে বেঁচে থাকার অন্য কোনও পথ নেই বাণীকান্ত। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেলেও এ স্থান আমাকে ত্যাগ করতেই হবে। আর কত রাত নির্ঘুম কাটাব বাণীকান্ত? বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন আর নিজের ভেতরে ডুবে যান।

বাবার মনের আগুনের আঁচ এসে যেন লাগে আমার ছোট্ট প্রাণে আর তাতেই আমি পালটে যেতে থাকি। বদলে যেতে থাকে আমার বোধ, চেতনা। সব ভাবনা ছাপিয়ে-ডুবিয়ে দিয়ে আমার মনের আকাশে জেগে রইল বাবার সেই মুখখানা, জ্বলন্ত তারার মতো যেন বা চিরকালের মতো।

দেশভাগের পরপরই আমার বড়দা মনে করেছিলেন তাঁর পক্ষে পাকিস্তানে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। জাতীয় কংগ্রেসে প্রকাশ্যে সক্রিয় মদত করার জন্য তিনি তখন থেকে ভারতে নিজের শিকড় গেড়েছিলেন আর পাকিস্তান থেকে নিজের শিকড় উপড়ে নিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর নৌকার নোঙর নিজেই তুলে নিয়েছিলেন। ফলে ভারতে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। বড়দা এতদিন যে পাকিস্তানে থাকতে পারলেন তা সম্ভব হয়েছে বাবার মতো বিশাল বটগাছের ছায়া তাঁর মাথার ওপর ছিল বলেই।

ছিয়ানব্বই অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ভারতে উড়ে যাবার জন্য তাঁদের ডানা

তাঁরা প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। কংগ্রেসকর্মীদের প্রচেষ্টায় সে সব মানুষজনদের মনেপ্রাণে স্বভূমিতে বিশ্বাস আনানো হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর শুনে তাঁরা এক ঝটকায় ভেঙে পড়লেন। হিন্দুস্থানে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন।

বাবার চোখের সামনে কেবল বড়দাই ছিলেন না, তাঁর চোখের সামনে অগণিত নিম্নবর্গের দলিত মানুষ ভেসে উঠেছিলেন— যাঁরা ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি, জমিজমা সর্বস্ব ফেলে রেখে এক কাপড়ে ভারতে চলে যাচ্ছেন। মানুষ তো প্রায় বলত, ভারতে যাওয়া খুবই সোজা— পথে সরাসরি রেলপথ বিছানো আছে, পিচঢালা রাস্তাও আছে। অবশ্য কিছুদিন পর সেই যাত্রাপথের অন্তঃস্থলের কথা স্পষ্ট জানা গেল— সেটা আসলে একটা রক্তসমুদ্র পেরিয়েই ভারতে যাওয়া যায়। এই পথকে মানুষ কি 'বৈতরণী' জ্ঞানে আরাধনা করতেন? নিশ্চয়ই না। কিন্তু মানুষ আপন আত্মীয়-স্বজনদের বিদায় জানাতে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে যে বর্ণনা দিলেন তা জাহান্নামের। পথের কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে কতজন পথেই মারা গেলেন। কত যুবতী নারী পথেই লুঠ হয়ে গেলেন, কত মানুষকে দাঙ্গাবাজরা পথেই কেটে দু'খানা করল— প্রাণ নিয়ে খুব অল্প মানুষই শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানের নাগাল পায়।

এত সব খবর জেনেও আমার বাবা কিন্তু হাল ছেড়ে হাত-পা কোলে করে বসেছিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতা যশোহরের জীবনরতন ধর, বাগডাহার অমূল্য কর, প্রতাপকাটির বিষ্ণুপদ রায়, কুলটিয়ার উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, পোড়াডাঙার শরৎচন্দ্র মজুমদার, হাটগাছার বাণীকান্ত বৈরাগী, বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুন্দলীর সন্তোষকুমার মল্লিক, দেড়লির আক্রম আলি, গঙ্গানগরের অবিনাশ সরকার, মশিয়াহাটির মধুরানাথ মল্লিক, পাঁচকাটিয়ার সুজন বাছাড় এবং ছিয়ানব্বই অঞ্চলের অন্যান্য সব জনদরদি দেশপ্রেমিক মানুষদের কাছে। তাঁদের সঙ্গে বসে পরামর্শ করেছেন, আলোচনা করেছেন দেশের এই ভয়ংকর সংকটে কী করা যায় তাও ভেবেছেন।

জীবন তো ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে থাকতে পারে না, তাকে মাটিতে শিকড় বসাতেই হয়। কোন পরিস্থিতিতে, কতখানি বেদনা বুকে এসে আঘাত হানলে একটি পরিবার বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের জন্মভূমি ভিটে ছাড়বার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়— সে কেবল তিনিই জানেন, অনুভব করেন। যিনি সেই নিদারুণ ভয়ংকর অসহায় পরিস্থিতিতে পড়েন, অন্যে তা ভাবতেই পারেন না।

প্রথমেই তাই সীমান্ত পেরিয়ে অজানা অচেনা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পাড়ি

না-দিয়ে, আমার বাবা আর আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত চেনা মানুষজন একসঙ্গে পরামর্শ করে, সীমান্তের খুব কাছে পাকিস্তানে আমাদের যশোহর জেলার মধ্যেই, বোলপোতা গ্রামে বাড়ি-জমি কিনে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভবিষ্যতে সেখানেও যদি পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তাঁরা বাস করতে না পারেন, তবে তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে অতি সহজে তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানে ছুটে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। অর্থাৎ তাঁরা হিন্দুস্থানের কাছেই এগিয়ে থাকলেন। ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে যাতে তাঁরা বাঁচতে পারেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার বাবা, দহকুলার বড়মামা বনমালী মণ্ডল, মামার জ্ঞাতিভাই বিজয় মণ্ডল, পুলিন মণ্ডল, নলিনী মণ্ডল বেদভিটা গ্রামের মেজদার শ্বশুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পাঁচকাটিয়ার বড়দার বড় শ্যালক মানিক বিশ্বাস, চোঙোরডাঙার সুরেন মণ্ডল, দত্ত গাথির ইতবর বিশ্বাস, পোড়াডাঙার পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ সরকার, ভবদহের ছোট ভগ্নিপতি অধীর মণ্ডল, বেলেডাঙার অঘোর দত্ত, সুজাতপুরের সুধন্য মল্লিক, মহাদেবপুরের মহাদেব সরকার এবং হাটগাছা লেবুগতি কোড়ামারা, কুচলে প্রভৃতি গ্রামের বারোটি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম বোলপোতায় নতুন বসতি গড়ে তোলেন। খুবই তাড়াতাড়ি আর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমার বাবা গ্রামটাকে বাসের উপযোগী করে তোলেন।

দেশের মানুষ আমার বাবা চটকচন্দ্রকে বটবৃক্ষ মনে করতেন। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে থেকে, জন্মভূমি থেকে তাঁকে উপড়ানো ভীষণ শক্ত। কিন্তু আজ দেশের মানুষের মনে হল— চটকচন্দ্র বালা দুর্বল লতার মতো একটা হালকা হাওয়ার ঝাপটায় উপড়ে গিয়ে দূরে মুখ থুবড়ে পড়লেন। নতুন পরিবেশে, নতুন বসতি গড়ে তুলতে বাবাকে এতটা ছোটছুটি করতে হয়েছিল, দেশের মহাসংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল, কালের ঝঞ্ঝার মুখোমুখি লড়াই করতে হয়েছিল— তার জন্য তাঁর প্রাণশক্তি তলানিতে এসে ঠেকেছিল। সময়ের হাতে নিজেকে সমর্পণ করাতে, আমার বাবা চটকচন্দ্র বালা, অকালে, ঊনষাট বছর বয়সে বোলপোতা গ্রামে মারা গেলেন। সামন্য একটু বুকে ব্যথা নিয়ে তিনি শয্যা নিয়েছিলেন আর তাতেই মারা গেলেন।

মানুষ যেখানে যায়, সেখানকার মাটিতে শেকড় গাড়ে, কিন্তু আমার বাবার দুর্ভাগ্য, জন্মভূমি ভিটের মাটি থেকে ছিন্নমূল হয়ে, তাঁকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিন্নমূলতা অনুভব করেই, চলে যেতে হল— এ এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। আর আমরা অকালে দেশের এবং দেশের মানুষের মহাসংকট সময়ে জন্মদাতা পিতাকে

হারিয়ে, শোকের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হতে থাকলাম।

আমার বাবা কিন্তু পরম শান্তিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হল।

বুকে সামান্য ব্যথা নিয়ে বাবা পুবপোতার ঘরের বারান্দায় ক'দিন শুয়ে আছেন। মরবার আগের দিন শেষরাতে আমরা ক'ভাইবোন বাবাকে ঘিরে বসে আছি। বাবার মাথায় বড়দা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেলেন। হঠাৎ বড়দার ডান হাতটি বাবা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মিনতির কোমল কণ্ঠে বললেন, বাবা, বিজয় রে, আমি চলে গেলে আমার এই দেহটাকে কোনও ভাবেই আগুনে পোড়াস না। মাটি খুঁড়ে কবরও দিসনে। সোনামোহর মহাবিলের মাঝখানে ওই ছোট্ট দ্বীপটিতে রেখে আসিস। এই যে ভাবে আমি চিত হয়ে শুয়ে আছি, ঠিক এই ভাবেই শুইয়ে রেখে আসিস। আমার এই শেষ ইচ্ছাটা তোরা পূরণ করিস, বাবা। আমার ডাক এসেছে, আমাকে চলে যেতেই হবে। আমার এ-দেহ পুড়িয়ে নষ্ট করিস নে। কবরে দিয়ে পচাসনে। পরিবর্তনের প্রাণকণার জন্য উৎসর্গ করিস, আমি যখন এ নশ্বর দেহের মধ্যে থাকব না, তখন এ-দেহ অন্য প্রাণের বাঁচবার জন্য উৎসর্গ করিস। বাবার মুখের কথা শেষ হতেই অদ্ভুত উজ্জ্বল আলোর মহাদ্যুতিতে ঝিকমিক করে উঠল তাঁর দু'চোখ। স্ফূর্তির আভায় মুখটা তাঁর উদ্ভাসিত। পূর্ণ সচেতন ভাবে ফের তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন—

আমি চলে যাচ্ছি, তোরা কাঁদিসনে। যাওয়া-আসাটা শাশ্বত সত্য, সবাইকে ডাক আমার কাছে... কথা বলতে বলতেই বাবার মাথাটা একদিকে ঢলে পড়ল। চিরদিনের মতো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

ধারে কাছে যাঁরা ছিলেন, তারা ছুটে এসে বাবার মুখে শেষ জল দিলেন। বাবা তাঁর মুখে আনন্দের আলো ছড়িয়ে চলে গেলেন। কিন্তু গোটা বাড়িটা শোকে কান্নায় যেন মুখ থুবড়ে পড়ল।

সাতখানা বড় বড় তালডিঙিতে চড়ে আমরা বাবার মরদেহ নিয়ে উঠলাম সোনামোহর মহাবিলের সেই নির্জন দ্বীপে। দ্বীপের পরিধি খুব বেশি নয়, জল ছাড়িয়ে হাত দুই উঁচু ডাঙা। বিঘে দুই ভুঁই গভীর সবুজ মখমলের মতো নরম ঘন ঘাসে ঢাকা। ঘাসগুলি এমন প্রাণময় যেন তাদের শরীরে তেল গড়িয়ে পড়ছে। দ্বীপের মাঝখানে ঝাঁকড়া মাথাদু'টি প্রাচীন খেজুরগাছ একপায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে যেন উঠে গেছে আকাশে। তারই অদূরে দাঁড়িয়ে একটা মোটা বহু প্রাচীন বাবলাগাছ অসংখ্য হলুদফুল ফুটিয়ে আমাদের খুশি মনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

বাবলাগাছের পশ্চিমে নিবিড় সবুজ ছায়ায় পুরু শয্যা পেতে বাবার মরদেহকে

শোয়ানো হল। তার দু'ধারে বাবার নিত্যব্যবহার্য সব দ্রব্যাদি সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হল। বাবার মরদেহে মাখানো হয়েছে হলুদের সঙ্গে চন্দনবাটা। মরদেহের চারপাশে বড় বড় পদ্মফুল ফুটে আছে। আগাগোড়া দুধসাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বাবার শরীর। বাবার উজ্জ্বল দরদভরা মুখখানা এখনও তেমনই স্বাভাবিক সুন্দর। গোটা দৃশ্যটা যেন অনন্ত আকাশে জ্বলন্ত একটি নক্ষত্র আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আকাশের নীচে মহাসবুজের মাঝে নির্জন দ্বীপে নিবিড় ঘন ছায়ায় বাবা একা শুয়ে রইলেন আর আমরা ডিঙিতে এসে উঠলাম। ডিঙিগুলি তরতর করে এগিয়ে চলল লোকালয়ের দিকে।

আমার সারাজীবনের মধ্যে এই একটা মহাদিন— যাকে কেবলই অনুভব করা যায়। কোনও ভাষা দিয়েই তাকে প্রকাশ করা যায় না। তার প্রাণময় স্বরূপ কিছুতেই উদঘাটন করা যায় না। যেমন একটা উজ্জ্বলতম দিন যার অন্তরাত্মা জুড়ে জীবনের-প্রাণের-সজীবতার ঐকতান বেজে চলেছে। মহাকাশের অনন্ত গভীরতায় ভেসে আছে— সে গানের সুর আজও আমি কান পাতলেই শুনতে পাই।

অনিশ্চয়তার পথে শিকড় ছেঁড়া প্রাণ

বাবার মৃত্যুর পর সারাদেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। নোয়াখালি আর কলকাতার দাঙ্গার স্মৃতি যেন দেশের মানুষের মনে নতুন করে জেগে উঠেছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ— এই দুই শিবিরে হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদের অপচ্ছায়া মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেশভাগের পর পাঞ্জাব ও বাংলায় এমনকী গোটা ভারত উপমহাদেশে দাঙ্গার আগুন কোনওদিন নেভেনি বরং তার পরিমাণ প্রতিদিন বেড়ে যেতে লাগল। এরই ভেতর পাকিস্তানে এবং হিন্দুস্থানে বহু এলাকায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামান্য দাঙ্গাও হয়ে গেছে— সে কথা এখানে খুব আলোচনা হতে লাগল।

প্রতিদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের গ্রামে অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটতে থাকল। মাঝেমধ্যেই শোনা যেতে লাগল দাঙ্গায় হিন্দুদের খুন হয়ে যাওয়ার সংবাদ এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ হওয়ার খবর। এ সব ঘটনায় বোলপোতা গ্রামের মানুষজনের মনোবল প্রতিদিন তলানিতে নেমে যেতে লাগল।

ভয় আর বিশ্বাসহীনতা গ্রামের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে গেড়ে বসে গিয়েছিল। বোলপোতা গ্রামের আশপাশে কাছে-দূরের গ্রামে মাঝেমধ্যেই দাঙ্গার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে বোলপোতা গ্রামকে যে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, বড়দার মনে তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। চতুর্দিকে উত্তেজনাপূর্ণ দাঙ্গার পরিস্থিতিতে তিনি আরও বেশি নিরাপত্তার এক অভাব বোধ করছিলেন। বোলপোতা গ্রামের ভেতর ঘুরতে গিয়ে তিনি দেখলেন, গ্রামের মানুষজন যারপরনাই ভীত এবং চিন্তাক্লিষ্ট এবং তা দেখে তিনি আরও বেশি বিচলিত হলেন।

পাকিস্তানের পরিস্থিতি যখন এমন, সেই সময় হিন্দুস্থান থেকে দাঙ্গায় তাড়া-খাওয়া বিহারি মুসলমানরা বোলপোতার পাশের গ্রাম মোহনপুরে আশ্রয় নেয়। বিহারি মুসলমানদের সঙ্গে স্বার্থে অন্ধ স্থানীয় কিছু মুসলমান যোগ দিয়ে বোলপোতা গ্রামের ঘরবাড়ি সব আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আমরা প্রাণ বাঁচাতে বোলপোতা গ্রামের দক্ষিণে সোনাকুঁড় বিলের গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিই। দাঙ্গাবাজরা আমাদের বাড়িঘরই শুধু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় না, তারা আমাদের সর্বস্বও লুঠ করে নিয়ে যায়। জান-প্রাণ বাঁচাতে আমরা বোলপোতা গ্রাম চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে জমিজমা ফেলে রেখে সাতনল নদী পার হয়ে হিন্দুপ্রধান গ্রাম বড়মান্দারতলায় সাময়িক আশ্রয় নিয়ে প্রাণগুলি বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হই।

আমাদের জন্মভিটে, জমিজমা, ঘরবাড়ি— চোদ্দোপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থস্থান, ছিয়ানব্বই অঞ্চল তখনও অক্ষতই ছিল। আমরা ইচ্ছা করলে ছিয়ানব্বই অঞ্চলের মূল মাতৃভূমির ভিটায় ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু গোটা পাকিস্তানের যে ভয়ংকর অবস্থা তাতে সে স্থানও নিরাপদ ছিল না। তাই পিছনে নয়, এগিয়ে চলার জন্যই হিন্দুস্থানে যাওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

এমন অবস্থায় বড়দা তো সারারাত জেগে শুধু পায়চারিই করতেন। পাকিস্তানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমনটা যে হবে তিনি তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না। যাঁরা জানতেন, তাঁরা তাঁকে আগাম জানিয়েছিলেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন ঘটনা ঘটবে, বিশ্বাস করেননি এবং এই দুঃস্বপ্নকে মনেপ্রাণে ভোলার চেষ্টাই করে এসেছেন। কিন্তু ইতিহাস তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর দ্রুতই রাখল। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিন্নমূল হয়ে অনিশ্চয়তার স্রোতে তাঁকে ভাসতে হল।

আমাদের আর বিলম্ব সইছিল না। অনিশ্চয়তার নদীতে ভেসে নৌকার

নোঙর আমরা নিজেরাই তুলে নিয়েছিলাম। বড়মান্দারতলার সাময়িক আশ্রয়স্থান ত্যাগ করে, পথে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের জন্মভূমি, ভিটেমাটি, জমিজমা, ঘরবাড়ি তখনও ছিয়ানব্বই অঞ্চলে অক্ষত ছিল। বারবার ভিটে পালটালেও মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ির যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে, তা এতদিন আমাদের ছিন্ন হয়নি। জন্মভূমির পরিমণ্ডলের মধ্যেই আমরা ভিটে পালটিয়ে, কেবল মূল শিকড় আলগা করছিলাম। এই প্রথম আলগা শিকড় চিরদিনের মতো ছিঁড়ে, কেটে বন্ধনমুক্ত হতে চাইলাম— বেঁচে থাকবার তাগিদে।

আত্মীয়স্বজন মিলে আমাদের সঙ্গীসাথী পাঁচটি পরিবারের সাতাশ জন ছোট-বড় মানুষ একসঙ্গে আগুপিছু হাঁটছি। পুরুষদের অনেকেরই খালি গা, খালি পা, পরনে কেবল খেটোধুতি, তার ওপর গামছা গিঁট দিয়ে বাঁধা। ছোটদের দড়ি-ভরা প্যান্ট পরা, খালি গা, খালি পা। আর মেয়েদের যুবতীদের পরনে শাড়ি, তার নীচে একটিমাত্র সেমিজ, বয়স্কাদের কেবলই শাড়ি অথবা থানকাপড়। তাঁদেরও খালি পা। প্রত্যেকের হাতে, না-হয় মাথায় অথবা ঘাড়ে বা কাঁখে বোঁচকা-বুঁচকি— তাই নিয়ে আমরা চলেছি। আমরা খালি পায়েই দ্রুত হেঁটে চলেছি— মাঠঘাট, চষাক্ষেত, আলপথ, কাঁচা রাস্তা, ভাগাড়ে কখনও-বা একপেয়ে মেঠো পথ মাড়িয়ে— আমরা চলেছি অনিশ্চয়তার পথে।

বড়দার মাথায় আছে— ঠাকুরমার হাতে আর আমার মায়ের হাতে সেলাই করা তিনখানা ফুলতোলা কাঁথা এবং তার মাঝে নতুনবস্ত্র খণ্ডে বাঁধা-পোঁটলায় বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের ভিটের পবিত্র একদলা মাটি, জন্মভূমি মায়ের স্মারক স্মৃতি— মাঝে মাঝেই তিনি বোঁচকাটি মাথা থেকে নামিয়ে বুকে চেপে ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন আর একা একাই কী সব বলতে বলতে পথ হাঁটছেন। প্রাণের হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ বুকে চেপে ধরে কখনও তিনি অস্ফুটস্বরে বলে চলেন:

জীবনের খুঁটি উপড়ে গেলে এমনই অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে যেতে হয়। লোভে, জেদে, স্বার্থে, অহংকারে, বিদ্বেষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, দেশভাগ হয় আর গ্রাম জনপদ ছারকারে যায়, নলখাগড়ার প্রাণ যায়। মানুষের এ দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবার নয়। এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তবু মনপ্রাণ তো মানে না। হায় হায় করে তিনি বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়েন আর পা পেতে হাঁটেন।

পথে বাড়িঘর তো মেলাই দেখলাম, বেয়ান, আড়াল আবডাল বলতি কিছুই নেই। কোথাও গিয়ি উঠি জিরনের জায়গাটুকুও নেই। বড়মামি কথার খেই ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললেন।

শুধু গাঁ থাকলি হবেন না। মানুষ থাকতি হবে মামি। নালি কনে কার ঠাঁই পাবানে? পুতুলবউদি বোঁচকা কাঁখে টেনে তুলতে তুলতে বল্লেন আর জোর পায়ে হাঁটতে থাকেন।

খানিক দুর যেতে না যেতে অধীরদা বললেন, বাতাসে মড়াপচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি না?

মেজদা বাতাস শুঁকে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা পাচ্ছি তো। কনে কী মরে পচে পড়ে রয়েছে। কেডা জানে, কোন আপথে কুপথে হাঁটতিছি। তাড়াতাড়ি হাঁটো, দাঙ্গাবাজরা মানুষ খুন করে ওই কানাপুকুরের জঙ্গলে হয়তো ফেলে গেছে। হাঁটো, দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে আসছে। মেজদা দ্রুত হাঁটতে থাকেন। আর তাঁর সামনের মানুষজনকে তাড়াতে থাকেন— যাতে তাড়াতাড়ি দুর্গন্ধ পেরিয়ে যাওয়া যায়।

বড়মামা হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করেন। পথের দু'ধারের নিস্তব্ধতা ক্রমশ যেন আমাদের ঘিরে ধরছে। বাতাসে শুধু শবগন্ধ নয়, অদূরে গাছের ডালে ছাড়া বাড়ির মটকায় শকুন বসে আছে। কাকের পাল কা কা করে চিৎকার করছে। শিয়াল ছুটে গেল বাড়ির উঠোন মাড়িয়ে। অদূরে কোথাও কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

কী দেখতিছ বেয়াই? শকুন দেখতিছ নাকি? শকুন দেহা তো অমঙ্গল বেয়াই। তালুইমশাই বড়মামাকে বলেন আর জোরে জোরে হাঁটেন।

ভিটে ছাড়ি যহন পথে নামিছি, অনিশ্চিতির স্রোতে ভাসি চলিছি, তহন আর অমঙ্গল কনে হবে! বড়মামার বুক ভাঙি যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

এ দিকটা মনে হচ্ছে ভাল না। বিপদ আসি ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তি পারে যহন-তহন, তোমরা তাড়াতাড়ি হাঁটো সব, মাঠটুকুন পাড়ি দিতি না পারলি, মনের জ্বালা জুড়াতিছে না। নরেনদা সবাইকে তাড়া লাগান আর জোরে জোরে পা চালিয়ে হাঁটেন।

গোচারণের মাঠ দিয়ে পায়ে চলা পথ দিয়ে হাঁটছিলাম, উবদো-ওঠা শুকনো ধারালো মাটি। পরিত্যক্ত গ্রাম-গাঁ, ঘরবাড়ি, এরই মধ্যে সবুজ লতা ঘরের চাল বেয়ে উঠেছে। তেলাকুচো লতা ছাঁচতলায় ঝুলে আছে। উঠোনে ঘন দুর্বাঘাস গজিয়েছে। এক জোড়াবেজি একটা গোখুরো সাপ তার পিছে শুঁকতে শুঁকতে চলেছে। গোটা অঞ্চলটা খাঁ খাঁ নির্জনতায় মোড়া আর ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়ে আছে।

বড় বেশি চুপচাপ পথঘাট। বাঁশগাছ, আম-কাঁঠালের গাছ, আর জামগাছের

ঘনছায়ায় পথ একেবারেই নিঝুম। তা দেখে বড়মামা গলায় উদ্বেগ ঢেলে দিয়ে বললেন: বড়কোদা, ভাল ঠেকছে না, যেন গাঁ-ঘরের ছামুতে আলাম, ছেলেপিলে কলকলাবে, হাঁস-গোরু ডাকবে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে। কই সে সব কনে? এ গাঁয়ের নামটা কী গো?

কেউ উত্তর দেয় না। নির্জনতার বুক চিরে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। নিঃশব্দ শব্দকে যেন গিলে খায়। ভয় আমার পায়ের পাতা ফুটো করে বুকে ধাক্কা দেয়।

রেগেমেগে মেজপিসি গলায় খেদ ঢেলে দিয়ে কন, এ গাঁয়ের মাগিগুলানও দেহি ঝগড়াও করে না। অ্যাঁ কনে আলাম, বাপু, কনে আলাম মত্তি?

আমাগে মতন নয় গো পিসি, এরা ঝগড়াটে নয় গো, কেমন কুবাতাস বইছে দ্যাহ! নাকে কাপড় দাও দিনি, দুর্গন্ধে টিকা যাচ্ছে না। নাকে কাপড় গোঁজো পিসি, গন্ধে বমি আসতিছে আমার। বড়বউদি কয় আর কোলের বাচ্চা বুকে তুলে জোরে জোরে হাঁটেন।

ভাগাড়ের পাশ দিয়ি যাতিছি আমরা? মনে লয় শ্মাশান মাড়িয়ে যাচ্ছি, কে একজন জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু উত্তর মেলে না। নির্জনতা গলা বুঝি টিপে ধরে।

মাগো মা, কনে আলাম গো, আমার ভয় কত্তিছে মা, বাবা গো, কনে যাচ্ছি আমরা? মামার ছোট মেয়ে কনকদি জোরে চিৎকার করে ওঠেন। বড়মামির গা ধরে বুকে তরাসের আগুন নিয়ে হাঁটেন আর ভীত সন্ত্রস্ত এদিক-ওদিক তাকান।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই, এক বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকেন। পেঁজা তুলোর মতো ফুরফুরে সাদা চেহারা— সাদা ভুরু, চোখের পাতা সাদা, চামড়া কুঁচকানো দু'খানা, পায়ে এখনও বেশ শক্তি। কথায় কথায় তিনি জানালেন, মেয়ে বাড়ি থেকে ফিরছেন। বৃদ্ধা সকাতরে বললেন, বাবা সকল গো, তোমাগে দেহি, আমার ভীষণ ভয় কত্তি নাগিল। গাঁয়ে ফিরি কী যে দেখতি হবেনে। কী সর্বনাশ যে দেখবানে তা ভাবলি মাতা আমার ঘুত্তিছে। আমাগে গাঁয়ে গিয়ি কী যে দেখতি হবেনে, কী যে হতি লাগিছে। বলতে বলতেই সেই বৃদ্ধা ডান হাতের রাস্তায় গেলেন, আমরা বাঁ হাতের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলাম জোর পায়ে।

বুঁচতলা গ্রামে হারাণ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা হারাণ মণ্ডলের। দেখে মনে হয় একটা টসটসে কালো টোপা জাম, দীর্ঘদিন গাছের তলায় পড়ে থেকে ছাতা ধরেছে। ছ্যাদলা-পড়া হলদে দাঁতের গোড়াগুলিতে, কাঠি দিয়ে হরদম খোঁটে। সামান্য সবুজ ছোট দুটো চোখ, অমায়িক হাসিতে ভরে রাখে। গলার স্বরটা সত্যি মোলয়েম, ভদ্র। মিষ্টিমধুর তার ব্যবহার। আমাদের দেখে কেমন বিষণ্ণ হাসলেন।

ছিয়ানব্বই অঞ্চল থেকে আসা, আরও দু'টি পরিবার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এ বাড়িতে। বাহাদুরপুর গ্রামের সুবল ঢালির পরিবারে— মা-বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে পাঁচজন মানুষ আর পোড়াডাঙা গ্রামের সুরেন বাছাড়ের পরিবারের বৃদ্ধ বাবা, বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ছয়জন মানুষ। হারান মণ্ডলের উত্তরপোতায় একখানা মাত্র শোবারঘর, তার বারান্দা আগেই দখল করে রেখেছে ছিয়ানব্বই গ্রামের দু'টি পরিবার। অগত্যা উঠোনেই আমাদের আশ্রয় নিতে হল। পলগাদা থেকে পল টেনে এনে উঠোনে বিছিয়ে তার ওপর বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে আমরা বসে পড়লাম।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলি, উলুখড়ের প্রাণ যায়, মত্তি মরণ তো এই গরিবগুরবোদের, সুবল ঢালি গলায় ক্ষোভ ঢেলে কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে নেমে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন দু'হাত জোড় করে। ফের বললেন, হারান মণ্ডল আমার পিসতুতো ভাই হয়।

সর্বনাশ শুরু হলি নদীর বান কী আল দিয়ে ঠেকানো যায় রে বাপু। সর্বনাশী বানের জল সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়— না-হলি কী আমাগে পথে ভাসতি হয়। বড়দা তাঁর কথার খেই ধরে কথা বলে এগিয়ে গিয়ে, সুবল ঢালির হাত ধরে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তালি তোমরা এলে, তা ভাল আছো তো সবাই, বড়দা আন্তরিক হয়ে বলেন।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে প্রাণের দায়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের হাত ধরে অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা না বাপু। তবু শেষ অবধি এট্টুখানি দাঁড়ানোর জাগা দিতি পাল্লাম— এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। এট্টু কষ্ট করি রাতখানি কাটান মা সকল, দেখতি তো পাচ্ছ মা-রা আমি ধনেখাটো, ঘরবাড়ি কত্তি পারিনি, তা কী কও মা সকল এট্টু কষ্ট হবেনে, হলি কিচ্ছু করার নেই। বাবা সকল, একটা মাত্তর রাত্রির তো, সুবল বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়েন, বলেন।

সত্যিই কঠিন খুড়ো। দিনকাল যা, কেউ ডাকি জিজ্ঞাসা করে না। কনে যাচ্ছ। আদিকাল থেকি এ দেশে গাঁয়ের মানুষজন দিনান্তে একমুঠ গরম ভাত খাতি পল্লি জীবন সার্থক মনে করে। চিরকাল তাঁদের কোমরে খেটো ধুতি, তার ওপর গামছা গিঁট দিয়ে বাঁধা। সম্বলমাত্র কাঠের লাঙল আর আলবাঁধা এক টুকরো জমি। জমির মতো তাঁদের জীবনও আলবাঁধা। একটুকু গণ্ডির মধ্যি চলাফেরা। দশ বিশ ক্রোশ পথ যাওয়া সে তো ভাগ্যের ব্যাপার, ভাবতিও পারি না। সেই মানুষ দেশভাগে পথে নেমে হাঁটছে। তোমাগ পাব, ভাবতেই পারিনি। তবু

এলে শেষ পর্যন্ত তোমরা, সুরেন বাছাড় আন্তরিক হয়ে কথা বলেন প্রাণ খুলে।

সুরেন বাছাড় ছোট্টখাটো মানুষ। খেটো ধুতি পরা, খালি গা, খালি পা। বুক ভর্তি ঘন লোম, দু-তিন দিনের না কাটা দাড়ি মুখে তবু মানুষটাকে কী সুন্দর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কথা বলছেন বেশ দরদ দিয়ে। তাঁর স্ত্রী একেবারেই সাদামাটা যুবতী মা, বুকের কাপড় সরিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন কোলের বাচ্চাটিকে। আমাদের সদলবলে আসতে দেখে বেশ সরস মনে হল তাঁকে।

হারান মণ্ডল পলগাদা থেকে পল এনে বিছিয়ে দিয়ে, ফের ছুটে গেলেন কলসি হাতে জল আনতে। কলসি ভর্তি জল এনে বললেন, কে কে জল খাবা, অ্যাসো জল খাও। ঘটিতে জল ঢেলে জনে জনে জলপান করাতে ব্যস্ত তিনি। আপনস্বজনের দরদ ঢেলে সেবা করেন তিনি মানুষের।

হারান মণ্ডলের বউ বাসমতী। লম্বা রোগা চেহারা, ফ্যাকাশে মুখখানার মধ্যে প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টি চোখ। চালচলন পুরুষালি। কালো মোটা ভুরু জোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা পাশ দুটো কাঁপিয়ে কথা বলেন। পুরু ঠোঁটে একটুখানি হাসির রেখা ঝুলিয়ে বাসমতী গেলেন রাতের খাবার রান্না করার জন্য, রস জ্বালানো বড় দু'চোখা উনুন থেকে ছাই তুলতে।

হারান মণ্ডলের ছোট্ট বাড়িখানার আবহাওয়া শান্ত সংযত। আশপাশের অন্য বাড়িগুলোর চাইতে কেমন যেন একটু আলাদা রকম। পাড়ার একধারে বাড়িটা জলার ধার ঘেঁষে, একটা উঁচু ঢালুর উপর। বাড়িখানার প্রায় তিন ভাগের একভাগ জুড়ে গোয়ালঘর, তাতে কাঠের খুঁটি, টিনের ছাউনি। দোচালা বাংলাঘর, মাটির পুরু দেয়াল, ঢেউ টিনের ছাউনি, তার দক্ষিণ বাতায় ছোট্ট রান্নাঘর, মাটির দেওয়াল, বড় বড় দু'টি জানলা, এক টুকরো বারান্দা, ঘড়ের ছাউনি, বাঁশের খুঁটি। বাড়িখানা বেশ ছিমছাম।

হারান মণ্ডলের মা সাদাথান পরে চাটকোল পেতে মাটির মেঝেতে বসে, লম্বা দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা। হাড়ভাঙা খাটনি-খাটা চেহারা। চওড়া লম্বাটে শুকনো শুকনো কোঁচকানো মুখ। তাতে জ্বলজ্বল করছে একজোড়া ঘন ভীরু আর্ত চোখ। ডান ভুরুর ওপর দিকে একটা গভীর কাটা দাগ থাকায়, ভুরুটা একটু ওপর দিকে টানা। মনে হয় ডান কানটা ওঁর বাঁ কান থেকে কিছু ওপরে। তার ফলে সর্বদাই যেন উদ্বেগের সঙ্গে কান খাড়া করে আছে এমনই একটা ভাব মুখে মাখানো। ঘন কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদার রেখা ঝিলিক দিচ্ছে। সব মিলিয়ে কোমল বিষণ্ণ ভীরু চেহারা মহিলার। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর। মানুষের আর কত কষ্ট দেখব বাবা,

প্রতিদিন তো মানুষ আসছে, চলে যাচ্ছে, মানুষের এত দুঃখ দেখা যায় না, কচিকচি বাচ্চা কোলে নিয়ে, বোঁচকা মাতায় নিয়ে জলকাদা, ধুলো ভেঙে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে, না-খেয়ে কত লাঞ্ছনা সয়ে এখানে একটু জিরিয়ে ফের ছুটছে হিন্দুস্থানের দিকে। এত দুঃখ, এত কষ্ট, নির্দোষী কত মানুষ পথেই মারা যায়— মুখের কথা তাঁর ফুরায় না, হাত দুটোকে বুকের ওপর আড় করে রাখা। পলকহীন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথাটা অনবরত বিষণ্ণ ক্লান্ত ভাবে নড়ে।

ঠিক যেন ঝড়ে ওপড়ানো একটা গাছের মতো আলুথালু চেহারা নিয়ে পিসিমা তার কাছ ঘেঁষে বসেন। অথৈ চিন্তা বুকের মধ্যে তাঁর তোলপাড় করে। ভিটে ছাড়ার কষ্ট, পথের কষ্ট, অনিশ্চয়তার কষ্ট, কষ্টে কষ্টে তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে যেন ফালি ফালি করে দিচ্ছে। কিন্তু তা বোঝাবার ভাষা কোথায় পাবে পিসিমা? হাত নেড়ে বোবা ব্যথায়, তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাভরা দৃষ্টিতে হারান মণ্ডলের মায়ের দিকে পিসিমা তাকিয়ে থাকেন।

ওদিকে বাইনশালায়, মাটিতে খুঁটি পুঁতে, চাদর টাঙিয়ে ছাতনা করে, তার নীচে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। রান্না বলতে জালাহাঁড়িতে ভাত আর ডাল রান্না হচ্ছে দু'চোখো বাইনে।

সন্ধ্যা ঘুরতেই আকাশে গোল চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় ভরে গেল উঠোন। সুবল মণ্ডল গামছা কাঁধে ফেলে বললেন, আইসো বাবা সকল, মা সকল, খাতি চলো। গরিবের ঘরে দু'মুঠো ডালভাত খেয়ে রাতটুকু কাটাও। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে গোমড়া মুখে ফের বলেন, রোজগেরে জোয়ান ছেলেকে দাঙ্গাবাজ বেজন্মারা খুন করে গেলে, তার আর কী থাকে? অভাবে পড়লে লোকে ইঁদুরও ধরে খায়, আমার অবস্থা তাই। কত শোক আর সইব। বড় ওই দাদা ছিল বলে এখনও আছি।

আমরা নিজেরাই উঠোনে খড় পেতে, পঙক্তি করে খেতে বসলাম। ডাল-ভাত আর মেটে আলুর ঘণ্ট দিয়ে খাওয়া সারা হল। আমার দেহ আর চলছিল না। পিসিমাকে বললাম, আইসো শুয়ে পড়ি। সুবল মণ্ডলের কথা শুনে বুকের মধ্যে সেই থেকে বিশ্রীরকম তেতো হয়ে আছে। শুতে গিয়ে দেশলাইয়ের হলদে আগুনের মতো, একটি যুবক ছেলের মুখ, ফস করে জ্বলে ওঠে মনের পর্দায়। ভেতরটা আমার জ্বালা করে ওঠে। আর তখনই এলোমেলো মেঘের মতো, পথের ভাবনাগুলো ধেয়ে এসে আঁধার করে ছেয়ে ফেলে মনটাকে। উঠোনের ছাঁচতলায়, বারান্দায় যে যেখানে পারল শুয়েই সব ঘুমিয়ে পড়ল।

পথের কষ্টে ক্লান্তিতে, পথের প্রথম রাতটি যে কী ভাবে কাটল, বুঝতেই

পারলাম না। ভোর না-হতেই দেখি বড়দা, আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকছেন, ওঠ, ওঠ, ভাইডি ওঠ। রান্না হয়ে গেছে খেতে ডাকছে। ওঠ, ওঠ। চল খাবি। ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। চানটান করার কোনও সময় সুযোগ নেই। এক্ষুনি নাকেমুখে দুটো গুঁজে, পথে নেমে ছুটতে হবে। ওঠ ভাইডি শিগগির খাতি বস।

পাতড়া পেতে নাকেমুখে ফেনাভাত গুঁজেই আমরা পোঁটলাপুঁটলি, বোঁচকাবুঁচকি মাথায় ঘাড়ে, কাঁধে হাতে আর শিকে বাঁকে নিয়ে ফের পথে নামলাম। রোদ চড়ে গেলে খালি পায়ে পথ হাঁটা যাবে না। তাই দ্রুত আমাদের ঘর থেকে বেরুতে হল। এখন একসঙ্গে আমরা চলেছি সাতটি পরিবার। আমাদের দলে লোকসংখ্যাও বেড়ে গেছে অনেক। সামনে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাস্তা যশোহর রোডে ছিয়ানব্বই অঞ্চল থেকে আসা এগারোটি পরিবার আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাদের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা সকলে সীমান্ত পার হব।

দুপুরের আগেই হেঁটে এসে আমরা উঠলাম, পিচঢালা রোদে ঝলকানো চওড়া রাস্তা যশোহর রোডে। খালি পায়ে পিচঢালা রাস্তায় হাঁটা যায় না। তাপে খালি পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের পথের হাঁটা হাড়ভাঙা খাটুনিতে আর জন্মভূমি ত্যাগের বেদনায় ভোঁতা, তাই ব্যথার অনুভূতিটা মরে গেছে। ফলে কোনও কিছুই আমরা টের পাচ্ছিলাম না। ছুটে হাঁটছিলাম।

বাবার সঙ্গে ছিয়ানব্বই অঞ্চল থেকে, বোলপোতায় আসবার সময়, যশোহর রোডে এর আগে বারদুই আমি হেঁটেছি। কিন্তু সে দিন পায়ের তলায় নতুন কিছুই আমি অনুভব করিনি। আজ যখন পিচঢালা যশোর রোডে পায়ের পাতা ছোঁয়ালাম, আমি চমকে উঠলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমাদের আগেপিছে অসংখ্য মানুষ চলেছেন— যাঁদের মাথায়, ঘাড়ে, হাতে, কাঁখে, শিকে বাঁকে বোঁচকাবুঁচকি, থালা বাটি বাসন, হাঁড়িকড়াই-হাতা-খুন্তি। যশোর রোডের দু'ধারে নয়ানজুলিতে, দলে দলে বোঁচকাবুঁচকি আগলে বসে আছেন। কেউ কেউ তিন ইটের উনুনে, হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করছে ভাত। আগুন জ্বলছে না। কেবল ধোঁয়াই উড়ছে গলগল করে। মাটিতে উবু হয়ে জাবড়ে বসে, কেউ কেউ প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতে চাইছেন উনুনে। দলবেঁধে বসে-থাকা মানুষগুলির চোখেমুখে, অসহ্য খিদের জ্বালা। তাঁরা নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। আশপাশের ঘরহারা মানুষের গায়ে মাথায় ছাই উড়ছে, বোঁচকাবুঁচকি মাথায়, ঘাড়ে, কাঁখে, হাতে এবং শিকে-বাঁকে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন। ব্যগ্র উত্তেজিত, ব্যর্থ চাপা কোলাহলে গোটা আকাশবাতাস গমগম করছে। চোখের সামনে বিচিত্র

ঝাপসা, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, অসহায় সব মানুষের মিছিল স্রোতের মতো বয়ে চলেছে অবিচ্ছিন্ন, বিরামহীন...

পিচঢালা রাস্তার কোল ঘেঁষে, গোটা নয়ানজুলি জুড়ে তিন ইটের অসংখ্য উনুন। ভাঙা ইট, ভাঙা হাঁড়ি, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, ফুটো থালা, পাতাপুতি। টুকরো টুকরো ডালপালা ছড়ানো আর তার মধ্যেই নিরন্ন অন্তহীন মানুষের জটলা। কেউ রান্না করছেন। কেউ খেতে বসেছেন। কেউ আর্তনাদ করছে। কেউ বুক চাপড়ে কেঁদে চলেছেন। কেউ বসে সন্তানকে স্তন দিচ্ছেন। কেউ পথের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, রাস্তার ঢালুতে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে আছেন। অসুস্থ বাচ্চা, বুড়ো পথেই মরে পড়ে থাকছে, তাদের দল চলে যাচ্ছে যেন ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই।

বিপদকালে নির্ভীক, কুশলী আর দুঃসাহসী হওয়া ভাল। তবু দুশ্চিন্তায় আমাদের কপাল কুঁচকে যাচ্ছিল। মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা আর নাড়ি-ছেঁড়া কান্না বুক খামছে ধরে আছে। সেই বুক চেপে ধরেই আমরাও হাঁটছিলাম পশ্চিমমুখো, স্রোতে চলা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। পলকহীন চোখে হাঁটামানুষ, নয়ানজুলিতে এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখছিলাম। ক্ষীণ চাপা, ভাঙাচোরা স্বর একটু একটু শোনা যাচ্ছে। ক্রোধে ক্ষোভে কারও কারও চোখে আগুন জ্বলছে, অসহায় অপমানে ঘৃণায় অবহেলায়, কারও কারও চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। দেশভাগে, দাঙ্গায়, ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বার্থবাদী চক্রান্তে, নিম্নবর্গের মানুষগুলোর পাঁজরার তলায় গোপনে যে অসন্তোষ, যে ক্ষোভ এতদিন গুমরে গুমরে ছিল, আজ সেটা নাড়া খেয়ে আগুন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে। মানুষের দলটার মাথার ওপরে ধুলো আর ঝুলকালির ঘন মেঘ ভাসছে। ঘর্মাক্ত কালো মুখগুলি ঝলসে উঠছে, চোখ আর দাঁতগুলি ঝিলিক কাটছে। দেখতে চাইলেই দেখা যায় না। মানুষ ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।

কাঁধে শিকেবাঁক। দু'ধারে শিকেয় ধামা। ধামার ভেতর থালা-বাসন, হাঁড়িকুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটুলি সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র সব ঠাসা। কোনও কোনও ধামায় কচিকাচা, বুড়োবুড়ি, ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পথে নেমে হাঁটছেন। মেয়েছেলে ছিন্নমস্তা, তাঁরা পথের বোঝা, তাঁদের নিয়েই যত ঝামেলা, দুর্ভোগ আর অশান্তি। পথে নানা বিপদ। পোয়াতি পথেই বিয়োচ্ছেন, অনাথ আঁতুর পথেই পড়ে থাকছেন। শেয়াল, কুকুর, আঁতুড়ের ছেলেমেয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ সব ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটে চলেছে, আমি তার অতি সামান্য মনে রাখতে পারছি।

যুবতী সুন্দরী বউ-ঝিরা পথে দুষ্টু মানুষের পাল্লায় পড়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। না-হলে পথে পড়ে, কেঁদে আকাশ ফাটাচ্ছেন। উপায় নেই, মানুষ তাই সব দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, শোকতাপ বুকে চেপে রেখে প্রাণ হাতে নিয়ে পথ মাড়াচ্ছেন, হেঁটে চলেছেন, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। নিরন্ন মানুষ, অগুণতি মানুষ প্রাণ বাঁচাতে সন্তান আর জায়ার হাত ধরে হেঁটে চলেছেন। বৃদ্ধ আঁতুড়, অনাথ শিশু, সদ্যজাত পথেই মরে পড়ে থাকছে। কেউ মুখ ফিরিয়ে দেখছে না। পেটের সন্তান কোলের বোঝা হলে মা সন্তান ছুঁড়ে ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছেন। কেউ কাউকে দেখে না, সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে ছুটছেন, প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছেন— বউ পথে স্বামীকে হারাচ্ছেন। স্বামী হারাচ্ছেন বউকে। বাঁচাও বাঁচাও প্রাণ যায়। কে কাকে বাঁচায়।

সবাই মৃত্যুপথের যাত্রী। উর্ধ্বশ্বাস ছুটছেন। আশেপাশে পিছনে— কোনওদিকে দেখবার সময় নেই, সুযোগ নেই। মানুষ ছুটছেন।

এক ছিন্নমূল পড়েছিলেন পথের বুকে। মলমূত্রে একেবারে মাখামাখি। কাতর স্বরে তিনি ডাকলেন: প্রাণ যায়। জল দাও। প্রাণ বাঁচাও। জল দাও। প্রাণ যায়। প্রাণ বাঁচাও। কেউ শোনেনি তাঁর কথা। কেউ শোনে না। শুনেও না-শোনবার ভান করে চলে যায়। পিছন ফিরে তাকায় না। সঙ্গী সামনের মানুষ দূরে চলে যায়।

কী ভয়ংকর, কী বীভৎস, কী নৃশংস সময়ের ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে প্রাণটুকু বুকে চেপে আমরা পথ হাঁটছিলাম।

আমাদের দিন সুনির্দিষ্ট, ছিয়ানব্বই অঞ্চলের আত্মীয়স্বজন, সঙ্গীসাথীরাও পাকিস্তান সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। আমরাও মিলিত হব তাঁদের সঙ্গে। আমরা একই দিনে, একই সময়ে সীমান্ত পেরিয়ে একসঙ্গে পা রাখব হিন্দুস্থানের মাটিতে। একই সঙ্গে ভেসে যেতে পারব যতদূর যাওয়া যায়। তার জন্যই দ্রুত পায়ে আমরা হাঁটছি।

দেশভাগ, বাংলা ভাগ, মাতৃভূমি ভাগের বিষাক্ত শেলবুকে বিঁধিয়ে নিয়ে আমরা কোন জাহান্নামে চলেছি— মহাপ্রলয়ের এ কোন কালস্রোতে আমরা ভেসে চলেছি।

অবসন্ন, রক্তাক্ত দেহে খেটো ধুতি পরা— তাও ছেঁড়া ময়লা, মুখটা ছুঁচালো, মাথাটা লম্বা, খাটো করে কাটা চুল, খালি গা, খালি পা, একজন কৃষকই বুঝি হবেন, রাস্তার পাশে শিশুগাছের গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ কাঁধে, হাতের কবজিতে, কপালে অস্ত্রের আঘাতের ক্ষত, এখন দগদগে ঘা,

ভনভন করে ডুমোমাছি উড়ছে, বসছে ঘা-র ওপর। মানুষটা হঠাৎ ক্ষীণ স্বরে, শুকনো গলায়, মিনতি করে বলল, কেডা যায়। বাবারে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়। গলায় এক ঢোক জল ঢেলে দিতে পারিস! জল খেয়ে প্রাণে বাঁচি! কেডা যাস্। এক ঢোক জল দে, বাবা রে প্রাণে বাঁচি। অসহায় মানুষটা যেন কাঁধে গুঁজে থাকা মাথাটা খানিক টেনে তুলে, চোখ মেলে হাঁ করে জল চাইছিল, প্রাণপণে শব্দ করে।

বড়দা থমকে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে এক মুহূর্ত এক নজর দেখলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, রও দাদা, রও দাদা জল দিচ্ছি তোমাকে। একটু ধৈর্য ধরো। বড়দা মাথার বোঁচকা একহাতে বুকে চেপে ধরে ছুটে এলেন আমার কাছে। ফের হাত বাড়িয়ে বললেন, দে ভাইডি, জলের ঘটিটি দে। তৃষ্ণায় মানুষটার প্রাণ যায়। বড়দা আমার হাত থেকে ফেরো ঘটিটি টেনে নিয়ে ছুটে গেলেন মানুষটাকে জল খাওয়াতে। গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন, নাও দাদা, জল খাও, জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাও। নাও জল খাও।

মানুষটার গাল বেয়ে তখনও চোখের জল গড়াচ্ছে। মুখ হাঁ করে রইলেন। বড়দা তাঁর মুখে জল ঢেলে দিলেন। মানুষটা ঢক ঢক করে দু'ঢোক জলপান করে ফের চোখবুজে ঘাড়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন— যেন অচৈতন্য।

ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গীসাথীরা বেশ কিছু দূর চলে গেছেন। অন্য কোনও উপায় না থাকায় মানুষটাকে পথে ফেলে রেখেই আমরা ছুটে গিয়ে তাঁদের সঙ্গ নিলাম। একসঙ্গে হেঁটে চললাম সবাই মিলে পিচঢালা রাস্তা ধরে।

'একটু জিরিয়ে নিতি পাল্লি বাঁচতাম রে, আর পারি না— বড়মামা কথা বলতে বলতেই কাঁধের বাঁক নামালেন রাস্তার কোলে। কোমর থেকে গামছা খুলে তিনি মুখের ঘাম মুছে ফেলেন। আমার বড়মামা মাথায় সামান্য টাকপড়া, বেঁটেখাটো মানুষ। খাটো ঠ্যাং, ল্যাংলেঙ্গে দু'খানা হাত, থুতুনি বেশ চাপা। মামার পা তাড়াতাড়ি চলে না। ফলে তিনি বোঝা টেনে হেঁটে এসে খুবই ক্লান্ত অবসন্ন, হাঁপাচ্ছেন, চোখ দু'টিতে কষ্টের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। একটা সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলে আগের কথাটার তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, দাঁড়াও বড়কোদা। আমাগে পিছের মানুষ সুমুখে আসুক। সুমুখে যারা এগিয়ে গেছে তাদের থামতি বলো বড়কোদা। তাগে থামতি বলো।

বড়দা দাঁড়িয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। মামার জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ নীলচোখ দু'টি তুলে ধরে, বড়দা গলায় দরদ ঢেলে দিয়ে বলেন, দেশের বুকে ইতিহাস যে খানাখন্দ তৈরি করে দিয়েছে তা আমরা ডিঙোতে পারিনে।

তা এড়িয়ে যেতেও পারিনে। যখন পথে নেমেছি, সবই আমাদের সইতে হবে মামা, উপায় নেই। এ মহাবিপর্যয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই তো তপ্ত পিচের ওপর দিয়েই হেঁটে চলেছি খালি পায়ে। ফোস্কা ফেটে কাঁচা ঘা দেখা দিলেও থামা যাবে না। দু'দিন ধরে হেঁটে হেঁটে প্রত্যেকেরই হাঁফ ধরেছে। মামা একটুখানি জিরাও, সকলকে থামতে বলছি। বড়দার সমবেদনা— ডালপালা মেলে ফুলে ফলে আলোয় ভরে ওঠে।

এর মধ্যেই অনেকে কাছে এসে গেছেন। সুরেন বাছাড় কাঁধের বাঁক মাটিতে নামাতে নামাতে বলেন, চারদিন হয়ে গেল নিজের চেহারাখানা দেখি না। দেখলেই যে ও রে মা রে, ও রে বাবা রে বলে আমি নিজেই পালাব, তাতে কোনও ভুল নেই। গোলমাথা, পাকাচুল, বেগুনি গাল আর মস্ত নাকের সুরেন বাছাড়, ভাঙা গলায় বুকের ব্যথা মুখে এনে বলেন আর আকাশপানে চেয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পাশেই বসেছিলেন এক বৃদ্ধ, মুখের চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে। কিন্তু চোখ দু'টিতে তাঁর বয়সের ছোঁয়া লাগেনি। রোগা ঘাড় ফিরিয়ে সকলের কথাই তিনি শুনতে চান। পথ চলতি সকলের ওপর ঘুরে বেড়ায় তাঁর দৃষ্টি। অস্পষ্ট ভাবে কী যেন বলেন নরেনদা। তার পর সরে আসেন তাঁর কাছ থেকে। লোকটার কোঁচকানো চোখের ধারালো দৃষ্টির সামনে, অনিচ্ছায় চোখ বুজে ফেলেন।

ওদিকে নয়ানজুলিতে আধপোড়া কাঠে হেলান দিয়ে মাটির ওপর আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে মরা একটা মানুষের দেহ। ডান কাঁধের ওপর হেলে আছে খালি মাথাটা। বাঁ হাতটার রোগা আঙুলগুলো যেন মাটি খিমচে ধরে আছে আর ডান হাতে ছিল যে একটা লাঠি, তা বোঝা যাচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাকাই মরা মানুষটার দিকে। বিশ্রী ভাবে পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। দু'পায়ের ফাঁকে ছোট্ট বোঁচকাটি। একটা চোখ যেন ঝাপসা ভাবে তাকিয়ে আমার দিকেই, ঠোঁট দু'টি ফাঁক, যেন অবাক হয়ে হাঁ করে আছে মানুষটা। লোকটার রোগা টিং টিঙে দেহটা চোখামাথা আর হাড্ডি-বের-করা দাগড়া দাগড়া মুখ বুঝি মরণের আক্ষেপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। বুক ভেঙে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনিই বেরিয়ে আসে। চোখ সরিয়ে নিই ভয়ে ভাবনায় আর অসহ্য বেদনায়।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছি, তার গা-ঘেঁষে আলুথালু বসে আছে ছোট্ট একটি পরিবার। পুরুষটা মধ্যবয়সি, গোঁফ আছে, চোখ দুটো বেশ ছোট, গাট্টাগোট্টা চেহারা, মস্ত একটা আলু হাতের তালুতে রেখে নুন ছিটিয়ে মুখে

পুরে চিবোতে লাগল ঠিক ষাঁড়ের মতো। খেতে খেতেই পুরুষটা তার পাশে বসা বউটিকে ধমকায়, হেই, খেঁকি কুকুর, বাচ্চাডারে মাই দে না, মাই দে শিগগির।

বউটার হাড় বের করা হলদে মুখ, কালো কোটরের মধ্যে বসে যাওয়া চোখ দুটো জ্বলছে যেন জ্বরের তাড়সে। নুইয়ে বসা শরীর থেকে কর্কশ হাঁপানির শব্দ উঠছে সাঁই সাঁই করে। কোলে তার রোগা একটা বাচ্চা মেয়ে— সমানে চিৎকার করে কান্না করছে। বউটা কিছুতেই তাকে সামলাতে পারছে না।

বউটা ধমক খেয়ে রোগা অস্থিসার শরীরে আরও জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে। মুঠো মুঠো বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে যেন গিলতে চায় লোভীর মতো। দুর্বল অস্থিসার আঙুলগুলো বুকের ওপর নাড়াতে নাড়াতে জামার বোতাম খুলে খুঁজে টেনে আনল শুকেনো একটি স্তনের বোঁটা, তাই গুঁজে দিল তার বাচ্চার মুখে।

আমাদের ডান দিকে নয়ানজুলির খাদে রান্না চাপিয়েছে একটি পরিবার। তিন ইটের উনুনে হাঁড়ি চড়ানো। আগুন জ্বলছে, পাতাপুতি ডালপালায়, ধোঁয়া উঠছে আকাশকে আড়াল করে। ক্ষুধায় কাতর এক বয়স্কা বিস্ফারিত দুই চোখে আগুনের আর হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। বয়স্কা অনর্গল কেশে চলেছেন। কাশির ঝোঁকে থরথর করে কাঁপছেন— যেন ব্যাধিক্ষয়িত দেহখানা থেকে অবশিষ্ট প্রাণটুকু বেরিয়ে আসার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। আগুনের লাল আভা খেলা করছে বয়স্কার মুখে। তবু নিষ্প্রাণ ত্বকে জীবনের রং ধরছে না। শুধু চোখে তাঁর নির্বাণোন্মুখ আগুনের জ্বালা।

যাঁরা দূরে ছিলেন তাঁরা কাছে আসতে থাকলেন। আর যাঁরা কাছে এসে দলে ভিড়েছেন, তাঁরা একটু জিড়িয়ে নেবার ফুরসত পেতেই জীবনের ইতিহাস খুলে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লেন। বউ-ঝি, মা-মাসি, পিসি-বউদিরা ফিরে গেলেন মা-মাটির উষ্ণ আলিঙ্গনে।

মা গো, মা, আমার ঘরের আড়ায় ঝুলছে পুঁটলি-বাঁধা শাকমুলো, বেগুন-সরষে, লাউয়ের বিচি, তুষভর্তি জালা, ঢেঁকিশালে নোটভর্তি শুকনো ধান— সব ফেলে রেখে চলে এসেছি। মা গো, মা, আর কবে ফিরি পাব তা সব। হায় হায় আমার কী হবেনে, সে সব কনে পাবানি! চেনা গলায় কে একজন ভিড়ের ভেতর জোর কান্না জুড়ে দেন।

আমি মাঠে গোবর কুড়াতাম, খেতের আলে কাঁচা ঘাস কাটতাম, টুনি জালে বিলে-খালে মাছ ধরতাম, কুড়ল মেরে কাঠ ফাড়তাম— হায় হায় জেবনে তা সব কী কোনওদিন ফিরে পাব আর? কার ভাঙা গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে হতাশা ছড়াতে থাকে।

বলি, আমরা তো মেয়েমানুষ— দশ হাতে কাছা নেই, তোমরা ব্যাটারা সব্বাই তো ছিলে, পাঁচপুরুষ মাথা এক ঠাঁই হয়ে, এত সব নৈরেকার কাণ্ড ঘটে গেল, দেশখান দু'টুকরো হয়ে গেল, তার কিছুটি করতি পাললে না? ঘরের বউঝিদের ধম্মই যদি রাখতি না পারলে তাহলি কিসির জেবন তোমাগে? ক্ষতবিক্ষত একটি কালোমুখ, ট্যারা চোখ, ঝুঁটি-বাঁধা মাথা নাড়িয়ে ভেতরের ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন আর হাতের আঙুল তুলে অভিযোগ করেন।

ভরা পোয়াতি হলে কী হবে পুতুলবউদির নাক তো অনেক লম্বা— পরের ঘরের যত সব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি শুঁকতে না পারলে তাঁর পেটের ভাত হজম হয় না। তিনিই রাস্তার মাঝে হাঁড়ি ভাঙলেন। যার বউকে অন্য পুরুষে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে, পাকা তিনমাস ঘাটাঘাটি করল, নষ্ট করল— সেই ননী মালাকার তবু নষ্ট-বউ শিবানীকে নিয়ে এই হিন্দুস্থানের পথে, এই নয়ানজুলিতে তিন ইটের উনুনে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে গলায় গলায় দেখো পিরিত করছে— মা গো মা, ঘেন্নায় বাঁচিনে। এও দেখতি হল দু'চোখ মেলি। ছিঃ ছিঃ— পুতুলবউদি দু'পা সরে গিয়ে থুথু ছুড়ে কাপড়ের আঁচল টেনে মুখ মোছেন।

এর মধ্যেই দেখি একজন মাঝবয়সি পুরুষ, মুখে বসন্তের দাগ, খালি গা, খালি পা, খেটো ময়লা, ছেঁড়া ধুতি পরা, মাথায় বোঁচকা, হাতা-খুন্তির ডাটি— দেখা যাচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে গলায় উত্তেজনা ঢেলে দিয়ে বললেন:

আমাগে মণির মা রে তুমরা দেহিছ? কোলে দেড় মাসের বাচ্চা, হলুদ শাড়ি পরা, চোখ ট্যারা, নাকে নাকচাবি। আমাগে মণির মা, কনে গেল? ও গো তুমরা বলতি পারো, কনে গেল। ও মণির মা, ও মণির মা গো— তুমি কনে গেলে। তুমি কনে গেলে গো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা ভিড়ের স্রোতে মানুষটা তার মণির মাকে উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে অন্তহীন খুঁজে চলেন।

মুখে গভীর ক্ষতের চিহ্ন, একটা চোখ সামান্য ছোট, ছিনেজোঁকের মতো পাতলা শুকনো চেহারা, হাঁটুর ওপর হাতের তেলোয় ভর দিয়ে বসে নিজের চোখে দেখা ঘটনা বলতে শুরু করল, দাঙ্গাবাজরা যহোন আমাগে দক্ষিণ ডহরপোতা গাঁয়ে ঢুকিল, আমি ছুটি গিয়ে বুদ্ধি করে নিরাপদ কীর্তনীয়ার খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে, লুকিয়ে থেকে দেখলাম, নিরাপদর সুন্দরী সুবাঁশি রে দাঙ্গাবাজরা উঠোনে চিত করে ফেলে ছিঁড়ে খাচ্ছে। নিরাপদ কীর্তনীয়া পাগলের মতো ছুটে গেল দাঙ্গাবাজদের কবল থেকে বউকে ছিনিয়ে আনতে। এক দাঙ্গাবাজ ছুটে এসে রামদার এককোপে নিরাপদ কীর্তনীয়াকে দুখণ্ড করে, ফের বউটার

মধু লুটতে ছুটে গেল।

দাঙ্গাবাজরা সুবাঁশিকে অর্ধমৃত ফেলে রেখে ঘরের সব লুঠপাট করে বুক চিতিয়ে চলে গেল। আর আমি প্রাণে বেঁচে ছুটে গেলাম বউটার কাছে। বললাম, মা, পালিয়ে যাও শিগ্‌গির, দাঙ্গাবাজরা ফের আসতি পারে। যাও মা, পালিয়ে যাও। সে বলে, পালিয়ে কী হবে?

প্রাণে বাঁচবি তো, যা মা, পালিয়ে যা, শিগ্‌গির যা মা । গলায় সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে বলি। ফের সে বলে, আমাগে পরান! এ পরান থাকলি বা কী, আর গেলি বা কী?

তবু তো কাঁচা প্রাণটা হেলায় হারাবি! যা মা, বাঁচ গিয়ে। মরে কোনও লাভ নেই মা। যা পালা। আমি হাল ছাড়িনে দাদা। সে কিন্তুক নাছোড়বান্দা নড়তেই চায় না।

সে বলে, আমাগে কাছিমের পরান বাবা। এ মত্তি চায় না সহজে। মরেও না, বাঁচেও-বা কী হবে?

প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার আগে শ্রোতা বয়স্ক পুরুষ মানুষটা ঘাড়ে বোঁচকা তুলতে তুলতে শুধোয়, তোমাগে বাড়ি কনে ছিল গা?

শুকনো চেহারায় মানুষটি বলে, আমাগে বাড়ি ফরিদপুর।

পাশের এক প্রৌঢ়, বুকে পাকা লোম নীল চোখ গালের বলি রেখার ভাঁজে ভাঁজে তখনও যেন চোখের জল টলমল করছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচড় কেটে বলেন, ফরিদপুর, বরিশাল যশোর, খুলনা, পাবনা কয়ে আর কী হবে ভাই। এহান যা অবস্থা চাল-ডাল-জিরে-ধনে সব মিলেমিশে তো একাকার হয়ে গেল। আমাগে এই মানুষগুলানরে এ্যাহোন কী কতিছে তা শোনোনি ভাই?

ক্যান কী কয়? ও-পাশের ভিড় থেকে একজন ফোড়ন কাটেন।

আমরা হলাম গে রিফিউজি; কিন্তু কেউ তা কয় না, আমাগে সক্কলে কয় রিপু! রিপু!

ওদিক থেকে ভিড় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে মরিপড়ি ছুটছেন এক মহিলা আর মুখে সমানে চিৎকার করে চলেছেন:

আমাগো যশোরের হরবোলা মানুষটা কনে গেল? ও ফটিকের বাবা, ও ফটিকের বাবা, কনে গেলে তুমি? ফটিকের বাবাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছেন এক মধ্যবয়সি মহিলা তাঁর অতল হতাশা আর ত্রাসের ঢেউ উথাল-পাতাল করছে, আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে।

কখন যে আমাদের দলটি চলতে শুরু করেছে টের পাইনি। আমার জীবনের

এই কঠিনতম দিনগুলি, মুহূর্তগুলি, আমার কাছে ছিল হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো অমোঘ তাই বারে বারে নিজেকে ভুলে ঘটনার উত্তাল স্রোতে ভেসে যাচ্ছি, স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিনে। সবাই কিছুদূর চলে যেতেই যেন আমার হুঁশ হচ্ছে, আমিও দেশভাগের মহাদুর্যোগে অনাহার আর নৈরাশ্যকে নিয়ে ছিন্নমূল জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছি, চলেছি, প্রতিমুহূর্তে অনন্ত অনিশ্ছয়তা, আশংকা ও প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা বুকে, ইতিহাসের ঘনঘটার খরস্রোতে অন্তহীন ছুটে চলেছি।

পচা মড়ার ওপর যেমন পোকা গিজগিজ করে তেমনি গোটা যশোর রোড ধরে শিকড় ছেঁড়া মানুষ গিজগিজ করছে। পাঁচ, আট, বারো দিন কেউ কেউ একটানা হেঁটে এসেছেন— খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, চোখেমুখে তাদের খিদের আগুন জ্বলছে। খিদেয় নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে। এমনকী মনুষ্যত্বকেও গিলে খাচ্ছে খিদে নামক অসুর দানব। পথেই অসৎ মানুষের খপ্পরে পড়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে যুবতী সুন্দরী নারী, কোলের ফুটফুটে শিশু। এত কিছুর মধ্যেও খিদের জ্বালায় ধুকপুকিয়ে কেউ কেউ বেঁচে থাকছেন। কিন্তু সে বাঁচা-মরার বাড়া, পচে-গলে যাওয়া।

সরস মাটি থেকে টেনে ছিঁড়ে উপড়ে আনা মানুষগুলি এখন পাতা শুকিয়ে আমশি হয়ে যাওয়া চারাগাছের মতো মৃত্যুমুখে ঢলে পড়া মানুষগুলি,— তাদের প্রাণরস শুকিয়ে যাওয়া ধূসর মুখগুলি, খুনির তাড়াখাওয়া ভয়ার্ত অস্থির চোখগুলি, — অন্ধজীবের অনিশ্চয়তার ঘন আঁধারে বাঁচবার পথ ঘুঁজে হয়রান হওয়া জীবনগুলি, চিরকালের মতো আমার সরল সহজ শিশু হৃদয়ে ছাপ রেখে যাচ্ছিল। আমার আশপাশে হাতের নাগালে ঘটে চলা অন্তহীন ঘটনা স্রোত— তার নির্মমতা, নিষ্ঠুররতা, হৃদয়হীনতা, আর ভয়ংকরতা আমার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমাকে বারবার ছুঁড়ে দিচ্ছিল অন্য এক পৃথিবীতে— যেখানে মানুষের জন্যে কোনও মানুষ নেই, দয়া নেই, করুণা নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, মানবিকতা নেই, মনুষ্যত্ব নেই। মানুষের এত বিপুল অপচয় এ পৃথিবী এর আগে কোনওদিন দেখেনি।

পিসি পথের কষ্টে অস্থির হয়ে চটে ওঠেন। কে জানে বাছা, কনে যাচ্ছি আমরা। এতটা দূর আলাম পথের তো কোনও মুড়োদাড়া পালাম না বাপু। কী যে হবে! হায় হায় সন্ধ্যা হতি যাচ্ছে কে আমাগে ভিটেয় গোবর দেবে, ঘরের দেওয়াল লেপাপোঁচা করবে? কে ভিটায় তুলসিতলায় পিদিম দেবে? ভিড়ের ভেতর কারও কান্না শোনা যায়।

এক মধ্যবয়স্কা মহিলা হা-হুতাস করে কাতর কণ্ঠে কয়, ওগো ঠাকুর, তুমি আমাগে এমন করে হাঁচড়ে পিঁচড়ে মারতেছ ক্যান ঠাকুর। আমাগে এক্কেবারে মারি ফেলো ঠাকুর। ল্যাঠা চুকে যাক। আর পারি না ঠাকুর, আর পারি না।

মা গো, ঘর চলো মা। আর যে হাঁটতি পারি না। ঘর চলো মা। মা গো পারি না। ঘর চলো মা!

ঘর কোথা পাব বাবা? মা মুখ ফিরিয়ে কাঁদেন। শিরাভাসা কালো হাতে লালকড় এয়োতির চিহ্ন, হাঁটতে গিয়েও থামেন, দাঁতে দাঁত চেপে শূন্য আকাশ মাথায় নিয়ে শুদ্ধ হয়ে থাকেন। হঠাৎ বুঝি বুকে একটা চোট খেয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আর আমি প্রাণপণে বুকে বল বেঁধে সমস্ত ক্ষুদ্র দুষ্ট চিন্তা ঝেড়ে ফেলে শিকড় ছেঁড়া জীবনের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু পারি না, কী যেন একটা প্রতিকূল শক্তি আমার বুকে আঘাত হানছে, আমার চলার গতি থামিয়ে দিচ্ছে— আমার রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপদপ করছে। মাথার চুলের গোড়া থেকে ছুটছে আগুন, আগুন মাথায় নিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ ঠাকুরদার, বাবার, আমার পূর্বপুরুষদের মুখ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো খেলে যায় আমার কচিচিত্তের আকাশে। এক মুহূর্তের দ্বিধায় মনপ্রাণ আমার শক্ত হয়ে ওঠে। বুক ধড়ফড়ানিটা শান্ত হয়ে আসে। আমার চেতনার দরজা খুলে যায়। জীবন এসে হাত ধরে প্রশ্ন করে:

এ কী কালান্তর?
যুগ কি এ ভাবেই বদলে যায়?
এমনই ভাবেই কি মানবসমাজে নাড়া পড়ে?
যুগ পালটায়?
মানুষ সময়ের বুকে পদচিহ্ন রেখে যায়?
যুগে যুগে— নতুন যুগ— এ ভাবেই কি আসে? যায়?
এ ভাবেই কি মহাকাল ইতিহাসের পায়ে শৃঙ্খল পরায়?
ঘোর দুঃসময় আর তার পথের বুঝি শেষ নেই...।

মহাবিপর্যয়ের স্রোতে ভাসা প্রাণ

পাকিস্তান সীমান্তে বেনাপোল অর্থাৎ যে স্থানে কোনও নদী নেই, কোনও সেতু নেই অথচ পার হতে হবে। বেনাপোল সীমান্তচৌকির এক মাইলের অধিক

স্থান জুড়ে শিকড় ছেঁড়া মানুষ যশোহর রোডে এবং তার দু'ধারে কাতারে কাতারে আটকে আছেন। রাত-দিন একই ভাবে সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউয়ের মতো মানুষ আছড়ে পড়ছেন। প্রতিদিন যত মানুষ সীমান্ত পার হয়ে হিন্দুস্থানে ঢুকছেন তার থেকে তিনগুণ মানুষ পাকিস্তান সীমান্তে আটকে পড়ে, আকাশের নীচে, গাছতলায়, নয়ানজুলির নিচু খাদে গিজগিজ করছেন। সামান্য পরিসর স্থানে অগুনতি পরিবার হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গাদাগাদি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পড়ে অছেন। এতগুলি মানুষের জন্য না আছে নলকূপে জল, না আছে নারী-পুরুষের জন্য শৌচালয়। একই জায়গায় থাকা-খাওয়া, শোওয়া-প্রস্রাব-পায়খানা, জন্মমৃত্যু— সবই চলছে।

পাকিস্তান সীমান্তের এক মাইল আগে থেকেই মাটিতে পা রাখতেই জীবন্ত নরকের আমি সাক্ষাৎ স্বাদ পেলাম। পূর্ববাংলা থেকে আগত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকছেন। যাঁদের চাল আছে, ডাল আছে তাঁরা তিন ইটের উনুনে রান্না করে তিন বেলার খাবার একবার আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকছেন। যাঁদের সে অবস্থা নেই, দিনের পর দিন উপোস করে থাকছেন। কালেভদ্রে কখনও বিভিন্ন বেসরকারি সেবা-প্রতিষ্ঠান চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য শুধু চিড়ে আর গুড় দিচ্ছে। এখানেই সরকার এবং সেবা-প্রতিষ্ঠানের সব দায়দায়িত্ব শেষ। যদি কোনও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, দেখবার কেউ নেই। কোনও নারীর প্রসব বেদনা উঠলে আশে পাশে যাঁরা আছেন, তাঁরা ছাড়া সাহায্য করার কেউ নেই। অসহায় নিরাশ্রয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, কেউ নেই।

আমরা দল বেঁধে স্বজনদের খোঁজ করতে করতে ভিড় ঠেলে সীমান্তের আধামাইল আগে এসে তাঁদের দেখা পেলাম। বোঁচকা-পুঁচকি নামিয়ে প্রথমেই আমার চোখ গেল একটি জীবন্ত কঙ্কালের ওপর। মানুষটি মলমূত্র বমিতে একাকার হয়ে আছেন। নগ্নশরীরে একটুকরো কাপড় নেই, যুবতী নারী, কিন্তু বোঝবার কোনও জো নেই।

বসতে বসতে শুনলাম আমার দূরসম্পর্কের ঠাকুরদা সুভাষ বালার ছোট মেয়ে মণিমালা গত তিনদিন হল ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনৈতিক জীবনের পথে চলে গেছেন। সেবাকর্মীর মুখোশ পরে তিন ঠগ এসে হারানের বউ যমুনাকে দু'দিন হল তুলে নিয়ে গেছে। কোনও কোনও ঠগ জুয়াচোর বাটপাড় টাকা ও ত্রাণসামগ্রী পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে নেতা সেজে অসহায় বউ-ঝিদের সঙ্গে সহবাস করে সরে পড়ছে।

আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ছিয়ান্নব্বই অঞ্চলের পনেরোটি পরিবার। এই পনেরোটি পরিবার ছিয়ানব্বই অঞ্চলের পনেরোটি গ্রাম থেকে এসেছে, পাঁচকাটিয়া গ্রামের নিরঞ্জন বিশ্বাস, পাঁচাকড়ি গ্রামের সুবল বৈরাগী, সুন্দলীগ্রামের সুধীর মণ্ডল, কুচলিয়া গ্রামের শশধর বিশ্বাস, মশিয়াহাটি গ্রামের সুধন্য মল্লিক, আলিপুর গ্রামের সুপদ রায়, সুজাতপুর গ্রামের বনবিহারী বাছাড়, কোড়ামারার নিখিল কীর্তনীয়া, মহাদেবপুরের অঘোর করাতি, খচিরাডাঙা গ্রামের নিমাই বাইন, তুলোরামপুর গ্রামের সনাতন বাছাড়, বলার আবাদ গ্রামের গৌরপদ চৌধুরী, রূপরামপুরের সীতাকান্ত সেন, বাহাদুরপুর গ্রামের সুধাকান্ত মৃধা, দহকুলা গ্রামের কাশীনাথ সর্দার। এতগুলো মানুষ গত তিনটি দিন আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করে, এবার চলতে শুরু করলেন।

বেনোজলের মতো ছুটে চলেছে মানুষ। নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কী-এক চঞ্চলতা, অস্থিরতা, সকলের চোখেমুখে। প্রাণ আর মান বাঁচানোর টানে কেবলই ছুটে আসছে মানুষ আর মানুষ, যেন আগ্নেয়গিরির বুক ফেটে লাভার স্রোত বইছে। একেবারে সামনে গিয়েছেন বড়দা, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি ও, আমাদের আশেপাশে ধীরে চলার দল চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে— সোনার মানুষ পথে নেমে কী ভাবে মরছে, হারিয়ে যাচ্ছে, আমি ভাবি আর বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। হঠাৎ দলটা সামনের দিকে ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে হটতে লাগল, শঙ্কার চাপা গুঞ্জন উঠছে ভিড় থেকে। আবার মানুষ উদ্বেল হয়ে ওঠে। আকাশকে প্লাবিত করে মানুষের ভয়-ত্রাস। কেউ কেউ আবার স্তিমিত হয়ে যায়। মানুষের বিশ্বাসের ভিত ফের নড়ে যায়, প্রত্যেকের চোখে-মুখে গলার স্বর ভয়-ত্রাস জড়িয়ে— এত কিছু খুইয়ে এত ছোটাছুটি করে এসে ফিরে যেতে হবে? হিন্দুস্থানে যাওয়ার পথ, হিন্দুদের বাঁচার পথ, এখানেই কি রুদ্ধ হয়ে গেছে? আমাদের দলের কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না। বড়দা ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যান সামনে, সঙ্গে আমিও। যারা পিছিয়ে আসছে পদে পদে ধাক্কা খেতে হয় তাদের সঙ্গে। কেউ ভুরু কোঁচকায়। কার ও মাথা নিচু, কারও মুখে দুশ্চিন্তার কড়া ছাপ, কারও চোখের কোল ছাপিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে চলেছে। চোখভরা মিনতি নিয়ে বড়দা যেন ভাষা খোঁজেন সকলের মুখে প্রাণে। কিন্তু যে সব কথা কানে আসছে তার মধ্যে প্রাণ নেই, মানুষের বাঁচার আবেগ নেই। অনেকের চোখে শোকের ছায়া নেমে এসেছে জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে এই মানুষগুলোর কী বাঁচারও অধিকার নেই। প্রাণটা আমার হায় হায় করে ওঠে।

আমরা সকলে একসঙ্গে পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়ে হিন্দুস্থানে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম।

লম্বা বাঁশের মতো কাঠের আড়া টাঙিয়ে রাস্তা আটকে সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। নোম্যান্স ল্যাণ্ডের একদিকে বেনাপোল-পাকিস্তান সীমান্ত, অন্যদিকে পেট্রাপোল-হিন্দুস্থান সীমান্ত।

ধূসর উর্দি-পরা, লম্বাটে মুখ, সূক্ষ্মাগ্র দাড়ি, দীর্ঘকায় পুলিশ— দু'হাত দিয়ে অভদ্র ভাবে খানা তল্লাশি নামে নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিষ্ঠুর ভাবে হাতিয়ে দেখছে। অন্য পুলিশ মোটাসোটা, চওড়া কপাল, চোখ ট্যারা, রাঙা কটা চুল ফ্যাকাশে মুখখানায় মস্ত বড় নাক, হাসি টিটকারী আর গালিগালাজ করছে চুটিয়ে আর সকলের জামাকাপড়ের ওপরে হাত দিয়ে চেপে চেপে দেখছে, গোনাগুনতি করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন ঘৃণিত ব্যবহার করছে পুলিশ-প্রশাসন— যা চোখে দেখা যায় না।

লাল গোঁফ পাঁশুটে মুখ আর ঝুঁকে-পড়া সরকারি অফিসার ছাড়পত্র পরীক্ষা করছেন, বেচারা তার জালার মতো পেটটি নিয়ে বড়ই বিব্রত। জামার ঝুল টেনে টেনে বারবার সেটি ঢাকছে, বারবার ঢাকা সরে যাচ্ছে।

পাকিস্তানি পুলিশের কাছে ঘাড় ধাক্কা খেয়ে আমরা যেন ছিটকে পড়লাম নোম্যান্স ল্যাণ্ডটুকু পেরিয়ে হিন্দুস্থান সীমান্তে— রাস্তা আটকে রাখা আড়ায়।

হলদে মুখ পুলিশ, মোটা শরীর জামার নীচে পইতে স্পষ্ট দেখা যায়, কালো মোটা পুরু ভুরু জোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা পাশ দুটো ঝাঁপিয়ে ধেয়ে এল। তীব্র আক্রোশের সঙ্গে তল্লাশির নামে তছনছ করতে থাকল বোঁচকাবুঁচকি, গোরু-ছাগল-কেনা দালালের মতো। নারী-পুরুষ হাতড়ে দেখে, চোখ কুঁচকে দুনিয়া দেখা প্রভুর মতো পাকা দৃষ্টি আমাদের মুখগুলি নিরীক্ষণ করে, আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে, উল্লাসে ফেটে পড়ে আর কাঁচা ঘৃণা ছুড়ে দেয় বারবার।

সরকারি অফিসারের দাপটে আর অযথা ধমকানিতে মানুষগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোবা হয়ে যায়। অপ্রস্তুতের মতো পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। হাঁটু কাঁপে, চোখের সামনে সব আঁধার দেখেন। তীব্র ঘৃণার পিচ্ছিল স্বরের ঝাপটা আরও নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। অমানবিক বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচায় মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে ওঠে, নিরুপায় মানুষগুলি পঙক্তিতে দাঁড়ায়।

রাস্তার ধারে তাঁবুর ঘরে বসেছিল একজন সরকারি কর্মচারী। টাকমাথা, কটা ভুরু, হাড়গিলের মতো চেহারা। মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম,

ভোঁতা আর মোটা গলায় লোকটা কথা ছুড়ে মারছিল। যারা লোকজন, মালপত্র খানাতল্লাশি করছিল তারা আরও পিছনে আরও শয়তান— হাড়ে হারামজাদা। গোরু-ছাগলের মতো নারী এবং পুরুষের গায় হাত দিয়ে তল্লাশি করছিল। এরা যে মায়ের পেটে হয়েছে, ওদের ব্যবহার ভাবভঙ্গি দেখে তা বিশ্বাস হবে না। ছিনেজোঁকের মতো মুখ বাড়িয়ে লোভীর ধারালো নখ দিয়ে মানুষের হাড়ের শাঁস অবধি টেনে বের করে আনতে পারলে যেন তৃপ্তি পায়।

সরকারি অফিসার লম্বা চওড়া, প্রশস্ত চেহারা, ফ্যাকাশে মুখ ঘনকালো ভুরু জোড়া নাকের ওপর এসে প্রায় মিশে গেছে। লোকটার একখানা লম্বা হাত সামনে পাতা কাঠের টেবিল পেরিয়ে ছাড়পত্র টেনে নিচ্ছে। আমার মনে হল লোকটার কনুই থেকে হাতের পোছাটা অনেক বেশি লম্বা। লম্বা হাতের কালচেপানা, গিট মোটা আঙুলগুলির আঠালো মাথা কাগজের ছাড়পত্র টিপেটিপে আঁকড়ে ধরছে। নেংটি ইঁদুরের মতো ছোট ছোট লাল টকটকে চোখ দুটোর ঢেলা বিচলিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রতিটি মানুষের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে মাথার চুলের ডগাটি অবধি, চোখ রেখে দেখছে আর ঠোঁট চাটছে বিশ্রী ভাবে।

লোকটার ভেতর থেকে একটা ঠেলামারা উৎসাহে, দাঁত খিঁচুনি দিয়ে শুকনো ধারালো গলায় বলল, এই, এই হতচ্ছাড়া বেজম্মা, আয় এদিকে, কী নাম তোর?— সঙ্গিন উঁচিয়ে রাখার মতো নিষ্ঠুরতা ছড়ায় আর তীক্ষ্ণ আঁচড় বিঁধিয়ে রাখে মুখে।

যে মানুষটা এগিয়ে এলেন, তাঁর খালি গা, খালি পা, পরনে ময়লা খেটো ধুতি, কোমরে ময়লা ছেঁড়া গামছা গিট দিয়ে বাঁধা। সজারুর কাঁটার মতো লালচে, কটা চুল, এত লম্বা চুল যে কানের লতি ছাড়িয়ে অসমান ঝুলে আছে বেঢপ। গোটা মুখটায় ধুলো উড়ছে, হলুদ কেতর ভরা গোল্লা চোখদুটোয় অসম্ভব দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তি ভরা। কোঠর থেকে ঠেলে ওঠা ভোঁতা নাকটায় জোরে শ্বাস টানার শব্দ ওঠে। মানুষটা বাঁ হাতের বড় বড় নখওয়ালা আঙুল দিয়ে বার দুই মাথা চুলকে সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দেয়, তা, তা আমার নাম হুজুর— অ-বি-না-শ ম-ণ্ড-ল।

সরকারি অফিসার দ্বিগুণ কর্কশ সুরে মোটা গলায় পচা কাদার মতো কথা ছুড়ে মারে। বলে, তোর কয় ছেলেমেয়ে? এ্যাই তোর কয় ছেলেমেয়ে? ক শিগ্‌গির।

ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া নিরীহ অবিনাশ মণ্ডল মিনমিন করে উত্তর দেন, আমাগে দু'ছাওয়াল, তিন মাইয়া হুজুর। এটা আমার পরিবার হুজুর।

ঘৃণা ভাবে বাঁ হাত উঁচুতে তুলে ধরে সরকারি অফিসার বলে, কই দেখি, তোর বুড়ো আঙুলটা।

সরকারি অফিসার সাঁড়াশি হাতটা বাড়িয়ে ধরে রইল আর চতুর লালাঝরা দু'চোখ দিয়ে গিলতে লাগল পাতলা অল্প ছেঁড়া কাপড়ে গা-ঢাকা সোমত্ত মেয়েটিকে— তার উদ্ভিন্ন পীনোন্নত বুক।

চোখ ছানাবড়া অবিনাশ মণ্ডল বোকাহাবার মতো পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন— ছেলেমেয়ে দেখাবেন না হাতের আঙুল দেখাবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না। তো তো কেরে মুখে সামান্য একটা শব্দ করেন। যা কেউ শুনতে পায় না।

সরকারি অফিসার কড়া তিক্ত সুরে জোরসে তাড়া কষায়, কই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা। এ্যই গেঁয়োভূত কোথাকার, শালা শয়তানের হাঁড়ি, ন্যাকা সাজা হচ্ছে? দে তোর বুড়ো আঙুলটা দে, বুড়ো হাবড়া।

অবিনাশ মণ্ডলের দেরি দেখে সরকারি অফিসার ফের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে, ধুৎ তোর নিকুচি করেছে। এ্যই ন্যাকা শয়তানকে নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল তো। এ্যই বেজম্মা কানে যাচ্ছে না? এ্যই কুত্তা ব্যাটা? দে তোর আঙুলটা দে, ন্যাকামি করার আর জায়গা পাওনি। সরকারি অফিসার যেন ঘৃণা, থু থু ছিটাতে থাকে আর মুখে যা আসে তাই গালমন্দ অনর্গল করতে থাকে।

মনে হল সরকারি অফিসারের কথাটা যেন অবিনাশ মণ্ডলের গায়েমুখে একটা চড়ের মতো লাগল। একবার দু'বার কথাগুলোর ওই স্থূল আক্রোশের ছোবলে অবিনাশ মণ্ডলের দৈহিক কষ্ট হতে থাকল— যেন গাল দুটোকে চিরে দু'ভাগ করে, চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে।

রাগে, তিক্ত অপমানে অবিনাশ মণ্ডলের চারদিক যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। তাঁর কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিঃশব্দে আর অপলক দৃষ্টিতে অবিনাশ মণ্ডলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর অবিনাশ মণ্ডল অথৈ ভাবনায় ডুবতে থাকেন।

আচমকা চারদিক থেকে শোরগোল চেঁচামেচি চিৎকার ছুটে আসে। আর সব কথা ডুবে যায় সেই শোরগোল চেঁচামেচি আর চিৎকারে।

কষ্টে-দুঃখে-বেদনায় আমার বুকের মধ্যের অস্বস্তির অনুভূতিটা চাপতে চেষ্টা করি; কিন্তু পারি না। কলজেটাকে সেটা ধীরে ধীরে শক্ত করে পিষে দিতে থাকে। অপমান, তাচ্ছিল্য-ঘৃণা ক্রমশ যেন ঠেলে উঠতে থাকল। গলার কাছে সারাটা মুখ আমার কেমন বিশ্রী একটা শুকনো বিস্বাদে ভরে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ভেসে উঠল দেশজননীর অঙ্গক্ষত চিত্তের আকাশে।

মুহূর্তের দ্বিধায় মনটা শক্ত হয়ে ওঠে। বুক ধড়ফড়ানিটা শান্ত হয়ে আসে।

আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিই। যে দিকে তাকাই অন্তহীন বিচিত্র বীভৎস সব ঘটনা ঘটে চলেছে। দাঙ্গাবাজ খুনিদের তাড়া-খাওয়া প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা বেঁটেখাটো একজন চাষি, ফতুয়া গায়ে অদূরে বসে ঝিমোচ্ছেন। চোখে চশমা পরা এক মধ্যবয়সি গঁ গঁ করে তাঁর বউকে বোঁচকাবুঁচকির ওপর চিত করে শুইয়ে বুকে তেল মালিশ করছে। কাঠিকুটি চেহারার দুধে বাচ্চাটি তার রোগা মা'র ছিবড়ে স্তনের বোঁটাটা মুখে টেনে নিয়ে চুষছে। একটি বাচ্চা মেয়ে রাস্তার ধারে মলত্যাগ করতে এসে চিলচিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কাঠের মূর্তির মতো যাঁরা ছাড়পত্র দেখানোর পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছেন, যাঁরা এখানে-সেখানে বসে প্রহর গুনছেন, তাঁদের চোখেমুখে অসীম অনিশ্চয়তা, যাঁরা চলতে শুরু করেছেন, তাঁদের চোখে ক্ষীণ আশার আলো চিকচিক করছে।

আমার চারপাশে এত সব জীবন্ত ঘটনা ঘটতে দেখছি— সেগুলি আমার হৃৎপিণ্ডে ঘষতে ঘষতে চলেছে, ছালচামড়া উঠে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে— যা কিনা নির্মমতম শাস্তির জন্য ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে, লম্বা দড়িতে বেঁধে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া, ছালচামড়া ছুলে যাওয়া জীবন্ত মানুষের রক্তাক্ত দেহের মতো— এত বছর পরেও চেতনাকেও করছে ক্ষতবিক্ষত আর রক্তাক্ত।

এক মা সদ্য বাচ্চার জন্ম দিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কঠিন বিবর্ণ মুখখানার প্রতিটি রেখা তীক্ষ্ণ ভাবে প্রকট। খালি গা, হাত দু'খানি বুকের ওপর চাপা। ঠোঁট দু'টি নড়ে কী-এক অব্যক্ত ভাষার ব্যঞ্জনায়। নিষ্প্রভ চোখ থেকে গাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

আমি চেয়ে থাকি চলমান জীবনের দিকে— আমার বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে অসংখ্য ঘটনা, ঘটনার প্রাণপ্রবাহে স্পন্দনের স্থানটুকুও বুঝি অবশিষ্ট থাকে না।

গোনাগুনতি খানাতল্লাশি শেষ, তছনছ বোঁচকাবুঁচকি ছেঁড়া ফুটো ন্যাকড়া, ঘটিবাটি থালা-বদনা শেষ সম্বল যেটুকু আছে তাই ফের গুছিয়ে বেঁধে মাথায় ঘাড়ে কাঁখে নিয়ে আবার পথে নেমে হাঁটতে থাকি পশ্চিমমুখো। আমাদের সঙ্গী হাজার হাজার প্রেতের মতো মানুষ।

যশোর রোড। পিচঢালা কালো উঁচু রাস্তা, দু'ধারে বিশাল বিশাল শিশুগাছ, মাথার ওপরটা যেন সবুজ ছাদের মতো পাতার আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েছে। আকাশ দেখা যায় না। শিশুগাছের বিশাল বিশাল গুঁড়ি, প্রকাণ্ড মহীরূহের মতো শেকড় চালিয়ে দিয়েছে মাটির অনন্ত গভীরে, পৃথিবীর পাঁজরে সৃষ্টির মর্মকেন্দ্রে জড়িয়ে

ধরেছে নিখিল রহস্যকে আর প্রতিটি শাখাই যেন পাতায় ফুলে বীজে মেলে ধরেছে অচেনা বার্তাকে, আনন্দকে।

অসংখ্য মানুষ পাঁচমিশেলি মানুষের ভিড়ে, পায়ের শব্দে পা মিলিয়ে পিচঢালা যশোর রোড ধরে হেঁটে চলেছি, আকাশের নীচে— পথের বুকে চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্না, কাতরানি। কেউ ভুরু কোঁচকায়, কারও মাথা নিচু, কারও মুখে অস্বস্তি, কারও চোখে জল, কারও বুকে ক্ষোভের আগুন জ্বলে, কারও বুকে রক্তক্ষরণ হয়। প্রাণ হাতে নিয়ে, বাঁচার আশায় মানুষ মরিয়া হয়ে বোঁচকাবুঁচকি মাথায় নিয়ে, ঘাড়ে নিয়ে, কাঁখে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। যতদূর দেখা যায় অগণিত মানুষ চলেছেন শেষ সম্বলটুকু বয়ে নিয়ে। এলোমেলো ধুলোভরা ছাইওড়া মাথার চুল। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, প্রত্যেকের চোখেমুখে দেহে অসম্ভব ক্লান্তি, সীমাহীন অনিশ্চয়তা। অচেনা, আজানা আতঙ্ক ভরা চোখ কাতারে কাতারে মানুষ চলেছেন। মানুষের ঢল, বাঁধভাঙা বন্যার মতো ছুটে চলেছে।

আমার হাতে একটা বড় ঘটি, মাথায় ছোট্ট একটা বোঁচকা। হাঁটছি বড়দার পিছে পিছে। বড়দাদার মাথায় বোঁচকা, ডান হাতে স্যুটকেস, মেজদাদার ঘাড়ে শিকেবাঁক, দু'দিকে দু'টি ধামায় থালাবাসন, হাঁড়িকুড়ি-কড়াই— অনেক কিছু জিনিসে ঠাসা। প্রত্যেকের মাথায়, ঘাড়ে, কাঁধে কিছু না কিছু নিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, চেনাজানা আমরা পনেরোটি পরিবার হিন্দুস্থান সীমান্তে মিলিত হয়ে একসঙ্গে পথ হাঁটছি। পাঁজরার তলায় হৃদপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, আগুনের মতো জ্বলছে। পা চলতে চায় না, তবুও পথ মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সামনে। ছিপছিপে রোগা লম্বা নিখিল বাছাড়— যাকে খুড়ো বলেই ডাকি, তিনি খুব সাবধানে আমাদের আগে আগেই চলছিলেন। মাথায় একটা কাঠের মাঝারি বাক্স নিয়ে হাঁটছিলেন মরিয়া হয়ে। তাঁর পরনে ছেঁড়া ময়লা খেটো দুতি, খালি গা, খালি পা, মুখটা শীর্ণ, চোখের দৃষ্টি উর্ধ্বগতি। তিনি তাঁর ছোট মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। ভিড়ের মধ্যে মানুষের স্রোতের মাঝে খরদৃষ্টি হেনে গোরু-খোঁজা খুঁজে চলেছেন। চলতে গিয়ে আচমকা তিনি মুখ থুবড়ে পড়লেন রাস্তার পাশে, ইট-পাথরের ধারালো টুকরোর ওপর। শেষ আর্তনাদে ঠোঁটদুটো হাঁপানি রোগির মতো ফাঁক হয়ে রইল।

পাশ থেকে কে একজন ইস ইস শব্দ করে উঠলেন। সামনের একজন বলে উঠলেন, হায় হায় মানুষটা পড়ে মরে গেল রে। তিনি ছুটে গিয়ে নিখিল বাছাড়ের মুখে জল দিলেন। নিখিল বাছাড় চোখ খুলে এক নজর দেখেই চোখ বন্ধ করলেন। দাঁতে দাঁত চেপে যেন যন্ত্রণাকে ঠেলে ফেলতে চাইছেন। নীচের ঠোঁটটা

অস্বাভাবিক ঝুলে পড়েছে, ওপরের কালো মোটা ঠোঁটটা কুঁচকে মুখের ভেতর ঢুকে গেছে। কশ বেয়ে রস গড়াচ্ছে, মানুষটার বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো।

ও-পাশ থেকে সহানুভূতির শব্দ ভেসে আসে। আহা, আহা কী হল মানুষটার? অস্ফুটস্বরে কাতরিয়ে উঠলেন তিনি। বুকে ঘড়ঘড় পাকা সর্দির আওয়াজ পাওয়া গেল।

পড়ে-যাওয়া নিখিল বাছাড় হাতদুটো শূন্যে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণপণে কিছু-একটা আঁকড়ে ধরতে গেলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। শুধু হতাশায় আবার নেতিয়ে পড়লেন। দু'চোখে অঝোরে জলের ধারা নেমে এল। বুক ভেসে যাচ্ছে তাঁর।

ধারালো দৃশ্যটা ছুরির ফলার মতো আমার প্রাণে হৃদয়ে আমূল বিঁধে রইল। চলার পথে এমনই প্রখর জ্বালাময় বেদনাময় অসংখ্য ঘটনা অন্তরাত্মায় তীব্র ভাবে ভরপুর হয়ে চলল।

জীবন, প্রাণ মান নিয়ে প্রত্যেকেই ছুটে পালাচ্ছেন, দাঁড়াবার সময় নেই, সুযোগও নেই। কে, কোথায়, কখন পড়ে গেল, হারিয়ে গেল, মরে গেল— কারও দেখবারও অবকাশ নেই, সময়ও নেই। তাই বুকের ব্যথা, বুকে চেপে চেতনায় রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে আমিও হাঁটছি মানুষের পায়ে পা মিলিয়ে। খালি পা, তপ্ত পিচে পুড়ে যাচ্ছে পায়ের পাতা। কষ্টে-দুঃখে শ্রমে-ঘামে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবু হাঁটার খামতি নেই। পিছনের হাজার হাজার মানুষের স্রোত ঠেলে নিয়ে চলেছে।

এক মা পড়েছিলেন রাস্তার পাশে মলমূত্রে মাখামাখি হয়ে। কাতরে ডাকছিলেন, জল দাও, প্রাণ বাঁচাও। জল দাও, প্রাণ যায়— বাঁচাও! বাবাসকল আমার যে কেউ নেই, আমাকে বাঁচাও। কেউ তাঁর কথা শোনেনি, সবাই চলে যায়, সবাই পালায়। বাতাসে জানা গেল তার পুত্র-কন্যা-স্বামী সবাই রাতে তাকে ফেলে পালিয়েছে।

পথে আঁতুড় জল চায়, অনাথ শিশু কাঁদে, সন্তানকে জন্ম দিয়ে, নবজাতককে বুকে নিয়ে রমণী সাহায্য চায়। বলে, প্রাণ যায়, বাঁচাও। কেউ ফিরে তাকায় না। নিজের প্রাণ বাঁচাতে সবাই ছুটে পালচ্ছে। কে, কাকে সাহায্য করবে, বাঁচাবে— সবাই শরণার্থী যে।

কত মানুষ, কত প্রাণ এদিক থেকে ওদিক ছিটকে পড়ছে কে তার হিসেব রাখে! কত মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের অরণ্যে,

মরে পড়ে থাকছে পথেঘাটে, রাস্তায় স্টেশনে, রেললাইনের উপর নয়ানজুলিতে। দেশভাগে দেশত্যাগে মহাবিপর্যয়ে জীবনের প্রাণের কী অপচয়। পথে পথে কত অবাঞ্ছিত প্রাণের জন্ম হচ্ছে। পথে পথে কত মানুষের অসহায় মৃত্যু— সৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু একই সঙ্গে চলেছে। আমরাও চলেছি দুর্যোগের অনিশ্চয়তার অন্তহীন পথে।

সেই প্রথম থেকে বড়দা আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছেন। ভাঙা বুক, ছিন্নমূল প্রাণ, উদ্বাস্তু হৃদয়, চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টি, চোখ মেলে মাঝে মাঝে শূন্য বিবর্ণ আকাশের দিকে তাকান, অনেকখানি লম্বা একখানা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে হাতটাকে প্রবল ভাবে নেড়ে নেড়ে বলতে আরম্ভ করেন: ভাইডি রে, তুই আমার কাছে থাকলি বুকে বল পাই। অন্তত কলজের মধ্যে এই যে দেশভাগের কাঁচা ঘা-টা দগদগ করছে— তার জ্বলুনিটা থাকে না।

পিচঢালা কালো রাস্তাটা ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে, নিচু হয়ে ইছামতী নদীতে ভাসমান বোটপুল পেরিয়ে পুরনো শহর বনগাঁর বুক চিরে বনগাঁ-রানাঘাট রেললাইন টপকে চলে গেছে মহানগর কলকাতায়। রাস্তার দু'ধারে পুরনো বাসিন্দাদের ছোট ছোট, ফাঁকা ফাঁকা আর ঘিঞ্জি বসতি। গোটা এলাকার গায় চোখ বুলালে মনে হবে একদা এখানে মহামারি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তারই স্পষ্ট চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র । যশোহর রোড ডান হাতে ছেড়ে বাঁ হাতে এঁদোসুড়ি দিয়ে গলে আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম ক্রমশ যেন নরকের দিকে। পচাগলা পুঁজ রক্ত ধোঁয়াটে ঘোলাটে কুম্ভিপাকের দিকে।

বনগাঁ জংশন-রেল স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা নেই। গিজগিজ করছে উদ্বাস্তু মানুষ। পা ফেলবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত নেই। রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম আর তার আশপাশ, রেললাইনের এ-ধার ও-ধার মানুষ যে যেখানে পেরেছেন, ঝিমুচ্ছেন, কাঁদছেন, খাচ্ছেন, হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। কারও হাঁ-করা মুখে ডুমো মাছি ঢুকছে, কেউ শেষ সম্বল দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আকাশ-পাতাল ভেবে দিশাহারা হচ্ছেন, কুচোকাঁচা বাচ্চারা কেউ কাঁদছে, কেউ মার দুধ টেনে ছিঁড়ছে, কেউ পায়খানা করছে, কেউ জন্ম নিচ্ছে। চারিদিকে থুথু, কফ, প্রস্রাব, পায়খানা, রক্তমাখা ন্যাকড়া, নোংরা মানুষের ঘিঞ্জি। সাত-আটদিন একটানা পথে হেঁটে, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, পরনে ময়লা নোংরা, ঘামে ভেজা জামাকাপড় মাথায় গায়ে ধুলো উড়ছে। গা থেকে দুর্গন্ধ ছুটছে। বাতাস ভারী করে তুলছে যেন নরককুণ্ডের মধ্যে একদঙ্গল নরনারী-শিশু-বুড়োবুড়ি কিলবিল করছে। জগতের এই কোণটা মরে-পচে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

পৃথিবী বুঝি এখানে ঘুরছে না। সূর্য এখানে আলো ঢালছে না। ধিকিধিকি পচা-গলা, বদ-রস গড়ানো গোটা ফালিটুকুতে বনবন করে উড়ছে মাছি— অসংখ্য বড় বড় নীল ডুমোমাছি।)

সন্ধ্যার আগে আমরা পনেরোটি পরিবার ছোট-বড় একাশিজন মানুষ বনগাঁ স্টেশনে নরকের দরজায় এসে ঢুকলাম। সামান্য পরিসরে অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশু-বুড়োবুড়ি অসুস্থ রোগী বোঁচকাবুঁচকি হাঁড়িকলসি, থালাবাসন— গাদাগাদি করে পড়ে আছে। তার মধ্যে আমরা এক ফোঁটা, একতিল জায়গা পাবার জন্য হন্যে হয়ে স্টেশনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা আশপাশে খুঁজেও পেলাম না। নিরুপায় কত পরিবার দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু শিয়ালদহে স্থানান্তরিত হলেই তারা সেই পরিবার সেখানে আশ্রয় নেবে। আধঘণ্টা একঘণ্টা বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে মাথায় কাঁখে নিয়ে অনেকেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও দাঁড়িয়ে রইলাম। যেখানে-সেখানে একটু জায়গা হঠাৎ খালি হতেই জাবরে বসে পড়ি আমরা। অনেক কসরত আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে ঢেউ টিনের ছাদের তলে এই ভাবে দখল নিয়ে অস্থায়ী আস্তানা গাড়তে হল বনগাঁ স্টেশন চত্বরে। নিজেদের রক্ষা করার, বাঁচিয়ে রাখার বিকল্প কোনও উপায় ছিল না।

শেষ সম্বল বোঁচকাবুঁচকিতেই জায়গাটুকু ভরে গেল, মানুষ বসবার কোনও স্থান থাকল না। তবু তার উপরেই আমার মতো ছোট মানুষকে বসিয়ে দিলেন বড়দাদা, বড় বউদির মেয়ে কোলে, তাকে বোঁচকার গায়ে ঠেলেঠুলে বসিয়ে দেওয়া হল। বাকিরা সব দাঁড়িয়ে রইলেন বোঁচকাবুঁচকি ঘিরে। ফের জায়গা খালি হলে প্রায় মারপিট করে, ঠেলেঠুলে যদি বসবার জায়গা পাওয়া যায় তবেই তাঁরা বসবেন, জিরিয়ে নেবেন। না-হলে রাতদিন ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে—।

মালপত্রের ওপর বসতে-না-বসতেই আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম ছন্নছাড়া, বীভৎস ঝাঁঝালো, পচা-গলা, পুঁজ রক্তে মাখামাখি অজানা-অচেনা এক পৃথিবী— যার স্বরূপ কোনও ভাষা দিয়ে, শব্দ দিয়ে উদ্‌ঘাটন করা যায় না। দেশভাগে দেশত্যাগে মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে এক ভয়ংকর নরক যন্ত্রণা— যা আজও প্রাগৈতিহাসিক— যা আমার জীবনে আলো-আঁধারে এখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে।

হাত-সাতেক দূরে খোলা আকাশের নীচে অল্পবয়সি একটা বউয়ের শরীর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। আচমকা শানের ওপর আছড়ে সে চিৎ হয়ে পড়ল। তার লম্বা লালচে এলোমেলো চুলের রাশি লটোপুটি খাচ্ছে আর শুকনো

ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখটা মুহূর্তে গাঢ় নীলচে হয়ে উঠছে। চোখের পাতা একদম বন্ধ। দাঁতে দাঁত ঘষার কর্কশ শব্দ স্পষ্টই শুনতে পেলাম। অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলাম, অ্যাঁ এ আবার কী? মনে মনে শিউরে উঠলাম। কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার পুঁতে রইল দৃশ্যের ওপর।

যন্ত্রণাকাতর বিকৃত সুরে বউটা কেঁদে ফেলে পাশে দাঁড়ানো বয়স্কাকে কাতরে বলল, এট্টু আড়াল করে দাঁড়াও মা। একটু আড়াল করে দাঁড়াও। আর যে পারি না মা। আর যে পারি না মা...কাতরানির সঙ্গে কোঁত দিতে থাকে।

নিঃশ্বাসের হাওয়ায় বাতাসে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে আরও প্রবল নিঃশ্বাসের স্রোতে। ধুলোবালি ওড়ে। যুবতি পোয়াতির গোঙানি গুমরে উঠতে থাকে ভিড় থেকে।

বয়স্কা আঁতকে ওঠেন এক অজ্ঞাত ইশারায়। ব্যাপারটা মুহূর্ত মধ্যে বুঝে নিয়ে বয়স্কা আলুথালু হয়ে বউটাকে আড়াল করে বসে পড়লেন দাইয়ের ধৈর্য আর সান্ত্বনা গলায় ঢেলে দিয়ে বলেন, ভয় পেও না মা। ভয় পেও না। প্রথম পোয়াতি। যিনি দিয়েছেন, তিনিই খালাস করবেন। সবুর করো মা, ধৈর্য ধরো মা। একটু ধৈর্য ধরো মা। ডাইনে বাঁয়ে ঘিরে বয়স্কা ফের বললেন, এই এয়োরা, তোরা কে কোথায় আছিস এদিকে আয়। এই এয়োরা সব এদিকে আয় গর্ভ-যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে— শিগ্‌গির আয় তোরা। একটুও দেরি নেই, বাচ্চা এক্ষুনি ভূমিষ্ঠ হবে। তোরা সরে আয়। হায় ঈশ্বর এ সময় তুমি ছাড়া কে রক্ষা করবে পোয়াতিরে, লজ্জাকে, শরমকে, ব্যথা-যন্ত্রণাকে, নগ্নতাকে, নবজাতককে।

বয়স্কার আঁচলের তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— বউটা অসহ্য যন্ত্রণার আছাড়-পাছাড় আর গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের শানের ওপর সে অবিরাম গোঙাচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে। কোঁত দিচ্ছে ব্যথা খাচ্ছে— বউ কোঁতাচ্ছে।

আচমকাই ওই বউ-ঝিদের দলা পাকানো ভিড়ের মধ্যে থেকে নবজাত শিশুর কান্না ভেসে এল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বউ-ঝিরা ফাঁক হয়ে সরে গেল।

শানের মেঝের ওপর রক্ত চুঁইয়ে চলেছে— যাঁরা ঘুমোচ্ছেন, তাঁদের পিঠের তলা, বোঁচকাবুঁচকি ভিজে জবজবে হচ্ছে। যাঁরা খেতে বসেছেন, তাঁদের ভাতের থালার তলা দিয়ে থই থই রক্ত বইছে।

স্টেশন-চত্বর জুড়ে এখন আঁধার নেমে এসেছে। যে যে ভাবে পেরেছে কাত হয়ে, চিৎ হয়ে, কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। মালপত্রের ফাঁকে ফাঁকে হেলানো বালবাচ্চা নিয়ে আধশোয়া শুয়ে আছেন— কর্তাগিন্নি, বর-বউ, মা-ছেলে, মেয়ে-বাবা, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি।

কেউ সারা রাত বুঝি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কারও দুশ্চিন্তায় চোখে ঘুম নেই, চোখ জ্বলেপুড়ে ছাই হচ্ছে। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে কেউ হা-হুতাশ করছেন। কেউ-বা সারা রাত কাতরাচ্ছেন, কেউ গলা ছেড়ে কেঁদে চলেছেন, কেউ রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। এই মহাবিপর্যয়ের মহাদুর্যোগের রাতে চোর, পকেটমার, শয়তান, লম্পট সুযোগ বুঝে হাতড়ে নিতে ব্যস্ত। এই অসহায়, বাস্তুহারা উদ্বাস্তু মানুষের চুরি গেছে কানের সোনা-রূপা, দুল-মাড়কি, গাঁটের টাকাকড়ি, ঘটিবাটি, থালা, পুরনো ফুলতোলা কাঁথা, শাড়িসায়া, যৌবন মানসম্মান, কারও-বা খোয়া গেছে জীবন। কারও খোয়া গেছে ছেলেমেয়ে, স্বামী, মা-বাবা, কারও-বা স্ত্রী, কারও-বা স্বামী-দেশভাগের এই মহাবিপর্যয়ের জীবনে। সময়ের নিষ্ঠুর ঘনঘটায় লেলিহান আগুনের মতো এখানে-সেখানে দাউদাউ করে জ্বলছে। দেশভাগে দেশজননীর অঙ্গচ্ছেদে বিষাক্ত ক্ষতে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পুঁজ রক্তরস গড়িয়ে চলেছে তার ভেতর ছিন্নমূল মানুষ যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন।

আজও এত বছর পেরিয়ে এসেও আমি চোখ বুজে স্পষ্ট দেখতে পাই, হঠাৎ ওঠা ঘূর্ণি ঝড়ে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা, নষ্ট দু'লক্ষ মানুষের প্রাণ, লাঞ্ছিত তার চেয়েও বেশি মা-বোন। বাস্তুহারা হয়েছেন কোটি মানুষ— অন্তহীন হত্যা, রক্তপাত, নারীহরণ, নারী-ধর্ষণ, নারী-নির্যাতন, রক্ত কলুষময় ভয়ংকর সেই ইতিহাস। এই ভয়ংকর জীবনের মুখোমুখি, এমনকী তারই একজন ক্ষুদে অংশীদার হাওয়ায় ঘটনাগুলোর তলদেশে অন্তরাত্মার গভীরে, যেখানে নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আত্মস্বার্থের অদৃশ্য হাত চালিয়ে দিয়েছে, বইয়ে দিয়েছে কলঙ্কময় রক্তস্রোতে— আমার শিকড়ছেঁড়া জীবন— হৃদয় এখনও হামা দিয়ে চলেছে সেই রক্তস্রোতে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, আত্মঘাতী স্বদেশবাসীর স্বার্থে অন্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীর হিংস্রমুখ আর বিষ-মাখানো তীক্ষ্ণ নখ— দেশজননীর কোমল হৃৎপিণ্ডকে ক্ষত করে ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলেছে, জাতীয় জীবনকে করছে হাজার বছরের পশ্চাৎগামী।

আড়েদিঘি সাড়ে তিন হাত জায়গায় আমরা পাঁচটি পরিবার একত্রিশজন মানুষের থাকা শোয়া বসা ঘুমানো খাওয়া গাদাগাদি পড়ে থাকা। দুটো রাত এর মধ্যেই কেটে গেছে। শিয়ালদহে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনও খবর আসেনি। গোটা স্টেশন-চত্বরে হাজার হাজার মানুষের জন্য মাত্র দু'টি নলকূপ, একঢোক জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, নারীদের জন্য একটি আর পুরুষের জন্য তিনটি শৌচাগার, প্রাণটুকু টিকিয়ে রাখা সে যে কী ভয়ংকর সাধ্যসাধনা, কষ্টকর সে ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বোঝানো যায় না। পরিবারের মা মাসি

পিসি বউ-ঝিরা পাছে শৌচাগারের নরককুণ্ডে যেতে হয়, তাই আড়াইটা রাতদিন একফোঁটা জল মুখে দেননি। তাঁরা নির্জলা, নিরাহারে কাটাচ্ছেন— যাতে প্রস্রাব, পায়খানা না-করতে হয়।

সেই কোন আড়াইটা রাতদিনে কোনও-এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে গিয়েছে, রান্না করে খাবার কথা কেউ কল্পনা করতে পারেননি। ভাত খাওয়ার জন্য ছোটরা কান্না জুড়ে দিয়েছে। অথচ একমুঠো ভাত মাথা খুটে মরলেও পাওয়া যাচ্ছে না। নিভন্ত জীবনগুলোর মাঝে, বোঁচকাবুঁচকির ওপর কুকুর-কুণ্ডলী শুয়ে চোখ মেলে দেখছিলাম— মানুষের অন্তহীন দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-জ্বালা। শুনছিলাম সীমাহীন আর্তনাদ, চিৎকার-চেঁচামেচি, কাতরানি। পা টিপে টিপে তৃতীয় দিনের আঁধার নামছিল স্টেশন-চত্বরে। বাতাস শ্বাস ফেলছিল, প্ল্যাটফর্মের আলোগুলি কাঁপছিল হাওয়ায়। আমার মনে হল গোটা অঞ্চলটাই থরথর করে কাঁপছে। প্রাণভয়ে মরিপড়ি ছুটে আসা ছিন্নমূল জীবন দুশ্চিন্তায় অনিশ্চয়তায় বিপন্নতায় আকাশছোঁয়া ক্লান্তিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড় অসহায়।

আচমকাই আকাশ ভেঙে ঝপঝপ করে বৃষ্টি নামল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো খোলা আকাশের তলায়, কাতর প্রাণগুলি ও তাদের মালপত্রগুলি চুপসে গেল। খুনির সামনে থেকে কুড়িয়ে আনা, ছিনিয়ে আনা শেষ সম্বলটুকু ভিজে জবজবে হয়ে গেল। আমিও ভিজে গেলাম ঝোড়ো বৃষ্টির দাপটে। গোটা স্টেশন-চত্বর বৃষ্টির জলে ভিজে ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিল। ঝোলা গুড়ে পিঁপড়ে ডুবে গেলে যেমন হয়, মানুষগুলির অবস্থা এখন তার থেকেও করুণ অসহায়, নরক যন্ত্রণার সমুদ্রে ছিন্নমূল জীবন যে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার চারপাশে ঘটে-চলা ঘটনা, অন্তহীন ক্লেদ, পঙ্কিলতা দুঃখ-বেদনা আমাকে ঠেলে ফেলে দিল অনন্ত নরককুণ্ডে— যা চেতনাকেও অবশ করে দেয় প্রতিমুহূর্তে।...

কথা-গেলা ছিল আমার অভ্যাস। কাউকে কথা বলতে দেখলেই আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম— তার বলা প্রতিটি কথাই গোগ্রাসে গিলে ফেলতাম। দু'কান খাড়া করে থাকতাম। টু শব্দটি হলেই আমার চেতনা ঝাঁপিয়ে পড়ত তার ওপর। এই মহাবিপর্যয়ে দুর্যোগে মানুষের ভিড়ে আমি নাক-কান-চোখ খোলা রেখে মুখ হাঁ করে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষের বলা কথা গিলতাম। প্রতিটি কথা তার নিজস্ব ধার-ভার-রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ লোভনীয় স্বাদ নিয়ে আমার অন্তরের দ্বারে হাজির হত। আমি মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে বাতাসে ভাসা প্রতিটি

কথার আপাদমস্তক গিলে ফেলতাম। অর্থের ধার ধারতাম না। চারদিকে মানুষ গিজগিজ করছে। তাদের নানা ঢঙের বিচিত্র সব কথার ঢেউ ভেসে আসছে— নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল, খুলনা, পাবনা, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিং কত সব ভাষার ছাদ বাতাসে ঘুরছে। চিন্তাকুল মুখ, কুঞ্চিত কপাল, রঙজ্বালা চেহারার বেঁটেখাটো মানুষটি ভিড় ঠেলে তাঁর হারিয়ে-যাওয়া স্ত্রীকে খুঁজে চলেছেন। বলছেন, আমাগে মণির মা, কোহানে গেল? তুমরা কতি পারো, আমাগে মণির মা কনে গেল! একটা ভীষণ বোঝা বুকে চাপিয়ে মানুষটা মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন। আমাগে বেলেডোঙার মানুষগুলান কুথা গেল। ও ফটিকের বাপ তুমি কুথা গো? তোমার পরিবার কান্তে লেগেছে। ছোট ছেলে কাতরে মাকে বলছে, মা গো নাত্তির হল যে, ঘরে যাবি না মা। মুই ঘরে যাব, ভাত খাব মা! মুই ভাত খাব মা গো। ঘর চ মা, ঘর চ।

ঘর কোথায় বাবা? মা বলে গলায় অসহায়তার খেদ মিশিয়ে।

ঘর নেই মা, আঁধার হয়ে এখনই ইস্টিশনে বসি রবি? আমি ভাত খাব মা, ঘর চ মা, ঘর চ।

ভাত কোথায় পাব বাবা, ভাত নেই। এই শুকনো চিঁড়ে খা বাবা! নে খা।

বাবা কোথায় মা? ছেলে শুধায়।

বাবা তো নেই বাবা! মা বলেন আর আঁচল টেনে চোখের জল মোছেন।

চাষির ঘরের ছেলে কোমরে খেটো ধুতি, শীর্ণ শরীর, সর্বাঙ্গে ধুলোকাদা মাখা, কালশিটে পড়া চোখ, জখমি কান-নাক-পিঠ। ক্ষত পোড়া হাত-পা, বুকের মধ্যে তার কী যেন বিষণ্ণতা।

মায়ের মনের চোখে দাঙ্গায় ঘর পোড়ায় অমানুষিক বর্বরতার তিক্ত অভিজ্ঞতা। বুকখানা কুঁকড়ে ওঠে, ছেলেকে সান্ত্বনা দেন।

একচোখা একটা ঢ্যাঙা মানুষ দাঙ্গার আগুনে পোড়া হাত-পা কোলে করে বসে আছেন। নিভে-যাওয়া মুখটার দিকে তাকাতেই বুকটা হঠাৎ তাঁর মোচড় দিয়ে ওঠে একটা তীব্র ব্যথায়। বলেন, মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে এই নরককুণ্ডে সবাই উত্যক্ত হয়ে উঠেছে। সবাই চেঁচাচ্ছে।

বনগাঁ রেল স্টেশনের সাতটা দিন যেন আমার সাতটা বছর কেটে গেল। শিকড় ছেঁড়া মানুষ, তাঁদের টিকে থাকা, আমি নিজেও যার শরিক। আমাকে এত বেশি শিক্ষিত করে তুলেছে যে, তার জন্য গর্ববোধ করি। আমার অন্তরাত্মায় হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করি সেই সব জীবনকে, মানুষকে— যাঁদের মধ্যে আমি কাটিয়েছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তাঁরাই আমার চেতনাকে

করেছেন সমৃদ্ধ-সচেতন, দিয়েছেন বাঁচার প্রেরণা।

চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এত অদ্ভুত আর বিচিত্র মানুষকে একই জায়গায় আমি দেখেছি— যার জুড়ি হয়তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দিনের পর দিন তাদের দেখে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের মুখের কথা শুনে শুনে এই ছন্নছাড়া, ছিন্নমূল অসহায় বিপদে পড়া উদ্বাস্তু মানুষগুলো সম্পর্কে একেটা ভিন্ন ধারণা ও চেতনা গড়ে উঠেছিল। ওই পাকা চুলওয়ালা বুড়ো, মধ্যবয়সি চাষির বউ, স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সন্তানটি, সদ্য বিধবা অল্পবয়সি বধূটি প্রথম মা হয়েছে— যে বউটি, পা টেনে হাঁটা ছোট্ট মেয়েটি, চোখ ট্যারা ছেলেটি— আরও কত শত ছেঁচা-খাওয়া, নির্ঘাত মৃত্যুর মতো রামদার কোপের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা মানুষটি— এরা প্রত্যেকেই জীবনের আর সময়ের এই মহাঘোর অমাবস্যার রাতে বাঁচবার জন্য কি না করছে। পঙ্‌ক্তিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এক ঢোক জল আর একমুঠো খাবার সংগ্রহ করছে, বৃষ্টিভেজা কাপড়ের অর্ধেকটা পরে বাকি অর্ধেকটা রোদে দাঁড়িয়ে শুকোচ্ছে, মৃত সন্তানকে নিজে করব দিতে নিয়ে যাচ্ছে, খোলা আকশের নীচে বা তলায় অগণিত মানুষের ভিড়ে চোখের সামনে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

মাত্র হাতদশেক দূরে আমাদের ছিয়ানব্বই অঞ্চলের জোয়ান মরদ ছেলেটির ভেদবমি হল। চিকিৎসার অভাবে সে মারা গেল। তার রশিখানিক দূরে যুবতী বউটির মায়ের দয়া হল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেও মারা গেল। জ্বরে বেহুঁশ কোলের ছেলেটি সারারাত ভুল বকে সকালবেলায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, আমাদের অঘোর খুড়ো, পিটানো স্বাস্থ্য শক্তমানুষও ক'বার রক্ত পায়খানা করেই মারা গেল। বনগাঁ স্টেশন-চত্বরে জীবনের সীমাহীন অপচয় আর রোগশোক, মৃত্যুর হিড়িক পড়ে গেছে। পিছনের সমস্ত দিনগুলিকে ম্লান করে দিয়ে নতুন নতুন আরও ভয়াবহ ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার জন্ম দিচ্ছে প্রতিটি ঘণ্টা মিনিট আর সেকেণ্ড। Health

সরল সাদাসিধে গোবেচারি দেশভাগে দাঙ্গায় মৃত্যুর তাড়া-খাওয়া ভদ্রমানুষটি গতকালও তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সন্তানকে বুক ভরে ভালবাসতেন। তিনিও আজ জীবনের অনিশ্চয়তার জ্বালায়, ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় খাপছাড়া অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। নিজের বউকে মাগিছাগি বলছেন। আপন সন্তানদের বেজন্মা, শুয়োরের বাচ্চা বলতেও মুখে বাধছে না তাঁর।

একজন রোগা নিঙড়ানো চেহারার মানুষ নিজে না-খেয়ে আপন সন্তানদের খাওয়াতেন, তাঁরও মুখে লেগে আছে মরণের মতো নিষ্ঠুর বুলি। বিড়বিড় করে

Self preservation instinct

বলছেন তিনি, যা মরগে যা, যা মরগে যা, বেঁচে থেকে ভাগ বাড়াবি। তোরা মরলে বাঁচি, যা মরগে যা।

ওই তো ক্লান্ত আর ভোঁতা গলায় মধ্যবয়সি স্ত্রীলোকটি তার পেটের সন্তানকে চিৎকার করে বলছেন, যা গতর বেচে খা, আর জ্বালাস নে। মরগে যা, বেশ্যাবৃত্তি করে খা গিয়ে।

এই সেদিনও যে মানুষটি আমার থুতনি ধরে গলায় দরদ ঢেলে বলছিলেন, ইস্, ইস্ কী কষ্ট এই সব বাচ্চাদের। না-খেয়ে, না-নেয়ে, চোখমুখ শুকিয়ে গর্তে ঢুকে গেছে। আহা, বাছার আমার, এত কষ্ট সহ্য করা যায় না। আজ সকালেই সেই মানুষের নির্জীব দেহটা মুর্দাফরাস এসে বেঁধে নিয়ে গেল। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না।

আমার খুব কাছে গায়ে জ্বর নিয়ে ঠেস দিয়ে শুয়েছিলেন সুধামামি। হঠাৎ দেখি তিনি ঘন ঘন শ্বাস টানছেন। আঁচল টেনে মুখের ঘাম মুছছেন। তাঁর হাতের নড়াচড়াটা এলোমেলো। দু'বার হাতটা এলিয়েই পড়ল শরীরের পাশে। আঁচলের খুঁটটা দলা পাকিয়ে গেল হাতের আঙুলের মধ্যে।

অ্যাঁ জল, জল প্রাণ যায়...।

ঘটিভর্তি জল নিয়ে মুখের সামনে ধরলাম। অতিকষ্টে মাথাটা একটু তুলে একঢোক জল খেলেন তিনি। তার পর ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালেন আমার দিকে আর আশপাশে দাঁড়ানো-বসা মানুষজনের দিকে। ঠোঁট দুটো নড়তে লাগল। তার পর চোখের পাতা আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের ওপর— দু'হাতের কনুই শরীরের দু'দিকে শক্ত ভাবে এঁটে রয়েছে। হাত দু'টি ধীরে ধীরে চলেছে হলদে চামড়া টান হয়ে রয়েছে। মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল না।

জলের ঘটিটা হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম যেন অনন্তকাল। আমার দৃষ্টির সামনে সুধামামির মুখটা শক্ত ও পাঁশুটে হয়ে গেল।

সুধামামির বর আমাদের উপেনমামা সামান্য খাবার হাতে কাছে আসতেই আমি বললাম, মামি মারা গেছেন। আমার চোখ থেকে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মনে হল।

মিথ্যে কথা বলে তোর কী লাভ হচ্ছে ছোটকোদা। এই তো আমি কথা বলে গেলাম একটু আগে। উপেন মামা সুধামামির কাছে সরে আসতে আসতে বললেন আর অন্ধের মতো টলতে টলতে ভিড় ঠেলছেন। তাঁর চোখদুটো ঠেলে বেরোচ্ছে কোঠর থেকে।

'মানুষ মরে গেছে'— এই খবর দাবানলের মতো এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে ছড়িয়ে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুর্দাফরাস এসে সুধামামির দেহটা বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

এ-কয়দিন বড়দাদার সঙ্গে আমার প্রায় দেখাই হয়নি। কী করে, কত তাড়াতাড়ি এই নরক থেকে বেরুতে পারবেন তাই নিয়ে রাত দিন অন্তহীন ছোটাছুটি করেছেন তিনি। আমাদের নামডাক হতেই এসে হাজির হলেন। বললেন, অনেক কষ্ট করে আমরা অনেকের আগেই ডাক পেয়েছি। এক্ষুনি ট্রেনে উঠে শিয়ালদহ যেতে হবে। জয় ভাই কোথায় গেল? কাছে ছিলেন বড়বউদি, তাঁকে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

বড়বউদি মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বললেন, মেজবউ আর মেজভাইডি ভাত রান্না করতে রেল গুদামের পিছনে গেছে। সেরখানেক চাল আনিলাম, তাই নিয়ি গিছে, ক'দিন ভাত না খায়ি মত্তি বসলাম যে।

কথা শেষ হওয়ার আগেই বড়দাদা অস্থির হলেন। এখন খেতে গেলে হবে না। যে অবস্থায় ওরা আছে এক্ষুনি ডেকে আনতে হবে। দেরি করলে ট্রেন আমাদের না নিয়েই চলে যাবে। ফের কবে ডাক হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এক্ষুনি গোছাতে শুরু করো। দেরি করলে ভয়ংকর বিপদে পড়ব। বলতে বলতেই বড়দাদা ছুটে গেলেন মেজদাদাদের ডাকতে।

চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। মানুষের ভিড়ের মধ্যে ফুট কেটে কে কোথায় আশ্রয় নিয়ে আছেন, সবাইকে জড়ো করে ট্রেনে ওঠাতে হবে। নরেনদা, অধীরদা, বড়মামা, তালুইমশাই এবং অন্যান্য স্বজনরা সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন।

বড়দা, মেজদা, মেজবউদি, বড়দিদি ফিরে এলেন ভেজা চাল গামছায় মোড়া বেঁধে। তিন ইটের উনুনে আগুন জ্বেলে হাঁড়ি বসিয়ে চাল চড়িয়ে সবে রান্না শুরু করছিলেন। সেই আধসিদ্ধ চাল গামছায় বেঁধে ছুটে এসেছেন।

বোঁচকাবুঁচকি শেষসম্বল কুড়িয়ে নিয়ে আমরা ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। আমরা ছিয়ানব্বই অঞ্চলের একুশটি পরিবার স্বভূমি থেকে জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে শিয়ালদহগামী ট্রেনে উঠলাম। অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে চললাম যেন যাযাবররা এক ডেরা ছেড়ে ভিন্ন জায়গার উদ্দেশে রওনা দিল।

সুধামামির স্বামী সন্তানরা দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবারও অবকাশ বা সময় পেলেন না। মালপত্র ঘাড়ে মাথায় নিয়ে তাঁরাও নীরব দর্শকের মতো শিয়ালদহগামী ট্রেনে মানুষের দলে মিশে গেলেন।

বনগাঁ স্টেশন-চত্বরে ছয়দিন আগে আমরা পনেরোটি পরিবারের ছোট-বড় একাশিজন মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলাম। তার থেকে সাতজন ছোট-বড় মানুষ চিরদিনের মতো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

বিষাক্ত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় আর সর্বগ্রাসী ঘরপোড়া আগুনে পুড়েও যাঁরা মরলেন না, দেশভাগে আশ্রয়ের খোঁজে মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটার দুঃসহ ক্লেশে যাঁদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল না, তাঁরাই অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে প্রিয় জন্মভূমির গাছপালা প্রকৃতিকে ছেড়ে আসার অশেষ যন্ত্রণা নিয়ে ট্রেনে এসে উঠলেন। যাঁরা চললেন, তাঁরা পিছনে চিরদিনের মতো ফেলে রেখে গেলেন কত শত প্রিয়জন, আপন-স্বজন, সন্তান, পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হৃদয়ের জনকে, যাঁদের হিসাব পৃথিবীর কোনও সরকারই রাখল না। কোনও ইতিহাসই সেই মহা-করুণ কাহিনি লিখল না। দেশভাগে দেশত্যাগে শত শত ভারতবাসীর শেষ পদচিহ্ন পথেই হারিয়ে গেল চিরকালের মতো...।

অস্তিত্ব সংকটে আশ্রয়ের সন্ধানে

স্বভূমি থেকে উৎপাটিত মানুষ-ভর্তি একটি গোটা ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে এসে থামল। ছেঁড়া কাঁথা, শতছিন্ন ন্যাকড়া বাঁধা বোঁচকাবুঁচকি— ঘাড়ে মাথায় কাঁখে নিয়ে, খালি গা, খালি পা, ধুলোবালিতে ময়লা নোংরা কাপড় পরনে, অসংখ্য নরনারী শিশু বুড়োবুড়ি নামছেন প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু পা-টুকু রাখবার জায়গা নেই। গোটা স্টেশন-চত্বর গিজগিজ করছে শরণার্থী মানুষ— কেউ বোঁচকাবুঁচকির ওপরেই শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ জ্বরে বেহুঁশ, কেউ খেতে বসেছে, কেউ মরে পড়ে আছে, কোনও মাতা সন্তান জন্ম দিতে ব্যস্ত। ময়লা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে যেমন এক জায়গায় স্তূপ করে রাখা হয়, সে রূপ উদ্বাস্তুদের ঝেঁটিয়ে এনে স্তূপ করে রাখা হয়েছে— ঠিক যেন গাদা করে রাখা হয়েছে। শরণার্থীদের গায়ে মাথায় চুলে ছাই উড়ছে, মুখগুলো শুকনো, দুশ্চিন্তার কড়া ছোপ ধরে গেছে চোখে-মুখে। বহুদিন ধরে এক কাপড়ে থাকার জন্য নোংরা ময়লা দুর্গন্ধে আর পচা ঘামের গন্ধে মাছির দল ভনভন করে উড়ছে। চিৎকার-চেঁচামেচি, হই-হল্লা, কান্নাকাটি, হা-হুতাশ, আর্তনাদ, কাতরানি, গোঙরানিতে আকাশ-বাতাস ভরপুর হচ্ছে আর তাদের মাথার ওপরে গরম শ্বাস-প্রশ্বাসে ঝুলকালির ভুষো দাগের মতো ছাইভস্ম ভাসছে।

আকাশের নীচে বোঁচকাবুঁচকি আর শরণার্থীদের মধ্যে ফুট কেটে হাজার হাজার উদ্বাস্তু অস্থায়ী আশ্রয় নিয়ে শেষ সম্বলটুকু বুকে আগলে নিয়ে দিন গুনছে, প্রহর গুনছে— কখন ডাক আসবে আবার কোথায় অনিশ্চিত পাড়ি দিতে হবে। বোঁচকাবুঁচকি মাথায় নিয়ে, ঘাড়ে নিয়ে, কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা আকাশের নীচে। কখন ডাক ধরে শরণার্থীরা জায়গা ছেড়ে লরিতে উঠে কোনও অজানা অচেনা জায়গায় শরণার্থী শিবিরে চলে যাবে আর সেখানে আমরা সাময়িক আশ্রয় নিয়ে দিন গুনব অনিশ্চিত ডাকের।

মাথায় বোঝা নিয়ে বড়দাদা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছেন স্টেশন-চত্বরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। একবার ঘুরে এলেন, কোথাও জায়গা পেলেন না। আমরা এগারোটি পরিবার ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার পথের গা-ঘেঁষে অতি সংকীর্ণ জায়গায়। ট্রেনযাত্রীরা যেতে পারছেন না। তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমাদের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করছেন। বলছেন, আরে, এই রিপুগুলো দেশটাকে ছারখারে দিচ্ছে। যেতে যেতে আরও একজন টিটকিরি দিচ্ছেন, কেউ গালাগালি দিচ্ছেন, কেউ শরণার্থীদের মাথায় মুখে চোখে ঘাড়ে আঘাত দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে চলে যাচ্ছেন। একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালি জামার নীচে পৈতে দেখিয়ে মারমুখী ধেয়ে এলেন। আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলল, আরে উড়ো আপদ, এখানে মরতে এলি ক্যান। ভাগ এখান থেকে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছিস, বেজন্মারা তাড়া খেয়ে এখানে মরতে এসেছ। থু-থু যত সব বেজন্মাদের দল, ছুঁয়ে দিলে রক্ষে নেই। অফিস কামাই করে স্নান করতে হবে। লোকটা ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে হাঁটতে থাকেন। চোখ কুঁচকে মেজদাদার মুখটার দিকে একবার কঠিন দৃষ্টি হানলেন। তার পর একদলা থুথু ঘৃণাভরে ছুড়ে দিয়ে রুষ্টমনে গা বাঁচিয়ে স্টেশন পেরিয়ে গেলেন।

মেজদাদা চোখদুটো এমন পাকান যেন অসহ্য কী-একটা ব্যথায় ওঁর কলজেটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি যেন রাগে চিৎকার করে উঠবেন তিনি। আমি ধুলো ঝেড়ে ফের উঠে দাঁড়াই। মেজবউদি এ সব কাণ্ডকারখানা দেখে অপমানে তাঁর চোখ জলে ভরে আসে। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গবাসী ট্রেনযাত্রী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেন, এখনই সব চোখের জল ফুরিয়ে ফেলবেন না দেবী, এরপরে কী ফেলবেন? কিছুটা বাকি রাখুন।

পিসিমা রাগে গরগর করেন। কাঁধের বোঁচকাটা টেনে তুলতে তুলতে বলেন, মানষির দুঃখকষ্টির কট্টুখানি দেহেছ? কঠিন ক্রোধে চোখে তাঁর আগুন জ্বলতে থাকে।

নরেনদা অবস্থা দেখে সরে আসেন। বলেন, মা শান্ত হও তুমি। বিপদে পড়লে আরও অপমান সইতে হবে। ওই চ্যাংড়ার কথায় রাগলে হবে না মা।

আমাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করছে এবং তার ফলে মৃদু গণ্ডগোল হওয়াতে এক পুলিশ অফিসার ছুটে এলেন। লম্বা লিকলিকে চেহারা। কালো পাতলা গোঁফ। গোঁফে তা দিয়ে বিনয়ের প্রলেপ দেওয়া বিদ্বেষের সঙ্গে বলেন, এই তো হাড়গিলের মতো চেহারা, তা অত চেঁচাচ্ছেন কেন? অফিসার একটুকরো হাসি ছুড়ে মারেন তাঁর দিকে।

আমাকে শক্ত শানের ওপর ঠেলে ফেলতে হাঁটুতে সামান্য একটু ছিঁড়ে গেছে চামড়া। সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরুচ্ছে চুঁইয়ে। মুখের থুথু দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করছি; কিন্তু রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। সেই ঝরা রক্ত নিয়েই উঠে বসি।

পিসিমা অফিসারের হলদেটে মুখের দিকে তাকান আর শোনেন তাঁর ক্ষীণ কাঁপা ভাঙা ভাঙা স্বর। বুঝতে পারেন লোকটা একটা দুশমন। ওঁর মধ্যে দয়ামায়া নেই। উদ্বাস্তু মানুষের ওপর ওঁর রীতিমতো আমিরি ঘৃণা।

হাঁটুর ব্যথায় আমার চোখে যেন জল এসে যায়। ব্যথাটা খানিকটা অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন পিসিমা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু সান্ত্বনার ছলে বলেন, কাটা জায়গায় চুন লাগায়ে দিবানে ছোটকোদা। একটু সবুর কর বাবা। থুবার জাগা পাক আগে।

এর মধ্যে বড়দাদা প্রায় ছুটে এসে বলেন, নে ভাইডি চ, জায়গা পাইছি। সামান্যি হলিও বোঁচকাবুঁচকি রাখতি পাল্লি তো বাঁচতি পারবানে, চ চ। নে সব নিয়ে চল। বলেই বড়দাদা আমার হাতের ছোট বোঁচকা একহাতে টেনে নিয়ে অন্য হাতে আমার ডানা ধরে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এইমাত্র ক'টি পরিবার ডাক পেয়ে জায়গা ছেড়ে লরিতে গিয়ে উঠল আর সেখানে দখল নিতে ট্রেনে-আসা নতুন মানুষদের মধ্যে কী কামড়াকামড়ি পড়ে গেল। তা চোখেও দেখা যায় না। দেশভাগে দাঙ্গায় মানুষ যেন আর মানুষ নেই। হিংস্র জন্তুর মতো সব হামলে গিয়ে পড়ল। সামান্য সাড়ে তিন হাত জমিও না, তবু সেখানে ছ'টি পরিবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বোঁচকার ওপর বোঁচকা তুলে মানুষের ঘাড়ের ওপর মানুষ দখল নিয়ে বসে পড়ল। কেউ শুয়ে পড়ল, কেউ সামান্য খাবার বের করে খেতে আরম্ভ করল। নারীপুরুষ কোনও বাছবিচার নেই। লজ্জা-শরম-ঘৃণা সব পথেঘাটে প্ল্যাটফর্মে ঝেড়ে ফেলে রেখে এসেছে এরা, এদের সামনে এখন একটাই সত্য বাঁচা। মান-সম্মান, সং

অসৎ সব ধুয়ে খেয়ে বাঁচা যাবে না। তাই ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সতী-অসতী, মান-অপমান সব বিসর্জন দিয়ে কী করে প্রাণটা টিকিয়ে রাখা যায়— তাই নিয়ে সবাই মরিয়া, বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

একটা দেওয়াল ঘেঁষা কোণে বহু কষ্টে খড়কুটো পুড়িয়ে একচিলতে জায়গা আমরা পেলাম। ওপরে ছাদ নেই। হাত দেড়েক ঢেউ-টিনের ছাঁচ বাড়ানো আছে মাথার ওপরে। কিছুটা ছাঁচতলায়, কিছুটা আকাশের নীচে বোঁচকাবুঁচকি রেখে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সেই মুহূর্তটা বাঁচলাম। ঘণ্টা তিনেক ছোটছুটি দৌড়াদৌড়ি করে যেটুকু আশ্রয় পাওয়া গেল তাই চরম পরম পাওয়া। বন্যায় সমুদ্রে ভেসে যাওয়া মানুষগুলি পায়ের তলায় মাটি পেল এখন, যতই ঢেউ আসুক মানুষগুলি ডুবে মরবে না— এমন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বড়দাদা আকাশের নীচে শক্ত শানের ওপর জাবড়ে বসে পড়লেন।

বড়দাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে ফের বাতাসের সমুদ্রে শ্বাস ফেলে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, যে মানুষ দেশের বিপর্যয়ে, দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবে, দেশের মানুষের সেবা করবে— সে কি না আজ ভিখারির মতো পথে পথে ঘুরে মরছে, অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে চলেছে। কথা তাঁর শেষ হল না চোখের জলে বুক ভেসে যেতে থাকল। ফের তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠে বলতে শুরু করলেন: বাপ-ঠাকুরদা আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমি তোমাদের সম্মান রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি,— ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকেন। তারপর দু'হাত দিয়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে মুঠো করে চেপে ধরেন। নিজেকে তিনি সামলান।

আমি চোখ জ্বালা-করা ক্লান্তি আর কষ্ট বুকে চেপে বোঁচকাবুঁচকির ওপর নেতিয়ে পড়লাম। এখন আর এ সব কথায় ঘাবড়ে যাই না। কথাগুলো যতই সাংঘাতিক হোক, যতই বেআব্রু হোক, মনের মধ্যে গিয়ে আগের মতো আর ধাক্কা দেয় না। সব কিছু শুনতেও শিখেছি, ঝেড়ে ফেলতেও শিখেছি। সব কিছু সহ্য করবার ধৈর্য ধরতেও শিখেছি।

দু'চোখ মেলে তাকালেই যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখা যায়, মানুষের কালো কালো মাথা গোটা স্টেশন চত্বর, ওদিকে ট্রাম লাইন, বাস ট্যাক্সি, টানা-রিক্সশা চলা রাস্তায় সর্বত্র থিকথিক করছে মানুষ। দেশভাগের মহাবিপর্যয়ে ধ্বংসকাণ্ডে ভাগবাঁটোয়ারায়, সব রাজনীতির অসহায় শিকার পূর্ববাংলার হাজার হাজার ছিন্নমূল দলিত, নিরপরাধ মানুষ, ভিটেমাটি সহায় সম্পদ সর্বস্ব ফেলে, প্রাণের দায়ে শিয়ালদহ স্টেশন-চত্বরে, কোথাও এক তিল জায়গা খালি পড়ে নেই।

মানুষের ওপর মানুষ যেন চড়ে আছে, শুয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা খালি পড়ে নেই। মানুষের ওপর মানুষ যেন চড়ে আছে, শুয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, জায়গার অভাবে। বিভিন্ন শিবিরে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে উদ্বাস্তুরা ওই স্টেশন চত্বরটুকু ব্যবহার করার অধিকারী। এই সামান্য পরিসরে পাঁচ থেকে ছয় হাজার দশ থেকে বারো হাজার নারী-পুরুষ-শিশু গাদাগাদি করে পড়ে আছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। প্রতিদিন হাজার হাজার উদ্বাস্তু শিয়ালদহ স্টেশনে যেমন ঢুকছে, তেমনি প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে লরিতে উঠে চলেও যাচ্ছে। কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনে বারো থেকে পনেরো হাজার মানুষ সব সময় থেকেই যাচ্ছে। ফলে পরিবারগুলি সাত দিন থেকে পনেরো দিনও শিয়ালদহ স্টেশনে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই এতগুলি মানুষের জন্য তিনটি মাত্র নলকূপ, নারীদের জন্য মাত্র দু'টি এবং পুরুষদের জন্য মোট আটটা শৌচাগার।

আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে আসবার পর তিন দিনে মাত্র দু'বার চিঁড়ে আর গুড় পেয়েছি তাও পেয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র ৩-৪ জনের খাবার। তা বিলি করে সেবা-প্রতিষ্ঠান। এখানেই সরকার এবং সেবা-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব শেষ। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে দেখার কেউ নেই। দেশত্যাগে দিশেহারা মানুষের জীবনে কী করুণ আর নিদারুণ দুঃখকষ্ট দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে এখানে না এলে জীবনে আমি তা কোনওদিনও দেখতে পেতাম না, জানতেও পারতাম না। সময়ের স্রোতে এই মানুষগুলি, টোপা শ্যাওলার মতো, অনির্দিষ্ট কেবল ভেসেই চলেছে। ব্যথাতুর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি মানুষের দিকে। শুনি তাদের কথাও:

বাঁচতে তো হবে মানুষকে। বাঁচতে তো হবে। কটা চুলের মস্ত মাথা, খুদে চেহারার এক আধবুড়ো মানুষ দু'হাতে ধরা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে ভিড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বারদুই একই কথা উলটে-পালটে বলছে আর জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টি চাটছে। পিছু পিছু গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে আট-দশ বছরের একটি মেয়ে। লালচে চুলের জঙ্গল ভরে মাথা ঢেকে রেখেছে। ওলট-পালট হাওয়ায় তার গোছাগোছা চুল উড়ছে। মুখে তার যেন ধুলো উড়ছে। শুকনো খটখটে, রসকষহীন চেহারা তার।

ওপাশেই দেওয়ালের গা-ঘেঁষে একজন মধ্যবয়সি স্ত্রীলোক কেন যেন হাউহাউ করে কেঁদে উঠল এবং ব্যাকুল হয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, ওরে সরে আয়, কেলেঙ্কারির একশেষ হয়ে যাবে। এ কী হল আমার। এও কী দু'চোখ

মেলে দেখতে হবে। ভিটে ছেড়ে এ কোন্ মুলুকে এলাম। এ যে দিনকে দুপুর-রাত করে নিচ্ছে। হায় ভগবান, হায় ঈশ্বর, এ কী হল। গলার স্বরটা তার কলবরে ডুবে গেল।

উশকো-খুসকো ধুলোভরা একমাথা চুল নিয়ে বেঁটেখাটো একটা মানুষ তাদের সামনে দাঁড়াল। খালি পা, খালি গা, মুখটা লম্বাটে, চোখদুটো মরছে-ধরা ছেঁড়া ন্যাকড়া। একটুকরো কাপড়ের ফালিতে বাঁধা টিনের থালায় কিছুটা খাবার। সেটা রাখতে রাখতে মানুষটা অসহিষ্ণু চোখ-মুখ কুঁচকে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বলল, ঈশ্বর যদি সত্যিই থাকত, মানুষের এমন দশা হত না। নে পাঁচি খেয়ে নে। খেয়ে নিয়ে বাঁচ তো। খেয়ে বাঁচ, নে ভাত বাড়। ওরা ভাত খেতে বসল আর পাশেই পড়ে আছে বেআব্রু উলঙ্গ মহিলার আধমরা শরীরটা।

তিনদিন হয়ে গেল ভাতের মুখ দেখিনি। যে চিঁড়ে গুড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে তাতে পেট ভরছে না। প্রাণ টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে উঠল। অথচ আমাদের আশপাশে রান্নার কোনও জায়গা নেই। সেই যেখানে ট্রামলাইন পাতা আছে, অনেকেই সেখানে রান্নার সব কিছু নিয়ে গিয়ে রান্না করে আনছে। পুরুষরাই সেখানে যাচ্ছে আর রান্না করে নিয়ে আসছে।

বড়দা খুঁজে খুঁজে কাঠ কিনে আনলেন। গেলাম ট্রামলাইনের মাঝে। গিয়ে দেখি গোটা লাইন পাতা এলাকায় তিন ইট পাতা শত শত উনুন। ২০০-২৫০ মানুষ রান্না করতে ব্যস্ত। আমরাও একটা উনুনে খিচুড়ি চড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। কাঠের জ্বাল কিছুতেই জ্বলে না। একে তিন ইটের উনুন, তায় ভেজা কাঠ। বড়দাদা তো মাটির সমান্তরালে মাথা নুইয়ে প্রাণপণে উনুনে ফুঁ দিয়ে চলেছেন। কিন্তু আগুন তেমন ভাবে জ্বলছে না। গলগল করে গাঢ় ধোঁয়া উঠে ছোটখাটো একখানা মেঘই যেন আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

বড়দাদা ছাড়বার পাত্র নন। কৌশল কাটিয়ে আগুন জ্বেলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেললেন। কিন্তু দুই ভাইকে এত কষ্ট করতে হল যে, ঘেমে নেয়ে একেবারে একাকার হয়ে গেলাম। রান্না শেষ এখন গরম হাঁড়িভর্তি খিচুড়ি। বড়দার পরনে ধুতি গায় জামা, ঝুল পকেটে একদিকে ক'টি খুচরো পয়সা, অন্য পকেটে কাগজে মোড়া একপাতা সিঁদুর। বড়দার খালি পা। আমারও খালি পা, খালি গা। একটা দড়িভরা প্যান্ট পরনে। বড়দাদা দু'হাতে গরম খিচুড়ি-ভরা হাঁড়ি ধরে নিয়ে হাঁটছেন। আমি পিছনে ঘটি আর খুন্তি হাতে বড়দার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি। মানুষের ভিড়ে হাঁড়ি হাতে চলা খুবই কঠিন, তবু চলেছেন বড়দাদা।

ট্রামলাইন পেরিয়ে আমরা স্টেশন-চত্বরে ভিড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে হেঁটে

পার হচ্ছি। হঠাৎ দেখি বড়দাদা দু'পায়ের কাছে সামনে হাঁড়ি নামিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠলেন, ভাইডি, দাঁড়া, জল দে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, জল দে ভাইডি।

ঘটির জল বাড়িয়ে দিতেই দেখি বড়দাদার চোখেমুখে সিঁদুর ছড়ানো। সামনে সিঁদুর পাতার কাগজখানাও পড়ে আছে। আর একটি ঠ্যাঙা লোক, টাকমাথা উঁচু কপাল ভিড় ঠেলে ছুটে পালাচ্ছে। আর বড়দাদা চিৎকার করছেন, ওই যে পকেটমার, ধর শালাকে। ওই পকেটমার পালাচ্ছে ধর শালাকে। পকেটমার পালাচ্ছে ধর শালাকে...।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। পকেটমার পালিয়ে গেল। বড়দাদা বললেন, ভাইডি পকেটমার মনে করেছিল আমার ঝুল পকেটে টাকার বাণ্ডিল আছে। কিন্তু পাতা খুলে দেখে সিঁদুরের পাতা। তাই রেগে আমার চোখেমুখে সিঁদুর ছুড়ে দিয়ে গেল। চল ভাইডি চল। এমন ঘটনা কতই ঘটবে চলার পথে। কিছু নিতে পারেনি পকেটমার। চল ভাইডি। চ। চ।

হ্যাঁ চলো দাদা, হাঁড়ি আর ঘটি তো আছে। চল, চল দেরি করলে আবার কী ঘটবে কে জানে। আমরা ভিড় ঠেলে হাঁটতে থাকালাম। শেষে পৌঁছে গেলাম আমাদের সেই ফুট জায়গায়— বোঁচকাবুঁচকির ওপর এঁটো থালা ঘটিবাটি থোবার কোনও জায়গাই নেই। অগত্যা দু'খানা থালা আর একটি বাটিতে ছোট-বড় একুশজন মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিলাম খিচুড়ি।

আমাদের ফুট জায়গায় মুখোমুখি আড়েদিঘে সাড়ে তিন হাত জায়গায় শেষসম্বল আগলে বসে আছে একজন শুকনো মানুষ। লম্বা পাটকাঠির মতো চেহারা, খালি পা, খালি গা, কালচেপানা গায়ের রং, ঠোঁটদুটো সাদা, পুরু কানের লতি। যেন লোকটা জেগে বসে পাহারা দিচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে একটুখানি ঝুঁকে বউ-ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প টাকপড়া মাথাটা শূন্যে হেলান দিয়ে বিড়বিড় করে অবিরাম কী যেন বলে চলেছেন। তার কালো গর্তে ঢোকা চোখদুটো থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে তীক্ষ্ণ ঘৃণা। অন্তর্ভেদী সেই প্রখর দৃষ্টি যেন শানের ওপর দাউদাউ আগুন জ্বেলে দিচ্ছে।

বোঁচকার ওপর কত সময় আর বসে থাকা যায়— এদিক-ওদিক ঘুরি, মানুষ দেখি, ট্রেন দেখতে প্ল্যাটফর্মের দিকে যাই— কত মানুষ যাচ্ছে আর আসছে। প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার মুখে পান-বিড়ির দোকানদার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, এ ছেলে তুমি হারিয়ে যাবে, শিগগির তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও। লোকটা একজন খরিদ্দারকে পান দিতে ব্যস্ত। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা শুনি।

ছুটে এল এক ফেরিওয়ালা। যারা ট্রেন থেকে নামছে, তারা সবাই আমাকে ধমক দিতে শুরু করল, এটা কার ছেলে? তোর মা-বাবা কই? এই ছেলে, তোর মা-বাবা কই?

আমার মা-বাবা নেই বলে আমি পিছে পা-পা হাঁটতে থাকি। দু'চোখে বুঝি ভয়তরাস।

অনেকক্ষণ ধরে তারা আমাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি করল কেউ নাক টিপল, কেউ গাল টিপল, কেউ চুল ধরে টানল, কেউ খেলো পেটের চামড়ায় চিমটি কাটল, কেউ কান মলে লাল করে দিল। তারা যেন আমাকে অদ্ভুত খেলনার বস্তু পেয়েছে এমন করতে থাকল নিষ্ঠুর ভাবে।

অবশেষে সেই ফেরিওয়ালা পাকা চুল, মাথায় ফেটি বাঁধা, পিটানো স্বাস্থ্য, মুখে পান খাচ্ছে, ঠোঁট লাল আমার কাছে সরে এল। সে বলল, এ একটা রিফ্যুউজি ছেলে। ওরা এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। মানুষটার গলায় বাদামের ঝুড়ি ঝুলছে। তার থেকে দুটি বাদাম তুলে আমাকে প্রায় জোর করে ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাও খোকা, তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে ফিরে যাও। ভিড়ে তুমি হারিয়ে যাবে। ফেরিওয়ালা যতটা পারল নত হল। আমার হাতটি শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল।

ও ভাই, তুমি এখনও কিছু বোঝো না, কিছুই চেনো না, জানো না— হারিয়ে যাবে পালাও, পালাও ট্রেন ছেড়ে দেবে এক্ষুনি। ছেলেধরা ধরে নিয়ে যাবে। পালাও! ফেরিওয়ালা ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠল। ট্রেন চলে গেলে, প্রচণ্ড শোরগোল এবং তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে স্টেশন চত্বরে ঢুকবার মুখে চোখের দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল একজন নগ্ন মানুষ। বলা উচিত একটি কঙ্কাল, শরীরের কোথাও একটুকরো মাংস নেই। মলমূত্রে একেবারে মাখামাখি। মাছি উড়ছে, পাশে রক্তবমি, কুকুর জিভ দিয়ে চাটছে— বীভৎস্য দৃশ্য! যেখান দিয়ে হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর যাতায়াত, সেই পথেই ওই মানুষটা মারা যাচ্ছে— কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। অদূরেই পোঁটলাপুঁটুলি আগলে ক'টি পরিবার। এই জীবন্ত নরক নিয়ে বাস করছে তারা। আমি ভাবতে পারি না, দেখতেও পারি না ছুটে আসি আমাদের বোঁচকাবুঁচকির আস্তানায়।

বোঁচকার ওপর উঠে বসতেই শুনলাম, আমাদের সামনের পরিবারটির সোমত্ত বড় মেয়েটিকে গতকাল সন্ধ্যা থেকে খুঁজে পাচ্ছে না, তার মা পা দাপিয়ে চাপা সুরে কাঁদছে।

খবরটা নতুন নয়, মাঝেমধ্যেই তো শুনছি— যুবতী মেয়েরা হারিয়ে যাচ্ছে, যুবতী বউদিদেরও ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট, এত দুঃখ আর অনিশ্চয়তার মধ্যেও এসে জুটেছে ঠগের দল। সেবাকর্মীর মুখোশ পরে দালালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে— যুবতী, তরুণীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে মোটা টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। নারীরাও পেটের ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ঠগ জোচ্চোরে শিয়ালদহ চত্বরের উদ্বাস্তু মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। কিন্তু কে কাকে বলবে? সবাই জীবনের কশাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা। এ সব ভাববার, শুনবার, জানবার মনটাই হারিয়ে ফেলেছে তারা। এখন বাঁচাটাই বড় ধর্ম। আর সবই মিথ্যা, মানবিকতা, সামাজিকতা সব শেষ। বাঁচার জন্য মানুষ মানুষকেই খুন করছে।

আমাদের বোঁচকাবুঁচকির পিছনে হাত তিনেক দূরে চোখদু'টো কপালের গর্তে ঢুকানো, চুলদাড়ি দু'মাস না-কাটায় মাথাভর্তি, মুখভর্তি জঙ্গল, ভোঁতা নাক, পাতলা কাঠিকুঠি চেহারা, দু'হাত নেড়ে মাঝে মাঝেই চিৎকার করে ওঠেন, শালারা কিছুতেই আমাগে এখান থেকে সরাবে না। এই ঠনঠনে শানের ওপর পুরো দু'টি মাস ধরে শরীরের রস নিগড়ে নিচ্ছে। তার পর কঙ্কাল করে পাঠাচ্ছে উদ্বাস্তু শিবিরে। উদ্বাস্তু শিবির নয়তো কয়েদখানা। মরগে যা। ঠেলা খাওয়ার জাত। যা মরগে যা— এই তো শেষ পরিণাম। শরণার্থীদের পরিণাম হবে জাহান্নাম।

পথে আসবার সময় এই মানুষটার স্ত্রী মারা গেছে। দু'টি সোমত্ত মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে এখানেই পড়ে আছে। স্ত্রী মারা যাওয়াতে মানুষটার পরিবারটি উদ্বাস্তু শিবিরে নাকি পাঠানো যাচ্ছে না।

ডাক না-হওয়া উদ্বাস্তু শিবিরে না-পাঠানো অনেক পরিবার আটকে রয়েছে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে। একবার ডাক এসে চলে গেলে ফের ডাক হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না তা উদ্বাস্তুরা জানে না। তাদের খোঁজও কেউ নিচ্ছে না। এমন আরও একটি পরিবার দেড়মাস ধরে ডাকের অপেক্ষায় বসে আছে তার নাম সুবল সর্দার। নাক ভোঁতা মানুষটির কথা শুনে সুবল সর্দার বলল, চলো দিহি ভায়া নিজির মতো। চলো তালি, নিজির ভাগ্যকে মাথায় করি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বসে বসে হুঁকো টানছিল সুবল সর্দার। সেই কথা পাড়ল বিরক্তিতে ভুঁরু কুঁচকিয়ে।

আকাশের নীচে একটুকরো ছেঁড়া মাদুর পেতে হাতের ওপর মাথার ভার রেখে কাত হয়েছিল যে মানুষটি— সে তার কাঁচাপাকা চুলের ভারী মাথা নাড়িয়ে

যেন গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলল, শোনো ভায়া, বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে কিচ্ছুটি হবে না, এখন দরকার খালি মাথাটা বাঁচানো। বুঝলে ভায়া, পৈতৃক জানটা বাঁচানো দরকার। বুঝলে ভায়া, বুঝলে— মাথাটা, জানটা না বাঁচালে সব ফক্কা। এ বিপর্যয়ে জানটা বাঁচানো চাই-ই। কথা বলতে বলতে মানুষটা উঠে বসলেন।

ও-পাশ থেকে বোঁচকাবুঁচকির আড়াল ডিঙিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁটেখাটো মানুষটা যেন কথার মতো কথা শুনতে পেয়েছে— এমন একটি উৎফুল্ল ভাব মুখেচোখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, কে যে কী ভাবছে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। কারও পেট থেকেই কথা টেনে বের করা যাচ্ছে না। সাধে কী বলেছে, বারো জায়গার তেরোজন, কারও ভেতরেই ঢোকা যাচ্ছে না। মুশকিল আর কাকে কয়। সে গুম হয়ে মাথায় হাত রাখে।

হুঁকোটানা বুড়ো সুখটানই বুঝি দিলেন। তার পর দলাপাকানো ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বলল, তা সত্যি তা সত্যি ভায়া। কারও পেট থেকেই কথা টেনে বার করা যাচ্ছে না। সবাই কুলুপ এঁটে বসে আছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভেতর ডুব মেরে সময় কাটাচ্ছে। ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। ঠিক সময় বুঝেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের নিজের জীবন বগলদাবা করে লেজ তুলে ছুটে পালাবে। হা হা। লোকটার চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

গোটা শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের বাতাসে নাই নাই খাই খাই-এর মতো লক্ষবার একটাই কথা ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছে— কিছু করার নেই, কিছুই করার নেই। শুধু স্রোতে গা ভাসিয়ে বেঁচে থাকা। কেবল হা-হুতাশ করে সময় কাটানো, মরা খিদের আগুন পোহানো।

একটা কথাই মুখ থেকে মুখে ঘুরে চলেছে এবং মানুষের মুখে মুখে তা ধারালো হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আরও ধারালো হয়ে উঠছে— কিছুই করার নেই। ঘটে-চলা ঘটনাগুলোর স্রোতে গা ভাসিয়ে মানুষ ভেসে চলেছে— কিছুই করবার নেই। কেবল মরা খিদের আগুন পোহানো।

আমাদের পরিবারের মানুষগুলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। প্রত্যেকেরই চেহারা ক্লান্ত-বিষণ্ণ-উদ্‌ভ্রান্ত। মহিলাদের অবস্থা আরও ভয়ংকর। তাদের স্নানের জায়গা নেই, প্রস্রাব পায়খানা করবার জায়গা নেই। তাই তারা খাবার খেতে ভয় পান— পাছে পায়খানা করতে নরককুণ্ডে ঢুকতে হয়, জলটুকু খেতেও ভয় পায় তারা। গত ছ'-ছ'টা দিন প্রায় না-খেয়েই তারা কাটিয়ে দিল। বড়দাদা তো অন্তহীন ছোটাছুটি করছেন— কত তাড়াতাড়ি ডাক নিয়ে এই নরক থেকে বেরিয়ে যাবেন সেই চেষ্টায়। মেজদা ছোটাছুটি করেন, পরিবারের মানুষগুলির কখন কী

প্রয়োজন হয় তার জন্য। কোন সুদুর গ্রাম থেকে এসেছে পরিবারের মহিলারা। কোথাও তারা যেতে পারে না। ফলে মেজদাদাকেই সব করতে হয়। পিপাসার জল সংগ্রহ করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ছোটদের পায়খানা প্রস্রাব করাতে ট্রামলাইনের ওদিকে নিয়ে যেতে হয়। প্রতিদিন সকালবেলায় রেল-কর্তৃপক্ষ স্টেশন চত্বর জল দিয়ে ধুয়ে দেয়। ওই সময় বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে মাথায় কাঁখে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

দাঙ্গায় তাড়া খেয়ে, ঘরপোড়ায় ভীত হয়ে বহু মানুষ এক কাপড়েই পথে নেমে এতদিন ধরে হেঁটেই চলে এসেছেন। তাদের পরনের কাপড় ভিজলে আধখানা কাপড় পরে থাকেন আর অর্ধেক কাপড় রোদে শুকোতে দেন। লোহার চটারবেড়ার ধারে প্রতিদিনই দেখি কত মহিলা অর্ধনগ্ন হয়ে রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে কাপড় শুকাচ্ছেন।

দিনের পর দিন এই সব মানুষ না-খেয়ে দীর্ঘদিন থেকে স্নান না-করে এক কাপড়ে থেকে, পরনের কাপড় না পরিষ্কার করে ধুলোর মধ্যে শুয়ে-বসে গড়াগড়ি করে থাকতে থাকতে মানুষগুলিকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। নগ্ন, অর্ধনগ্ন মানুষগুলির চোখেমুখে মাথায় সমস্ত শরীরে যেন পোড়া ছাই উড়ছে, চোখের কোণায় হলুদ পিচুটি জমে গেছে। মাথার চুলে তেল দেওয়া নেই, চিরুনি দেওয়া নেই। তাতে জটা বেঁধে গেছে। মানুষগুলি মনুষ্যতর জীবে পরিণত হয়েছে। অনেককে আর মানুষ বলেই চেনা যাচ্ছে না।

মানুষগুলি পথেঘাটে আঘাত খেয়ে খেয়ে শেষ হয়ে গেছে। দেহে শক্তি নেই, বল নেই, মনে এতটুকু সাহস নেই। অভিমান আর অসন্তোষ বাইরে প্রকাশ করবার আর শক্তি নেই। ভেতরে তাদের আগুন নিজেকে পুড়িয়ে মারছে। কুরকুর করে ক্ষয় করে নিচ্ছে অস্থিমজ্জা আর রক্ত।

আমাদের সামনে হাতদশেক দূরে অসমান দেওয়ালে পিঠ বাঁধিয়ে একজন মা একেবারে কঙ্কাল চেহারা— তিনি তার কোলের আধমরা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন প্রাণপণে। শুকনো স্তনের বোঁটাটি সন্তানের মুখে গুঁজে দিয়ে মা নিজেই স্তন টিপে বাচ্চার মুখে দুধ দিচ্ছেন। কিন্তু দুধ বেরোচ্ছে না। শিশুটি হাত-পা নাড়াতেই পারছে না। এক সময় দেখা গেল, শিশুটি মার কোলেই মারা গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে শিশুর পিতা ডাক নিয়ে ছুটে এলেন। শিশুটি মারা গেছে জেনেও সেই মরা শিশু কোলে নিয়ে মা লরিতে গিয়ে উঠলেন। লরিতে উঠতে উঠতে লোকটি হাত নেড়ে আমাদের বললেন আবার দেখা হবে ভাই। যাই...।

পরপর বড়দাদাও আমাদের ডাক নিয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু আমরা পরিবারের সকলে এক উদ্বাস্তু শিবিরে যেতে পারছি না। মেজদাদার ডাক হল ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে আর বড়দাদার ডাক হল কুন্তি উদ্বাস্তু শিবিরে। মেজদাদার সঙ্গে যাবেন মেজবউদি, বড়দাদার সঙ্গে বড়বউদি, বড়দি। আমার বড়বউদির কোলের মেয়ে আর আমি। মেজদাদার লরি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে লরিতে উঠতে হবে। তাই শিয়ালদহ স্টেশনে ওই ফুট পরিমাণ জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে সংসারটি ভাগ করতে হল। শেষসম্বল যা কিছু ছিল তাই কিছু ভাগ করে মেজদাকে দিয়ে দেওয়া হল। কোনওমতে যাতে জীবন প্রাণ বাঁচাতে পারেন। আমাদের নিকটতম স্বজন পিসতুতো দাদা, মেজদাদার শ্বশুর মহাশয়, আমাদের ভগ্নিপতি অধীর মণ্ডল, সঙ্গে ছোটদি এবং মেজদাদা এক উদ্বাস্তু শিবিরে চলে গেলেন। আমরা স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রইলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। বারোটার সময় মেজদাদা লরিতে উঠলেন। আমরা লরিতে উঠলাম তিনটার সময়। এক পরিবার ভাগ হয়ে অজানা অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে গেলাম। আমাদের সঙ্গের এক পরিবার সুধন্য দাস মৃত বাবাকে ফেলে রেখে লরিতে উঠলেন।

উদ্বাস্তু শিবিরে যাওয়ার জন্য যে পরিবারের নাম ডাক হল সেই পরিবার শেষ সম্বলটুকু মাথায় তুলে স্ত্রী-পুত্র কন্যার হাত ধরে লরিতে গিয়ে উঠল। যে পরিবারের নাম ডাক হল না সে পড়ে রইল প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাতে, রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে। যারা বেঁচে রইল তারা হয়তো এক সময় চলে গেল আর যারা পথের কষ্ট সইতে না পেরে মরে পড়ে রইল— তাদের ঠাঁই হল গণকবরে— গণচিতায়।

এ রকম গণচিতায় পোড়ানোর জন্য প্রতিদিন সকাল বিকাল শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে মুর্দাফরাস আসত। দেখতাম প্রতিদিন মরা মানুষের লাশ তারা চারটি-পাঁচটি কখনও আটটি-দশটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষদের লাশগুলি গণচিতার নাম করে কোথায় যে যাচ্ছে কোনও মানুষ তা জানে না।

অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা লরিতে গিয়ে উঠলাম— পিছনে পড়ে রইল অসংখ্য মানুষ।

ভেসে যাওয়া জীবনের পথে কেউ কারও জন্য থেমে থাকল না— প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রাণটুকু বুকে আগলে চলে গেলেন— পিছন ফিরে তাকালেন না। আমাদের দলের আর পরিবারের সকলকে নিয়ে বোঁচকাবুঁচকি-সহ লরিতে উঠলাম। আমরা লরিতে উঠতে গিয়ে দেখলাম আমাদের মতো আরও ক'টি উদ্বাস্তু পরিবার ইতিমধ্যে লরিতে উঠে জায়গা নিয়েছে। আমরা শুনেছিলাম প্রত্যেকটি লরিতে দশটি করে পরিবার যাবে। তাতে যত লোকই হোক না কেন তা দেখবার, ভাববার কোনও সরকারি প্রতিনিধি নেই। ভেড়া-ছাগলের মতো মানুষগুলো লরিতে গাদাগাদি করে তুলে ঠেসে ভরে দিয়ে যেন চালান করে দেওয়া হচ্ছে। উদ্বাস্তুরাও যে মানুষ এ-দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ তা মনেই করে না। মনুবাদী প্রশাসন উদ্বাস্তুদের প্রতি সীমাহীন অবহেলা অত্যাচার ঘৃণা আর অমানবিক ব্যবহার প্রতি ক্ষেত্রেই করে চলেছে। তাদের কী হাল, কী অবস্থায় তারা শিয়ালদহ স্টেশনে পড়ে আছে, কী অবস্থায় তাদের পাঠানো হচ্ছে তার ভালমন্দ দেখবার কোনও সরকারি কর্মচারী ছিল না। আর থাকলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বাস্তুরা 'উড়ো আপদ' এদেশে, অবাঞ্ছিত, এদের যেখানে খুশি ঠেলে ফেলতে পারলেই যেন দায়মুক্ত হতে পারে। কায়েমিদার উচ্চবর্ণের মানুষ যারা সরকারি ক্ষমতায় ছিল, তারা নিম্নবর্ণের এই উদ্বাস্তুদের মৃত্যু কামনাই করেছে তার জন্যই এক-একটা লরিতে দশটি করে পরিবারকে আবর্জনার মতো নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ঠেসে গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষ মরুক আর বাঁচুক সে দিকে তাকায়নি তারা।

একটি গাছের শিকড় মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এবং অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গাছের অস্তিত্ব, শ্রীবৃদ্ধি আর বেঁচে থাকা শিকড়ের ওপরেই নির্ভরশীল। সেই গাছকে মাটির সস্নেহ আলিঙ্গন থেকে যদি উপড়ে তুলে অন্যত্র আনা হয়, তা হলে তার জীবনীশক্তি প্রতিদিন শেষ হতে থাকে। সঠিক সময়ে তাকে পুনরায় মাটিতে উপযুক্ত ভাবে বসাতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। উদ্বাস্তু মানুষের অবস্থা আজ তাই দীর্ঘদিন অব্যবস্থায় অনাহারে অযত্নে ফেলে রেখে তাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে হীনপ্রাণ বস্তা পচা মালের মতো লরিতে গাদা মেরে তুলে দিল। নির্মম নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত অবস্থায় জোর করে ঠেলে লরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অনাহার, অনিদ্রায় অমানবিক অব্যবস্থায় অত্যাচারে অবহেলায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে।

বিকালবেলায় আমরা যখন ঠেলেঠুলে মরিয়া হয়ে লরিতে উঠলাম, কারও হাঁটু কেটে গেল, কারও মাথায় জোরে ঠোকা লাগল কারও পা ভাঙল,আমার তো হাতের পোছায় লরির ডালার ঘষা লেগে খানিক চামড়াই উঠে গেল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরতে থাকল সেখান থেকে। রক্ত বন্ধ করতে একটুকরো ন্যাকড়াও জুটল না। খোলা লরির ওপর গাদাগাদি। একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ কেউ নিরুপায় লরির ডালা ধরে কষ্ট করে বসলেনও। লরি চলতে শুরু করলেই ধুলো-বালি রাস্তার আবর্জনা উড়ে এসে আমাদের মুখে পড়তে থাকল। চোখ অন্ধ। বুকে লাগল বেপরোয়া বাতাসের মার। মাথার এলোমেলা চুল, মেয়েদের কাপড়ের আঁচল বাতাসে ছিঁড়ে নিচ্ছে যেন। শিকড় ছেঁড়া মানুষের ফ্যাকাশে উদ্বিগ্ন মুখগুলি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। প্রত্যেকের শুধু চিন্তাকুল মুখ আর কুঞ্চিত কপাল একটা শঙ্কিত অনুভূতি আছন্ন করে ফেলে অনেককেই, সামনে তো অনন্ত অন্ধকার। আমরা কোথায় চলেছি? কোথায় গিয়ে আমরা শিকড় বসাব, থিতু হব? না অথৈ আঁধারে ডুবে মরব?

লরির ঝাঁকানিতে অনেকেই ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠেন। মানুষের কষ্ট দেখে বড়দা তো আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না, তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। তার আলুথালু পোশাক এলোমেলো চুল সমস্ত আকৃতিতে যেন একটা শজারুর কাঁটার মত্তো তীক্ষ্ণতা। তিনি কাতরে আমার কাছে ঘেঁষে এসে ঝুঁকে পড়ে জখম হাতটা দেখতে থাকেন।

হাতের পোছায় তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে দেখে আমার মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে। বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। ব্যথায় চোখের জল আপনি ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে থাকে।

বড়দা দরদি গলায় সান্ত্বনা দেন, ভাইডি, একটু সহ্য কর। লরি থেকে নেমেই কিছু একটা লাগিয়ে দেব। একটু সহ্য কর ভাইডি। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেন।

একজন মা সীমান্ত পেরিয়ে আসবার সময় গণ্ডগোলে পড়ে তার সন্তানকে তিনি হারিয়েছেন, লরিতে উঠেই তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাকে দেখে মনে হল যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ওই সন্তান-হারা অভাগী তার মরা ছেলের হিংস্র শোক আর প্রতিশোধের জ্বালা ভুলতে পারবেন না।

বড়দা যেন মানস নেত্রে দেখতে পান সেই রক্তপাত, সেই মুখ, সেই জ্বলন্ত চোখ, অমানুষিক বর্বরতার সামনে একটা তিক্ত অসহায়তায় তার বুকখানা কুঁকড়ে ওঠে। আজ যেন তাঁর ফের মনে পড়ছে— রক্ত আর আগুন, আতঙ্ক আর সন্ত্রাস, অপমান আর নির্যাতন— এই সব জীবনসত্য তো ভরে থাকে তাঁর

চিত্তবিশ্ব। কিছুতেই তিনি তা ভুলতে পারেন না।

আমরা যারা এখন লরিতে চড়ে অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে চলেছি, আমাদের একটাই পরিচয় আমরা উদ্বাস্তু, শরণার্থী। কোথায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা তা জানি না। আমাদের আগে পিছে তিরিশটা লরি চলেছে। এই তিরিশখানা লরির জন্য একজন মাত্র সরকারি প্রতিনিধি বরাদ্দ— যিনি জানেন কোথায় যাবে এই মানুষগুলি। কোথায় খোলা হবে নতুন উদ্বাস্তু শিবির।

চলার পথে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে বালি ব্রিজের আগে লরিগুলি সব দাঁড়িয়ে পড়ে। আমার হাতের ব্যথা ভুলাতে বড়দা আমাকে লরির ঢালার ওপর দাঁড় করিয়ে দেখান আর বলেন: ওই দেখ ভাইডি, মা গঙ্গাকে দেখ। আমরা এখন বালি ব্রিজ পার হব। বুকের ব্যথা সব যেন মুখে এসে জমা হয়েছে, এমন ভাবে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে তিনি বলেন।

ক্লান্তিতে আমার দেহমন অবশ হতে থাকে। কেবল জ্বালাধরা চোখদুটো দিয়ে অন্ধকারে মা গঙ্গা খুঁজি। বালি ব্রিজকে খুঁজি আর ব্যথা-জ্বালা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি।

খোলা আকাশের নীচে দিয়ে একটানা আমাদের লরি ছুটে চলেছে। শেষ সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরে মানুষজন গাদাগাদি লরির ভেতরে দাঁড়িয়ে প্রহর গুনছেন— কখন আবার মাটিতে পা পড়বে, কখন আমরা খোলা বাতাসে প্রাণ ভরে পুনরায় শ্বাস নিতে পারব। হেমন্তের শিশিরে ভিজতে ভিজতে ধুকধুক প্রাণগুলো আমরা লরির ভিতরে প্রাণ হাতে নিয়ে চলেছি। সারি সারি মানুষবোঝাই লরি ছুটে চলেছে। লরির ভেতর মানুষদের যে কী কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। অনেকেই ঝাঁকানির কষ্ট ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অবিরাম কেঁদে চলেছেন। একজন বুড়োমানুষ পায়খানা করে ফেললেন। একজন যুবতি-বউ সারা রাস্তা বমি করে চলেছেন। দু'জন মহিলা কিছুদূর এসেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। লরির ভেতর এমন কোনও জায়গা নেই, তাদের শুইয়ে দেওয়া যাবে। মানুষের গায়ের ওপর তারা পড়ে রইলেন। রোগের যন্ত্রণায় দুই পুরুষ আর এক মহিলা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে, আর পারি না। হে ঈশ্বর আমাকে নাও, একমুহূর্ত বাঁচতে চাই না। আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও প্রভু। লরির ডালায় একজন মাথা কুটতে থাকেন। আসন্নপ্রসবা এক মহিলা বহুক্ষণ ধরে ছটফট করছে। মধ্যরাতে সে আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, মা গো আমি আর পারছি না। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। কথা বলতে বলতে মহিলাটি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু-তিনজন বয়স্কা মহিলা অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে তার দেহটা হাতের ওপর তুলে ধরে রাখল, একটু সয়ে থাক মা, একটু সয়ে থাক মা।

মহিলারা সান্ত্বনা দিলে কী হবে আসন্নপ্রসবা মহিলার ঠুসি ভাঙতে শুরু করেছে, চার মহিলার হাতের ওপরে প্রসবের পূর্ব জল ভাঙচে। সন্তান প্রসব হতে আর দেরি নেই।

লরি দাঁড় করানোর জন্য মহিলার স্বামী পাগলের মতো লরির ডালিতে আর মাথায় আঘাত করছেন, লরির চালক তবু লরি দাঁড় করাচ্ছে না। বরং আরও জোরে লরি ছুটে চলল। গোটা লরির মানুষজন সমস্বরে চিৎকার শুরু করল। কিন্তু তাতেও লরির চালকের কানে জল ঢুকল না। লরি তেমনি চলতে থাকল।

এ দিকে লরির ভেতর আসন্নপ্রসবা মহিলা ঠুসি ভেঙে চলেছেন। বয়স্করা নিরুপায় হয়ে কেউ গালাগালি দিচ্ছে লরির চালককে। কেউ অভিসম্পাত দিচ্ছে। কেউ গালাগালি দিচ্ছে ভাগ্যকে।

চলার পথে শেষ রাতে চলন্ত গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনও আঁধারে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবু বোঝা গেল এটাই আমাদের গন্তব্যস্থান। যারা পারল লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল। তার পর লরির ডালা খুলে বোঝাই মাল খালাস করার মতো মানুষদের, তাদের বোঁচকাবুঁচকি নামিয়ে দিয়ে লরি ফিরে চলে গেল। আমরা এক লরি মানুষ আর বোঁচকাবুঁচকি আঁধারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঝামটি বনে পড়ে রইলাম।

আসন্নপ্রসবাকে ধরে নামালেন চার বয়স্কা। তরুণী প্রসব যন্ত্রণায় শুয়ে পড়লেন মাটিতে দু'হাতে মাটি খামচে শুকনো ঘাস-পাতা ছড়িয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা রক্তাভ চোখের মণিদুটো অমানবিক বীভৎস মুখে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কোঁতাচ্ছে উঃ ভগবান, ভোরের গায় তখনও সামান্য আঁধার জড়িয়ে। তরুণী ফের চিৎকার করে উঠল, উঃ ভগবান, বাঁচাও, আবছা আলোয় দেখতে পাচ্ছি দাঁত দিয়ে কামড়েধরা ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে, চোখদুটো ঝলসে যাচ্ছে। মা হওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। শরীরটা এমন ভাবে মোচড়াচ্ছে যেন এক্ষুনি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবে।

সমবেত মহিলাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ জোরে, আরও জোরে বেগ দাও। কোঁথ দাও, বেগ দাও, কোঁথ দাও। আরও জোরে...।

বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘটছে ওখানে। তার পরই শুনতে পেলাম নবজাত শিশুর কণ্ঠস্বর— ওঙা, ওঙা, ওঙা...।

সমবেত বয়স্করা বুঝি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের নিজের বোঁচকাবুঁচকির কাছে চলে গেলেন। তরুণী মা সেই ঝামটি বনে সন্তান কোলে বসে রইলেন।

ধারে কাছে গ্রাম-গাঁ বলতে কিছু নেই। লরির পর লরি আসছে আর ইতস্তত ঝামটি বনের এখানে-ওখানে লরি লরি শিকড় ছেঁড়া মানুষদের খালাস করে চলে যাচ্ছে। আমার চারদিকেই আবছা আঁধারে শুধু ক্লান্ত বিষণ্ণ ভাঙাচোরা আধমরা মানুষজনই কিলবিল করছে, হা-হুতাশ করছে, আর্তনাদ করছে। বিরামহীন কাতরাচ্ছে। দুর্যোগের রাত শেষ হলেও মানুষের দুঃখকষ্ট বেদনার বুঝি শেষ নেই। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আধমরা মানুষদের ক্ষীণ কণ্ঠের কলরব ঝিমিয়ে আসছে মৃত্যুর মতো শীতল আঁধারে সব বুঝি তলিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুধায় কাতর, প্রচণ্ড তেষ্টায় গলা শুকনো মানুগুলো শেষসম্বলটুকু জড়িয়ে যে যেখানে পারল নির্জীব হয়ে পড়ে রইল আগামী দিনের সূর্য ওঠবার আশায়। যারা একটু সচল ছিল তারা দূরে মিটমিট করে জ্বলা আলো লক্ষ করে বুক বেঁধে এগিয়ে গেল। তৃষ্ণা মেটাতে জলের খোঁজে, খাবারের খোঁজে— কোথায় আশ্রয় হবে তার খোঁজে। কেউ কেউ দল বেঁধে হাঁটলেন সরকারি লোকের খোঁজে, অন্যরা গেল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এদিক-ওদিক বাগানে আগানে ঝোপে-ঝাড়ে আড়ালে।

কষ্টে দুঃখে ক্লান্তিতে ক্ষুধায় কখন যে চোখের পাতা বুজে এসেছিল তা টের পাইনি। ঘুমের ঘোরে বুঝি পাশ ফিরে শুতেই পিঠে পাঁজরার হাড়ে দারুণ ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে উঠলাম, উঃ উঃ। চোখ মেলে পাশ ফিরে দেখি, মাটির ওপর ধারালো ঘেঁষ বিছানো রাস্তায় একটি ফুটো টিনের থালায় মাথা রেখে শুয়ে আছি। ঝামটি গাছের নুয়ে-পড়া মাথা আমার চোখের ওপর, বুকের ওপর, মুখের ওপর। আমার চারপাশে গা-ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে শুয়ে আছে নতুন আর পুরনো এবং অপরিচিত নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। গোটা মানুষজনের দঙ্গলটা এত গাদাগাদি আর বেসামাল পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে যেন একগাদা পিঁপড়ের ঢিবি। অসম্ভব বিস্ময় কৌতূহল আর ব্যথা কষ্ট যন্ত্রণা যেন গলা চিরে ফেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। ক্ষতবিক্ষত হাত পা মাথা টেনে উঠে বসি। দেখি, আমার পায়ের কাছে চোখদুটো ট্যারা, মুখটা হিজড়ের মতো ফ্যাকাসে কাঁচাপাকা চুলের মস্ত মাথার এক বুড়ি সমানে কেশে চলেছে। কাশতে কাশতে বুড়ি বমি তুলল— ওয়াক, ওয়াক শব্দে আর পচা দুর্গন্ধময় তরল পদার্থে গোটা পরিবেশটা ঘিনঘিন করে উঠল। অন্ধ বোবাহাবার মতো মানুষগুলো শেষসম্বল যে যে ভাবে পারল কাচ্চাবাচ্চা দু'হাতে পাঁজা করে দূরে সরে পড়তে ব্যস্ত হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁধানো পাকা খাতা হাতে এক আধবুড়ো সরকারি কর্মচারীই হবে, হাজির হল সেখানে। পায়ে হাঁটু অবধি ঢাকা বুটজুতো। তার মাথায় টাকের চারপাশে ক'গাছি বেজির লোমের মতো অসমান চুল ঝুলছে। ভুঁড়িটা সামনে এগিয়ে রয়েছে। সরু হাত পা নিয়ে ঠোংয়ো পায়ে মুখটা উঁচু করে এগিয়ে এল। বলল, হেউ, বাঙ্গালরা, তোরা সব উনিশ লম্বর লরির মানুষ, নাম ক' তুগে। তার পর সে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার সঙ্গে কুতে কুতে উচ্চারণ করে চলল— বিজয়কৃষ্ণ বালা, ধনীদাসী বালা, উর্মিলা বালা, যতীন্দ্রনাথ বালা, গৌরীরানি বালা, কেশবচন্দ্র বিশ্বাস, সুধারানি বিশ্বাস, শুভ বিশ্বাস, শশধর সিকদার, নির্মল সিকদার, শ্যামল সিকদার, শোভারানি সিকদার, হরিমোহন সিকদার, তারিণীচরণ বালা, সবিতা বালা, মণিমালা বালা, শিবানি বালা— তার নামডাক শেষ হয় না এবং একই ভাবে আমাদের লরির প্রত্যেকের নাম ডেকে গুনেগেঁথে খাতা বন্দি করে যাওয়ার সময় দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমাগে জন্যি বরাদ্দ কাপড়ে মোম লাগানো একটি হলদে রঙের তাঁবু, তিনটি শালকাঠের প্যাড়, চোদ্দোখানা মুখ ছুঁচোলো কাঠের গোঁজ, আর কাঠের একটা মস্ত মুগুর প্রত্যেক পরিবারের।

যেতে গিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখের বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে সব লোকগুলোকে বেশ নেড়েচেড়ে দেখে বার দুই হাই তুলে উদাস হয়ে ঘুমের ঘোরে যেন হাল ছেড়ে দিয়েই বলল ওই যে ওই দেখতিছ না রেলপাটির লাইন, ওই ব্রিজ— হঠাৎ বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে দেখিয়ে বলল কুন্তি নদীর ও-পাড় এ-পাড় রেললাইনের দু'দিকেই ওই পোয়াটাক মাইলের মধ্যে যার যেখানে ভাল লাগবি, সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে বাস কত্তি পারো। বুঝলে না হে, শোনো বাঙ্গালরা, বুঝলে না, বুঝলে না। তাঁবু খাটাও গে যাও। 'বুঝলে না' বারবার লোকটার মুদ্রাদোষটা বলতেও ভুলল না।

লোকটার কুঁতকুঁত আধবোজা চোখদুটো শুয়ে-বসে থাকা তেল চিক্কণ গা-খানা নাড়িয়ে মানুষগুলোকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে চেখে চেখে দেখে মুখের প্রতিটি রেখা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। গালের হাড় ওঠে খাড়া হয়ে— যেন অদৃশ্য একটা মাকড়সার জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে চায় অসহায় ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের। জালে বাঁধিয়ে শেষ করে দিতে চায়। ধূর্ত শয়তানের ভঙ্গি করে ঘাড়টা যতটা পারে উপরে তুলে বুকটা চিতিয়ে লোকটা হাঁটতে থাকে— একবারও ফিরে তাকাল না, মড়াঘাঁটা শকুন চেহারা নিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠার আগেই, নেতিয়ে পড়া মানুষগুলো ঘাসলতা ঝোপ আর মাটির স্পর্শ পেয়ে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। তিনখানা খুঁটি চোদ্দোখানা

গোঁজ একটা মুগুর আর তাঁবু নিয়ে ছুটল যে যার জায়গা খুঁজে বের করতে। আধমরা মানুষগুলোর পা মাটিতে পড়ায় তারা হই হই উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে জাগিয়ে নিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টায় এগিয়ে গেল। ঝোপ নটেনাটা আর ভাটি গাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে জঙ্গল কেটেই হবে অস্থায়ী বাসস্থান, মাথা গোঁজার ঠাঁই।

প্রত্যেক পরিবারের বয়ে আনা শেষসম্বল আর এই নতুন পাওয়া তাঁবু-আড়া খুঁটি গোঁজ আর মুগুর হাতে হালকা শোলার মতো ছুটে চলল। যারা একটু আগেও মৃত্যুর কথা ভাবছিল, তারা বাঁচবার সামান্যতম আঁচটুকু পেয়ে প্রাণের তাগিদেই অনায়াসে চটপট হাতে কাজ করে চলল। ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে মাটির ভিত উঁচু করে খুঁটি গেড়ে গোঁজ পুঁতে তাঁবু খাটিয়ে নিলেন। রেললাইনের এপাশে ওপাশে কুন্তি নদীর পাড়ে নির্জনতার বুকে উঠল মানুষের পদশব্দ, শোরগোল, ছোটাছুটি, মাটিতে গোঁজ পোঁতার শব্দ, ধুমধাম তাঁবু ফেলছে, কাঠ কাটার শব্দ হচ্ছে। শত শত হলুদ রঙের তাঁবু খাটানো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে গোটা স্থানটার চেহারা বদলে গেল, মানুষের কলরবে ভরে গেল। উদ্বাস্তু মানুষগুলো এর জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই আশায় আশায় বসে হাত পায়ে খিল ধরে ছিল। তা যেন তারা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেহনতের নেশা ধরানো আবেগ নিয়ে আবার সংসার পেতে বসল। বাস্তুহারা, খুনির তাড়া-খাওয়া, ঘরপোড়া মানুষগুলি যতই অস্থায়ী হোক মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন পেল। শত কষ্ট-দুঃখের মধ্যেও বউ-সন্তান নিয়ে শোবার মতো আস্তানা পেল। নতুন জীবন তৃষ্ণায় তারা মেতে উঠল।

আমাদের পরিবার বসবাসের জন্য জায়গা বেছে নিয়েছিল কুন্তি নদীর ধারে উঁচু একটা টিলার ওপর— যেখানে একটা ঝাঁকড়া-মাথা অশ্বত্থ গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের গোড়া থেকে হাত তিনেক দূরে সমতল একটু লালমাটির ভুঁই। সেই ভুঁইয়ে হাতখানেক উঁচু ভিত করে তাঁবু টাঙানো হল। সেই সকাল থেকে পরিবারের সকলে মিলেই খাটছি। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু গড়ে তুলছি, অদূরে নদীতে নামবার পথটাও আমি বানিয়ে নিলাম— ঝোপঝাড় সাফ করে মাটি কেটে সিঁড়ি তৈরি করে।

আমাদের তাঁবুর পাশেই সমর সর্দার, রামদার কোপ-খাওয়া জখম হাতখানা টেনে নিয়ে তাঁবুর দড়ি টেনে গোঁজে বাঁধছিল। তার সত্তার ভেতরও যেন আনন্দের একটা দমকা হাওয়া বইছিল— এই ভেবে যে একটা রাত হলেও সে নিশ্চিন্তে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে শুতে পারবে, ঘুমোতে পারবে। কত দিন, কত রাত তার

জীবনে যা আসেনি, তা সে ছাড়া আর কেই বা তা জানে। সুন্দর না হোক, সুখী না হোক, জীবনের মানবিক আবেদনে সাড়া সে দেবে।

প্রায় একমাস ধরে, দু'-তিন দিন অন্তর অন্তর কুন্তি নদীর পাড়ে, কুন্তি হল্ট স্টেশন ও রেললাইনের দু'পাশে উদ্বাস্তুদের লরি ভরে ভরে এনে ফেলতে লাগল আর কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পও গড়ে উঠতে থাকল। কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পে দেখতে দেখতে প্রায় আড়াই হাজার পরিবার মোটা কাপড়ের ওপর মোম লাগানো হলুদ রঙের তাঁবুর অস্থায়ী সংসার পেতে বসল। হুগলি জেলার এই ট্রানজিট ক্যাম্পে নদীর এপার ওপার মিলে প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার বাস করত তাঁবুর আচ্ছাদনের নীচে। উদ্বাস্তু শিবিরবাসীর মাথা গুনতি প্রত্যেককে মাসে ছয় টাকা হারে 'ক্যাশ ডোল' নগদ টাকা দেওয়া হত। আমাদের চাল ডাল নুন তেল কিনতে যেতে হত নসরাইন বাজার। না-হলে ত্রিবেণী বাজারে, হাটে। রান্না করবার জ্বালানি সংগ্রহ করা ছিল ভীষণ কঠিন। প্রথম দিন রান্না করা ছিল আরও কঠিন। আধলা ইট পাওয়া গেল না, অনেক খুঁজে পেতে তিনখানা বড় পাথর সংগ্রহ করে উনুন করে রান্না করা হয়েছিল।

সারি সারি এলোমেলো একটা বিশাল এলাকা জুড়ে শুধু তাঁবু আর তাঁবু। হাজার হাজার পরিবার আশ্রয় নিয়েছে এই উদ্বাস্তু শিবিরে। শিকড় ছেঁড়া মানুষের আলগা ক্ষতশিকড়ে যেন জল ঢেলে বাঁচিয়ে রাখা অথবা সীমাবদ্ধ টবে খাঁটো করে বনসাই করে বাঁচিয়ে রাখা। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা তখনও আলো ঢালছে। যে মেঘখানা সূর্যকে ঢেকে রেখেছিল হঠাৎ দমকা হাওয়ার টানে তা দু'ভাগ হয়ে ছিঁড়ে গেল। আর সেই ফাঁক গলিয়ে পৃথিবীতে নেমে এল গোলাপি আলো। নিজের নিজের এই ছোট্ট তাঁবুর ঘরের আস্তানায় উদ্বাস্তু মানুষগুলি শত কষ্ট শত লাঞ্ছনা অবহেলা ঘৃণা ক্লান্ত হাতে সরিয়ে রেখে আবেগে সোহাগে ভালবাসায় আনন্দে জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় প্রাণের স্ফূর্তিতে যেন গুছিয়ে নিচ্ছে নতুন গড়া সংসার। প্রাণশক্তির এই রহস্যময় আশ্চর্য প্রকাশে আমিও যেন বোকা হয়ে গেলাম এই ভেবে যে মানুষের ভেতর কিই-না আছে আর কিনা সে করতে পারে।

চারদিক থেকে মানুষের প্রাণময় কলরব জীবনের অদম্য সাড়া ভেসে আসছিল। মানবিকতার প্রেমপ্রীতি ভালবাসার গুঞ্জন, শিশুর কান্না মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসছে নতুন নতুন তাঁবুর কাপড় থেকে এমন একটা মাদক-মাখানো হৃদয়ের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল গোটা এলাকা জুড়ে যেন রজনীগন্ধা ফুল সৌরভ ঢালছে। সেই সৌরভে সুগন্ধে প্রাণের আস্বাদে অনেক মেহনত করে টিকিয়ে রাখা প্রাণগুলো

মাথার ওপর সামান্যতম একফালি অস্থায়ী অশ্রয় পেয়ে খরস্রোতে ভেসে যাওয়া শ্যাওলার মতো শিকড়ে একটু মাটির ছোঁয়া পাবার মতো পরস্পরের ভালবাসায় বিভোর হয়ে কাঁপছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল মানুষগুলিকে বুক দিয়ে হৃদয় দিয়ে জড়িয়ে ধরি ওদের অপরাজিত প্রাণে চুম্বন এঁকে দিই। জীবনকে জড়িয়ে ধরে প্রাণময় জীবনের জয় সোৎসাহে ঘোষণা করি।

বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা এত বিচিত্র মানুষ এক জায়গায় ডেরা গেড়েছে— তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, ব্যবহার, চালচলন, মানবিক আবেদন-নিবেদন, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা এত আলাদা— আমি দেখি আর বিস্ময়ে মাথা ঘুরে যায়। এত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক এক সময় আমি দিশেহারা হয়ে পড়তাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষের ভাষার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ, কথার টান, মুখের বুলি যেমন ভিন্ন, তেমনই রহস্যময়, বিদঘুটে। তাদের অদ্ভুত জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমি হিমশিম খেয়ে যেতাম। আমার ছোট্ট প্রাণে, চেতনায় তা যেন ধরত না, উপচে উপচে পড়ত।

খুব ভোর থেকে গভীর রাত অবধি জীবনের চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে থাকত গোটা শরণার্থী শিবির জুড়ে। রান্নাবান্না, খাওয়া-শোওয়া, মিলন হাসিঠাট্টার মধ্যেও উদ্বাস্তু মানুষের মনে জেগে থাকত ফেলে-আসা জন্মভূমির মায়া, দাঙ্গায় বিধ্বস্ত-অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত স্বজনদের কথা, আগুনে-পোড়া ঘরবাড়ি, জায়গাজমি।

ছোটবেলায় আমি যখন শরণার্থী শিবিরে ছিলাম, তখন যে শরণার্থীদের আমি দেখেছিলাম তা গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে নিহিশ্চহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ছোটবেলার সেই জীবন্ত নরকের ছবি আজও আমার স্মৃতিকোটরে জীবন্ত— মুছে ফেলার কোনও উপায় নেই।

মানুষ দেখা আর তাদের জীবনের ছাপ মনেপ্রাণে হৃদয়ে গেঁথে রাখা ছিল আমার স্বভাব। এই অগণিত উদ্বাস্তুরা, সবাই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের অচ্ছুত মানুষ— নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কপালি, যোগী, ধোপা, জেলে, মালো, মুচি-মেথর শ্রমজীবী মানুষজন। অবাঞ্ছিত এই অবহেলিত, ঠেলা-খাওয়া ভবিষ্যৎহীন মানুষদের মাঝে নিজেকে মনে হত খাঁচায় পোষা জীবদের মতো— যাদের জীবনের সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে শুধু যাতে প্রাণটুকু বেরিয়ে না যায় তার জন্য সামান্য খুদকুড়ো খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। আমার প্রতিটি দিন ভরে থাকত অসংখ্য বিচিত্র লোমহর্ষক আর অকল্পনীয় ঘটনার জীবনস্রোতে। এত বিভিন্ন, এত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের, এত বিপুল সমাবেশ জীবনের রূপ রস গন্ধ

বর্ণ, যা মহাকাব্যের চরিত্রকেও হার মানায়। জীবনের এই মহান আর অভূতপূর্ব ঘটনার তীব্রতায় আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম শুধু এই ভেবে, দেশত্যাগের মহাজীবনে আমিও একজন অবিচ্ছেদ্য শরিক। আমার প্রতিটি জ্বালাময় দিন অসহায় মানুষের মধ্যেই কেটেছে। যাঁরা আমার প্রাণের স্বজন-স্বজাতি-আপনজন।

রেললাইনের ওপারে কুন্তি নদীর দক্ষিণ পাড়ে পুরনো শরণার্থী শিবিরে আধবুড়ো এক পাগল ছিল। শরণার্থীরা তাঁকে 'সদাশিব' বলে ডাকত। কাঁচাপাকা একমাথা চুল, নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো, পা-দুটো বকের মতো লম্বা, হালকা চেহারা— উদ্বাস্তু শিবিরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরপাক খেত। তাকে যে যা দিত, তাই খেত। কোলাব্যাঙের মতো খপখপ করে পা ফেলে হেঁটে বেড়াত আর চিৎকার করে বলত, এই জীবন, এই তো তোমাগে ঠেলা-খাওয়া জীবন। ওয়াক থু, ওয়াক থু। জীবনে বেঁচে থাকা— থু থু থু। এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভাল। কখনও সে অনর্গল আকাশে মুখের থুথু ছিটাত— যেন পৃথিবীর ওপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভ উগরে দিত।

তীব্র ঘৃণায় অস্বস্তিতে আর বিরুক্তিতে তার নাকের ডগা ফুলেও উঠত। আর সমানে চেঁচাত, এই তোগে ছন্নছাড়া জীবন, ঝাঁটা মার জীবনের মাথায় ঝাঁটা মার ওয়াক থু। পেটে খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, হাতে কাজ নেই, পরনে শতছিদ্র ন্যাকড়া, সামনে সব ফাঁকা। ধূ-ধূ শূন্য। ঘুটঘুটে আঁধার। দু'হাত মাথার উপরে তুলে নটরাজের মতো নেচে চলত। নাচ থামিয়ে সদাশিব হা হা করে হাসত। আবার কখনও দু'চোখে জল ঝরিয়ে চিৎকার করে কাঁদত।

সদাশিবের হা হা অট্টহাসি আর বুকভাঙা কান্না— দুটোই যেন খোলা আকাশের বুকে গিয়ে ধাক্কা খেত। ধাক্কা খেয়ে আবার পৃথিবীর মাটিতে উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে আসত। গোটা শরণার্থী শিবির সে অট্টহাসিতে আর বুকফাটা কান্নায় কাঁপিয়ে দিত।

নদীতে বাঁধ দাও, রেললাইনটা উপড়ে ফেলে দাও ওই নদীতে, জীবনে বেঁচে থাকার একটা অর্থ করে নাও। নাও, নাও, আর সময় নেই; এক্ষুনি করে নাও— বলতে বলতে এক সময় সদাশিব কাঁপতে থাকত। পিটপিট করুণ তাঁর চোখদুটো থেকে অঝোরে জল ঝরত। ফুলে-ওঠা চোয়াল ভিজে যেত। তবু সদাশিব একনাগাড়ে চিৎকার করে যেত, মরিয়া হয়ে উঠত— যেন পাগলা কুকুর সে।

আবার হঠাৎ চিৎকার থামিয়ে ভালমানুষের মতো বলত তোমরা আমার আপন প্রাণের স্বজন। জীবনের জন্য কিছু একটা করো। তোমাগে এ-মরণদশা

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কত আর দেখব বলো— চোখের সামনে এতগুলো লোক মরছে, এত রক্তপাত হচ্ছে, দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। হায় হায় এত রক্ত, এত রক্ত— হাউ হাউ করে কেঁদে, দু'হাতে বুক চাপড়ে কঠিন আঘাত করতে করতে হঠাৎ মাটিতে পড়ে সে অজ্ঞান হয়ে যেত। আর সেখানেই পড়ে থাকত। জ্ঞান ফিরলে মাটি থেকে উঠে এক সময় তাঁবুতে ফিরে যেত।

পরে শোনা গিয়েছিল সদাশিব সরকার পূর্ব বাংলায় ছিয়ানব্বই অঞ্চলের একটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দাঙ্গার বছর তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কেটে ঘরপোড়া আগুনে ছুড়ে, পুড়িয়ে শোল-পোড়া করে রেখে যায় দাঙ্গাবাজরা। সেই শোকে মানুষটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এই ভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন সেই থেকে।

আমাদের তাঁবুর সামনে গলিমতো সরু একটা পথ ছিল— কুন্তি নদীতে নামার জন্য সরু পথটা ডান হাতে যেখানে মোড় নিয়েছে, তার উলটো দিকে আমাদের তাঁবু থেকে দু'টি তাঁবুর পরে যে তাঁবু ছিল, তাতে বাস করতেন কিরণ পোদ্দার আর তাঁর বউ-সেজে-আসা মালতী পোদ্দার (বিশ্বাস)। কিরণ পোদ্দার লোকটি চোখ ছোট, মাথা কালো চুলে ঢাকা, কথা বলার সময় গলার স্বরটা কোমল হয়ে ওঠে। নীল চোখদুটো টেরে কথা বলে, ধনুকের মতো বাঁকা পা, মুখ দেখে বয়স বোঝবার জো নেই। ঘনঘন সিগারেট ধরিয়ে সুখ টান দেন মনপ্রাণ খুলে। আর মালতী বিশ্বাসের গলাটা একটু মোটা। কথা বলেন হিজড়েদের মতো, নাকের নীচে কালো হয়ে ওঠা একটু গোঁফ, তাতে নড়ে ওঠে। প্রশস্ত চেহারায় সুন্দর সুস্বাস্থ্য। হাসলেই বাম গালে টোল পড়ে আর তাতে তাঁর মোহিনী রূপটা আরও খুলে যায়। হাত নাড়িয়ে, শরীর নাড়িয়ে রসরঙ্গের কথা বলে গোটা পরিবেশটা সব সময় যেন রসে তরতাজা করে রাখেন। মালতী হাসলেই তাঁর লাল মাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। ভারী বুক দু'টি নিয়ে মালতি অহর্নিশ ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মধ্যে বুকের আঁচল টেনে খুলে স্তন দেখে ফের বুক ঢাকেন।

মালতী প্রায় বলেন, কিরণবাবু, একটা চা খেলে হয় না? হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙেন। এই যে এক্ষুনি করে দিচ্ছি। কিরণ পোদ্দার যন্ত্রচালিতের মতো দ্রুত উঠে গিয়ে কাঠের উনুনে আগুন জ্বেলে কফি করতে লেগে গেলেন। চা না, আপনার জন্য চায়ের বদলে কফি এনেছি দিদিমণি। উদ্বাস্তুরা যেখানে দু'মুঠো ভাত জোটাতে পারে না দু'বেলা, সেখানে মালতি বিশ্বাস ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফির সঙ্গে দামি বিস্কুটও খান। সকালে উঠে গ্লাসভরে হরলিকস্‌ও খেতেন।

প্রথম দিকে উদ্বাস্তু শিবিরে এসে মালতী বিশ্বাস আর কিরণ পোদ্দার স্বামী-স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁদের ভাবভঙ্গি, চালচলন দেখে অনেকের মনে নানা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। আর সন্দেহ বাস্তবে রূপ নিতে বেশি সময়ও নিল না। সুশ্রী গড়ন, মাজা-ঘষা তেলচিক্কণ চেহারার এই মালতীর ঢেউ-খেলানো একমাথা কালো লম্বা চুল, বড় সিঁথিকাটা। মধ্য মাথা অবধি সিঁথিতে লাল ডগডগে চওড়া করে সিঁদুর পরা থাকত। কপালের মাঝখানে বড় আকারে সিঁদুরের টিপ আঁকতেন তিনি। কিরণ পোদ্দারের বিয়ে-করা বউ না— কেবল ছাড়পত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ পাতিয়ে সীমান্ত পার হয়েছিলেন তাঁরা! মালতীর স্বামী আছেন এ দেশের সরকারি চাকরিতে আর কিরণ পোদ্দার বিয়েই করেননি।

মালতী বিশ্বাস নিজে উদ্যোগ নিয়ে উদ্বাস্তু শিবিরের মেয়ে চন্দনা ঢালির সঙ্গে কিরণ পোদ্দারের বিয়ে দিলেন। চন্দনাকে আর কিরণ পোদ্দারকে পিঁড়িতে বসিয়ে মালতী নিজেই উলুধ্বনি দিয়ে বর-বউকে তাঁবুর ঘরে তুললেন। মুখ টিপে খুশির হাসি হেসে ঠাট্টা করে বললেন, শুধু একটা রাত; এই কালরাত্রিটা এক তাঁবুর মধ্যে থাকলে মহাভারতও অশুদ্ধ হবে না। সারারাত আমি মড়ার মতো পড়ে থাকব— এক মুহূর্তও চোখ খুলব না। সকালে মোরগ ডাকার আগেই চলে যাব। একটা রাত একটু উপোস করো ভাই। চন্দনার থুতনিতে হাত বুলিয়ে চুমু খেলেন তিনি।

সত্যি তাই হল। রাত পোহাতে তারা আকাশে থাকতেই মালতী বিশ্বাস আমাদের তাঁবুতে এসে ডাকলেন বড়দাকে: দাদা দাদা আমাকে একটু স্টেশনে এগিয়ে দিয়ে আসবেন। চলে যাচ্ছি, আপনার একটু সাহায্য নিতে হল। আর তো দেখা হবে না। ভাল থাকবেন। চলুন দাদা, চলুন।

বড়দা মালতী বিশ্বাসকে প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন। মালতী বিশ্বাস ফিরে তাকিয়ে বিদায় নিলেন। ট্রেন মালতী বিশ্বাসকে নিয়ে কলকাতা চলল।

উদ্বাস্তু শিবিরে আমার সঙ্গী ছিল হারান মণ্ডল। চওড়া বুক, কালো কালো একমাথা চুল, বেঁটেখাটো, একখানা আধলা ইটের মতো শক্তপোক্ত চেহারা, হাসলেই তার মোটা মাড়িতে একটা বাড়তি দাঁত দেখা যেত। হাসতেও পারত হারান। এমনই দিলখোলা হাসি আগে আমি কাউকেও দেখিনি। জীবনের কোনও কিছুই যেন তাকে ভাবাত না। যা হবে তা হবে গোছের নির্লিপ্ততাই ছিল তার স্বভাব। প্রাণের অদম্য আবেগেই প্রতিটি কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত। চোখের সামনে যত নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনাই ঘটুক না কেন হারান মণ্ডল অবিচলিত। তার

দিলখোলা স্বভাবের কোথাও একটু চিড় ধরত না। সেই হারানই আমার দু'চোখের সামনেই প্রতিদিন ভিজে মুড়ির মতো মিইয়ে যেতে থাকল। কারণ পেট ভরে সে খেতে পেত না। আমরা উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষজন কেউ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেতাম না। যা ক্যাশডোল সরকার দিত তাতে বড়জোর মাসের পনেরো দিন চলত— যদি সবাই দু'বেলা পেট ভরে খেত। অথচ প্রতিটি পরিবার গোটা একমাস ধরে সেই সামান্য টাকায় প্রাণগুলোকে বাঁচিয়ে রাখত। উদ্বাস্তু শিবিরের প্রতিটি পরিবার যৎসামান্য ক্যাশডোলে আধপেটা খেয়ে অতিকষ্টে দিনপাত করত। ছ'মাস না যেতেই করুণ অবসাদে প্রতিটি দুঃসহ যন্ত্রণাময় দিন-রাতকে বুকে নিয়ে ধুকতে শুরু করলেন উদ্বাস্তুরা। প্রাণের মায়া অনেকেই ভুলে যেতে বাধ্য হলেন। আমার বড়দাদা পরিবারের মানুষগুলোর প্রাণ কী করে বাঁচিয়ে রাখবেন সেই চিন্তাতেই তার বুকের হাড়গোড় বেরিয়ে যেতে থাকল আর নৈরাশ্যভারে প্রতিটি মুহূর্তে অস্থির হয়ে থাকতেন, বাঁচবার পথ অন্তহীন ভাবে খুঁজে খুঁজে এবং শেষ পরিণাম কী হবে এই কথা ভেবে।

অশান্তি ভরা আর দুশ্চিন্তার মধ্যেও সে বার উদ্বাস্তু শিবিরের একটি তাঁবুতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। মোমের তাঁবুতে আগুন ধরা মানেই আগুন একলাফে আকাশে উঠে গেল দাউ দাউ করে।

শীতকালের সকালবেলা। উদ্বাস্তুরা লেপ-কাঁথার অভাবে শীতকাতর। বুড়োবুড়ি আর বাচ্চারা টিলার ওপর আগুন জ্বেলে হাত-পা সেঁকে আগুন পোহায়, আর মাঠঘাট বাগান ঢুঁড়ে আনা আলু আর আলুর ফল পুড়িয়ে খাচ্ছিলাম আমরা ক'জন বালক। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে শুকনো পাতা জড়ো করে রাখে বুড়িরা। সকালে উঠেই আগুন ধরিয়ে জ্বলন্ত আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকেন তাঁরা আর আমরা খিদে মেটাতে আলু আর আলুর ফল পুড়িয়ে খাই সেই আগুনে।

ফিনফিন করে হাওয়া আসে উত্তর দিক থেকে। গা শিরশির করে ঠাণ্ডায়। আগুন তখন ভাল লাগে। খিদের পেটে আলুর ফল পোড়া আরও মিষ্টি লাগে। বুড়োবুড়িরা হাতের মুঠো খুলে হাতের তালু জ্বলন্ত আগুনের শিখার ওপর মেলে ধরেন। সারা শরীর গরম হয়ে ওঠে। বড় আরাম পান। শীতের হাত থেকে বাঁচেন তাঁরা।

এক সময় সূর্য ওঠে। আগুন নিভে যায়। জ্বলন্ত ছাই তাপ ছড়ায়। পাতা পোড়া আগুন তখনও পুড়তে থাকে মিহি তাপে। চিকচিক করা রোদে বসে আমরা আলুর ফল পোড়া খাচ্ছিলাম। হারান আমার সামনে বসে আলুর ফল

মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে। হঠাৎ খাওয়া শেষ করে অস্থির হয়ে সে বলে, একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছি যেন! অ্যাঁ, এ তো পাতা পোড়া গন্ধ না। নাক দিয়ে বাতাস টেনে শুঁকে হারান চিৎকার করে উঠল, অ্যাঁ, এ তো মোম-লাগানো তাঁবু পোড়ার গন্ধ। কেমন যেন সে অসংলগ্ন হয়ে গেল আচমকা।

ঠিক তখনই দশ-বিশখানা তাঁবুর ওপাশ থেকে তারস্বরে চিৎকার উঠল মানুষের। সমবেত মানুষজনের ভীতসন্ত্রস্ত গলা শোনা গেল: আগুন, আগুন, আগুন, বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও...।

আমরা যে ভাবে পারলাম মরিপড়ি ছুটলাম চিৎকার লক্ষ্য করে। নয়-দশখানা তাঁবু পেরিয়ে যেতেই সামনে পড়ল লেলিহান অগ্নিশিখা— যেন আকাশ অবধি আগুন হাত-পা-ছুড়ে নাচছে।

এক নজরে তাকিয়ে দেখেই শিউরে উঠলাম, সর্বনাশ, মহাসর্বনাশ! যেদিকটায় ঘনঘন তাঁবু খাটানো, আগুন লেগেছে ঠিক সেদিকটায় আর তার গা-ঘেঁষেই উদ্বাস্তু শিবিরের অফিসটা। অফিসের কর্মচারীরা তখনও কেউ ওঠেনি। আগুন লেগেছে গোটা শিবিরবাসীর তাঁবুর গাদায়। নতুন গাদামারা তাঁবুতেই আগুনটা ধরেছে। সেই আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। উদ্বাস্তুদের খাটানো তাঁবুগুলিতে দাউ দাউ আগুনের শিখা একটার পর একটা তাঁবুকে নিমেষে শেষ করে ফেলছে— উদ্বাস্তুরা শেষ সম্বলটুকুও নিয়ে পালাতে পারছে না।

আমি হতভম্ব। এক মুহূর্ত ঠায় তাকিয়ে রইলাম। দেখছিলাম আগুনের লীলাখেলা। লাল নীল শিখারা যেন চেটেচুটে খাচ্ছে, হলুদ তাঁবুগুলিকে। শালকাঠের খুঁটি-আড়াগুলিকে ভোরের প্রথম ওঠা লাল ডগডগে সূর্য আর হলুদ আগুনের শিখা যেন গলাগলি কোলাকুলি করে মহোৎসবে মেতেছে।

আগুন নেভাতে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে এসেছে। মানুষে মানুষে ছয়লাপ। মানুষজন ছুটে আসছে আর হাতের নাগালে যা পাচ্ছে তাই আগুনে ছুড়ে মারছে। ইটপাথর খোয়া ডেলা জল কাদা ধুলো মাটি।

না এতে কোনও কাজই হবে না। দরকার বালি মাটি আর তাল তাল পেড়কাদা ছুড়ে ছুড়ে মারো, নতুন কোরা তাঁবুগুলোকে যদি বাঁচানো যায়। ওপাশ থেকে সুধীর ঢালি চিৎকার করতে থাকে।

সমবেতে মানুষজন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, আনো জল কাদা মাটি বালি। কিন্তু ও সব এ দিকে কোথাও নেই। গোটা দঙ্গলটা যেন চমকে উঠল— যেন সবাই সম্বিত ফিরে পেল দরদের সহায় কেশবকাকা জল কাদা মাটি বালির খোঁজ দিয়ে বললেন, সবই তো কুন্তি নদীতে। আসো সবাই নদীতে। আসো,

জল কাদা মাটি বালি সবই পাবে। এসো ভাই সব নদীতে চলো। বাতাসে ধ্বনিটা ছড়াতেই ভিড়টা মুহূর্তে ভেঙে ছুটে গেল নদীর গাবিতে, ভিড়ের ভেতর প্রাণের মতো শব্দটা গুঞ্জন তুলল— চলো চলো নদীতে চলো। ভিড় ভেঙে মানুষ মরিপড়ি ছুটলেন, শেষসম্বলটুকু যদি বাঁচানো যায়।

এ দিকে আগুন কিন্তু বসে নেই। জ্বলন্ত আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁবু থেকে তাঁবুতে। এ দিক থেকে ও দিকে। একটু একুট ফিনফিনে হাওয়া হঠাৎ যেন দমকা হাওয়ার রূপ নিয়ে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্মশান করে ফেলছে— হাওয়ার পিঠে ভর করে আগুন লাল-নীল-হলুদ শিখা ছুটছে পাগলের মতো, চারিদিকে সব হারানোর আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে বুক চাপড়িয়ে। সমানে কেঁদে চলেছেন— স্বামী-স্ত্রী। এক বুড়ি তো হাত-পা ছুড়ে পাগলামি শুরু করে দিলেন। একখানা পাতি কোদাল হাতে নিয়ে আগুনের মুখোমুখি নগ্ন হয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে নাচছে। কোদাল তুলে আগুনে কোপ মারতে যাচ্ছেন আর মুখে বিচিত্র শব্দ করে চিৎকার করছেন।

প্রায় বিশ পঁচিশটা উদ্বাস্তু পরিবার ভিখারি হয়ে গেল শেষসম্বলটুকু আগুনে পুড়ে যাওয়ায়। অনেকের পরনের কাপড়টুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অর্ধনগ্ন মানুষগুলো ভয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন আর কপাল চাপড়ে ভাগ্যকেই দুষছেন। হা-হুতাশ করছেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, নিজেকেই অভিসম্পাত দিচ্ছেন, দু'হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখছেন।

পাগলিবুড়ি একটা তাঁবুর সামনে ছুটে গিয়ে আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটো বাচ্চা — পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটো বাচ্চা । এই যে এখানেই এই তাঁবুতে। বুড়ি যেন মন্ত্র বলে ভাল মানুষের মতো দরদে ফেটে পড়ছেন।

অসংখ্য চিৎকার চেঁচামেচির মধ্য বুড়ির মরিয়া সুরটা ভেসে উঠতেই চারপাঁচজন ছুটে গেলাম সে দিকে। গিয়ে দেখি তাঁবুটার চারপাশে আগুন যেন প্রলয় নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আগুন দাউ দাউ জ্বলছে। শিখা ছুড়ে দিচ্ছে আকাশে— তাঁবুর মাথার ওপরের আকাশটাই হলদে লালে ঝিকমিক করে উঠছে। তাঁবুর মাঝখানের শালকাঠের আড়াটা পটপট শব্দ করে পুড়ছে আর তার উপর থেকে নীচের দিকে সিঁদুর-রাঙা লম্বা জিভটা বের করে গোটা তাঁবুটাকে গিলছে আর আগুন হাত-পা ছুড়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তাপে মুখ-হাত জ্বলে যাচ্ছে— পুড়ে যাচ্ছে গা।

কে যেন একটা আস্ত বাঁশ চালিয়ে দিয়েছে তাঁবুর তলা দিয়ে। বাঁশটার

একমাথা উঁচু করে ফাঁক করে দিল খানিকটা। আগুনের তাপে শিখায় ঝলসে যেতে চায় চোখ মুখ গা-গতর। ফাঁক দিয়ে তাঁবুর ভিতর দৃষ্টি গলিয়ে উঁকি দিয়ে মাথা ঘুরে গেল আমার। তাঁবুর তলা গলিয়ে লকলক করে এগিয়ে আসছে আগুনের নীল লাল শিখা আর ওর ভেতরই দুটো বাচ্চার মরণ আর্তনাদ যেন আছড়ে পড়ছে। সে চিৎকার আর করুণ আর্তনাদ শুনলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অনেকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম— যদি বাঁচানো যায় দুটো প্রাণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে ধোঁয়া মেঘের ভেতর থেকে লাফিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে হারান আমার হাত সজোরে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। টাল সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম ছিটকে। কানে কেবল শুনতে পেলাম ক্ষেপেছ? শেষ স্বরটা বেরোল না। কেবল গো গো বিশ্রী শব্দ শোনা গেল।

গোটা অঞ্চল জুড়ে শোনা যাচ্ছে শিবিরবাসীর বুকফাটা বিলাপ, মানুষের কান্না, আর্তনাদ, হা-হুতাশ, শোরগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি আর আগুনের বিরামহীন শোঁ শোঁ শব্দ। শত শত মানুষ তখন তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে— প্রাণপণে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। নদী থেকে অসংখ্য মানুষ হাতে হাতে টেনে তুলছে কাদা মাটি জল। মানুষে আর আগুনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মানুষ হন্যে হয়ে বিরামহীন ছুড়ে চলেছে কাদা বালি জল জ্বলন্ত আগুনকে লক্ষ্য করে। এমনই বিরামহীন লড়াই চলতে চলতে এক সময় আগুন হেরে গেল, মানুষের জয় ঘোষিত হল। আগুন আয়ত্তে এসে গেল। ক্লান্ত মানুষ কপাল থেকে ঘাম মুছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল।

অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর আগুনের শিখাগুলো হেরে গেছে। পোড়া ছাইয়ের মধ্যে ওরা মুখ লুকাল আর ভয় নেই, মানুষ জিতে গেছে।

জল কাদা বালি ছিটানো তখনও সমানে চলেছে। তার মধ্যেই কে যেন হুংকার দিয়ে উঠল। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সমূলে শেষ করো, বিনষ্ট করো, এই শয়তানকে, আগুনকে। মানুষকে ও পথে বসিয়েছে। ঢালো জল, ছোড়ো কাদা, ছিটাও রাশি রাশি বালি আগুন। নির্মূল করে দাও। আগুন যেন মাথা তুলতে আর না পারে।

শালকাঠের খাড়া খুঁটিগুলোকে তখনও আগুন চেটেচুটে খাচ্ছে। সিঁদুর রঙের আগুনের খাটোখাটো জিভগুলো। মানুষ মারমুখী হয়ে ছুটল। লম্বা লাঠির আঘাত মেরে খুঁটিগুলো শুইয়ে ফেলা হল। মানুষের ক্ষোভও যেন নিভে গেল।

হারান খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওঠ ওঠ চল তোদের তাঁবুটাও পুড়ে বুঝি শেষ হয়ে গেছে। নে চ চ, ওদিকি চ।

হারানের মুখ মাথা গা-গতর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে উদ্বেগে আর আশঙ্কায়। তার সবুজ চোখ দুটো তখনও থরথর করে কাঁপছে।

পোড়া হাত পা-র জ্বালায় শরীর মুষড়ে উঠল। ব্যথায় জ্বালায় কঁকিয়ে উঠেই সোজা হলাম। হারানের গা ধরে পা পা হেঁটে চললাম আমাদের তাঁবু লক্ষ্য করে।

এর মধ্যেই শ'খানেক তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে আর শেষসম্বল যতটুকু পেরেছে তাই জড়ো করে আকাশের নীচে উদ্বাস্তুরা বসে বুক চাপড়াচ্ছেন। কেউ কেউ চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। কেউ কেউ ক্ষোভে দুঃখে আস্ফালন করছেন। কেউ কেউ উদ্বাস্তু শিবিরের সুপারের কাছে ছুটে গেছেন। কেউ কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছেন। কেউ অর্ধউলঙ্গ হয়ে বসে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন। মানুষের দুর্ভোগ আর কষ্টদুঃখ দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

এতগুলো মানুষ এ ভাবে তাঁবু পুড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল অথচ উদ্বাস্তু শিবিরের সুপারিটেনডেন্ট সুবল সুখার্জি এবং তার অধীনস্ত কর্মচারীগণ দেখতেও এল না। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর কী অবস্থা। সারারাত আকাশের নীচে শিশিরে ভিজে আমরা পড়ে থাকলাম— না জুটল খাবার, না জুটল কাটাছেঁড়া ক্ষতস্থানে একটু ওষুধ, জ্বালাপোড়া নিয়েই সারারাত ছটফট করলাম। আলো জ্বালবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তাড়াহুড়ো করে আগুনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতেই সবাই ব্যস্ত ছিল। অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের গায়ে দেওয়ার মতো জামাকাপড় লেপ তোশক চাদর কাঁথা কিছুই ছিল না। শিশিরের জল মাথায় আর হাওয়ার ঝাপটা গায়ে লাগায় থরথর করে কেঁপে চলল সকলে। চরমতম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে উদ্বাস্তু মানুষগুলো মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকল। অসহায় অবহেলিত মানুষের কী যে ভয়ংকর অবস্থা হল— তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই কেবল বুঝতে পারল। দুঃখ দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকল না। দীর্ঘ পনেরো বিশ দিন একমাস দেড় মাস ধরে সীমান্তের পথে যাদের প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা, প্রাণটাকে এতদূর টিকিয়ে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা— কী যে কঠিন কষ্টসাধ্য সে যাঁরা সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন, তাঁরাই জানেন অন্যেরা ভাবতেও পারবেন না, উপলব্ধিও করতে পারবেন না।

উদ্বাস্তু শিবিরে তাঁবুতে আমাদের থাকার জায়গা ছিল অকহতব্য। এক একটা ছোট তাঁবুতে আট-দশ-বারো-চোদ্দোজন নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে বুড়ি-বুড়োকে একত্রে রাত কাটাতে হত। বর্ষার দিনে সেই খুপরির মধ্যেই রান্নাবান্নাও করতে হত। ছয় হাত বাই ছয় হাত মতো পরিসর জায়গায় থাকা, খাওয়া, শোয়া,

জীবন কাটানো— যেন জেলখানার খুপরি— যা ঝুপড়ির থেকেও অত্যন্ত খারাপ। গ্রীষ্মকালে দুপুরে মোমের তাঁবু যেন আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তার মধ্যে থাকলে ফোসকা পড়ে যায় শরীরে। অথচ তার মধ্যেই উদ্বাস্তু মানুষদের দিনের পর দিন বছরের পর বছর বাস করতে হচ্ছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বৃক্ষহীন এক একটি উদ্বাস্তু শিবির যেন অগ্নিকুণ্ড। তার মধ্যে মানুষজন কাচ্চাবাচ্চা সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, অক্লান্ত যুদ্ধ করে এক সময় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত। যারা এত কষ্ট এত দুঃখ এত দুর্ভোগ সয়েও বেঁচে থাকত তাদের দিকে তাকানো যেত না, গায়ে মাংস নেই, চোখ কোঠরাগত। জ্যান্ত কঙ্কাল যেন উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরে বেড়াত। এরই মধ্যে যখন প্রলয়ংকর দুর্যোগ ঘটল, মানুষগুলো যেন বোবা হয়ে গেল। সারারাত ধরে শিশিরে ভিজে, ঠাণ্ডা বাতাসে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। কেউ কেউ পোড়া তাঁবু আর ছাইয়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন। কারও চোখে ঘুমই এল না। শোকে দুঃখে বুক চাপড়ে, মাথা খুঁটে সারারাত আর্তনাদ করল ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিল। বারবার মৃত্যু কামনা করল।

দুর্যোগের রাত কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না। বড়দা পায়ের ক্ষতস্থান নিয়ে ব্যথায় জ্বালায় আর রক্ত চুইয়ে আসা নিয়ে সারারাত ছটফট করতে থাকলেন। আকাশের ফালি চাঁদের আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তার মধ্যেই জার্মানি লতাপাতা দুর্বাঘাসের ডগা বেটে বেটে বউদি আর বড়দি রক্ত বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আর আমি তার কাছে বসে নিজের পোড়া হাত পায়ের অন্তহীন জ্বালা নিয়ে কেবলই অস্থির হচ্ছিলাম। এরপর আমাদের কী হবে? আমরা কি বাঁচতে পারব! জন্মভূমি থেকে তাড়া খেয়ে যে প্রাণ হাতে নিয়ে এত দূরে ছুটে এলাম, সে প্রাণ কি আজ রাতেই শেষ হয়ে যাবে?

তাঁবু-পোড়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা একটু সুস্থ ছিল, তারা দলবেঁধে প্রায় মরিয়া হয়েই ক্যাম্প-সুপারের কাছে গিয়ে দাবি জানাতে থাকল— খাবারের, বস্ত্রের আর তাঁবুর। যারা পুড়ে গেছে তাদের চিকিৎসার। কিন্তু ক্যাম্প-সুপার এই নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তু মানুষগুলির প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখাল না। উলটে তারা যে দলবেঁধে দাবি জানাতে গেছে, তাদের একদিনের ক্যাশডোল কেটে নেওয়ার হুমকিও দিল।

অসহায় মানুষগুলির প্রতি যে অন্যায়, যে অবিচার সে রাতে ক্যাম্প-সুপার বর্ণহিন্দু সুবল মুখার্জি করল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনও নজির নেই। আমার মতো ছোটমানুষও সেদিন বুঝতে পেরেছিল শরণার্থী মানুষগুলোর প্রতি দেশের

সরকার এবং তার ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মচারীগণ কত দূর নির্মম নিষ্ঠুর হতে পারে।

দাঙ্গায় মৃত্যু ভয়ে যারা বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এক দেশ ছেড়ে আর-এক দেশে এল, তাদের পেটে ছিল একমাসের দু'মাসের তিন মাসের খিদে। তাদের প্রতি যে অমানবিক ব্যবহার করল ক্যাম্প-সুপার— যা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

আমাদের তাঁবুর তিনটি তাঁবুর পর সুপদদের তাঁবু, সুপদ আমার থেকে সামান্য ছোট। কিন্তু এর মধ্যেই তার সঙ্গে মিশে গিয়েছি বন্ধুর মতো। গত পরশু থেকে সুপদর জ্বর। কিছুতেই জ্বর যাচ্ছে না। এর মধ্যে ওদেরও তাঁবু পুড়ে গেছে। সুপদকে পাঁজাকোলে সাফটে ধরে সুপদর মা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে সুপদকে বাঁচাতে পেরেছেন। না-হলে কী যে হত, সুপদর মা সে কথা বলছেন আর অঝোরে কেঁদে চলেছেন। বারবার কপাল বুক চাপড়ে বলছেন, গায়ে জ্বর। এই খোলা হাওয়ায় শিশিরে বিজলে আমার ছেলের কী হবে! ওগো, তুমি একটা কিছু করো গো। একটা কিছু করো, দেখো, ছেলে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। ওগো আমাগে কী হবে গো?

সুপদর বাবা মাথা নিচু করে বসে আছেন। কার তাঁবুতে নিয়ে যাবেন। একটা মাত্র তাঁবুতে আট-দশ-বারোজন মানুষ গাদাগাদি হয়ে শুয়ে থাকে। তার মধ্যেই হাঁড়ি-উনুন-রান্নার সরঞ্জাম থালাবাসন, কাঁথা মাদুর গোটা সংসার। ছেলেমেয়ে স্বামী-স্ত্রী বুড়োবুড়ি বাবা-মা সবই থাকেন। ইচ্ছা থাকলেও মানুষের জন্য কিছুই করতে পারেন না।

ওই রাতেই নতুন বউটির প্রসবের ব্যথা উঠল, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো পরিবারটির দ্বিগুণ দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেল। অন্ধকারে তাঁরা ছুটোছুটি শুরু করলেন। প্রসব বেদনা উঠেছে, অথচ ডাক্তার নেই। প্রসব করাবার মতো একটু আড়ালও নেই। আকাশের নীচে হাজার মানুষের মাঝে প্রসূতির প্রসবের জন্য বউ-ঝি-মা-মাসিরা জড়ো হলেন। ফালি চাঁদের ম্লান আলোয় গাছ আর ফল নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন তাঁরা।

সেই রাতে আরও ভয়ংকর একটি ঘটনার সংবাদ আমার পরিবারের লোকজন পেলেন— আমি শুনতে পেলাম। তাঁবু পুড়ে গেছে, যে যেখানে পেরেছে একটু আড়াল আবডাল নিয়ে সংসারের টুকিটাকি বউ-ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে প্রহর গুনছে— কখন সকাল হয়। এর মধ্যে সুযোগ বুঝে ক্যাম্প-সুপারের এক কর্মচারী একটি শরণার্থী যুবতি মেয়েকে নদীর পাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। যুবতি মেয়েটি ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে কান্নাকাটি করছে। এই বিপদে এমন কাজটি

কে করেছে তা শনাক্ত করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে সব অন্যায় মাথা পেতে মেনে নিতে হয়।

সকাল না-হতেই জল্পনা শুরু হয়ে গেল। তাঁবুতে আগুন কোথা থেকে ধরল? কারা এমন ঘটনা ঘটাল। এই তো ক'দিন হল উদ্বাস্তু শিবির গড়ে উঠল। এর মধ্যে বিধ্বংসী কাজ কারা ঘটাল? ঘটনার পরদিন ফের নতুন তাঁবু দেওয়া হল। কিন্তু জল্পনা-কল্পনা থামল না। এতগুলো তাঁবুতে কী করে আগুন ধরল? সত্য প্রকাশ হতে বেশি দেরি হল না। ক্যাম্প-সুপারের অফিসের এক শ্রেণি কর্মচারীই আগুন ধরিয়েছিল। বর্ণবিদ্বেষে আর আর্থিক কেলেঙ্কারি মুছে ফেলতে। কুন্তি নদীর অন্য পাড়ে আগে যে শরণার্থী শিবির হয়েছিল তারাই কঠোর আর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নতুন ক্যাম্প-সুপারকে বাধ্য করল। তার থেকেই বেরিয়ে পড়ল, আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে ক্যাম্প-সুপারেরই কর্মচারীরাই। বর্ণবাদী অর্থলোভী কর্মচারীরাই অর্থ আত্মসাৎ করতে আর শরণার্থীদের তাঁবুর হিসাবের গরমিলকে মুছে ফেলতেই এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে।

যে পরিস্থিতিতে ছিন্নমূল মানুষগুলো এখানে এসে পৌঁছেছে, এমনটা যে হবে তা তাঁরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। জীবনে বাস্তবে যা ঘটে গেছে, সেই দুঃস্বপ্নকে তাঁরা ভোলার চেষ্টাই করে এসেছেন সবাই। কিন্তু ইতিহাস-সত্য এমনিই তা ভোলাও যায় না, মুছেও ফেলা যায় না— তা আজীবন রক্তস্রোতে স্মৃতির মতোই রয়ে যায়। উদ্বাস্তু জীবনে মোম-লাগানো তাঁবুর ঘরে এবড়ো-খেবড়ো মেঝেতে শুয়ে অনিশ্চিয়তার দুশ্চিন্তায় যখন তাঁদের চোখে ঘুম আসত না, তখন অনেকই জীবনে ঘটা ঘটনায় চলে যেতেন। মনের ভেতর হিসাব-নিকাশের পালা শুরু হয়ে যেত। কে কী হারিয়ে এসেছেন, কার কতটা সম্পদ খোয়া গেছে, কে কতজন স্বজন হারিয়েছেন, কে পুত্রহারা, কে স্বামীহারা, কে পত্নীহারা— তা নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষেরা সহানুভূতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতেন।

আমাদের তাঁবুর খুব কাছের তাঁবুতে থাকতেন সুরেন বাইন, বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ। চৌকোনা লাল দাড়ি, মুখের চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে; কিন্তু চোখদু'টিতে বয়সের ছোঁয়া লাগেনি। মানুষটার বাড়ি ছিল নোয়াখালি। নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হতেই তিনি পাশে এক গ্রামে মুসলমান বন্ধুর বাড়ি আত্মগোপন করেন। তাঁর প্রাণও ওই মুসলমান বন্ধু বাঁচায়। দাঙ্গা শেষ হতেই গান্ধীজির সঙ্গে তিনিও নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন আর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি প্রায়ই বলতেন আর চোখের জল ফেলতেন।

দাঙ্গায় গ্রামের পর গ্রাম, পাড়ার পর পাড়া উজাড় হয়ে গিয়েছিল এবং জনশূন্য গোটা এলাকা তার স্তব্ধতার ভাষা দিয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা জানান দিচ্ছিল। এমন অনেক ভয়ংকর ভাবে জখম হওয়া মানুষ তখনও রাস্তায়, পথে, উঠোনে পড়েছিলেন, চিকিৎসার সুযোগ পেলে হয়তো বাঁচতেন। কিন্তু তা থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। চিকিৎসার অভাবে অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এমন অনেক গ্রামে পরিবারের সকলকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের স্মরণ করার মতো একজনও বেঁচে ছিলেন না। মানুষের লাশ এখানে ওখানে তখনও পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। গোটা এলাকার পরিমণ্ডল দুর্গন্ধ, শোকে ভারী হয়ে উঠেছিল। মানুষের মাংস পচা দুর্গন্ধে গোটা পরিমণ্ডল এমনই ভয়াবহ হয়েছিল যে, একমাত্র শক্ত হৃদয়ের মানুষই সেখানে যেতে পারতেন। যে সব মানুষ ভয়ংকর দাঙ্গায় কোনও-না-কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, যারা মেরেছিল তারা ভেবেছিল, মেরে ফেলেছে। তাঁরা কেবল ঈশ্বরের দয়াতেই বেঁচে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সেই সব মানুষজনের বলার মতো অনেক কথাই আছে, যা শোনা সত্যিই ইতিহাস। সুরেন বাইন চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতেন, বড়দা সুধীর বাইন এমনই একজন ব্যক্তি, যিনি দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী। দাঙ্গায় সুধীর বাইনের একখানা হাত বোগলের গোড়া থেকেই কাটা গিয়েছিল, কিন্তু তিনি এখনও রানাঘাট ক্যাম্পে বেঁচে আছেন।

আমাদের তাঁবুর থেকে ছয়টি তাঁবুর ওপাশের তাঁবুতে থাকতেন সুজিত সমাদ্দার, মানুষটা শোকে দুঃখে বয়সের ভারে একটু কুঁজো, মুখখানা থেলো আর চোখের নীলাভ সাদা মণির ওপর ভেসে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল শিরা যেন কতকাল তিনি ঘুমাননি। অতিকষ্টে এক ঢোক নিঃশ্বাস গিলে বলতেন, সন্ধ্যার আঁধার নামতেই আমাদের সীতাকুণ্ড গ্রামের চারদিক দাঙ্গাবাজরা ঘিরে ফেলল আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিতে থাকল। গ্রামবাসীরা ওই শোরগোল ও হাঙ্গামা শুনে মনে করলেন গ্রামে নিশ্চয়ই কারও বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, যারা গ্রামে লুটপাট করতে চায়। আমরা সেই মুহূর্তে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বের করে ফেলি— তলোয়ার, বল্লম, সড়কি, রামদা, টাঙি, তেল-মাখানো লাঠি, বর্শা প্রভৃতি। কিন্তু অনেক সময় চলে যাওয়ার পরও যখন দাঙ্গাবাজরা কেউ লুটপাট করতে এল না। কিন্তু জয়ধ্বনি এবং শোরগোল করতে থাকল, তখন আমরা বুঝতে পারলাম দাঙ্গাবাজরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে এবং যে-কোনও মুহূর্তে দাঙ্গাবাজরা আমাদের মেরে ফেলবে।

তার পর এমন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল যে, বলার মতো নয়। আমরা

পুরুষরা সব বাড়ির ছাদে জড়ো হলাম। একে অপরকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ বিদায়ের সময় যেমন ক্ষমা প্রার্থনা করে— আমরা তাই করতে থাকলাম। বাঁচবার জন্য যাঁর যা করণীয় তাই তাঁরা করতে থাকলেন। কেউ পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে বুক চাপড়াতে থাকলেন, কেউ ঈশ্বরকে ডাকতে থাকলেন, কেউ নিজের কপালে করাঘাত করে মরণকে কামনা করলেন। মেয়েদের বলা হল, গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দিতে, সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই মৃত্যুকেই তাঁরা মেনে নিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকল। সুজিত সমাদ্দার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেন আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে চলেন, আশপাশের মুসলমান প্রতিবেশীদের ওপর তখনও আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, হয়তো তাঁরা ছুটে এসে আমাদের রক্ষা করবেন। কারণ চোদ্দোপুরুষ ধরে একসঙ্গে তো বসবাস করেছি। তাঁদের সঙ্গেই ওঠা-বসা, পথেঘাটে, রাস্তায়, হাটে একসঙ্গে চলা, রক্তের সম্পর্ক না থাক, তাঁরাই তো পরম আত্মীয়। কিন্তু সে আশা যখন বৃথা জানা গেল, তখন আমাদের পা কাঁপতে থাকল। দাঙ্গাবাজদের সাহস তখন বেড়ে গেল। তারা তখনই বাড়িতে ঢুকে দরজা ভাঙতে থাকল, ফটক ভাঙতে থাকল। লুকিয়ে-থাকা মানুষজন ক্ষমা চাইতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের খুন করে উঠোনে ফেলে রাখল। যারা সামান্য অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলেন মুহূর্তে তাঁরা দাঙ্গাবাজদের হাতে জীবন দিলেন। মেয়েরা পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। ছেলেমেয়েদের নির্বিচারে হত্যা করল। যে বাড়ির দরজা দাঙ্গাবাজরা ভাঙতে পারল না, তাঁরা নিজেদের চোখে দেখলেন খুনি দাঙ্গাবাজরা তাঁদেরই প্রতিবেশী চেনা মুসলমানরা।

দাঙ্গায় যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের প্রতিটি দিন আর রাত্রি দুঃস্বপ্নে কেটেছে এমনই একজন দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ সুজিত সমাদ্দার।

উদ্বাস্তু শিবিরের তাঁবুতে বাস করতেন গণপতি কবিরাজ, মুখখানা রোগাটে, চোখের পাতা ভারী, বড় বড় চোখদু'টি তাই দেখায় আধবোজা। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহিমিহি রেখা পড়েছে। সাধারণত কথা বড়-একটা বলেন না। কিন্তু থেকে থেকে বুকের ভেতর দাঙ্গার স্মৃতি যখন উতলা হয়ে ওঠে তিনি মুখর হয়ে ওঠেন। পরিবার বলতে একমাত্র মেয়ে, বছর বিশ-বাইশ বয়স। তাকে নিয়েই সংসার। গণপতি কবিরাজদের গ্রামের সমস্ত মানুষ গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তিনি দোটানায় পড়েছিলেন। তখন দাঙ্গার আগুন পাশের গ্রাম মুরারিপুরে দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং যে কোনও মুহূর্তে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে তাঁদের সারা গ্রামটাকে ভস্মীভূত করে

দিতে পারে। তিনি নিজের চোখে দেখলেন গ্রামের কিছু মানুষ নিজের ছাগল গোরু আর হাঁস-মুরগির জন্যই ঘর ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না। দাঙ্গাবাজরা তাঁদের মেরে উঠোনে ফেলে রেখে যায়। গ্রামের বাড়িতে গোলায় রাখা কয়েক মণ ধান আর তারই মায়ায় রাজেন বিশ্বাস প্রাণ দিলেন। তাঁর স্ত্রী শোভা হাঁস পুষতেন, মুরগি পুষতেন। যখন গ্রামের মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যেতে লাগলেন, শোভা বিশ্বাস হাঁস-মুরগি আর ডিমের জন্য গ্রাম ছেড়ে যেতে পারলেন না। অথচ সেই হাঁস-মুরগি আর ডিমসুদ্ধ বাড়ির ভেতর ঘরপোড়া আগুনে পুড়ে মরতে হল।

অনেক অশ্রু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা দেশভাগের পর প্রতিদিন বিষাদ হয়ে যাচ্ছিল মানুষের কাছে। স্বাধীনতা এসেছে, দেশভাগ হয়েছে— অথচ দাঙ্গা রক্তপাতের শেষ নেই। রাজনীতিতে যা দেশভাগ, পার্টিশন— মানুষের কাছে তা হল বাপ-ঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া, শিকড় ছিন্ন হওয়া, চেনা প্রতিবেশীর কাছে পর হয়ে যাওয়া, স্বজনবন্ধুর চোখে নিজেই সন্দিহান হয়ে পড়া, একটা দেশ বা জাতির ইতিহাসে এর চেয়ে কঠিন অভিজ্ঞতা, এর চেয়ে বড় বেদনা আর কিছুই হতে পারে না। এই সব বেদনা বুকে নিয়েই উদ্বাস্তু শিবিরের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ে অর্ধাসনে, অনশনে ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে যদি হয়, তবে তো দাঙ্গার ঘটনাগুলি সারাজীবনই স্মৃতির স্রোতে কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়াবে, রক্ত ঝরায়, প্রাণ কে কাঁদায়, হায়...

ঝরা পাতার কান্না

হুগলি জেলার নসরাইল বাজারের পাশে কুন্তি নদীর পাড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে প্রায় এক বছর হতে চলল আমরা বাস করছি। কিন্তু শিশু-কিশোরদের পড়াশোনার জন্য কোনও পাঠশালা গড়ে তোলবার চেষ্টা সরকার করল না। উদ্বাস্তু শিবিরের নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ মানুষই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। সরকার এবং তার কর্মচারীগণ কখনও চায়নি দলিতবর্গের শিশুকিশোর বিদ্যাশিক্ষা করে শিক্ষিত হোক, সমাজের রাষ্ট্রের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করুক। অন্যদিকে তাদের জীবনে এত ভাঙাচোরা দুঃখকষ্ট, অনাহার-অনিদ্রা, অত্যাচার, অবহেলা, ঘৃণা-বিদ্বেষ আর অনিশ্চয়তা যে, বেঁচে থাকাই ছিল প্রধানতম সমস্যা। ফলে লেখাপড়া শেখবার মন মানসিকতা গড়ে ওঠেনি মানুষগুলির মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব

পাকিস্তানে থাকতে যেটুকু বিদ্যাশিক্ষা হয়েছিল, গত দু'বছরের টানা-ছেঁড়ায়, অনভ্যাসে তাও ভুলতে বসেছিলাম।

অবস্থা যখন এমন, বড়দা আমাকে কুন্তি নদীর দক্ষিণপাড়ের পুরনো উদ্বাস্তু শিবিরের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ে দু'দিন যেতেই আমি অসুখে পড়লাম। জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না আর বিদ্যালয়েও যাওয়া হচ্ছিল না। এমন সময় একদিন আমাদের নতুন উদ্বাস্তু শিবিরে বিদ্যালয় খুলবার জন্য তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ এবং নথিভুক্ত করছিলেন হবু শিক্ষকগণ। আমি তখনও জ্বরে অচৈতন্য। পাশের তাঁবুর সুধা কাকিমা আমার নাম, বয়স এবং শিশুশ্রেণির যোগ্যতা আছে তা লিখিয়ে দেন। নতুন করে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে জেনে সুধাকাকিমা আমার বয়স চার বছর কমিয়ে লেখালেন।

জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর আমি নতুন উদ্বাস্তু শিবিরের স্কুলে গেলাম। স্কুলটি ছিল চন্দ্রহাটি পেপার মিলের গা-ঘেঁষে উত্তর দিকে। বাঁশের খুঁটির ওপর মোম লাগানো তাঁবুর ছাউনি, উঁচু-নিচু মাটির কাঁচা মেঝেতে চাটাই, বস্তার ছেঁড়া টুকরো, কাপড়ের টুকরো, ছাত্রছাত্রীরা যে-যা নিয়ে যেত, তাতেই সে আসন পেতে বসে বিদ্যালাভ করত। একটানা পাঁচমাস এই স্কুলে আমি পড়ার জন্য নিয়মিত গিয়েছিলাম বললে ভুল বলা হবে। টানা খোলা হলঘরের মতো স্কুলবাড়িটির মধ্যে কোনও শ্রেণি ভাগ ছিল না, পাতনি ছিল না। কেউ ছেঁড়া চটের, কেউ চাটাই আর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মাটিতে ধুলোতেই বসত। কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলাই ছিল না। খড়িমাটির পেনসিল, খান দুই বই— এই ছিল আমাদের শিক্ষার সামগ্রী। আর প্রায় তিনশো ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র দু'জন শিক্ষক।

আমরা তো দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতেই পেতাম না। আধপেটা, কেউ কেউ অধিকাংশ দিন অনাহারেই থাকত। গায়-মাথায় সাবান-তেল এমনকী পরনের পোশাক-পরিচ্ছদও ঠিকমতো জুটত না। উদ্বাস্তুদের ছ'মাস অন্তর মাথাপিছু একখানা ধুতি, একটি শার্ট, একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ, একটা প্যান্ট, একটা জামা পাওয়া যেত। ছেলেমেয়েদের জামাপ্যান্ট আলাদা বরাদ্দ ছিল। স্কুলের জন্য বাড়তি কোনও জামা-প্যান্ট সরকার দিত না। কোনও ভাবে 'দায়সারা গোছের' দায়িত্ব সরকার পালন করত। ফলে স্কুলে শিক্ষার প্রহসন চলত দিনের পর দিন। বলতে গেলে আমাদের মতো শিশুকিশোরদের প্রচুর খিদে থাকত পেটে। সেই খিদে ভুলে থাকতেই শিক্ষার নামে এক জায়গায় জড়ো হতাম আমরা, যদি খিদে ভুলে থাকা যায়। শরণার্থী শিবিরের মোম-লাগানো তাঁবুর আগুন-জ্বালা যদি ভুলে

থাকা যায়। সর্বোপরি শরণার্থী জীবনের নরকযন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্যই আমরা ছুটে যেতাম স্কুলে টানা খোলা হলঘরের মাটির মেঝেতে।

তাঁবুর ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে— যতীন, যতীন ওঠ ওঠ। চল, দেখবি কী তাজ্জব ঘটনা ঘটেছে দেখবি। আড়মোড়া ভেঙে ঘুম-জড়ানো চোখে তাকাই। দেখি নতুন পরিচিত মহেন ভৌমিক এসে আমাকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে ডাকছে।

বিশটা তাঁবু পেরিয়ে বড় একটা ছাতিম গাছ, তার কাছেরই তাঁবুতে থাকে মহেনরা। তিন ভাই, দুই দিদি, মা-বাবা। মহেন দেখতে খুব ফর্সা, নাদুসনুদুস চেহারা ছিল একদা। এখন ভেঙে গেছে, কিন্তু খাঁচাখানা রয়ে গেছে। ছুঁচালো নাক, কটা চুল, হাসলে পোকায় খাওয়া একটা দাঁত স্পষ্ট দেখা যায়। মুখে ক'টা বসন্তের দাগ চিরদিনের মতো চিহ্ন এঁকে আছে। বেঁটেখাটো হাত দু'খানা নেড়ে ও যখন কথা বলত তখন ওর হলদেটে আর ফোলা গাল দুটোতে ফুটে উঠত গোলাপি আভা। বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠত ভেতরের উৎসাহে।

স্কুলে মহেনের সঙ্গে নতুন মেলামেশা শুরু হয়েছে। উচ্ছ্বসিত আমুদে ছেলে, দু'-চার কথাতেই মিল হয়ে যায়, ও আমার সঙ্গী হয়ে যায়।

বড় বড় চোখদুটোতে চকমক করা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি আমি মহেনের দিকে। ঝাঁকড়া চুলের ভারী গোল মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মহেন সুস্বাদ গ্রহণের মতো উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ফের বলে, মাটির তলা থেকে একজন সাধুকে টেনে বের করা হয়েছে, চল দেখবি। এমনটি আর দেখিসনি কোনওদিন। চ দেখবি, ওঠ শিগ্‌গির ওঠ, চ।

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকলই না। তাই মহেনের কথায় কোনও উৎসাহ এল না। উলটে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম।

মহেন ছাড়বার পাত্র নয়, ফের আমার পিঠে হাত দিয়ে জোরে জোরে ঠেলতে থাকে। চিৎকার করে ডাকতে থাকে। ঠেলতে ঠেলতে, ডাকতে ডাকতে এক সময় আমাকে উঠিয়েই ছাড়ল। আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে গেলাম মাটির তলার মৌনসাধুকে দর্শন করতে।

শিবিরের উত্তর-দক্ষিণ কোণে ঝামটিগাছ আর জীবনগাছের ঘন নিবিড় ঝোপঝাড়ের ভেতর বেলকাঁটা বুচকাঁটা কুলকাঁটা দিয়ে ঘেরা উঁচু মাটির বিশাল ঢিবি ছিল। সেই ঢিবির ভেতর মাটির তলায় গভীর সুড়ঙ্গ কেটে গুহা মতো কুঠরি তৈরি করে দীর্ঘদিন বাস করছেন মৌনসাধু। সাধুর চেহারা সেকালের মুনিঋষিদের মতো সাদা ধবধবে লম্বা ছুঁচালো দাড়ি, একমাথা সাদা-কালো চুলের

ঝুঁটি বাঁধা মাথার তালুতে, তপস্যাকঠিন শুকনো চেহারা, গলায় পৈতে, চোখ-নাক তীক্ষ্ণ প্রখর চিক্কণ ঋজু। সাধু মৌন, লেখাপড়া জানেন, কানে পেন্সিল গোজা, হাতে একতাড়া কাগজ। তাতে লিখে জানান আর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করেন।

আমরা দু'জন হাত নেড়ে জানলাম, আমরা মাটির তলার গুহটা দেখতে চাই। সাধু নির্মল চোখ মেলে তাকালেন। হাতের ইঙ্গিতে তাঁর পিছনে আমাদের অনুসরণ করতে বললেন। আমরা সাধুর পিছনে পিছনে সুড়ঙ্গে নেমে কিছুদূর গেলাম। যেমন অন্ধকার, তেমনই গা-ছমছমে ভাব। সাধু ক্রমশ অন্ধকারে আরও নীচে নেমে যাচ্ছেন। আমাদের ভয় করতে লাগল। মহেনই আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, চল উঠে যাই যতীন। ভেতরে কোথায় কী আছে জানি না তো, বিপদও হতে পারে। মহেন সাধুকে ডাকল, সাধুজি, ও সাধুজি কোনও সাড়া নেই। কোন আঁধারে, কোথায় যে হারিয়ে গেলেন। আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। ভয়ে তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গ ছেড়ে উপরে উঠে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি বিশ বাইশজন দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে। তাঁরা স্থানীয় মানুষ। সাধুদর্শনে এসেছেন। তাঁরাই জানালেন কতদিন যে সাধু এখানে আছেন এ-তল্লাটের কোনও মানুষই তা বলতে পারেন না। বিশেষ বিশেষ তিথিতে সাধু মাটির গুহার তলা থেকে উঠে বাইরের পৃথিবীতে আসেন। সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা এতদিন এখানে উদ্বাস্তু শিবির গড়ে উঠেছে, কিন্তু শিবিরের একটি মানুষও সাধুর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। এত লোক এখানে আছেন এতদিন, বাস করছেন দীর্ঘদিন। তবু সাধুর খোঁজ কেউ নেননি। হঠাৎ আজ সকালে কে না কে সাধুর খোঁজ পেয়ে সাধুকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছেন। যদিও এই নির্দিষ্ট তিথিতে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন।

রহস্যের আকর্ষণে আর গন্ধের টানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম গুহাদ্বারের অদূরে। পাশে দাঁড়িয়ে মহেন আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, কী বলিনি? কেমন মনে হচ্ছে এখন? দেখলে তো সত্যিকারের সাধু এটা? যেমন জটাজুটো, তেমনই বাঁকানো পাকা লম্বা দাড়ি।

মহেনের কথা শেষ না হতেই সাধু বেরিয়ে এসেছেন, ঝুঁটির জটা খুলে দিয়ে চোখে একটা প্রশস্ত হাসির আভা ছড়াতে ছড়াতে দর্শনার্থীদের সামনে দাঁড়ালেন। শিশুসুলভ সরল আর প্রাণময় হাসি ফুটে বেরুচ্ছে তাঁর চোখে। তিনি মানুষকে দেখছেন যেন শিশুর দৃষ্টি, বিনয় আর রহস্য নিয়ে।

'অতীত ভারতবর্ষের একটুকরো উজ্জ্বল আলো' দেখতে পেলে তো, ফের মহেন আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল। নে, চল এ বার, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

প্রতি শনিবার দুপুরে স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ঘরে বই রেখে ছুটতাম আশপাশের গ্রামের ফসলের ক্ষেতে আর হেলেঞ্চাশাকে ভরা পুকুর ডোবাতে। পাটক্ষেতে, আলুক্ষেতে, পেঁপে ক্ষেতে অজস্র বউটুকুনি, নটেশাক হয়ে থাকত। চাষিদের কাছে গাছগুলি আগাছা হিসেবেই গণ্য হত। এই শাকগুলিই তুলতাম। শাক তুলে বেছে আঁটি বেঁধে বিক্রি করতে নিয়ে যেতাম চন্দ্রহাটি পেপার মিলের সকালের বাজারে। প্রায় অর্ধহারে আমাদের দিন চলত, আমি কিছু আয় করাতে পেট ভরে না-হলেও বেঁচে থাকবার মতো খাবার আমরা পেতে থাকলাম।

উদ্বাস্তু শিবিরের পরিবার প্রধানকে ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে আয় করতে এমনকী ভিক্ষা করতেও দেবে না সরকারের কর্মচারীরা। আমার বড়দা তাই বাইরে গিয়ে দু'পয়সা আয়ও করতে পারতেন না। দু-তিন দিন অন্তর ক্যাম্প সুপারের কর্মচারীরা খাতা হাতে হাজিরা নিতে চলে আসত। বসে থেকে শুধু সেই হাজিরা দেবার জন্যই যেন মানুষগুলো আধপেটা আর অনশনে বসে থাকত সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে। পরিবার প্রধানকে তাঁবুর ঘরে না পেলে সুপারের কর্মচারীগণ নাম কেটে দিত। পুরোমাসের ক্যাশডোল বন্ধ করে দিত চিরদিনের মতো। আমি দেখতাম আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী বড়দা সামান্য ক'টা টাকা ক্যাশডোল তুলে এনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সারাটা মাস পরিবারের মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতেন। এ অবস্থা কেবল আমার বড়দার নয়, গোটা উদ্বাস্তু শিবিরের পরিবার প্রধানরা একটা নৈরাশ্য ভার জিদকে কামড়ে ধরে পড়ে থাকতেন—তাড়া-খাওয়া, মুখ গুঁজে, চোখ বুজে পড়ে থেকে নীরবে মার খেয়ে যাওয়া খরগোশের মতো। এই অদ্ভুত আর একঘেয়ে জীবনে বিষাদ আর উদ্বেগ যেন গুলিয়ে উঠত আর মানুষগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ক্লান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেন। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবার আকাশচুম্বি উদ্বেগ আর আশংকা নিয়ে দিন কাটাত এই বুঝি এত কষ্টে বাঁচিয়ে আনা প্রাণটা বেরিয়ে যায়। তাঁরা যে শ্বাসরোধী আতঙ্কজনক অনিশ্চিত জীবনে টিকে থাকতেন তা ভাবলে আজও আমার বুকের ভেতরের বিষাক্ত ক্ষতটা কাঁচা হয়ে ওঠে। ছিন্নমূল প্রাণ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, পাঁজরভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারি না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

সব থেকে বীভৎস করুণতম সময়টা ছিল গ্রীষ্মকালে আর বর্ষাকালে। গাছগাছালিহীন খা খা শূন্য মাঠে আকাশের নীচে হাজার হাজার মোম-লাগানো তাঁবু খাটানো অল্প সামান্য পরিসর জায়গা কোথাও সবুজ ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই। খাড়া ভাবে পড়া কড়া রোদ যেন আগুন ঢালত পৃথিবীতে। কাপড়ের ওপর

মোম-মাখানো তাঁবুগুলো যেন লোহার পাতের মতো তাপে জ্বলে লাল ডগডগে হয়ে জ্বলতে থাকত। তাঁবুর ভেতর জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে উদ্বাস্তু প্রাণগুলো ঝলসে যেত। রোদের অসহ্য তাপে গরমে কুকুরের মতো জিভ বের করে হাঁপাতে থাকত মরণ যন্ত্রণায়। গরমে ঘামে মানুষের মাংস পচা গন্ধে গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা আস্ত একটি নরক হয়ে উঠত। বড় বড় ফোসকা পড়ে যায় মানুষের শরীরে। এক অবর্ণনীয় দাবদহে, পচা গন্ধে গোটা এলাকায় শ্বাসরোধী অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন মানুষ মরতে থাকে।

বর্ষাকালে আর রক্ষা থাকত না। রোদের তাপে মোম গলে ফাঁসা হয়ে যাওয়া তাঁবুর ওপর, বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে সবটাই দরদর ধারায় জল পড়তে থাকে তাঁবুর ভেতরে। মাথা শরীর কাপড়-জামা বোঁচকাবুঁচকি কাঁথা মাদুর সর্বস্ব ভিজে জবজবে হয়ে যেত। আর তাঁবুর বাইরে জলে কাদায় প্যাচপেঁচে হয়ে উঠত। উনুন জ্বেলে রান্নার জায়গা থাকত না। বাধ্য হয়ে তাঁবুর ভেতর উনুন জ্বলত। তাঁবুর মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে রান্না খাওয়া চুলোয় যেত। গরম ধোঁয়া বৃষ্টির জল কাদা পচা কাঁথা মাদুর ভিজে জামাকাপড় বিষাক্ত হয়ে উঠত। ক্ষুধা তৃষ্ণায় হাহাকারে গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা যেন ধুঁকতে থাকত। মানুষের দুঃখ কষ্ট দুর্দশার অন্ত থাকত না। মানুষগুলি প্রতিদিন তিলতিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত।

কুন্তি উদ্বাস্তু শিবিরে ছিলেন মাদার মণ্ডল। হাড় জিরজিরে শরীর, একহারা চেহারা, মুখটা ছুঁচোর মতো লম্বা, মাথায় ক'গাছি বেজির লোম চুল, নাকটা খাড়া— ঠিক টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। চোখ দুটো কাঁকড়ার চোখের মতো কপালের হাড়ের ওপর ঠেলে বেরিয়ে আছে।

সুপারের কার্যালয় থেকে ক্যাশডোল পাওয়ার দিন বড়দার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম ক্যাম্পের অফিসে। ক্যাশডোল তুলে ফিরছিলাম আমাদের তাঁবুর দিকে। দেখি অদূরে ছোট্ট একটা জটলা। এগিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন মাদার মণ্ডল। সামনে তাঁর বউ পাঁচি, আধপোড়া কাঠের মতো শুকনো চেহারা, নোংরা উশকো-খুশকো একমাথা চুল, বেঁটেখাটো ভাল্লুকের মতো হাত-পা, ছোটছোট চোখে শূন্যদৃষ্টি। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। ডান চোখটা প্রায় বুজে গেছে। মুখের চামড়ায় কালশিটে দাগ। তিক্ত বিদ্বেষে, ক্ষোভে মাদার মণ্ডলকে অকথ্য ভাষায় খিস্তি দিচ্ছেন। বলছেন, ওরে বুড়ো ঢেমনা, তোরে গারদে দেব। এমন করে ছাড়ব জেবনে যাতে কিছুটি করি খাতি না হয়। তুমরা কেউ বিশ্বাস করো না মিনসে রে। ওরে কেউ বিশ্বাস করো না। মিথ্যাবাদী শয়তান, আমার চুলের

কাটাটি অবিধ বেচে খেয়েছে শালা। একফোঁটা দয়ামায়া নেই আমার জন্যি। মিনসে আমারে ছাড়ি চলি যাবে এই মতলবে আছে। আমার ক্যাশডোল আমি তুলি নেব। পাঁচি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে স্বামীকে গালাগালি দিয়ে ছুটে গেলেন ক্যাম্পসুপারের কাছে। মুহূর্তে গলার স্বর পালটে ফেলে হাউমাউ করে কেঁদেকেটে ভিখারিনীর মতো কাতর স্বরে সুপারের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নানা নালিশ আর অভিযোগ দাখিল করতে থাকলেন বিরামহীন ভাবে।

মাদার মণ্ডলও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি উলটে স্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। বলেন, হুজুর, ভয়ংকর চালাক বেটি। ওর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। ভীষণ স্বার্থপর। নিজের সুখ সুবিধা ছাড়া দুনিয়ার কিচ্ছুটি দেখে না। রান্না করে নিজে নিজে খেয়ে নেয় সব।

পাঁচি কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেন, হুজুর ও সব বানানো কথা। একবর্ণ সত্যি নয়। যে চাল ডাল কেনে তাতে ক'দিন চলে। আমি আধপেটা খেয়ে মিনসেকে খাওয়াই— এ কথা বলতে মুখে বাঁধল না। ছিঃ ছিঃ সব মিথ্যা কথা হুজুর।

পাঁচি দ্বিগুণ পাগলামি শুরু করে দেন। বলেন, আমারে মারি ফেলো হুজুর, আমি বাঁচতি চাই না। আমাকে মারি ফেলো, ওমন মিনসের সঙ্গে এক তাঁবুতি আর একটা রাতও আমি বাঁচতি চাই না।

বউয়ের কথা শুনে মাদার মণ্ডলের মুখের পেশি কুঁচকে যায়। কালচে পুরু ঠোঁট দুটো যায় বেঁকে। চোখ দুটো মুহূর্তে ঘোলাটে হয়ে যায়। ধূসর ভুরু জোড়া থরথর কাঁপতে থাকে। পালটা জবাব দেওয়ার জন্য তিনি তোতলামি জুড়ে দেন— মহা...চা...লা...ক...ও...বে...টি...।

আশপাশে উপস্থিত উদ্বাস্তুরা ঘরের কথা বাইরে আনাতে দু'জনার দিকে বিদ্রুপের বাণ ছুঁড়তে থাকেন। কেউ কেউ ফোঁড়ন কেটে নিরস্ত করতে চান, কেউ-বা চিমটি কেটে ভর্ৎসনা করেন, কেউ ভেংচি দিতে থাকেন। কিন্তু মাদার মণ্ডল আর পাঁচি মণ্ডল কিছুই গায় মাখেন না। তাঁদের বিদ্‌ঘুটে বচসা চালাতেই থাকেন।

হঠাৎ মাদার মণ্ডল ক্ষেপে গিয়ে বউকে দু'হাতে ঠেলে নিজের তাঁবুর দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। কঠিন শুকনো গলায় হুংকার দিয়ে ওঠেন, ফের যদি সুপারের ঠাঁই নালিশ জানাতি আসবি, আমি তোকে খুন করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। সমস্ত মানুষের সামনে তোরে ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

পাঁচি মাথায় জোরে ঝাঁকানি দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফোঁস ফোঁস

শব্দে পা ফেলে হাঁটেন। বলেন, মার আমাকে মেরে ফেল, এমন জেবন রাখতি চাইনে। আমার সব খেয়েছিস, এখন আমারে খালি তোর হাড়ে বাতাস লাগবে। খা মিনসে আমারে খা। হাউমাউ করে পাগলামি করতে করতে দু'জনেই নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে যান।

পরে শুনেছিলাম দাঙ্গায় চারটি ছেলেমেয়েকে হারিয়ে মাদার মণ্ডল আর পাঁচি মণ্ডলের এই দশা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন— যা বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না। এর আগেও কয়েকবার ক্যাম্প-সুপারের কাছে গিয়েছিলেন— সে খবরও পাওয়া গেল।

পূর্ব পাকিস্তানে আমরা তিন ভাই একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম। উদ্বাস্তু হয়ে ভেসে এলাম শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে। এক মায়ের পেটের ভাই, মেজদার উদ্বাস্তুশিবির হল ভাণ্ডারহাটিতে আর বড়দা আমাদের পরিবারের উদ্বাস্তু শিবির হল কুপি-নসরাইল। অচমকা দুর্যোগ দুর্বিপাকে পরিবার পৃথক হয়ে যাওয়ায় ভয়ংকর অসুবিধার মধ্যে আমাদের পড়তে হল। বেঁচে থাকবার সামান্যতম উপকরণ নিয়ে আমরা সীমান্ত পার হয়েছিলাম। সেই উপকরণও আবার যদি দু'ভাগ হয়ে যায় তবে বেঁচে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই বড়দা কুপি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পাবার পর তিন মাস গত হতেই গোটা পরিবারটি যাতে ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে বদলি হয়ে যেতে পারে তার আবেদনপত্র জমা দেন। কিন্তু দেড় বছরেও যখন বদলি হল না, তখন বড়দা আরও একটি আবেদনপত্র ক্যাম্প-সুপারের নিকট দাখিল করেন— বিষয়বস্তু ছিল আমাদের ছোট ভাই যতীন্দ্রনাথ বালাকে আমার মেজ ভাই যে, বর্তমানে ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে আছে জয়হরি বালার পরিবারভুক্ত করা হোক।

কুপি ট্রানজিট ক্যাম্পের সুপারিনটেনডেন্ট বদলি হয়ে নতুন একজন এলেন। বড়দা নতুন সুপারিনটেনডেন্টকে অনুরোধ করলেন আমাদের উদ্বাস্তু শিবির বদলির ব্যাপারটি যেন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। সুপারিনটেনডেন্ট মিলন চৌধুরী আমার বড়দা যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা জানতেন। ফলে ক্যাম্পের সুপার মিলন চৌধুরী, একসঙ্গে মেজদার উদ্বাস্তু-পরিচিতি পারিবারিক কার্ডে আমার নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বড়দাকে পরিবারশুদ্ধ ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্পে বদলির আদেশ দিলেন। সেই মতো আমরা দু'বছরে কুপি ট্রানজিট ক্যাম্পের আশ্রয় ছেড়ে হুগলি জেলার ভাণ্ডারহাটিতে 'ওয়ার্কসাইড' ক্যাম্পের আশ্রয়ে বদলি হয়ে গেলাম।

বিষাক্ত ক্ষতে নীল ডুমো মাছ

আমাদের পরিবারটি চলেছে এক উদ্বাস্তু শিবির থেকে বদলি হয়ে অন্য একটি উদ্বাস্তু শিবিরে— কুপ্তি ট্রানজিট ক্যাম্প ছেড়ে ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইড ক্যাম্পে। সম্পূর্ণ নিজেদের খরচখরচায় গোটা পরিবারটিকে যেতে হচ্ছে এতটা দূর রাস্তা। তাই টুকিটাকি মালপত্র যা না-নিলে নয়, তাই সঙ্গে নিয়ে বাকি সব ফেলে রেখেই রেলের টিকিট কেটে গাড়িতে চড়ে বসতে হল। কুন্তিঘাট স্টেশন থেকে ব্যাণ্ডেল, ব্যান্ডেল থেকে শেওড়াফুলি জংশন, তার পর তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল স্টেশনে নেমে বাসে চড়া। বেলা গড়িয়ে গেল, আমরা বাস থেকে নামলাম পুরনো একটা হাটখোলায়। সেই সকাল থেকে একটানা সারা দিন মোটমাটালি বোঁচকাবুঁচকি টেনে নিয়ে কী কষ্টে এতটা দূর যে এলাম তা একমাত্র পথই জানে আর হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আমরা ক'জন মানুষ।

ভাণ্ডারহাটি হাটখোলা থেকে একটা পিচঢালা সরু ভাঙাচোরা রাস্তা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে এঁকেবেঁকে ছুটে চলে গেছে। সরু রাস্তা ধরে মালপত্র মাথায় ঘাড়ে হাতে নিয়ে আমরা হেঁটে চললাম।

রাস্তার দু'ধারে সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে সাঁওতাল পরিবারের ছোট ছোট মাটির ঘর। প্রতিটি বাড়ি কী সুশ্রী আর কী ঝকঝকে তকতকে— দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছিমছাম ছোট ছোট ঘরদোর, নিকানো উঠোন, ঘরের দেওয়ালে ছবি-আঁকা, পেখম-তোলা মটকা রাস্তার দু'পাশ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে পড়ে— হায় হায় এমন বাড়িঘরদোর একদিন আমাদেরও ছিল। চোখে জল এসে পড়ে। দেখে দেখে হাঁটি আর আফশোসে বুকের ভেতর টনটন করে।

পোয়াটাক পথ হাঁটলেই গাছগাছালির ফাঁকফোঁকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল উদ্বাস্তু শিবিরের হলুদ তাঁবুর চূড়া। গ্রাম শেষ হতেই খানিকটা চাষের মাঠ, তার পর ঝোপজঙ্গল ছাড়ালেই বহু পুরনো একটি আমবাগান— ঘন আর পাতলা বুড়ো আমগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আমবাগানের এধারে ওধারে, রাস্তার দু'পাশে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য তাঁবুতে বাস করছেন উদ্বাস্তুরা। বাগান বলতে বিশ-পঁচিশটা গাছ, তার পাশে ছিল চাষের মাঠ। এখন উদ্বাস্তু শিবির, মজাখানা, মাটির ঢিপি— সব মিলিয়ে বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটা জায়গায় উদ্বাস্তু শিবিরটা গড়ে তোলা হয়েছে। সরু পিচঢালা রাস্তাটা ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকে শিবিরটাকে দু'ভাগে ভাগ করে যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিচু রোয়াজমির খাতটাকে লাফ মেরে পার হয়ে ওপাশের অগভীর বিল পেরিয়ে আরও দূরে কনুইভাঙা

গ্রাম ছুঁয়ে বেলমুড়ি স্টেশনে মিশেছে। ডান দিকে কাটা খাল (ক্যানাল) পূর্ব-পশ্চিমে রয়ে গেছে। সুদূর কানা নদী থেকে সেচের জল তুলে আনতে মাঠে চাষ করতেই এইখানে সৃষ্টি হয়েছে আর খাল খনন করতেই উদ্বাস্তুদের এই অস্বাস্থ্যকর জায়গায়, মাঠের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। খুব অল্প ডালপালা প্রায় পাতাশূন্য ন্যাড়ান্যাড়া বুড়ো আমগাছগুলিকে রিক্ত মানুষের জীবনের নিঃস্বতার বিষণ্ণতাকে শূন্যে মেলে ধরেছে— দূর থেকে আমগাছগুলি তাই মনে হচ্ছিল।

শিবিরে ঢুকবার মুখে দিঘির পাড়ে উঁচু মনোরম জায়গায় আলোখোলা পরিবেশে গোছনোগাছানো সুপারিনটেনডেন্টের অফিস এলাকাটি। শিবির ছাড়ালেই উদ্বাস্তুদের পাঠশালাটি। সরকারি অফিস এলাকাটি শাল, সেগুন, আম, জাম, তেঁতুল গাছের ছায়াশীতল পরিবেশ। তার পর খা খা শূন্য বৃক্ষহীন মাঠ। নিচু জায়গাটি উদ্বাস্তুদের জন্য। আলোর পাশে অন্ধকারের মতো উদ্বাস্তু শিবিরটি যেন ঝিম মেরে পড়ে আছে প্রাণের কোনও সাড়াই নেই।

আমরা বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে সোজা হেঁটে উদ্বাস্তু শিবিরের ভেতর ঢুকে গেলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা যখন মেজদার তাঁবুর সামনে হাজির হলাম, তখন আশপাশের তাঁবু থেকে উদ্বাস্তুরা সব ছুটে বেরিয়ে এলেন— আমাদের ঘিরে ধরলেন। আমরা বেঁচে থেকে আবার যে ফিরে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি— এটা যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হারিয়ে-যাওয়া আপনজনকে ফিরে পেলে যে আনন্দ হয় মনে, বাঁচার প্রেরণা জাগে— উপস্থিত সকলের মুখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও খুশির রেখা ফুটে উঠল। আমি খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম এই ভেবে, মা-বাপহারা এক মায়ের পেটের তিন ভাই আবার এক হাঁড়ির ভাত রোজ একসঙ্গে বসে খেতে পারব, একসঙ্গে থাকতে পারব। আপন-স্বজন প্রিয়তমজনেরা আমাদের বুকে টেনে নিলেন এমন ভাবে যেন গভীর দুঃখের মধ্যেও অন্তরাত্মা ক্ষণিকের জন্য হলেও একটু স্বস্তি পেল।

নতুন শিবিরে পা রেখেই আমার মনে হল, জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। উঁচু-নিচু বেখাপ্পা জায়গায় শিবিরটা কেমন স্যাঁতসেঁতে আর একটা উৎকট গন্ধে ভরে আছে। কোথাও উঁচু ঢিবি, কোথাও নিচু খাদ। নিচু জমিতে জমে-থাকা পচা জলকাদা থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ গোটা পরিবেশটাকে দম আটকে দিচ্ছে। ঘিঞ্জি ঘন ঘন তাঁবুতে পা ফেলবার জায়গা পর্যন্ত নেই। শিবিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা এঁদো পুকুর। তাতে চরছে পাতিহাঁস। পাশে শুয়োরের আস্তানা। জলে অসংখ্য মহিষ ডুবে মাথা-মুখ জাগিয়ে আছে।

মালপত্র নামিয়ে রাখতেই ক্যাম্পের পিয়ন এসে হাজির। লোকটার টাকমাথা, চওড়া কপাল, ট্যারা চোখ, বাঁ-পাখানা টেনে হাঁটে, রগে একগাছি কটা চুল, মুখের রংটা হলদেটে, চোখের চারধারে মিহিবলি রোঁয়া, কালো মোটা পুরু ভুরুজোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা পাশ দুটো কাঁপিয়ে কথা বলে। লোকটা এসেই সংবাদ দিল ক্যাম্পের সুপারসাহেব গোটা পরিবারটিকে এক্ষুনি দেখা করতে বলেছেন।

বড়দা বললেন, এক্ষুনি দেখা করে এসে হাত-পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেব। চল ভাইডি দেখা করে আসি। দাদাদের সঙ্গে আমিও গেলাম ক্যাম্প-অফিসে।

একটা ফাঁকা মতো জায়গায় অল্পবয়সি আমগাছের নীচে হলঘরের মতো উঁচু করে তাঁবু টাঙানো, সেখানে চেয়ার-টেবিল পাতা বেশ মনোরম একটি অফিস। একদিকের আরাম কেদারায় বসে হোঁতকা মতো সুপার, লোকটা পুরনো ঝানু, একটা দুশমন, দয়ামায়া নেই। উদ্বাস্তুদের ওপর তার রীতিমতো আমিরি ঘৃণা। সাদাটে চুল, লাল টুকটুকে গাল, বড় বড় চোখ। জালার মতো পেটটি নিয়ে বড়ই বিব্রত।

লোকটাকে দেখেই ভয় করে আমার। কাঁটার মতো খচখচ করে ভয়টা বিঁধে বুকের মধ্যে। অদৃশ্য হয়ে ভোঁতা ভাবে বেড়ে যায় শত্রুভাব। হাওয়ার মধ্যেই কী যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত— যা দুর্ভেদ্য মেঘের আড়াল রচনা করে উদ্বাস্তুদের বাইরের সব কিছু থেকে ঢেকে রাখতে চায়। সবকিছু দুর্বোধ্য।

মাংস থলতলে হাতখানা মুখের সামনে ধরে হাই তোলে হোঁতকা সুপার। লাল মুখখানা আরও পাণ্ডুর হয়ে যায়। বারেবারে আঙুল দিয়ে কপালের রগ চেপে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। চোখ দুটোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ছুরির ফলার মতো বিঁধে থাকে আমাদের মুখে।

চুলপাকা বড়শির মতো নাকওয়ালা এক সহকারি কর্মচারী খাতা হাতে হাজির। বড়দার হাত থেকে বদলির কাগজখানা নিয়ে খসখস করে খাতায় লিখে ফেলে নামগুলি। নাম ডাকছে আর কালো মুখের মধ্যে তার ঝলসে উঠছে চোখ আর দাঁতগুলি। বড়দার দিকে আঙুল তুলে তাচ্ছিল্য ছুড়ে দিয়ে যেন আদেশ দেয়। বলে: এই ব্যাটা, একটা তাঁবু, দশটা গোঁজ আর দুটো খুঁটি, একটা আড়া নিয়ে যা। সপ্তাহে একবার এখানে এসে হাজিরা দিয়ে যাস। যা ব্যাটা যা, জায়গা দেখে তাঁবু খাটিয়ে নিগে যা। বিদ্বেষ উগরে দিয়ে লোকটা বলে যায় তার কথা।

ঘৃণায় বড়দার সমস্ত অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তাঁর চোখ দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। রাগে দুঃখে ক্ষোভে তিনি কাঁপতে আরম্ভ করলেন। কেউ যেন তাঁকে

ধাক্কা দিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তার পর হঠাৎ যেন আগুন নিভিয়ে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পোড়া ক্ষতচিহ্নটা তামাটে রং ধরল, ভুরুটা নেমে এল চোখের ওপর।

সুপার একটুকরো ঘৃণা মিশ্রিত হাসি ছুঁড়ে মেরে বলে, যা পালা, এখান থেকে। পুরু ভুরুর তলায় কুঁতকুঁতে চোখজোড়া দিয়ে বড়দাকে দেখে সন্দেহ আর অবহেলার দৃষ্টিতে।

বড়দা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেন। সমস্ত ঘাড়টা যেন তাঁর লাল হয়ে উঠছে। কঠিন ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলছে। অসহায় জীবনের কথা ভেবে দমে যান তিনি। মনের আগুন নিভে যায়। অসহায় অপমানে চোখ জলে ভরে আসে। চোখের সামনে তাঁর ভেসে ওঠে বিয়াল্লিশের সেই ভারত ছাড়ো উত্তাল আন্দোলন। হৃদয়ের গভীর তল থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ওঠে। রক্ত শুকিয়ে যাওয়া কলজেটাও যেন টসটস করে ওঠে লোকটার দুর্বিনীত ব্যবহারে।

মেজদার বুকে এসেও সেই ঘৃণার, বিদ্বেষের ধাক্কাটা লাগে। ভুরু কুঁচকে থাকেন, চেষ্টা করেন কোনও কিছু না-দেখার ভান করেন— যেন এই সব গালাগালি বিদ্বেষের কথা তার কানেই ঢুকছে না। তাড়াতাড়ি তাঁবু খুঁটি, গোঁজ টেনে সরিয়ে আনেন। তিন ভাই ধরাধরি করে সব বাইরে বের করে আনি। তার পর ফিরে আসি শিবিরে।

সুপারের মেচেতা ধরা মুখটা আর তার সহকারির শুকনো চেহারা আমি মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারি না। চোখের সামনে নীল চোখ হোঁতকা লোকটার চেহারা আজও ভাসছে।

ফিরে আসতেই পিসতুতো দাদা নরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। দাদার মুখের দিকে গভীর ভাবে দেখি, নরেনদার চেহারাটা খুব বদলে গেছে। তিনি অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন। উশকো-খুসকো দাড়ি। তার নীচে চোয়ালের মোটা হাড়গুলো। চোখের নীচে সাদা মণির ওপর ভেসে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল শিরা। কতকাল যেন তিনি ঘুমাননি। নাকটা শিকারি বাজের ঠোঁটের মতো। জামার কলারটা এককালে বোধহয় লাল ছিল। এখন কাদামাটি ধুলো ঘাম লেগে রং ঢেকে গেছে। ফেঁসে-যাওয়া বোতাম খোলা জামাটার গলায় লুকনো হাড়গুলো বেরিয়ে আছে হাঁ করে। বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত জেগে গেছে। সমস্ত চেহারাটার একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। দেখলে কেমন যেন লাগে। লাল ভাঁটার মতো চোখদুটো রাগে ধকধক করে জ্বলছে। কালো মুখখানাও তার আঁচে জ্বলছে। মানুষটা শ্মশানের আধপোড়া কাঠের মতো হয়ে গেছেন।

এই ক্যাম্পে না এলেই ভাল করতিস ভাইডি। এখানে আমাগে আটকে রেখে তিলেতিলে শেষ করে ফেলছে। যেদিন ক্যাম্পে আলাম তার পর দিন থেকেই খালের মাটি কাটতে নিয়ে গেল শালারা। আমাগে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। শালাদের হাত নয়তো লোহার থাবা। আর তাই দিয়ে আমাদের বুকগুলোকে চষে চষে তার মধ্যে ঘেন্নার বীজ বুনে দিয়েছে। আমাদের ওপর ওদের একফোঁটা দয়ামায়া নেই। আদেশ হল, মাটি কাটো, গম চাল পাও— তাই খাও। একদিন না খাটলে ক্যাম্প থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। ক্যানেলের মাটি তাই প্রতিটি পরিবারের প্রধানকে কাটতেই হবে। আমার পিসতুতো দাদার ভেতরে রাগ যেন টগবগ করে ফুটছে। গোটা মুখটাই তার লাল টকটকে হয়ে ওঠে।

কথার মধ্যে এলেন আমাদের তালুইমশাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁর পরিবর্তনটাও চোখে পড়ার মতো। মুখখানা রোগা হয়ে গেছে। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহিমিহি রেখা পড়েছে। ক্লান্ত শুষ্ক চেহারা, গলা কর্কশ। বলেন, আমরা যেন ভেড়ার পাল। ওই ক্যাম্পবাবুদের তাড়া খেয়ে রোজ ঘুম থেকে উঠে ক্যানালের মাটি কাটতে ছুটতে হয়। আর ওনাদের কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। পাথর খেয়ে খিদেটাকে চাপান দিয়ে যদি মাটি কেটে কেটে মুখে রক্ত তুলতে পারি, তাতেও ওনাদের মন ভরে না। এমনই নিষ্ঠুর ওরা। কী বলব। বলতে গেলে পরানটা ফেটে যায় বাছা।

ক্যাম্পের অফিসবাবু ওই যে ছিনেজোঁক লোকটা, আমাদের মাটি কাটায়— ক্যানলের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু রোদের আঁচ পেলে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় সুতির রুমাল বাঁধে। মনে মনে ভাবে ওই রুমাল দিয়েই মানুষকে শাস্তি দেবার পাপ ঢাকা পড়বে। সেদিন ঝুড়ি আনতে গিয়ে আমার কনুইটা একটু লাগতেই মানুষটা এমন মুখভ্যাংচালো— বাঁদরের মুখও তার থেকে দেখতে ভাল দেখায়। তা ছাড়া মেহনতি মানুষের পিঠের শিরদাড়া অমন সোজা নয়। আমাদের আলোচনার মাঝে এসে কথা পাড়লেন ছোট ভগ্নিপতি অধীর মণ্ডল। এই দেড় বছরেই খেটেখুটে ক্যানালের মাটি কেটে মানুষটার চুল পেকে গেছে। শুকনো ভাবে তার কথা শেষ করেন।

এই সে দিন ডাক্তারের কাছে গেলে পরীক্ষায় রবীনের খুড়তুতো ভাই সুফল বাইনের যক্ষ্মা ধরা পড়েছে। ক্যাম্প অফিসের বাবুরা গম আর চালের বিনিময়ে মাটিকাটা কাজে খাটিয়ে খাটিয়ে জান কয়লা করে ছাড়ছে। পেট ভরে খেলেই তো পিঠে সইবে। ক'টা গম দেয় আর ক'টা চাল দেয়— খাটিয়ে নেয় তার তিন

গুণ। না-খেতে পেয়ে বারোআনা মানুষের যক্ষ্মা হয়ে গেল। তবু ক্যানেলের মাটি কাটা শেষ হল না। পিসতুতো দাদা কথা বলতে মাথাটা তার যেন ভারী হয়ে বুকের ওপর এলিয়ে পড়তে চায় এবং বারবার সেটি খাড়া রাখবার আয়াসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাঁধের কড়া মাংসপেশির টানে।

ক্যাম্পের অফিসবাবুরা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে মাথা তোলেন মেজদার পাশের তাঁবুর পরিবার-প্রধান জগবন্ধু সরকার। সরল মুখখানা তাঁর কবে থেকে যে আঁধার হয়ে উঠেছে তা আর খুঁজে বের করবার জো নেই। কী উপচে পড়া তেজ ছিল মানুষটার আর আজ কাটিকুটি চেহারা। মাটিকাটা খাটুনি খাটতে খাটতে ক্লান্তিতে একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছেন।

শিবিরের মানুষজন সব জড়ো হতে থাকেন। আমাদের ঘিরে ধরে তাঁরা ব্যথা আর জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখকষ্টের আলোচনা করে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করেন। পাশের একটি তাঁবুর মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসেন। দীর্ঘ দেহ নুইয়ে পড়েছে। একটা ছেঁড়া জামা গায়, তার বোতামগুলিও নেই। গোল মাথাটার চারদিকে পিঙ্গল চুলগুলো ন্যালন্যাল করে ঝুলছে। হাড় বের করা হলদে মুখখানায় সোনালি দাড়ির গোছা। ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করা। কালো কোটরের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখদুটো জ্বলছে যেন জ্বরের তাড়সে। কথা বলতেই তার বেদম কাশি উঠল। কাশি থামতেই হাঁপানির শব্দ উঠছে সাঁই সাঁই করে।

কথা বলবার জন্য মানুষটা গাল হাঁ করতে আরও জোরে হাঁপাতে থাকেন। মুঠো মুঠো তাজা বাতাস প্রাণপণে ছিনিয়ে নিয়ে গিলতে থাকেন লোভীর মতো। দুর্বল অস্থিসার আঙুলগুলো বুকের ওপর নাড়াতে নাড়াতে জামার বোতাম লাগাতে চেষ্টা করেন।

আমরা মেজদার তাঁবুর ভেতর গিয়ে বোঁচকাবুঁচকি রেখে বিশ্রাম করতে চলে যাই। মানুষের ভিড়টা কিন্তু কাটে না। পাঁচ-ছ'টা তাঁবুর মুখে তখনও মানুষজন আসছে আর আপন যন্ত্রণা আর কষ্টের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, তিক্ত জীবনের কথা বলে ভেতরের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। আমি ছিন্নমূল মানুষের হাঁফ-ধরা কথাগুলি শোনার জন্য কান পেতে সর্বাঙ্গ মেলে ধরি, আমাদের দেখে নিন। আমি সুখলাল বাছাড় সবে আঠাশ বছর বয়স আমার। আর এখনই মরতে বসেছি। ভেবেছিলাম লোহার শরীর আমার। সত্তরটা বছর তো অনায়াসে বাঁচবই। কিন্তু কোথায় গেল সেই সত্তর বছর! গত দেড় বছরে না-খেয়ে থেকে ক্যানেলের মাটিকাটা কঠোর পরিশ্রম করে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার জীবন

থেকে প্রাণরস সব শুষে নিয়েছে ক্যাম্পের অফিসবাবুরা।

বীরেন ঠাকুর কথা শুনতে মাটিতে জাবড়ে বসেছিলেন। এখন নিজেই কথা বলতে শুরু করেন, ক্যাম্পের কত মানুষ মাটিকাটা কাজের চাকায় পিষে নুলো হয়ে উপোস করে বোবার মতো মুখটি বুজে মরছে। কথা শেষ করতে পারেন না বীরেন ঠাকুর। তার কাশি আসে। কাশতে কাশতে দেহটা কুঁকড়ে যায়।

খাটিয়ে খাটিয়ে আমাদের ওরা শেষ করে দিতে চায়। তা না হলে যে ওদের মনে স্ফূর্তি আসবে না। মানুষরা যে দলিত তাই তাদের রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে জ্যান্ত মানুষটাকে ভাগাড়ে ফেলতে পারলেই ক্যাম্পবাবুদের পুণ্যি হবে— নিতাই বিশ্বাস জ্বালাধরা মন নিয়ে বলেন।

ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে ক'দিন বাস করতে-না-করতেই পূর্ববাংলার অনাশ্রয় মানুষদের প্রতি সরকার-প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠল। অবিভক্ত ভারতবর্ষে দেশভাগের অব্যবহিত আগে কংগ্রেসের নেতারা পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য প্রচুর দরদ ভরা প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু দায়দায়িত্ব যখন ঘাড়ে এসে পড়ল, তখন আগের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেতে এতটুকুও লজ্জা পেলেন না। বরং পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল অনাশ্রয় মানুষদের প্রতি তাঁদের আচরণে দেখা গেল অমানুষের মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ নির্লজ্জতা আর ভণ্ডামি। স্বার্থগন্ধী প্রশাসনের নিষ্ঠুরতা দেখে আমি চমকে উঠলাম। শুধু ক্যানেলের মাটি কাটাতেই অসহায় মানুষদের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বন্দি করে শ্রম রক্ত সব শুষে নেওয়া হচ্ছে। মাটি কেটে খাল খননে খেটে খেটে কালি হয়ে যাওয়া দেহগুলি থেকে অবশিষ্ট প্রাণটুকু বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যেন আকুলিবিকুলি করছে। সঙ্গে খিদের আগুনে পুড়ছে প্রতিটি উদ্বাস্তুর মুখ। সরকারি প্রশাসন কতটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর হলে, অমানবিক হলে মানুষগুলোর শেষ রসরক্ত শক্তিটুকু নিঙড়ে নিতে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিতে পারে— ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস না করলে আমি জানতেই পারতাম না।

তথাকথিত উচ্চবর্ণের হাতে ক্ষমতা ছিল, তারা বেছে বেছে নমঃশূদ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জেলে মালো, ধোপা কামার কুমোর প্রভৃতি শ্রমজীবী নিম্নবর্ণের মানুষজনকে ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইড ক্যাম্পে এনেছে চাষের জমিতে সেচের জল তুলতে খাল খনন করাতে। ভারতবর্ষ ভাগের মহাবিপদে পড়ে যে মানুষগুলি তাদের চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি-জন্মস্থান ফেলে রেখে নিঃস্ব হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আইনানুগ আশ্রয়ের খোঁজে এলেন, তাঁদের প্রতি যে অমানুষিক

আচরণ করা হল— তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই। কোন অবস্থায় পড়লে মানুষ পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি জন্মস্থান ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে এক বস্ত্রে অজানা পথে পা বাড়ায়? স্বার্থে অন্ধ প্রশাসন, কর্মচারীগণ দেশভাগের অন্তঃশায়ী দুঃসহ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ তারা বিদ্বেষবশত বুঝতে পারেনি, দূরদৃষ্টির অভাবে আর না হয় সব বুঝেও ভাবের ঘরে চুরি করেছে। বঙ্গদেশকে ভাগ করার মূলে যে কায়েমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা আর নিম্নবর্ণের মানুষদের শেষ করে দেবার সুপরিকল্পিত অমানবিক নিষ্ঠুরতা, স্বার্থবাদী অপকৌশল তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরের উদ্বাস্তুদের প্রতি তাদের আচরণের অন্তরালস্থিত সত্যে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্বাস্তু শিবিরে আমরা যেন জানোয়ারের জীবন নিয়ে এঁদো পচা পাঁকের ভেতর মুখ গুঁজে পড়েছিলাম। প্রতিদিন সকাল হলেই ঝুড়ি কোদাল কাঁধে চাপিয়ে ছোট বড় বৃদ্ধ সব পুরুষকেই খাল খনন করতে মাটি কাটতে যেতে হত। বারো ঘণ্টা তাঁকে কাজের জোয়ালে আটক রেখে দিত ক্যাম্পের অফিসবাবুরা। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কাজের দাসত্ব পালন করতেই হত। না হলে উপোস করে মরতে হত। দেশভাগের পরিণাম কী ভয়ংকর অমানবিক।

শিবির অফিসের সেদিনকার সেই হলদেমুখো নীল চোখ কর্মচারীটি প্রতিদিনের মতো উদ্বাস্তুদের ঠাট্টা টিটকিরি অপমান আর আঁতে ঘা দিয়ে কথা আর নিষ্ঠুর উল্লাস করতে থাকত। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর শাসানিও চলে। তার ফলে বড়দার হাতের ভেতর পর্যন্ত প্রতিবাদের ভাষা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে বড়দা শুধু লোকটার ছোট্ট মেচেতা ধরা মখুটার দিকে তাকিয়ে থাকেন নিঃশব্দে। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে কোদাল তুলে শক্ত মাটিতে কোপ বসায়।

সবার পেটেই খিদের আগুন জ্বলছে অথচ ছুটি দেওয়ার নাম নেই। সকাল থেকে খাল কাটছে মানুষজন। ওপাশে এক আধবুড়ো মাটি ভর্তি ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁপাতে থাকেন তিনি।

উদ্বাস্তু জীবনে খিদে নিত্যসাথী। নিজের ছায়ার মতো পেছনে খিদে লেগে আছে অষ্টপ্রহর একদলা ভাত, এক টুকরো রুটির পিত্যেশ নেই কোথাও। খিদে উদ্বাস্তুদের খাচ্ছে। এমনকী খিদে ওদের আত্মাকে অবধি গিলে খাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের চেহারা আর মানুষের মতো আছে? খিদের জ্বালায় সেটা অবধি চলে গেছে। কোনও মতে ধুকপুকিয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু সে বাঁচা মরার বাড়া। গলে-পচে যাওয়া, পচে গলে যাওয়া।

আর শিবির অফিসের কর্মচারীরা সরকারি গোলামরা শকুনির মতো ঘিরে থাকে উদ্বাস্তুদের। এক ঝুড়ি মাটিও কম ফেললে রক্ষা নেই। গম কম দেবে, চাল হয়তো দিলই না। ক্যাম্পের হাজিরা খাতা থেকে নামটাও কেটে তাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যায় অবিচার অত্যাচারের জুলুম বিরামহীন ভাবে চলে।

শকুনরা আমার মতো বাচ্চা মানুষদেরও ঠেঙিয়ে মাটি কাটতে নিয়ে যায়। খাল খনন করবার কথা শুনে আমার তো গা গুলিয়ে উঠল। প্রথমে তো মনে হয়েছিল বুঝি পারব না। মনে মনে নিজেকে ধমক দিলাম কষে। খবরদার না খেয়ে মরার থেকে খেটে মরে যাওয়াও ভাল। রবিবারের দিনটা এক সের গমও তো পাওয়া যাবে। পালানো-টালানো চলবে না। খিদের রুটি হয়তো জোগাতে পারব না, কিন্তু খিচুড়ি তো পাকাতে পারব। কোদাল ধরে মাটি কেটে ঝুড়ি ভরলাম। মানুষের প্রতি অপমানে অন্যায় অবহেলায় অত্যাচারে আর ঘৃণায় আমার গায়ের চামড়া চড়চড় করতে লাগল। সেই ঘৃণা অপমান অবহেলা আজও কলজের মধ্যে ধারালো ছুরির ফলার মতো বিঁধে আছে।

দিন যায়। মাসও যায়। ছ'মাসের মাথায় বড়দা বায়নানামা করে জমি কিনে ব্যবসা করবে বলে সরকারি ঋণ নিয়ে বনগাঁয় চলে গেলেন সপরিবারে। আমি কিন্তু থেকে গেলাম মেজদার ক্যাশডোল কার্ডের সদস্য হিসাবে। ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্পে খাল কাটাও শেষ হল। তার পরই বাতাসে খবর শোনা গেল ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবির তুলে দেওয়া হবে। এখনকার লোকগুলোকে বিভিন্ন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এখানে আর কাজ নেই। মাটি খনন করে খালকাটা নেই। সুতরাং এখানে আর উদ্বাস্তুদের রাখবারও দরকার নেই। লরি এসে দাঁড়ালেই সেই লরিতে উঠতে হবে এবং অন্য যে কোনও শিবিরে গিয়ে ফের আশ্রয় নিতে হবে।

সংবাদ শুনে শিবিরের উদ্বাস্তুরা মরবার শেষমুহূর্তে দাবি জানালেন, উদ্বাস্তু মানুষ পুনর্বসতি চায়, জমি চায়, ঘর চায়, খেটে খেয়ে বাঁচতে চায়, নিজস্ব একটি বাঁচার আস্তানা চায় এবং এই দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করলেন।

সময় থেমে থাকে না। দিন গড়ায় সপ্তাহে, সপ্তাহ গড়ায় মাসে। শিবিরের ক্লান্ত বিষণ্ণ মানুষের আর্তনাদে কান্নায় আকাশটা যেন আঁতকে ওঠে। টপটপ করে সারারাত শিশির পড়ে মোম লাগানো তাঁবুর ওপর, কুয়াশার গুমোট আঁধারে ক্ষুধায় কাতর মানুষগুলোর ঘুম ভেঙে যায়। কনকনে ঠাণ্ডায় ধড়ফড় করে উঠে তাঁবুর খুপড়িগুলো থেকে ভাঙাচোরা মানুষজন বাইরে বেরিয়ে আসেন। শেষরাতের আবছা আঁধার তখনও লেগে থাকে ভোরের গায়। ওদের দিনগুলো

গিলে খায় খিদে। দেহে শক্তি নিঙড়ে নেয় রোদে দাউ দাউ করে জ্বলা মোম-লাগানো তাঁবু। এক-একটা দিন এমন করেই যায়— একেবারে ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবু বেঁচে থাকার আশা মরে না। চাঙা হয়ে উঠতে চায়, থেঁতলে যাওয়া মনপ্রাণও।

ঠিক এমনই সময়ে ভাণ্ডারহাটি শিবির সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে পরিবারগুলিকে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ বাঁচার ন্যায্য দাবি জানাতে না পারে। অত্যাচার আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারে সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ভাণ্ডারহাটি শিবির অফিস কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে দিল— উদ্বাস্তুদের শিবিরে গিয়ে যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে ভাণ্ডারহাটি শিবিরের সমস্ত পরিবার যেন তার জন্য বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে প্রস্তুত থাকে লরিতে উঠে অন্য ক্যাম্পে চলে যাওয়ার জন্য। এটা ক্যাম্পসুপারের আদেশ সব উদ্বাস্তুকেই মানতে হবে।

ক্যাম্প-প্রশাসনের ঘোষণা এবং নির্দেশ পাবার পরপরই শিবিরে একটি গুঞ্জন উঠল— এই পরিস্থিতিতে কী করবেন? উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কি পুনর্বাসনের দাবি করবেন, না কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে অন্য শিবিরে মাথা নিচু করে অন্যায় অবিচারের ঘানি টানতে যাবেন? শিবিরের এ-মাথা ও-মাথা তিনবার পাক দিয়ে এলেন আমার মেজদা এবং পিসতুতো দাদা। ক'জন চেনা-জানাশোনা পরিবারের প্রধানকে ডেকেও এলেন— এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুদের কী করা উচিত তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। দাদাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় হাজির হলেন— খুলনা জেলায় বাড়ি ছিল— কার্তিক মণ্ডল, ফরিদপুর জেলায় বাড়ি ছিল মাখন বৈদ্য, ভরত সমাদ্দার, বরিশালে বাড়ি ছিল গৌরহরি হালদার, নিকুঞ্জ গোলদার, ঢাকা জেলায় বাড়ি ছিল ভবেশচন্দ্র সরকার, নিখিলনাথ রায়, গোপাল কীর্তনীয়, ত্রিপুরা জেলার নিতাইপদ সরকার, গোবিন্দচন্দ্র বালা, হরিদাস দাস এবং পাবনা জেলায় বাড়ি ছিল দীনবন্ধু সেন, যুগলকিশোর বিশ্বাস, নিরঞ্জন পোদ্দার ও রমানাথ বৈরাগী।

বুড়ো ন্যাড়া আমগাছটার একফালি মরা ছায়ায় মেজদা পিসতুতো দাদার সামনে ভুরু নেই, পাতলা ঠোঁট, বসন্তের দাগওয়ালা মুখ দু'হাঁটুর ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে বসে নিকুঞ্জ গোলদার, তাঁর মুখেই প্রতিবাদের কথা শোনা গেল, আমরা কে কোথায় ছিলাম, সেটা বড় কথা নয়, মেজদা আমরা তা জানতেও চাই না। এখন— আমরা বাঁচতে চাই, মানুষের মতো বাঁচতে চাই।

নিকুঞ্জ গোলদারের কথা শেষ হতে পারে না। গৌরহরি গোলদার টাকমাথা,

ছোট চোখ, মুখের রংটা হলদেটে, মোটা গলায় গমগম শব্দ করে বললেন, ঠিক কথাই বলেছ দাদা। আমরা বাঁচতে চাই। যারা আমাদের ভুল বুঝিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের আমরা স্পষ্ট চিনতে পেরেছি। তারা ওই অফিসের বাবুরা। ফের আমরা আর কোথাও মাটি কাটতে যাব না। আমরা পুনর্বাসন চাই। বাড়ি চাই, ঘরদোর চাই, জমিজমা চাই চাষের, ক্যাম্পের উদ্বাস্তু জীবনে আমরা যেতে চাইনে। আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। খেটে খেতে চাই, ফসল ফলাতে চাই।

পরস্পর তর্ক বেধে যায়। কথা ছোটে যেন আগুনের হলকা। উত্তেজনায় সকলের মুখ লাল, কিন্তু কেউ চটেননি, একটি নোংরা কথাও কেউ মুখ থেকে বার করেননি। বরং কারও কারও মাথা নুয়ে গেছে গভীর চিন্তায়, বিপদের আশঙ্কায়।

মেজদা ধীরেসুস্থে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলেন, দেখো ভাই আমরা মহাবিপদে পড়েই উদ্বাস্তু হয়েছি। তার মানে এই নয় আমরা আর মানুষ নেই। যারা আমাদের ঘৃণা করছে, অবহেলা করছে, উদ্বাস্তু বলে তাচ্ছিল্য করছে, বাঁচতে দিচ্ছে না, অন্যায় ভাবে মাটি কাটাচ্ছে, আমাদের পুনর্বাসন না দিয়ে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে ফেলছে, আমাদের চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে— তাদের দেখাতে হবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের শয়তানি ষড়যন্ত্র আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই, পুনর্বাসন চাই। শত্রুদের দেখাতে হবে— যত নীচে তারা আমাদের ফেলে রাখুক, যত অত্যাচার ঘৃণা অবহেলা করুক আমরা উদ্বাস্তু হলেও মানুষ এবং জ্ঞানের মাপকাঠিতে মানবিক আবেদনে তাদের সমান, কোনও অংশেই আমরা ছোট নই, খাটো নই, এমনকী কোথাও কোথাও আমরা তাদের চেয়েও বড়। দেশভাগের মহাবিপদে না পড়লে এ দেশে ছিন্নমূল হয়ে আসতাম না। ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় হৃৎপিণ্ড বুঝি তাঁর ছিঁড়ে যেতে থাকে। হাত দু'খানি বুকের ওপর চাপা, ঠোঁটদুটি নড়ে যায় কী-এক অব্যক্ত ভাষার ব্যঞ্জনায়। তাঁর নিষ্প্রভ চোখ থেকে গাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। দেশভাগ আমরা চাইনি অথচ দেশভাগের বলি হলাম আমরা— তাঁর মুখের কথা থামে না।

রমানাথ বৈরাগী যেন বুকের মধ্যে কার কথা শুনতে পান। তার পর আস্তে আস্তে বলেন, যাঁরা বলছেন সামনে পিছনে আমাদের সব কিছুই জানা দরকার। তাঁরা ঠিক কথাই বলছেন। আমাদের মধ্যে চেতনার আলো জ্বললে তবেই তো যাঁরা আঁধারে আছেন, তাঁদের আমরা দেখতে পারব। আমরা কেন আজ উদ্বাস্তু

তা জেনেও যারা না-জানার ভান করছে, তারা স্বার্থে অন্ধ। আমাদের সবংশে মৃত্যুই কামনা করে। তারা ভণ্ড, নির্লজ্জ, বিশ্বাসঘাতক। উদ্বাস্তুদের অবস্থা বুঝেও ভাবের ঘরে চুরি করে মাটি কাটাচ্ছে। পুনর্বাসন না দিয়ে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে ফেলছে।

বঙ্গদেশ ভাগের বলি আমরা যাঁরা নিম্নবর্ণের মানুষজন জানোয়ারের জীবন নিয়ে এঁদোপচা পাঁকের মতো শিবিরে মুখ গুজে পড়ে আছি, দাসত্বের জীবনযাপন করছি। সেই পচা এঁদো গর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। না-হলে মৃত্যুই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে... আমার পিসতুতো দাদা ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি শব্দকে ওজন করে করে উচ্চারণ করেন।

ভাববার সময় নেই ভাই। সামনে তিনটি দিন মাত্র, যদি ক্যাম্পেই যেতে হয় একই ক্যাম্পে চল। না-হলে পুনর্বাসন চাই। হরিদাস দাস মিনমিন করে মতপ্রকাশ করেন। হয়তো কারও কানেও তা সঠিক পৌঁছে যায় না।

একটা কিছু শেষ সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে ভাই। সময় কিছু হাতে নেই। মেজদা বলেন আর সবার মুখের দিকে তাকান। কারও চোখেমুখে কোনও নতুন আলো দেখা যায় না। কেবল ভাবনায় বুঝি মাথা নুয়ে থাকে আঁধারের দিকে ঝুঁকে।

মাঝরাত্রির আগেই সভা ভাঙল, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারলেন না কেউ। মাখন বৈদ্য প্রথম উঠে গেলেন যেন ঘুম আসছে— এমন একটা ভাব দেখিয়ে। এ ব্যাপারটা মেজদার একটুও ভাল লাগল না। এত তাড়া থাকলে কিছু কী ভাবা যায়! কার্তিক মণ্ডল নিখিলনাথ রায় এক এক করে যে-যাঁর তাঁবুতে চলে গেলেন।

এই সময়েই আমি উপলব্ধি করলাম আমার জীবনই আমাকে শিক্ষিত করে তুলল— সত্যিই উদ্বাস্তু জীবন কঠিন, কঠোর এবং এই জীবনের অভ্যাস থেকে নিস্তার পাওয়া তার থেকে শতগুণ শক্ত। মানুষগুলোর অসীম ধৈর্য দেখে আমি অবাকও হতাম, মুখ বুজে তারা কী জঘন্য অত্যাচার অবহেলাই না সহ্য করছে এবং এই বাঁধন কেটে-ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার শেষ ইচ্ছাটুকুও তাদের সমূলে মরে যাচ্ছে। উদ্বাস্তুরা যেন হালছাড়া নৌকা। সব যন্ত্রণা গা-সওয়া একটি চেতনাহীন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এদের হাত-পায়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করার শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে ছাড়ছে প্রশাসন। মানুষগুলোকে জড়বস্তুতে রূপান্তরিত করার কী ভয়ংকর অপকৌশল। ভাণ্ডারহাটি শিবিরের উদ্বাস্তুদের ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে ভাগ করে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ আবার নতুন দুর্ভোগের মধ্যে

দুর্দশার মধ্যে তাদের নিষ্ঠুর ভাবে ছুড়ে ফেলা হবে। মানুষগুলি গুমরে গুমরে মরতে থাকল কিন্তু কিছুই করার নেই কারও। বারো জেলার তেরো জন এক উদ্বাস্তু শিবিরে ঠাঁই পেয়েছে। যেখানে যে ভাবে নিয়ে যাবে প্রশাসন, সেখানেই যেতে হবে। বারবার ছিন্নমূল, কোনও মাটিতেই স্থায়ী ভাবে শিকড় এদের বসাতে দেওয়া হবে না। এই ভাবেই এদের শুকিয়ে শেষ করে ছুড়ে ফেলে দেবে আবর্জনায়— সেই নিষ্ঠুর চক্রান্তই প্রশাসন যেন সুপরিকল্পিত ভাবেই ফেঁদেছে।

একটা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে বাকি রাতটকু কাটল। পরের সারাদিন আর নিদ্রাহীন রাত যেন কাটতেই চায় না। দেহেমনে অসীম ক্লান্তি। আগের দিনে রাতে যা ঘটে গেছে তার স্মৃতি কুয়াশার জালের মতো চেতনায় ছেয়ে রইল।

ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবির তুলে দেবার সেই নির্দিষ্ট দিনটা এল। শুধু এল না যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষগুলোর ওপর।

সকালের আকাশটা ভয়ংকর ঘোলাটে। হাওয়া নেই। যেমন গুমোট, তেমনি অস্বস্তিকর। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ঘন কালো কুচকুচে জমাট বাঁধা মেঘের তলায় সকালের সূর্যটা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। চরাচরে সারা আকাশটা থমথমে। গোটা প্রকৃতি দম মেরে কীসের অপেক্ষায় পড়ে আছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। প্রলয়ের পূর্বাভাস যেন দশদিক থেকেই ঘনিয়ে আসছে। মহাপ্রলয়ের সংকেতের মতো গুরুগুরু মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে।

ভাণ্ডারহাটির গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা একই দিনে উঠে যাবে আজ। রাতেই লরিগুলি এসে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে সারি সারি। সকালের খাওয়াদাওয়া শেষ করেই উদ্বাস্তুরা লরিতে উঠবেন, তারই সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলছে তঁবুতে তাঁবুতে।

ওদিকে কেউ কেউ হয়তো উঠে গেছেন লরিতে। শেষ মানুষটি আসতে এখনও বাকি তাই লরি ছাড়তে দেরি হচ্ছে। হয়তো আকাশের দিকে তাকিয়ে কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, সত্যি আজকে কী যাওয়া যাবে? কেউ হয়তো লরিতে উঠেই চিৎকার করছেন তার ছেলেকে ডাকছেন, মেয়েকে ডাকছেন। হয়তো পরিবারের কর্তাই উঠেননি এখনও। মালপত্র বোঁচকাবুঁচকি অন্যসব লোকজন লরিতে উঠে বসে আছে।

তখনই খোলা আকাশটা পাগল হয়ে উঠল, মার মার কাট কাট ধেয়ে এল প্রবল মারমুখী হাওয়া। মুহূর্তে তীব্র ঝড়ের দাপটে টুকরো টুকরো হয়ে চলল গোটা প্রকৃতি। সেই সঙ্গে তুমুল শব্দে বড় বড় ফোঁটায় চড়চড় করে বৃষ্টি নেমে

এল। মুহুর্মুহু ঝড় বৃষ্টিতে নিমেষেই পৃথিবীটাই পালটে গেল— এ-গ্রহের আয়ু বুঝি আজকেই শেষ। আকাশের সূর্য যেন চিরকালের মতো নিভে গেছে। এমনই ঝড় আর তুমুল বর্ষণ, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— বাজ পড়ছে। দেখতে দেখতে গোটা শিবিরটা যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল চোখের পলকে।

সারারাত চোখের পাতা এক হয়নি উদ্বাস্তু মানুষদের। মেঘের আওয়াজে বৃষ্টির তুমুল শব্দে সবাই ভয় পাওয়া পাখির দল। কে যে কোথায় মাথা গুঁজে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন বোঝাই যাচ্ছে না। চোখ দু'টি মেলে তাকিয়ে আছি ঝড়বৃষ্টির দিকে আর কান পেতে আছি আপন বুকের মধ্যে। মাথা ভারী, শুকনো চোখে নিদ্রাহীন রাত্রির জ্বালা। মনের মধ্যে নানা জ্বালা-পোড়া-ধিকিধিকি জ্বলছে। হৃৎপিণ্ডটা বেতালে টিপটিপ করে চলেছে।

আমি ছিলাম রাস্তার পাশে আমার ছোটদির তাঁবুতে। দেখতে এসেছিলাম কার কতদূর গোছানো-গাছানো হল। গোটা শিবিরের অর্ধেক পরিবারের টাঙানো তাঁবু খুলে গোটানো হয়ে গিয়েছিল। কিছু তাঁবু লরিতেও উঠে গিয়েছিল। বাকি উদ্বাস্তুরা তাঁবু খুলে গোটানোর তালে ছিল। ঠিক এমন সময় ঝড়বৃষ্টি এল। গোটা এলাকাটা দিশাহারা ঝড়বৃষ্টিকে ছাপিয়ে মানুষগুলোর ব্যগ্র উত্তেজিত একটা চাপা কোলাহল ছড়িয়ে আকাশ গমগম করছে। আমার চোখের সামনে ঝড়ে ওড়া, বৃষ্টি ভেজা ঝাপসা রঙের বিচিত্র প্রবাহ ছুটে চলেছে সঙ্গে মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ কান্না শোরগোল চিৎকার চেঁচামেচি।

ঝড়বৃষ্টির দাপট সমানে চলেছে। সেই ঝড়জলের মধ্যেই শিবির কর্তৃপক্ষের সরকারি কর্মচারীগণ মানুষজনকে লরি ভর্তি করে পাঠাতে চাইল অন্য উদ্বাস্তু শিবিরে এবং সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারকে আজই আধঘণ্টার মধ্যে উঠে যেতে হবে— এই আদেশটাই কাল হল। গোটা উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষগুলো এই অন্যায় অমানবিক নির্দেশে মুহূর্তে ক্ষেপে গেলেন। সম্মিলিত নারীপুরুষের প্রতিবাদ চিৎকার রাস্তায় এসে আছড়ে পড়ল। মহা বিরক্ত স্বর শোনা যেতে লাগল, আরে ভাই, ওদের কী মাগ ছেলেমেয়ে ঘরে নেই নাকি? কী করছে কী ভেবেচিন্তে করছে? মানুষের মাথা এই ভাবে কি মানুষ থেঁতলে দেয়? আগুনের মতো রাগের হলকা ছড়িয়ে যায়। গোটা উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষগুলি ক্ষেপে গেছে।

ক্লান্ত বিধ্বস্ত দিশেহারা মারমুখী জনতা ছুটে চলল শিবির অফিসের দিকে। নারীপুরুষ একসঙ্গে ছুটে চলল। বাঁধবাঙা বন্যার মতো দেখতে দেখতে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল। ঝড়জলের মধ্যেই আচমকা এলোপাথাড়ি মারপিট শুরু হয়ে গেল। তাঁবুর লম্বা খুঁটি, খাটো খোটা গোঁজ, মুগুরগুলোই হয়েছে ক্ষিপ্ত মানুষের

হাতিয়ার। তাই নিয়েই সবাই ছুটছে। মারমুখী মানুষ লরির খালাসি, ড্রাইভার, সরকারি কর্মচারী স্থানীয় মানুষজন গোটা এলাকা জুড়ে কী যে ঘটছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মারপিট, ভাঙা, ছেঁড়া, মটমট, কান্না, আর্তনাদ, চিৎকার, চেঁচামেচি, শোরগোলের মহাশব্দ মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে, ছিটকে পড়ছে। বড় ধরনের কিছু-একটা বুঝি ঘটে চলেছে। হুড়মুড় করে এদিক থেকে ওদিক ছুটে আসছে শিবিরবাসীরা। হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আবার উঠছে, উন্মাদ হয়ে ছুটছে— তাঁদের দেখাচ্ছিল সাক্ষাৎ খুনির মতো। সর্বাঙ্গ ওদের জলেকাদায় চপচপ করছে।

শিবিরের শেষ মাথায় সুপারের অফিসের মুখে প্রায় শ'খানেক মানুষ জমায়েত হয়েছে। কার্তিক মণ্ডলের গলা শুনতে পাওয়া গেল তাদের মধ্য থেকে। অগোছালো এলোমেলো কথা। যেমন করে ঘানিতে তেল বের করে, তেমনই করে ওই সরকারি কর্মচারীরা আমাদের সব রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে।

বিশ-তিরিশটা গলার স্বর একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে, ঠিক তাই ঠিক তাই। এ অন্যায় অবিচার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমরা মরে আছি, কিন্তু পচে তো এখনও যাইনি। ওই সরকারি দালালদের কাছে আমাদের কানাকড়িও দাম নেই। ভিড়ের ভেতর থেকে চেনা গলার স্বর শোনা যায়।

মারমুখী জনতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় ফুলে ফেঁপে ফেটে পড়ে। আর তখনই একটা অঘটন ঘটে যায়। লড়াই শুরু হয়ে যায়। অক্রোশের গালিগালাজ ওঠে। পাঁচমিশেলি জনতার ভিড় আক্রোশের এক চাপা গর্জনে থমথম করতে থাকে। চারদিকে ধাক্কাধাক্কি সশব্দে শক্ত লাঠির কঠিন আঘাত পড়ছে। মানুষ ক্ষেপে ক্ষেপে অমানুষ হয়ে গেছে। ওরা এখন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা পাগলা কুকুরের মতো এলোপাথাড়ি ছুটছে।

যা ঘটার তা তো ঘটেই চলেছে। কেউ তাকে থামাতে পারবে না। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা গোঙানি সোজা উপরে উঠে বাতাসে মিশছিল। তারই মাঝে অসাধারণ একটা কিছুর আঁচ পাচ্ছিলাম। বাতাসে কাঁচা রক্তের কটু গন্ধ ভাসছে। তীব্র বুকফাটা একটা চাপা আর্তনাদ তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

আমার নিজের ভেতর থেকে সর্বাঙ্গ ছেয়ে কেমন যেন একটা তীব্র ক্লান্তি ঘনিয়ে আসছিল। মাথাটা কী ঘুরছে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ বেদনায় মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি বুকের ভেতরটায় অস্থির হয়ে ওঠে। চেতনার আলোর আঁধারে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি।

ভিড়টা ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে সামনে পিছনে দুলছে। মরার আগে

মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে ঘৃণা বিদ্বেষ অবহেলা অত্যাচার দাসত্বের আঁধার ছিঁড়ে জনতা মত্ত হয়ে ছুটছে। ধোঁয়াটে রঙের মানুষগুলোর নিরেট ঢেউটাও আচড়ে পড়ছে এদিকে থেকে ওদিক।

ওদিকে কার বুকফাটা তীব্র আর্তনাদ ওঠে আহত পশুর মতো। কে যেন চিৎকার করে বলে, এই ছোঁড়া, পালা এখান থেকে, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যা, মরবি যে এখানে থাকলে। যা যা পালা। মানুষের ছোটাছুটি সন্ত্রস্ত কণ্ঠে চিৎকার। এই ভাগ এখান থেকে। কে যেন বুকে আঘাত হানল আমার। অন্ধকার চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিকে যেন আমার ঘুরছে, ভাসছে, কাঁপছে। বাতাস গমগম করে উঠল। জনতা উদ্বাস্তু শিবিরের দিকে ফিরে চলেছে। আঁধারে পা হাতড়ে চলেছি তাঁবুর দিকে। হাঁটু দুটোয় যেন বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। হাঁটতে গিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে। কান পাতলেই শুনতে পাই। কোথা থেকে জনতার চাপা কোলাহল ভেসে আসছে। তারই মধ্যে একটা অদম্য বাসনা নতুন চেতনা অগ্নিশিখার মতো ধকধক করে জ্বলতে থাকে মনেপ্রাণে।

অনেকক্ষণ হল গোটা শিবির এলাকা আঁধারে ঢেকে গেছে। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। গত তিনটি দিন ধরে মানুষ ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। শিবির ভাগের গোছগাছ নিয়ে। রাতের আঁধারে শিবির যেন ক্লান্তিতে কষ্টে আর অবসন্ন পরিস্থিতিতে ঝিমিয়ে পড়ছে। আর্তনাদ কান্না চিৎকার চেঁচামেচি শোরগোল আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। আঁধারের বুকে যে যেখানে পারছে ক্লান্ত শরীর মন নিয়ে ঢলে পড়ছে। আমার দুই দাদা মামাতো পিসতুতো ভাই— তারাও ফিরে এসেছে তাঁবুতে। যাদের তাঁবু গুটিয়ে ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল তারা তা ফের খুলে তাঁবু মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। যারা যে যেখানে ছোটাছুটি করছিল তারা সব ফিরে এল।

গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা কষ্টে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, বচসা নেই। একটু আগেই যেখানে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে, এখন সেখানে টু শব্দটি শোনা যাচ্ছে না। কী অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক এই রহস্যময় জীবন জগৎসংসার। কাছেপিঠে রাস্তায় মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে পৃথিবী।

ছেঁড়া তাঁবুর বৃষ্টিভেজা মেঝেতে শুয়ে আছি। দুর্যোগের ঘনঘোর রাত্রি কখন কাটবে সেই আশায় চোখে ঘুম নেই। তাঁবুতে তাঁবুতে একটা অজানা শঙ্কার ত্রাসের খসখসানি স্পষ্ট টের পাচ্ছি। আমাদের তাঁবুর পাশ মাড়িয়ে কারা যেন

দ্রুত হেঁটে চলে গেল। আবার কারা সশব্দে এদিকেই আসছে। ভারী ভারী বুটের কঠিন কর্কশ শব্দ রাতের বাতাসে চকিতে ভয়ার্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের পাশের তাঁবুতে নিখিল বৈদ্যের তাঁবুতে শব্দ উঠল ফড়ফড়। তাঁবুর সামনের দরজার একটা পাট বুঝি কেউ টেনে ছিঁড়ে ফেলল। কে যেন ভোতা গলায় হিংস্রতা ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, মার মার ছারপোকাগুলোকে পিষে মার। রক্ত চোষার দল। মার না, খেয়ে খেয়ে শালাদের গায়ে জুত হয়ে গেছে। মার শালাদের মার। একেবারে মেরে ফেল।

ওদিকে আবার নিশিকান্ত সর্দারের তাঁবুতে শোরগোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কোনও মহিলা বুঝি বুকফাটা আর্তনাদ করছে। সঙ্গে আরও ক'জন মহিলা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। নিশুতি রাতে হঠাৎ আর্তনাদে কান্নায় চিৎকারে নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে খানখান হয়ে গেল।

আবার সেই কর্কশ বুটের শব্দ। পুলিশের তীব্র হুইসেল, সঙ্গে গালিগালাজ, আস্ফালন— মার মার শালাদের। মেরে পুঁতে ফেল মাটিতে। বড় বাড় বেড়ে গেছে শালা। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতগুলো যার খাবে তাকেই আবার ঠেঙাবে। বেইমানের জাত শেষ করে দে। হাড় হাভাতে শুয়োরের বাচ্চাদের ঝাড়ে বংশে মেরে শেষ করে দে।

ওদিকে আবার কে যেন হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। অন্ধকারে কারা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে গেল। চারদিক থেকে অবিরত কান্নার রোল, হাহাকার, ফিসফিস কথার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। তারই মাঝে কর্কশ বুটের শব্দ, চাপা গুঞ্জন, আস্ফালন, হুমকি শোনা যেতে থাকে।

কালো মিশমিশে আঁধার ঠেলে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আকাশ মেঘে ঢাকা। কোথাও একফোঁটা আলো নেই। সরকারি কর্মচারী আর পুলিশ বাহিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকে চিরুনি তল্লাসি চালাচ্ছে। ঘুমন্ত ক্লান্ত শিবিরে বেছে বেছে নির্দিষ্ট তাঁবুর সামনে গিয়ে সন্তর্পণে জোয়ান পুরুষদের এক-একজন করে টেনে বের করে মারতে মারতে শিবির অফিসে নিয়ে যাচ্ছে। অফিসে নিয়ে গিয়ে সঠিক অপরাধীকে ধরবার জন্য পুরুষটির হাড়মাস ঝাঁঝরা করে পিটিয়ে জেরা করছে প্রশাসনের পুলিশ আর কর্মচারীরা। মেরে আধমরা করে মানুষটাকে আবার সেই তাঁবুতেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে যাচ্ছে।

গভীর রাতের বাতাসে একটা প্রশ্নই বারবার আছড়ে পড়ছে ক্যাম্প সুপারিনটেনডেন্ট কালীশংকর মুখোপাধ্যায়কে কে বা কারা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে? কে কে?

সেই একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে শত শত উদ্বাস্তু মানুষকে পিটিয়ে লাশ করে ছাড়ছে। পুরুষ নারী কাউকে বাদ দিচ্ছে না। যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই ঘুম থেকে টেনে তুলে নিয়ে গিয়ে বেদম মারছে। কোনও বাছাবাছি নেই। উদ্বাস্তুরা আবার মানুষ নাকি, যা খুশি তাই করছে। উদ্বাস্তু যুবতি নারীকে ঘুম থেকে টেনে তুলে উলঙ্গ করে প্রশস্ত নিতম্বে, বুকের পাঁজরে বুটের লাথি মেরে-মেরে জেরার নামে সুখ করছে পুলিশবাহিনী। অসহায়, নিরস্ত্র হাড় বের করা মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র একঝাঁক পুলিশ সারারাত ধরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। নিঝুম রাত বারবার আর্তনাদে আঁতকে উঠছে। কারও নাক থেঁতলে রক্ত ঝরছে, কারও ঠোঁট ফেটে রক্তের ধারা বইছে, কারও কানের তালা ফেটে গেছে, কারও বুকের হাড় ভেঙেছে, কারও পুরুষাঙ্গ থেঁতলে দিচ্ছে, কারও যোনিদেশে রুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হাড়ভাঙা পিটুনি খেতে খেতে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেউ সহ্য করতে না পেরে মনের সমস্ত জোর একত্র করে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে সেই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে। সামান্য সন্দেহের বশে কায়েমি স্বার্থবাদী হিংস্রশক্তি কী ধরনের ভয়ংকর প্রতিশোধ স্পৃহায় মেতে উঠতে পারে, নিম্নবর্ণের মানুষদের কী জঘন্য অত্যাচারে অবিচারে শেষ করে দিতে পারে, ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষদের শাস্তি না দেখলে কেউ তা ভাবতেও পারবে না।

প্রথমে পুলিশের দল সঙ্গে সরকারি কর্মচারী আমার পিসতুতো দাদার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ায়। একজন পুলিশ হেঁকে, তাঁবুতে আঘাত করে ডাকে, হেই কুত্তির বাচ্চা, উঠে আয়, সুপারের অফিসে যেতে হবে। ওঠ শালা, ওঠ। শিগ্‌গির ওঠ শালা।

পিসতুতো দাদা তাঁবুর দরজা খুলে বেরুতেই পুলিশ সার্জেন্ট চুল মুঠো করে ধরে পাগলের মতো মাথাটাকে ঝাঁকাতে লাগল। মাগনা খেয়ে তেল হয়েছে গায়, চল।

কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই জানিনে। পিসতুতো দাদা করুণ সুরে বলেন আর মাথাটা ছাড়াতে চেষ্টা করেন আপ্রাণ।

পিসতুতো দাদার কানের ওপর এক ঘুষি মেরে সার্জেন্ট চেঁচিয়ে ওঠে, চোপরাও শালা, তুই শালা পাণ্ডা। এখন ন্যাকা সাজছিস। এই কুত্তির বাচ্চা, আগে চল, তার পরে দেখাচ্ছি মজা। কে মাথা ফাটিয়েছে সুপারের। চল, চল, পিসতুতো দাদাকে বুটের লাথি মারতে মারতে টেনে নিয়ে চলল ক্যাম্পের অফিসের দিকে।

অসহায়তায় অসহ্য যাতনায় পিসিমা হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। তিনি আর দাঁড়াতে পারেন না। বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে থাকেন আর আমরা গভীর দৃষ্টিতে এক ভাবে তাকিয়ে থাকি আঁধারের দিকে চোখ মেলে। একটি কথা নেই মুখে। একটা অদৃশ্য গুরুভার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। স্বস্তি নেই মনে, চোখে ঘুম নেই, প্রতিমুহূর্তে চেতনা অবশ হয়ে আসতে থাকে। প্রায় মাঝরাতে উদ্বিগ্ন চাপা স্বরে আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে দু'টি-একটি উচ্চারিত হয় শব্দ।

আধঘন্টাও হয়নি ফের পুলিশের দল আর সেই দু'জন সরকারি কর্মচারী মেজদার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ায়। হুংকার দিয়ে ডাকে, শুয়োরের বাচ্চা দরজা খোল, বউদি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে শরীরে কাপড় চড়াতে চেষ্টা করে। থরথর করে তাঁর হাত কাঁপে বারবার, কোমর থেকে কাপড় খসে পড়ে।

ফের সতর্ক খসখস আওয়াজ করে তাঁবুতে লাঠির আঘাত পড়ে, তীক্ষ্ণ অধৈর্য হুংকার শুয়োরের বাচ্চা দরজা খোল, বারবার আঘাত পড়তে থাকে তাঁবুতে।

মেজদা তাঁবুর দরজা খুলতে খুলতে শুধোয়, কে?

তোর বাবা, শালা হারামি দলের পাণ্ডা, বেরিয়ে আয়। মেজদার চুল খামচে ধরে বাইরে টেনে এনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় মাটিতে। হাঁট শালা, ক্যাম্পের অফিসে চল। হাঁট শালা। পিছনে বুটের লাথি পড়তে থাকে। মেজদা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে চলতে থাকেন। পিছনে চলেছে পুলিশের দল আর সরকারি কর্মচারী দু'জন। তাদের মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর ঘৃণার থুথু ছোটে।

ব্যথায় কলজে যেন ফেটে যাচ্ছে। মায়ের পেটের ভাইকে চোখের সামনে বিনা অপরাধে এমন অন্যায় ভাবে মারতে দেখে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারি না। প্রতিবাদের ভাষা বুকের মধ্যে মাথাকুটে মরে। আমি আর তাঁবুতে বসে থাকতে পারি না। ভেতরটা আমার আগুন হয়ে উঠতে থাকে প্রতিবাদে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই পুলিশদলটিকে অনুসরণ করে।

আট-দশটা তাঁবু পেরিয়ে রাস্তার পাশে পুলিশদলটি একটি তাঁবুর সামনে দাঁড়ায়, হাঁকে, কে কে এই তাঁবুর ভেতর কথা বলে, এই দরজা খোল শিগ্‌গির। কারও অপেক্ষা না করে সার্জেন্ট ফড়ফড় করে তাঁবুর দরজা ছিঁড়ে উলটে হাট করে খুলে দিল। দু'জন মহিলা, একজন যুবতী বউ অন্যজন বৃদ্ধা তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। গায়ে কাপড়ও ঠিকমতো দিতে পারেনি।

একজন সরকারি কর্মচারী তিড়িং করে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যুবতীর দিকে আঙুল তুলে বলল, এই মাগি ভয়ংকর। এই মাগির হাতেই তাঁবুর খুঁটি

ছিল। এই সুপারের মাথা ফাটিয়েছে। দেখছ না। যেমন ময়লা রং, তেমনই পেটানো শরীর। একেবারে খাজা-মার্কা মাগি।

চড়া গলায় বলে সার্জেন্ট, এটাকে বাঁধ। নিয়ে চল অফিসে। একজন এসে যুবতীর হাত ধরে টানে।

বৃদ্ধা উঠে তার শরীর ঢাকতে ঢাকতে বলে: কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড রে বাবা। গেরস্ত মানুষ ঘুমুচ্ছে। মাঝরাত্তিরে দুয়ার খুলে মেয়েলোকের হাত ধরে টানাটানি। ছিঃ ছিঃ। এ কী কাণ্ড রে বাবা, ভূ-ভারতে নেই।

ততক্ষণ অন্য এক পুলিশ বসন্তের দাগওয়ালা মুখটা তুলে ওর ছোট্ট কটা চোখ দুটো যেন বিঁধে রাখে যুবতীর শরীরের ওপর। ঠোঁট চেটে চেখে চেখে দেখছে পুলিশটা। ঠিক হ্যাংলার মতো।

বৃদ্ধা ভয় তাড়াতে সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে জোরে পা ফেলে খানিক হেঁটে গেলেন পুলিশ দলটির সঙ্গে, স্বভাব মতো কুঁজো হয়ে নয়— ভারিক্কি চালে তোয়াক্কা না করার ভান করে ভুরু দুটো তবু তাঁর কাঁপতে থাকে।

পুলিশদলটি সরকারি কর্মচারীদের চেনাপথে হেঁটে চলেছে। মেজদার হাতে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। তিনজন পুলিশ পিছনে যুবতীকে ধরে টানতে টানতে চলেছে। যুবতী কিছুতেই ক্যাম্পের অফিসে যাবে না। অথচ পুলিশরাও ছাড়বার পাত্র নয়। যুবতীর গায়ে ব্লাউজ নেই, শাড়ির নীচে শায়া নেই। টানাটানিতে যুবতী অর্ধনগ্ন হয়ে পড়েছে, তবু পুলিশরা তার দু'হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টানে মুখ থুবড়ে পড়ছে। পুলিশ টেনে তুলে ফের হাঁটছে।

মেজদা ভয়ে ভয়ে পুলিশ অফিসারের হলদেটে মুখের দিকে তাকায় আর শোনে তার ক্ষীণ চাপা ভাঙা ভাঙা স্বর। মেজদা বুঝতে পারেন লোকটা একটা দুশমন। ওর দয়ামায়া নেই উদ্বাস্তুদের ওপর।

মেজদা সাহসে ভর করে মরিয়া হয়ে বলেন, আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আমি তো কিছু জানি না।

আরে বাছাধন টের পাবে ক্যাম্পের অফিসে গেলে। বিনয়ে মধুর প্রলেপ দেওয়া বিদ্বেষের সঙ্গে ঘৃণা উগড়ে দিয়ে সার্জেন্ট বলে। সার্জেন্ট একটুকরো হাসি ছুড়ে মারে তাচ্ছিল্যভরে।

মেজদা জোরে জোরে শ্বাস নেন। সমস্ত ঘাড়টা লাল হয়ে ওঠে তাঁর। কঠিন ক্রোধে দু'চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে। বহু উদ্বাস্তু তখন দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। সবাই দেখছে কাকে কাকে ধরে মারতে মারতে ক্যাম্পের অফিসে নিয়ে যাচ্ছে। দেখ দেখ তোরা সবাই। আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখে যা ইচ্ছে তাই জুলুম চালাচ্ছে।

এই ভাগো সব হিয়াসে— দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে ভয় দেখিয়ে তাঁবুর ভেতর পাঠাতে চায়। আর সার্জেন্ট একটুকরো মাংসের সামনে কুকুর যেমন পাগল হয়ে লাফ দেয়, সেই ভাবে লাফাতে লাফাতে মেজদার বুকে মুখে পেটে অবিরাম কিল চড় ঘুষি মারতে থাকে নিষ্ঠুর ভাবে।

উদ্বাস্তুরা অপরাধ করলে জেলে দাও। খবরদার আর মারবে না— ভিড়ের মধ্য থেকে এক একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

চারদিক থেকে সমর্থন শোনা যায়। অমন করে মারছ কেন শুনি? আগে অপরাধ প্রমাণ হোক। সত্যি মানুষটা দোষী কি না? খবরদার। প্রতিবাদের অনেক কণ্ঠ শোনা যায়।

নীলচোখ পুলিশ দ্রুত মেজদাকে টানতে টানতে চলতে থাকে।

শিবির আর ক্যাম্প সুপারের অফিস, মাঝখানে বিশটা বাড়ি সাঁওতালদের তারাও পথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পর চাপা স্বরে ফিসফিস করে কথা বলছে। এমন একটা ভালমানুষকে এ ভাবে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা করুণ সহানুভূতি তাদের চোখেমুখে ফুটে বেরোতে থাকে।

ক্যাম্পের অফিসের বাইরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছেন উদ্বাস্তুরা। তাঁরা দর্শক না অভিযুক্ত বোঝা যায় না। অফিস তাঁবুগুলির উঠোনে পিটিয়ে বুট দিয়ে গুঁতিয়ে এক যুবতীকে জেরা করছে পুলিশ। তার অদূরে একজন উদ্বাস্তুকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রেখেছে। দু'জন সরকারি কর্মচারী একনাগাড়ে মেরে চলেছে ধরে আনা তিনজন উদ্বাস্তুকে। তার মধ্যে একজন মধ্যবয়সি নারী। যারা মারছে তাদের মুখে রাগের কোনও চিহ্ন নেই, বলার ভঙ্গিও ঠাণ্ডা। অথচ অভ্যাস মতো লম্বা লম্বা শক্ত হাত দুটো দিয়ে কিল চড় ঘুষি মেরে চলেছে মানুষগুলোকে। হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই সরকারি কর্মচারীগুলি মেরেই চলেছে।

দু'জন পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে ধেয়ে আসে। বলে: ভাগো সব এখান থেকে। শালা বেজম্মারা, মাগনা খেয়ে খেয়ে গায় তেল জমেছে। ভাগ সব এখান থেকে, নইলে হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব। উৎসুক জনতাকে দু'জন পুলিশ তাড়িয়ে দিয়ে আসে বেশ কিছু দূরে।

ক্যাম্প অফিসের উঠোনে দেখি বিশ-পঁচিশজন উদ্বাস্তুকে হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে বসিয়ে রেখেছে। মেরে মেরে তাঁদের চোখমুখ ফুলিয়ে দিয়েছে। কারও কান দিয়ে চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আঘাতের ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

ফের একজন উদ্বাস্তুকে টেনে সরিয়ে আনে উঠোনের মাঝে। মাটিতে পা ঠুকে গাল দিতে দিতে পুলিশটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। দুম করে একটা ঘুষির আওয়াজ শোনা যায়। আর একটা মস্ত ঘুষি এসে একেবারে মানুষটাকে শুইয়ে ফেলে মাটিতে। বুট-পরা পুলিশের এলোপাথাড়ি লাথি এসে পড়ে উদ্বাস্তুটির মাথায় বুকে পিঠে পাঁজরে— সর্বত্র।

মেজদার সঙ্গে ধরে আনা যুবতীকে সার্জেন্ট টেনে আনে উঠোনে। সার্জেন্ট নিজেই এলোপাথাড়ি লাথি মারতে থাকে প্রশস্ত নিতম্বে মাথায় পাঁজরে। লাথি খেতে খেতে উলঙ্গ যুবতী মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বুটের আঘাত তবু থামল না।

শিবির থেকে শ'খানেক মানুষ তখন এসে জড়ো হয়েছে। জনতা দু'দল হয়ে যায়। একদল অফিসের সামনে গিয়ে উদ্বাস্তুদের ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকে, অন্য দল আঁধার মুখে গজরায়, ওরা যদি অপরাধী দোষী হয়ে থাকে আদালতে পাঠাও অন্যায় ভাবে ঠেঙানো যাবে না। উদ্বাস্তুদের আদালতে পাঠাতে হবে, না-হলে ছেড়ে দিতে হবে— অন্যায় ভাবে ঠেঙাতে দেব না।

পুলিশ প্রশাসন খুঁজে পায় না দোষী অপরাধীকে, তারা হাল ছেড়ে দিয়ে বেঁধে আনা উদ্বাস্তুদের বাঁধন খুলে ছেড়ে দেয়। বাইরে জনতার চিৎকারও নরম হয়ে আসে। এখন যেন সন্ধির পথ খোঁজে উভয়পক্ষ। একটা করুণ আশাহীন আকুতির স্বর মধ্যরাতের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অস্ফুট গুঞ্জনের তলায় ডুবে যায় সব। পুলিশ উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অর্ধ উলঙ্গ যুবতীর হাত ধরে টেনে তুলে জনতার হাতে দিয়ে দেয়। উদ্বাস্তু জনতা যুবতীকে হাতে হাতে তুলে ধরে শিবিরের দিকে চলে যায়। এত কিছু ঘটার পরেও দারুণ একটা নৈরাশ্যে আমার কলজেটা অবধি শুকিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ের কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে মনের আকাশটা। পরমুহূর্তেই মেঘের বুককে শত দীর্ণ করে হৃদয় জ্বলে ওঠে সহস্র শিখায়। নতুন অনুভূতি ডালপালা মেলে, ফুলে ফলে আলোয় ভরে উঠতে চায়। পা বাড়াই শিবিরের দিকে, সঙ্গে মেজদাকে নিয়ে।

হুবহু এমন একটি ঘটনার কথা কেউ ভাবেনি। কেউ ভাবতে পারে না। কেউ ভাবতে পারেওনি। তবু যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। না-ঘটে হয়তো উপায় ছিল না। মানুষের ধৈর্যের তো একটা সীমা পরিসীমা আছে। আছে তার সহ্যেরও শক্তি। একদিন না একদিন তা টুটবেই। মানুষের

ভেতরের ক্ষোভ ফেটে পড়বেই।

রাতের ঘটনা যেন রাতেই শেষ হয়ে গেছে। সূর্য উঠে এসেছে মাথার ওপরে। ঝড়-বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে চাষের খেতখামার থেকে। অসহায় নিরুপায় মানুষজন লরিতে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে উঠে পড়েছে। একটু পরেই লরিগুলি যে-যার গন্তব্যে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করবে।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি উদ্বাস্তু শিবিরের পরিত্যক্ত উঁচুনিচু মাঠটা শূন্যতায় যেন ধুঁকছে। ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকিয়ে মনে হল এক রাতেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জনপদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর ধ্বংসের শেষচিহ্ন শবের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

বিষাক্ত ক্ষতে পুঁজ

দগদগে ঘা বুকে নিয়ে আমরা ফের উদ্বাস্তু হলাম। ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবিরকে আমি চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু ছোটবেলার সেই শিবিরবাসের যে যন্ত্রণা পেয়েছিলাম, তা আমি নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলব কী করে? আমৃত্যু সে যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট রক্তে বহন করে চলেছি।

ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইড ক্যাম্পে ছিলাম দু'বছর। আমার মেজদা, মেজবউদিরা ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর। এরই মধ্যে জীবন যতটা শিকড় বসিয়েছিল মাটিতে, তা টেনে ছিঁড়ে উপড়ে নিতে অনেক রক্ত ঝরে গেল। খাটানো তাঁবুর দড়ি খুলে গুটিয়ে নিয়ে মোট বাঁধা হল। খুঁটি-গোঁজ উপড়ে বাঁধা হল বোঝা। বোঁচকাবুঁচকি বেঁধেছেদে টেনে তুললাম লরিতে। পুলিশের বুটের লাথি, হাতের কিল চড় ঘুষির আঘাতে মেজদার দেহ এবং মন ক্ষতবিক্ষত, তাঁর নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। মেজবউদি আর আমি প্রাণপণে খেটে গোটা সংসারটা টেনে যখন লরিতে তুললাম মনে হল শ্বাস ঘন হয়ে আসছে। মৃত্যু আসতে আর দেরি নেই। এক অনিশ্চিয়তার আঁধার পিছনে ফেলে সীমাহীন আর এক অনিশ্চয়তার পথের স্রোতে আমরা আবার ভেসে চললাম।

সাতটা উদ্বাস্তু পরিবার এক-একটা লরিতে। তাঁবু, তাঁবুর খুঁটি, গোঁজ আনা মুগুর এবং সাতটি সংসারের যাবতীয় মালপত্র ঠাসা লরিতে মানুষজনের বসবার তো দূরের কথা, এক ফোঁটা দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। শালের খুঁটি আর বোঁচকাবুঁচকির ওপর লরির ডালা ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলতে শুরু করলাম।

লরির প্রতিটি মানুষকে এমনি ভাবেই চলতে হল। যাওয়া মানে কোনওমতে প্রাণটা নিয়ে ভাণ্ডারহাটি থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। গত রাতে যা ঘটে গেছে, তার পরে প্রতিটি মুহূর্ত মনে হয়েছে— এই বুঝি আরও ভয়ংকর বিপদ লাফ দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে, জীবনটাই নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাই ভয়ে ভয়ে লরিতে উঠে আমরা লরি চালাতে তাড়া লাগালাম। লরি চলতে শুরু করল।

আমরা জানিনে আমরা কোথায় কত দূরে যাচ্ছি, কোন উদ্বাস্তু শিবিরে। সরকারি কর্মচারীরা ইচ্ছা করেই তা আমাদের জানায়নি— পাছে আমরা বেঁকে বসি। লরির চালক জেনেও আমাদের বলেনি। মাল মানুষ বোঝাই লরি চলতে শুরু করল পিচঢালা পাকা রাস্তা ধরে।

মেঘলা আকাশ। অচেনা রাস্তা। সকালের সূর্য মেঘের আড়ালে। গ্রামদেশে রাস্তায় তাই মানুষজন বড়-একটা দেখা যাচ্ছে না। সবুজের আচ্ছাদনে ঢাকা কত গ্রাম, জনপদ পেরিয়ে লরি ছুটে চলেছে। কিন্তু আমাদের মনে দেহে প্রাণে কোনও সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, প্রতিটি মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, গতরাতের ভয়ংকর ঘটনায় অনেকেই জখম হয়েছে, আহত হয়েছে, অনাদরে অবহেলা অত্যাচারে ঘৃণায় বিদ্বেষে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া প্রাণ ক'টি অনিশ্চিয়তার খরস্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে চলেছে। মন আমাদের বহুদিন হল মারা গেছে। প্রাণ মৃত্যু পথযাত্রী, জীবন ইতিহাসের প্রবল প্লাবনে একবার ডুবছি আর একবার ভাসছি— ফের ডুবে বাঁচাবার জন্য হাত-পা ছুড়ছি।

ভোরবেলা রওনা হয়েছিলাম। এখন প্রায় দুপুর হতে চলল। হেমন্তের বৃষ্টি ভেজা রাস্তা দিয়ে বোঝাই লরিটা ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর করতে করতে চলেছে। গাড্ডা-ভরা রাস্তায় মাঝে মাঝে লরিটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও টাল সামলে নিচ্ছে। ভেজা বাতাস। প্রতিমুহূর্তে গাড্ডা থেকে কাদা ছিটকে উঠছে। লোকালয় পেরিয়ে লরি মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলা পিচঢালা রাস্তায় চলেছে।

হেমন্তের সুস্পষ্ট কাকগুলি ব্যস্ত ভাবে রিক্ত খেতের আলে আলে বিষণ্ণ মনে যেন ঘুরে বেড়ায়। পাগলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা ঝাপটায় আড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারা কিন্তু টাল সামলাতে পারে না। উলটে উলটে পড়ে। পালকগুলো আলুথালু হয়ে যায়। অলস ভাবে ডানা ঝাপটিয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়। ধানের ক্ষেতের আলে গিয়ে বসে, তার পর ফের উড়ে যায়।

লরির একটা লোহার রডে বুকের হাড় আমার ঘষে চলেছে। হাড়ে ব্যথা পাচ্ছি অথচ নড়তে চড়তে পারছি না। জীবনের আশা ধিকিধিকি বুকের মধ্যে জ্বলছিল, আঘাতে তা শিখায় শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গত কয়েক

বছরের তিক্ত ঘটনা নদীর স্রোতের মতো বয়ে যায় স্মরণের কূল ছাপিয়ে। প্রত্যেকটি ঘটনার ঘোলা কাদা জলের ঢেউয়ের আঘাতের সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটাই জড়িয়ে রয়েছে। জন্মভূমি মাটির যে জীবন শিকড় ছড়িয়ে প্রাণরস শুষে নিয়ে আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছিল শান্তিতে, সুখে। সে আজ শিকড় উপড়ে তোলা উদ্বাস্তু, কোথাও প্রাণের শিকড় বসাতেই পারছে না। কালস্রোতে বারবার ছিটকে পড়ছে অনিশ্চয়তার আঁধারে জলোচ্ছ্বাসের ভয়ংকর ঢেউয়ে ঢেউয়ে। বারবার শিকড় উপড়ে জীবনটাই দড়কচা মেরে যাচ্ছে।

লরি চলেছে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারে সেই গতিতে। কিন্তু আমাদের সময় যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। কোথা দিয়ে কখন যে কী হল যেন ঠাহর করতে পারি না। কেন জানি না, কেবল একটি পুরনো ব্যথা গুমরে গুমরে ওঠে— কোন অতীতের আঁধার ঠেলে বহুদিনকার ভুলে যাওয়া দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষতটা নতুন করে ফের কাঁচা হয়ে ওঠে, পুঁজরক্তে মাখামাখি হয়ে যায়।

ওই খড়বিচুলির গাদা, ওই ধান খেত, রোয়ার মাঠ, নিকানো উঠোন, ঘরবাড়ি গোলা আর কোনওদিন হবে? লরির ভেতর থেকে কার দীর্ঘশ্বাস ওঠে, শুধু চাপা কান্নার শব্দগুলি হাওয়ায় দুলতে থাকে, কারও মুখে কথা নেই— কেবল চেতনার বেদনা জোর ধাক্কা দেয় বুকে, কী ছিল আর ভেঙেচুরে কী ছত্রখান হয়ে গেল?

পুকুরপাড়ে নারকেল সুপারি গাছের সারি, ঘরের চালে লাউ কুমড়োর লতা কি আর প্রাণের আলো ছড়াবে? পুরনো ব্যথা তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধতে থাকে— যেন মাউইমা বাতাসের বুক চিরে কান্নার ধনি ছড়িয়ে দেন।

রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ। লরি বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আর উঠছে। অসম্ভব ঝাঁকুনিতে হাড়ের সঙ্গে ঘষে চলেছে লরির ডালা। কেউ কেউ হুঁ, আঃ শব্দ করে কাতরে চলেছে। নদীর উঁচু সেতুটি পেরিয়ে যেতেই অঘোর বাইনের ছেলেটি সরে এল আমার বাঁ দিকে। বয়স আন্দাজ করেও বোঝা যায় না। আমার থেকে বেশ বড়ই হবে, কিন্তু একেবারেই বেঁটেখাটো।

ছেলেটাকে আস্তে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই তোর নাম কী রে? বল না তোর নাম কী? আঁধারে ওর চেরা গলায় শুনতে পাই, গ্যাঁ গ্যাঁ করে উচ্চারণ করছে— 'খাম্বা' আমার নাম। ধন্দ লাগল আমার, এমন চেহারা মিলিয়ে এই নামটা কে রেখেছে? খাম্বা তো খাম্বাই একটুও ভুল হয়নি।

রাস্তাটা বাঁক নিতেই খালাসি না লরির চালক তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, এত জোরে চিৎকার করল যাতে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে যায়। সামনে

রেললাইন, সামনে রেললাইন। সাবধান। মাথা সাবধান।

ধীরে ধীরে লরি রেললাইন পার হল। সেতুটেতু কিছুই চোখে পড়ল না। তবু আমরা আড়ষ্ট বসে থাকি। আঁধার রাতের সীমাহীনতার মাঝে কোথায় কুকুর ডেকে ওঠে, গভীর আর্তনাদ বাতাসে আছড়ে পড়ে। আর তখনই মনে হল অদূরে কোথাও জনপদের পদধ্বনি আছে, জীবন আছে। থেকে থেকে প্রাণের অস্ফুট সাড়া ভেসে আসছিল।

দূরে কুয়াশা কেটে স্পষ্ট হচ্ছে মাঠ, রোয়ার খেতের উঁচু আল, শিশিরভেজা টাটকা ধান গাছের গোড়া, সারি সারি খেজুরগাছ। তাদের গোড়ায় কাঁটানটের ঘনজঙ্গল। মাঠের গাঁ-ঘেঁষে ক'খানা খড়ের ঘর, আঁকাবাকা মেঠো পথ— পথ বেয়ে একজন মানুষ ধীরপদে হেঁটে চলেছেন। কালো কুচকুচে এঁটেল মাটির মতো শরীর, খালি গা, খালি পা— যেন পাথর কুঁদে গড়া মূর্তি। তার মাথার উপর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে ডানা মেলে পাশাপাশি দু'টি পাতিকাক। তাদের পিছু পিছু দৃষ্টি ছুটে যেতেই খোলা চোখের মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়ল— এক অজানা উদ্বাস্তু শিবির। উঁচু রেললাইনের দু'ধারে নিচু খাদে সারি সারি মোম-লাগানো হলদে রঙের তাঁবু। বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে ওঠে।

কে যেন কাকে কুয়াশার আড়াল থেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, দাদা ওইটা কি উদ্বাস্তু শিবির? গলা বাড়িয়ে পাথর কুঁদে গড়া মানুষটি উত্তর দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো বলাগড় উদ্বাস্তু শিবির।

ভুরু কুঁচকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখখানা কেমন হয়ে ওটে, মনের ভেতর চলা লড়াইটা থামিয়ে পিসতুতো দাদা বলেন, ভাইডি আমরা এসে গেছি। ওই তো উদ্বাস্তু শিবির— ভিটে ছাড়াদের কারাগার।

রেললাইনের পাশে নিচু খাদের বুকে ছড়িয়ে আছে শিবিরটা, কোনা উঁচু বেঢপ মাথাটা উঁচিয়ে যেন একটা কাটাছেঁড়া মাকড়সার শরীর নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝখানে বলাগড় রেলস্টেশন। দু'দিকে ছুটে গেছে কাটোয়া ব্যাণ্ডেল রেললাইন। চারদিকে তারই গা-ঘেঁষে উঁচু মাটির ঢালুতে খাটানো তাঁবুগুলি কুঁজো হয়ে গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ঘন তাঁবু গুলির ওপর দিয়ে লাল রঙের স্টেশন বাড়িটি যেন মরুদ্যান।

আমাদের ক্লান্ত লরিটা এঁকেবেঁকে গড়িয়ে গড়িয়ে রেললাইনের সংকীর্ণ গেট পেরিয়ে সেই উদ্বাস্তু শিবিরের গা-ঘেঁষে রেলের খালি মাঠটায় গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠের অসমান মাটি পাথরকুচির ওপর আমাদের প্রায় ঢেলে ফেলে দিয়ে লরিটা ফিরে চলে গেল। বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে আমরা সেখানেই পড়ে রইলাম— সূর্য

ওঠার অপেক্ষায়। গোনাগুনতি সাতটি পরিবার। তার ছোট বড় সাঁইত্রিশ জন মানুষ খিদেতে ক্লান্তিতে কষ্টে বেদনায় শেষসম্বল আগলে পড়ে রইলাম— যেন যাযাবর অজানা ভূখণ্ডে।

খালি মাঠটার বাঁ দিক দিয়ে রেলের গেট পেরিয়ে আসা পিচঢালা রাস্তাটা স্টেশন ছোঁয়া রাস্তাটা ডান দিকে রেখে এঁকেবেঁকে চলে গেছে শ্রীপুর বাজারে, নাওনগরীতে। ওই পাকা রাস্তার গায়ে স্টেশন রোডের মুখে সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়। ক্যাম্প-সুপারের অফিসটি উঁচু ভিটের ওপর। গাছগাছালির ছায়ায় মনোরম। অদূরে রাস্তার কোল ঘেঁষে উদ্বাস্তু শিবিরের পাঠশালাটি, খুঁটির ওপর তাঁবুর চাল। খোলামেলা হলঘরের মতো। পিছনে ধানক্ষেতের জমি বহুদূর বিস্তৃত।

এক সময় কুয়াশার বেড়া ঠেলে ফাঁক করে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে মাঠের ওপর। পা মাড়ানো শুকনো হলদে ঘাসে ঢাকা পথটি ধরে কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন। চওড়া কপাল, চোখ ছোট, টাকমাথা, ডান পাটা টেনে হাঁটছেন, মুখের রংটা হলদেটে, চোখের চারধারে মিহি বলিরেখা। হাতে মোটা বাঁধানো খাতা। তিনি সোজা এসে কড়া নজরে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। কালো মোটা পুরু ভুরু জোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা পাশদুটো কাঁপিয়ে হাঁকেন, এই যে ব্যাটারা, এদিকি ইদিকি আয়। লোকটা বারদুই গলা খাখারি দিয়ে এক এক করে সাতটি নাম ডাকেন। প্রতিটি পরিবার কর্তার নাম উচ্চারণে এমন তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা ছুড়ে মারেন— মনে হয় যেন পচা থুথু ছিটোচ্ছেন। গলায় কফ-জড়ানো স্বরে নাম ডাকা শেষ হল। উদ্বাস্তু পরিবারের প্রধানরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। আর তিনি চরম ঘৃণাভরে পরিবার প্রধানের টিপসই নিয়ে নেন খাতায় এক এক করে।

লোকটা খাতা বন্ধ করে চলে যাওয়ার ভঙ্গি করে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে কপালের ভুরুদুটো উপরে তুলে উঁচু আর মোটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মাড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, এই তোরা শোন, এই ক্যাম্প-অফিস থেকে টাকা নিয়ে যাস। টাকা নিয়ে যাস বুঝলি হাড় হাভাতেরা। তোরা টাকা নিয়ে যাস। লোকটা মাতালের মতো টলতে টলতে পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মনে হয় উলটো পালটা ভাবতে ভাবতে সুপারের অফিসে ঢুকে গেলেন।

বাস করবার জায়গাগুলিতে গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে উদ্বাস্তুদের তাঁবু। ধারেকাছে কোথাও তাঁবু খাটানোর একফালি জায়গা পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে মেজদা আর আমি সঙ্গে পিসতুতো দাদা আর আমাদের ছোট ভগ্নিপতি তিনটি তাঁবু খাটানোর মতো একটু সামান্য উঁচু ডাঙা জমি পেলাম

মাঠের রোয়া খেতের অদূরে। দুই নম্বর নিচু প্ল্যাটফর্মের সমান্তরালে রেলের একটি পুকুর, তারই পুব মাথায় প্রায় জলা জায়গায় সারাদিন খেটে মাটি তুলে পোতা বাঁধা হল। কিন্তু সেদিনও আমরা ফাঁকা মাঠে পড়ে রইলাম। কাঁচা মাটির পোতাটি একটু রোদে শুকানোর জন্যে। তাঁবু মুড়ি দিয়ে সারারাত তিনটি পরিবার পড়ে রইলাম মাঠে। যাযাবরও মনে হয় এর থেকে ভাল থাকে। আমরা এমন ভাবে দু'টি রাত কাটালাম, তাঁবু মুড়ি দিয়ে আকাশের নীচে শিশির ভেজা ঘাসের ওপরে।

এমন একটা জায়গায় এসে তাঁবু পাততে হল কোনও কিছুর সঙ্গে যেন আমাদের খাপ খাচ্ছে না। গাছগাছালি শূন্য মাঠের মধ্যে জলাভূমিতে প্রচণ্ড রোদ সারাদিন ঝাঁ ঝাঁ করে তাঁবুর মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। উপায় না পেয়ে রেলস্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল অশ্বত্থগাছটির ছায়াই শেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। রোদ চড়বার আগেই রোদে পোড়া মোম-লাগানো তাঁবুর গরমে আধসেদ্ধ হওয়া মানুষ ছুটে গিয়ে সেই অশ্বত্থগাছের ছায়া দখল করেন। ছায়া নিয়ে যেন কামড়াকামড়ি পড়ে যায়। যতক্ষণ সূর্য হেলে না পড়ে সকলে অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে শুয়ে জীবন প্রাণ বাঁচিয়ে রাখেন।

নতুন খাটানো তাঁবুর মাটির মেঝেতে শুয়ে মেজদা গত একটি মাসের প্রত্যেকটা দিনের দিকে তাকান। অবাক হয়ে ছেঁড়া বালিশ থেকে মাথা তুলে চারিদিকে তাকান। ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্প ছাড়বার আগের দিনের সেই ভয়ংকর সন্ধ্যার কথা ভেবে মনটা তাঁর কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া মাটিতে, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিল। বুটপরা লাথিতে পিঠের চামড়া থেঁতলে গিয়েছিল। মনের ভেতর ধিকিধিকি এখনও আক্রোশের আগুন জ্বলছে। জীবনে এই প্রথম আঘাত খাওয়া, মার খাওয়া— মন থেকে মুছে তিনি ফেলতে পারেন না, কিছুতেই পারেন না।

এত বিপদ, এত ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও কী করে এ জীবনকে সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়— তাই ভাবি আর আঁধারে হাতড়ে-চলা মানুষের মতো পথ খুঁজে না-পেয়ে ব্যথার শেল বুকে এসে বেঁধে— ঘুম আর আসে না দু'চোখে। ছিন্নমূল জীবনে পাঁজরার নীচে গুমরে-থাকা ঘৃণার বিদ্বেষের অবহেলার অন্যায় অত্যাচারের অসন্তোষটা যেন নাড়া খেয়ে আজ আগুন হয়ে উঠেছে। ক্ষোভের আগুন কিছুতেই নেভে না। চোখ জ্বালা করে, দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না।

দুটো উদ্বাস্তু শিবিরে ইতিমধ্যে আমি কাটিয়ে এসেছি। এই তৃতীয় উদ্বাস্তু শিবির বলাগড়ে এসে আমার মনে হল এখানেও ঠিক একই গড্ডালিকা স্রোতের

বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও পথই হবে না। জীবনের অন্তহীন অপচয় অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুরতা আর ধারাবাহিক অনিশ্চয়তার আঁধারে তলিয়ে যাওয়াই আমাদের ভবিতব্য। এ দেশের মাটিতে কিছুতেই উদ্বাস্তুদের স্থায়ী শিকড় বসাতে দেবে না এ দেশের সরকার। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে উদ্বাস্তুরা সকলেই নিম্নবর্ণের মানুষ। তাই ভারত যুক্তরাষ্ট্রে তারা অবাঞ্ছিত অবহেলিত ঘৃণার পাত্র। প্রশাসন তাই পূর্ববাংলার মানুষদের জন্য কোনও সম্মানজনক জায়গা কিছুতেই এ দেশে দেবে না, দেবে না ভাল ভাবে বাঁচতেও।

উদ্বাস্তুদের দুঃখকষ্ট দুর্দশা বিপন্নতা অসহায়তার শেষ ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতেন। আর এই লড়াইয়ে আমার সঙ্গি হিসেবে বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে ছিল হারাধন মণ্ডল। মাথাটা একদিকে চাপা, হালকা চেহারা। দেখে মনে হয় একটা বটফল। টসটসে টোপা অনেকদিন অবহেলায় পড়ে থেকে গায় তার ছাতা ধরেছে। হলদে মুখ ছুঁচলো একটা ধারালো কাঠি দিয়ে ছ্যাঁতলা-পড়া দাঁতের গোড়া হরদম খোঁটে সে। সামান্য সবুজ ছোট চোখ দুটোয় অমায়িক হাসি সব সময় মেখে থাকে। আর গলার স্বরটি হামেশাই বেশ মোলায়েম ভদ্র। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে হারাধন ছিল আমার সঙ্গী সহযোদ্ধা, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে।

খাতা হাতে ক্যাম্প অফিসের এক সরকারি কর্মচারী খানাতল্লাশি করতে এসেছে, তারই পিছন পিছন এসেছিল হারাধন। সরকারি কর্মচারী আমাদের পরিবারের লোকজন গোনাগুনতি করে চলে গেল। হারাধন তখনও আমাদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের তাঁবুর পাশেই জলা— সেখান থেকেই পচা একটা গন্ধ আসছিল। অথচ সরকারি কর্মচারীটি সে দিকে ফিরেও তাকাল না।

হারাধনই প্রথম কথা পাড়ল, দেখলে তো ভাই, এক নজরেই বোঝা যায় লোকটা কুত্তার মতো কেমন ভাবে দু'হাত দিয়ে ঘৃণা ছিটিয়ে গেল। এগুলো হল হাড়ে হারামদাজা, পিশাচ।

তা তো দেখলাম ভাই, কিন্তু উপায় কী। আমিই জবাব দিই ওর কথার খুব স্বাভাবিক ভাবে।

ওরা কেউ মানুষ না। সব লোহার হাতুড়ি। উদ্বাস্তুদের বেহুঁশ করে রাখা ওদের কাজ। স্রেফ যন্ত্র। ওদের দিয়েই তো আমাদের মতো মানুষদের শায়েস্তা করে। এমনই শায়েস্তা করে যাতে আমরা একেবারে ওদের হাতের পুতুল বনে যাই। জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে না পারি, ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারি। আমরা হলাম ওদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার।

এ ভাবেই হারাধনের সঙ্গে পরিচয়। হারাধন আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায় ওদের তাঁবুতে। আসা যাওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আস্তে আস্তে মাকড়সার জাল বোনার মতো করে আলাপের জাল বুনে চলি আমরা।

সে দিন শ্রীপুর বাজার থেকে ফিরলাম। পথেই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের গণ্ডগোলের কথা শুনতে পেলাম। গণ্ডগোল একটা নলকূপের জল নেওয়া নিয়ে। এবং তা নিয়ে চাপা ঝগড়ার আগুন বেশ কিছুদিন ধরেই ধিকিধিকি জ্বলছিল। এ দিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বলাগড় শিবিরে হাজার হাজার মানুষের জল ব্যবহারের ও খাবার জন্য নলকূপ ছিল খুবই অল্প এবং সরকারি নলকূপগুলি যাই-তাই করে বসিয়ে দিয়েই ঠিকাদারারা চলে যেত। কয়েক মাস পরেই নলকূপে জল উঠত না, অল্প পাইপ বসিয়ে নলকূপ করলে যা হয় তাই হত। জল ছাড়া মানুষ তো বাঁচতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই তৃষ্ণার জলটা আনতে উদ্বাস্তুরা কাছাকাছি গ্রামের স্থানীয় মানুষের জন্য পোঁতা নলকূপে জল আনতে যেত। স্থানীয় গ্রাম ঘোষপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ বাড়ির সামনে ছিল সরকারি একটি নলকূপ। এই নলকূপে প্রচুর জল উঠত। আর জলটাও ছিল মুক্তোর মতো পরিষ্কার টলটলে আর বেশ সুস্বাদু। গরমকালে একেবারে মাটির কুঁজোর জলের মতো ঠাণ্ডা।

এই জল উদ্বাস্তু মহিলারা কলসি কাঁখে আনতে যেতেন। স্থানীয় গ্রামের মানুষজন উদ্বাস্তুদের সবাইকে ছোট জাত, নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবেই প্রচণ্ড ঘৃণা করত। ফলে ওই নলকূপ থেকে জল আনতে গেলে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দয়াবশত নলকূপটি স্থানীয় মানুষ ছেড়ে দিলেই জল নিতে পারত। উদ্বাস্তু মহিলা নলকূপ চেপে জল নেবার পর স্থানীয় মানুষ নলকূপ ভাল করে ধুয়ে জল নিত। ছোট জাত উদ্বাস্তু মানুষরা নলকূপ থেকে জল নেওয়াতে নলকূপটাই যেন অপবিত্র হয়েছে। শুধু তাই নয়, উদ্বাস্তু মেয়েদের ছায়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের গায়ে পড়লে তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যেত।

তা ছাড়া স্থানীয় মানুষ দেশভাগকে ছিন্নমূল মানুষদের সমস্যা বলেই দূরে ঠেলে রেখেছিল এবং ‘উড়ো আপদ’ বলেই তাদের দেখত। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা কোনওদিন উদ্বাস্তুদের সুনজরে দেখেনি। বরং হাটে-বাজারে, মেলায় রেলগাড়িতে সর্বত্রই স্থানীয় অধিবাসীরা ঘৃণা করেছে, তাচ্ছিল্য করেছে, অত্যাচার করেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এও মনে করেছে যে, এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসিয়েছে। তার জন্যই উদ্বাস্তুরা ভারতের সর্বত্রই অন্যায় ভাবে মার খেয়েছে, হেনস্থা হয়েছে, বিদ্বেষ-বিষে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়েছে।

গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড খরা। রোদের তেজে খা খা করছে গোটা উদ্বাস্তু শিবির। অনেক নলকূপেই জল নেই। মানুষ তৃষ্ণায় ছটফট করছে। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়েছেন স্থানীয় গ্রামের ওই নলকূপে। অসাবধানে মহিলাটি একজন ব্রাহ্মণ মহিলাকে ছুঁয়ে দিয়েছেন জল নেবার সময়। আর যায় কোথায়, ব্রাহ্মণ মহিলাটি তেড়ে এলেন উদ্বাস্তু মহিলাটিকে মারতে, বচসা শুরু হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ মহিলাটির স্বামী ছুটে এসে উদ্বাস্তু মহিলাটির কাঁখের কলসিটি প্রথমেই ভেঙে দিলেন আর ব্রাহ্মণ মহিলা উদ্বাস্তু মহিলাটিকে অন্যায় ভাবে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন। দুই মহিলা যখন মারপিট করছিলেন, ব্রাহ্মণ মহিলার স্বামী ছাড়িয়ে দেওয়ার নাম করে উদ্বাস্তু মহিলাকে দু'-ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। উদ্বাস্তু মহিলার ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে, হাত-পায়ের অনেক জায়গায় কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সেই অবস্থায় মহিলাটি প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে থাকেন উদ্বাস্তু শিবিরের দিকে।

দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি অশ্বত্থ তলায় বিশাল ঘনছায়াটা ছিল উদ্বাস্তু মানুষের আশ্রয়স্থল। অশ্বত্থগাছটাই ছিল মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো আর রোদে গরমে দগ্ধ শত শত মানুষদের সান্ত্বনাগৃহ। অসহ্য গরমে রোদের হাত থেকে বাঁচতে বহু মানুষ আমরা গাছতলায়। আচমকাই ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে ছুটে এলেন সেই মহিলা অশ্বত্থতলায়। মহিলার মুখে অন্যায় অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বর্ণনা শুনে এবং তাঁকে দেখে ক'জন উদ্বাস্তু যুবক ছুটে গেলেন ঘোষপাড়া গ্রামের সেই ব্রাহ্মণবাড়িতে।

স্থানীয় মানুষের সঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষদের 'দা-কুমড়ো সম্পর্ক' তো চলছিল। এই ঘটনায় আগুনে ঘি পড়ল। স্থানীয় মানুষ সব এককাট্টা হয়ে উদ্বাস্তুদের আক্রমণ করল। উদ্বাস্তুরাও অন্যায় অবিচারে আঘাতে আঘাতে ঘৃণায় বিদ্বেষে মরিয়া হয়েছিলেন তাঁরাও এর প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

উদ্বাস্তুদের দিকে রেললাইন। রেললাইনের পাথর আর নুড়ি জড়ো করে তাই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকলেন। উদ্বাস্তুরা পাথর আর নুড়ি ছুড়তে থাকলেন স্থানীয় মানুষদের লক্ষ্য করে। দু'পক্ষে তুমুল মারামারি শুরু হয়ে গেল।

উদ্বাস্তুদের সীমানায় পাথর আর নুড়ি পাহাড় করে রাখা হয়েছে। এক একটা পাথর নুড়ি ঢিবিকে ঘিরে উদ্বাস্তু নারীপুরুষের দঙ্গল দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে স্থানীয় মানুষ দল বেঁধে জড়ো হয়েছে তাদের হাতে নানা মাপের চকচকে ছুরি। খালি গা, রুক্ষ্ম চেহারা সব উদ্বাস্তু মানুষ কাজিয়া দাঙ্গায় নির্ভীক। তাঁরা রেললাইনের পাথর-নুড়ি নিয়ে প্রস্তুত। ভয়ংকর দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। অবস্থা

যখন তুঙ্গে থানার পুলিশ দারোগা এসে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। রক্তপাত আর হল না।

এই ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত থাকায় বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের বহু মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। জানাশোনা আর অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠল।

এদের মধ্যে একজন ছিলেন মুকুন্দমাস্টার। কিন্তু কোনওদিন তিনি উদ্বাস্তু শিবিরের পাঠশালায় পড়াতে ঢোকেননি। ম্যাট্রিক পাশ লেখাপড়া জানা লোক। শিবিরের মানুষজন তাঁকে মানে। মানুষটি খাঁটি নমঃ অর্থাৎ নমঃশূদ্র বাঙালি। তাঁর বেশভুষা, কথাবার্তা চেহারায় নিষ্ঠাবান বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি বেশি লম্বাও নন আবার খাটোও নন। দোহারা চেহারায় একটা ব্যক্তিত্ব আছে। মানুষটি দেখতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ঠোঁট দু'টি পাতলা। সামান্য ভুঁড়ি। মাথার পিছনে সামান্য একটু টাকের আভাস। সারা শরীর কালো লোমে ঢাকা। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধিয়ে হাঁটেন। তাঁর চোখ দুটোয় বুদ্ধির দীপ্তি। কিন্তু উদ্বাস্তু শিবিরে অনিশ্চয়তার জীবনে হতাশার ছাপ পড়তে শুরু করেছে।

মুকুন্দমাস্টারের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে একই থানায় ছিল। তাই অতি সহজে আর তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে পরিচয় মেলামেশা আর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে এসে আমরা তাঁর পরামর্শ মতো চলাফেরা করতাম। কারণ তিনি বহুদিন ধরে বাস করছিলেন এই শিবিরে।

মুকুন্দমাস্টারের গলার স্বরটা চাপা। কথা বলেন মেপে মেপে। কাটাকাটা প্রতিটি শব্দ খুব সাবধানে যেন ওজন করে ব্যবহার করেন। কোনও পাঁচমিশালি বিষয়ে তাঁর কোনও আগ্রহই ছিল না। তাঁর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য জোরালো এবং প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। কথা বলতে বলতে প্রায় তিনি হাতের আঙুল তুলে বিষয়বস্তুটি প্রাঞ্জল করে তোলেন।

বলাগড় রেলস্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তু মানুষগুলি অশ্বত্থতলায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে জীবন নিয়ে শুরু করত বটতলা মার্কা তর্কাতর্কি—যার যা বোধবুদ্ধি চেতনা তারই জাহির করত আর বাতাসে আস্ফালন ছুড়ে ছুড়ে দিয়ে একসময় ঝিমিয়ে পড়ত। তারই মাঝখানে একদিন হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'মানুষের অন্তরের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব' শব্দবন্ধটি। মানুষ নিজের কাছে হেরে গেলে, কেউ তাকে জেতাতে পারে না। এই দৃঢ়বিশ্বাস থেকে অশ্বত্থগাছের তলায় উপস্থিত মানুষগুলি কেউ আমাকে একচুলও সরাতে পারল না। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখায় এটা আমি পেয়েছিলাম। তাই আমার আত্মবিশ্বাসের জোরটা ছিল আকাশছোঁয়া।

কথা শুনে মুকুন্দমাস্টার কোঁচকানো চোখের ধারালো দৃষ্টি আমার মুখের ওপর যেন বিঁধিয়ে রাখেন। আমি বুঝতেই পারছিলাম মুকুন্দমাস্টার আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছেন। কিন্তু মোক্ষম ঘা-টা হজম করা ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

হাওয়া বইছিল দক্ষিণ দিক থেকে। তিনি সে দিকে মুখ হাঁ করে বিরাট একটা হাই তুললেন। মাথার পিছনে গোল টাকটা একটু চুলকে নিলেন। দু'হাত পাখির ডানার মতো উঁচু করে মেলে ক্লান্তি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, এই তো চাই। আমাদের ভেতরটাকে শক্ত করতে হবে। ঠিকই বলেছ তুমি। খাঁটি সত্যি কথাই বলেছ। আমার স্পর্শকাতর হৃদয়টা হয়তো তিনি বোঝেন, কিন্তু তবু মনে দরদ জাগে না।

আমার নতুন পরিচিত সঙ্গী হারাধন বাহাদুরি নেবার ভঙ্গিতেই হঠাৎ বলে ওঠে, এ তো নতুন এসেছে এই ক্যাম্পে। পুবের ওই জলাভূমির টিলাতে ওরা তাঁবু গেড়েছে।

অশ্বত্থগাছ তলায় সমবেত উদ্বাস্তুদের মধ্যে এ-পাশ থেকে ও-পাশ অবধি অনেকেই ঘড়ঘড় করেও নিশ্চুপ হয়ে রইল।

মুকুন্দমাস্টার মোড়া মেরে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আস্তে আমার কাঁধটা ধরে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিলেন। তাঁর মুখে কোনও কথা জোগালো না। আবারও তিনি চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। মনে হল কিছু-একটা খুঁজছেন আমার ভেতরে, চোখের ভেতরে, মনের ভেতরে। মোটা ঠোঁটদুটো তাঁর কাঁপতে থাকে কীসের জ্বালায়।

একটু বিচলিত হলাম না। আমি পড়াশুনো সবে শুরু করেছি। অনেক ভাল ভাল কথা তখন আমার মুখস্থ। গড়গড় করে বলে গেলাম, উদ্বাস্তুদের হীনমন্যতা দাসত্বের শেকল। এই শেকল ভাঙতে না পারলে এই শিবিরের জেলখানা থেকে তাদের মুক্তি নেই। আমি উদ্বাস্তুদের মুক্তি চাই। আসুন আমাদের যার যতটুকু শক্তি, তাই দিয়েই বন্ধনের শেকল ভাঙি, স্বজনের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করি।

আমার কথা শুনে মুকুন্দমাস্টার চমকে উঠলেন, কঠিন দুঃখে তার হৃৎপিণ্ডটি কুঁকড়ে মুচড়ে যেতে লাগল, গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়াতে থাকল ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল। আস্তে আস্তে তিনি প্রাণ খুলে বলেন, দেশভাগের মহাদুর্যোগে আমরা প্রত্যেকেই ভাঙা কাচের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটছি। একটু অসাবধান হলেই রক্তপাত হবে নির্ঘাত। থাক আর কিছু বোলো না। ক্ষোভে দুঃখে অত্যাচারে ঘৃণায় বিদ্বেষের জ্বালায় আমার ভেতরটা নেকড়ের মতো গোঙাচ্ছে।

মুকুন্দমাস্টারের কথা শেষ হয় না।

কী আর বলব, আমার আর কিছুই বলার নেই। আমাদের প্রত্যেকের বুকেই দেশভাগের কাঁচা ঘা, তাতে নাড়া লাগলেই রক্ত ঝরে, ব্যথা বাড়ে বই কমে না। তা তো আমি জানি। হৃদয় দিয়েই অনুভব করি। মনটা যেন আপনা আপনি কোমল হয়ে ওঠে আমার। একটা ভীষণ বোঝা বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারলাম আমি।

খুশি হয়ে ওঠেন মুকুন্দমাস্টার। গালে গড়ানো চোখের জল তখনও থরথর কাঁপছে, কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মৃদু হাসিতে তাঁর ঠোঁট দু'খানি ভরে উঠল। ওদিকে মনের মধ্যে লড়াই চলেছে। জীবনের সর্বনেশে চেহারা এমন খাঁটি করে বুঝেছে এই ছেলে তাতেই যেন মুগ্ধ তিনি। ঠোঁট চেপে একটুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখেন। তার পর দু'হাত দিয়ে মাথার চুলগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে লাল চোখ দুটো আমার দিকে তুলে ধরেন। বলেন, কী নাম তোমার?

আমি পরিচয় দিলাম। মুকুন্দমাস্টার মন দিয়ে শুনলেন। একটি টু শব্দ তিনি করলেন না। কেবল আমার মুখের দিকে তাকালেন। চাহনির মধ্যে অর্থপূর্ণ কী-একটা যেন রয়েছে। হাতদুটো শরীরের পিছনে টেনে নিয়ে উঠে পড়লেন। পা পা হাঁটতে শুরু করলেন নিজের তাঁবুর দিকে। একবারও আর পিছনে ফিরে তাকালেন না।

সুচেতনার আলোয়

ক্লাস ফাইভের প্রথম দিনটির কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের আমরা ছাত্রছাত্রীরা রেললাইন ধরে তিন মাইল হেঁটে জিরাট রেলস্টেশনে যেতাম। সেখান থেকে বাঁয়ে আধমাইল কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে জিরাট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে যেতাম। পঞ্চম শ্রেণিতে বলাগড় ক্যাম্পের আমরা কজন ছাত্রছাত্রী ছাড়া বাকি সবাই ছিল আমার অচেনা ছাত্রছাত্রী। তাই ক্লাসঘরে বেঞ্চের এককোনায় আমি জড়োসড়ো বসে রইলাম যেন বাইরের কেউ। আমার পোশাক সেদিন ছিল ছেঁড়া-ময়লা, মাথার চুলগুলিও আঁচড়ানো হয়নি। ক'খানা মলাট ছেঁড়া পুরোনো বই আগলে জবুথবু বসেছিলাম। ক্লাসের সব থেকে দুষ্টু ছেলেটি আচমকা আমার সামনে এসে তীব্র সুরে জিজ্ঞাসা করল, ওহে আগন্তুক, তোমার নামটা কী হে? এদিকে তুমি কী পথ ভুল করে চলে

এসেছ? তার গলার স্বরে স্পষ্টই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আমার দিকে ছুড়ে মারে।

তখনই খেয়াল হল, আমি তো ওদের সবার থেকে একেবারে আলাদা। আমার প্যান্টের পিছনটা অতি ব্যবহারে ফেঁসে গেছে আর জামাটায় গোবর আর লাল মাটি মাখানো। আমার খালি পা, মাথার চুলে তেলও নেই, আঁচড়ানোও নেই। এ রকম পোশাকে আর শ্রীতে এর আগে এ বিদ্যামন্দিরে সত্যি হয়তো কেউ আসেনি, আমি ছাড়া।

ফাঁসা প্যান্ট গোবর আর লাল মাটি মাখানো জামা এবং আমার উদ্ঘট চেহারা ছবি নিয়ে ইতিমধ্যে ঠাট্টা আর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। বইগুলো নিয়েও কেউ কেউ ঝঞ্ঝাট ঝামেলা চালাচ্ছে। এর মধ্যেই মাস্টারমশাই বি দাস ক্লাসে ঢুকে আমাকে বাঁচালেন। ছেলেমেয়েরা অতি দ্রুত ছুটে যে যার নিজের জায়গায় চলে গেছে। তারা বসে আছে ভাল ছাত্রের মতো শান্তশিষ্ট।

রোদে, বাদলে, শীতে, অনাহারে, খালি পেটে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আমার রোগা চেহারা ভেঙেচুরে প্রায় আধখানা হয়ে গেছে। তার পর প্রথম দিনেই এই অবাঞ্ছিত কাণ্ডকারখানায় ভয়ে ভাবনায় আমার বুক টিপটিপ করতে থাকল। মনে মনে খুবই ঘাবড়ে গেলাম। সত্যি আমি যেন এই পরিবেশে বেমানান। মানুষের হাত-ছোঁয়া যেন একটি কাকের বাচ্চা, যাকে অন্য সব কাকেরা নির্মম ভাবে ঠুকরে চলেছে। আর আমি বেচারা নিরুপায় অসহায় নিজেকে রক্ষা করবার সামান্যতম খড়কুটোও খুঁজে পাচ্ছি না। তা সত্ত্বেও বিমল পাণ্ডের প্রেরণাটা বুকের ভেতরে দাপাদাপি করতে থাকে। আর মনে মনে বলতে থাকি: অসুবিধা যতই হোক, বাধাবিপত্তি যতই আসুক, পড়াশুনা আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে—এই আমার প্রতিজ্ঞা, বেঁচে থাকবার অমোঘ প্রতিজ্ঞা।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে জামা-প্যান্ট সোডা দিয়ে কেচে দিলাম। পরদিন সকালে উঠে কিন্তু আবার পুরনো উৎসাহ জেগে উঠল মনে। যখন যা পাই, তাই খাই, ছেঁড়া-ফাঁসা জামাপ্যান্ট যা জোটে তাই পরে স্কুলে ছুটে যাই। স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ধীরে ধীরে আলাপ পরিচয় হতে লাগল।

বি দাস ছিলেন আমাদের ক্লাস-টিচার। বেঁটেখাটো মজবুত শরীর তাঁর। ধুতি-পাঞ্জাবি ছিল তাঁর পোশাক। একেবারে টিপটপ তেল চিক্কন মানুষটি খুব সহৃদয় ন্যায়পর। তিনি বাংলা পড়াতেন। আমি পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু চেহারায় একেবারে রোগা টিংটিংয়ে। বি দাস স্যার কাছে ডেকে কবিতা পড়াতে বেশ মজা পেতেন। মিষ্টি গলায় আর মিষ্টি সুরে চমৎকার কবিতা পড়াতেন। তাঁর

সাহিত্য রসবোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বহু পুরনো ও নতুন বাংলা কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল। সুযোগ পেলেই তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন।

আমাদের একমাত্র দিদিমণি গীতা কাশ্যব আমাদের হিন্দি পড়াতেন। তাঁর ভাষা আর সুরেলা কণ্ঠে হিন্দি কবিতা পড়ানো, সুরের ঝংকারে গোটা ক্লাসঘরই যেন তন্ময় হয়ে যেত। প্রথমে তিনি গানের মতো কবিতাটি গেয়ে তার পর কবিতাটি অভিনয় করে দেখাতেন। কবিতা পড়ানো এই ছিল তাঁর রীতি। সঙ্গে সঙ্গে চলত এই কবিতার মতো অন্য হিন্দি কবিতা পাঠ। এর ফাঁকে ফাঁকে গল্প, স্মৃতিচারণা এবং কখনও কখনও নিজের লেখা হিন্দি কবিতাও আবৃত্তি করে শোনাতেন। এই সব শুনে আমার মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আমি মনের সব শক্তি তখন চোখ আর কানে এনে জড়ো করে এই পাঠ ও পড়া আবৃত্তি গোগ্রাসে গিলতাম আর অনুভব করতাম নতুন এক ভাবনা।

সহকারী প্রধান শিক্ষক শান্তিময় শীলদাস বাংলা ব্যাকরণ, রচনা লিখন, চিঠি লিখন প্রভৃতি পড়াতেন। তাঁর অসাধারণ প্রসাদগুণে ভরা পঠন-পাঠন মনে দাগ কেটে যেত। আর ভাষা শেখার পথ সুগম হত। প্রত্যেকটি পাঠে তাঁর নিজস্ব শৈলী আমাদের শেখাতে চাইতেন। তাঁর প্রতিটি ক্লাসেই আমরা শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতাম। বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল আর হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে তিনি কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন, উদাহরণ দিতেন। নিজের কবিতা তিনি খুব সুন্দর করে আবৃত্তি করতেন।

রবিবার আর ছুটির দিনগুলিতে আমি মাঠে, ফসলের খেতে যখন জনমজুরি খাটতাম, তখন মাস্টারমশাইরা ও দিদিমণি যে সব সুরে কবিতাগুলি আমাদের শেখাতেন, সে সব সুরে সব ক'টা পদ্যই সুর করে আবৃত্তি করতাম। খালি গলায় গেয়ে যেতাম। কবিতাগুলির মানে, অন্বয়, শব্দগঠন নিয়ে মনের ভেতর আলোচনা চলত। 'গঙ্গাং বারি মনোহারী' কবিতা পংক্তির সুর আপনি মনে হয়ে উঠত। 'ভারত হামারা দেশ হ্যায়' কিংবা 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'— স্কুলে-পড়া সব কবিতাই আমার মনে দাগ কেটে যেত। যে দিনগুলি এতদিন আমি কাটিয়ে এলাম, সে দিনগুলি যেন শীতের পত্রহীন বৃক্ষের মতো ছিল। স্কুলে আমি সবুজ, তরতাজা ও প্রাণময় হয়ে উঠলাম। চোখের সামনে প্রাণে ভরপুর সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা আর জলজ্যান্ত কবি গীতা কাশ্যব এবং কবি শান্তিময় শীলদাসদের দেখে বুঝলাম যে, কবিরাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাঁদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্রোধ-হিংসা, লোভ-ভালবাসা ইত্যাদি রিপু সকল আছে এবং আমিও চেষ্টা করলে, সাধনা করলে কবিতা লিখতে পারি— লিখতে পারি

গল্প, উপন্যাস। এই ভাবনা মনে এক নতুন আকাশের ঠিকানা দিল। আমিও কবিতা লেখা শুরু করলাম। মনে মনে গল্প লিখতাম। ধানের খেতে দু'হাতে বন-আগাছা নিঙড়াতাম আর মনে মনে কবিতা নির্মাণ করতাম, গল্প তৈরি করতাম। এ সব সুচেতনার মধ্যে ডুবে থাকলে কঠোর পরিশ্রমও আমাকে ক্লান্ত করতে পারত না। কাজের মাঝে নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা জেগে উঠত হৃদয়-মনে এবং দেহে। সহকর্মীরা যখন পরিশ্রমে নুয়ে পড়ছে, আমি তখন ভেতরের উদ্দীপনা আর উৎসাহে আহ্লাদিত হয়ে হাতের কাজ করে চলেছি। মনে মনে কবিতা নির্মাণ আর গল্প তৈরি করছি।

কবিতা, গল্প যখন আমার রক্তে আমার ভেতর হয়ে উঠছে, তখনই সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মিক বন্ধনের বোধ আমার ভেতর ডালপালা ছড়িয়ে দিচ্ছে আর সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি নিজেকেই অনুভব করতে পারলাম। সব কিছু বোঝার, সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করার তীব্র এক আকাঙ্ক্ষায়, উদ্দাম উদ্বেলিত এক নতুন প্রাণ যেন জন্ম নেয় আমার হৃদয়ে প্রাণে। সেই চেতনার আলোয় এই চেতনাময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমি যা চাইছি লক্ষ কোটি মানুষ তাই চাইছে। সমস্ত মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা, উজাড় করে দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। অশেষ কষ্ট করে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, অনাহারে থেকেও আমি স্কুলে যেতাম এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পড়াশুনা চালিয়ে গেছি আর মনে মনে বড় হওয়ার তীব্র বাসনাটা প্রাণে জাগিয়ে রেখেছি— তা ভেবে আমার কতই-না ভাল লাগছে।

জিরাট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের আরেক শিক্ষক ছিলেন বি বিশ্বাস, মাথার চুল তাঁর সবটাই সাদা ধবধবে। রোগা লিকলিকে চেহারা, চামড়ার নীচে হাড়গুলো যেন স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ তেলচিক্কণ মসৃণ চেহারা। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, নাকটা টিকালো, দুটো চোখ অতল গভীর চেতনাময়। তিনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। পাঠকক্ষে ঢুকতেন মাথানত করে— নমস্কার করে।

প্রথম প্রথম আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ টিপ্পনি কেটে, হাসাহাসি করেছিল। কেউ কেউ তো মন্তব্যই ছুড়ে দিল, ভূগোল স্যারের মাথায় গোল আছে, পুরোদস্তুর গণ্ডগোল আছে। একজন হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, পাগল আর কাকে বলে, যত পাগল-ছাগল, গোরু-গাধা-ভেড়া আমাদের স্কুলে এসে জুটেছে। ভাগ্য আমাদের ঘোলা নোনা জলে ভরা। ছিঃ ছিঃ ধ্বনিতে পাঠকক্ষ ভরে যেত।

কিন্তু এ ব্যাপার বেশিদিন চলল না। স্বয়ং বি বিশ্বাস নিজেই তাঁর চেতনাময়

দূরদৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, এই যে আমাদের পাঠকক্ষ, এই যে তোমরা খুদে খুদে ছাত্রছাত্রীরা বসে আছো— ভবিষ্যতের কোনও মহামানব, শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-শিল্পী, কেউ যে এখানে নেই, তা কেউ বলতে পারবে না। ভবিষ্যতের সেই সব মহামানব, শ্রেষ্ঠ মনীষী, লেখক-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিককেই আজ আমি প্রণাম করি। মাথা নত করে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমার আশা, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ হয়ে উঠবে, আমার শিক্ষক জীবন সার্থক হবে। আর কথা বলতে পারলেন না। চোখে তাঁর জল ভরে এল, তিনি দ্রুত শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বি বিশ্বাস এত ভাল পড়াতেন, যা মন দিয়ে শুনলে বইপড়ার আর দরকার হত না। অতি সামান্য, তুচ্ছ বিষয়কে পড়াতে পড়াতে তিনি চলে যেতেন অসামান্য তত্ত্বে-সত্যে। আর তাঁর অধীত পাঠ্য বিষয়বস্তুটি সূর্যের আলোয় মেলে ধরে আমাদের প্রাণে ঢেলে দিতেন। প্রতিটি শব্দবর্ণ অন্বয় ধ্বনি পেটের ভেতর থেকে তথ্যসত্যকে টেনে বের করে আনতেন প্রাচীন ঋষিদের চোখের মতো অতল গভীর তাঁর চোখদুটো থেকে ঠিকরে বেরোত ঐশীশক্তি, সুচেতনার আলো। আর আমরা সেই ঋষিমূর্তির সামনে বসে গোগ্রাসে গিলে চলতাম পবিত্র জ্ঞান আর খাঁটি সত্যকে।

বি বিশ্বাস প্রায় বলতেন, 'জ্ঞানের শেষ কথা, মানুষকে বুক ভরা ভালবাসা ঢেলে দেওয়া। এর থেকে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর আবিষ্কার হয়নি।' জীবনের গোড়াতেই তিনি আমার ভেতর এই মহাসত্য এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ ফল সারা জীবন ধরেই পেয়ে এসেছি, মানুষকে ভালবেসে নিজেকে সুসমৃদ্ধ করেছি, জীবনের প্রতি এই দৃঢ়বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা আমাকে এতটা দূর টেনে এনেছে।

জিরাট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে যখন পড়তাম, প্রধান শিক্ষক ছিলেন মাননীয় শ্রীযামিনী দাস। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষটি, পোশাকেআশাকে সাত্ত্বিক, গলায় তুলসির মালা, মাথায় বড়মাপের টিকি, তেলচিক্কণ পবিত্র চেহারা। কথা বলেন আস্তে আস্তে। মৃদু গম্ভীর গলায়, কোনও দূর বৈষ্ণবীয় পরিবেশে যে জন্ম, তার ছাপ রয়েছে তাঁর ভাষায়। মুখের রংটা হলদেটে, চোখের চারধারে মিহি বলিরেখা— দেখলেই মনে হবে আলাদা জগতের মানুষ এবং সাচ্চা। সহজ জীবনের মানুষ।

তা সত্ত্বেও নিজের চেহারা, পোশাক আর জাতবর্ণ নিয়ে আমি হয়তো বিব্রত ছিলাম। তাই পারতপক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠী-সহপাঠিনীদের খুব কাছে

ঘেঁষতাম না। নিজেকে সব সময় আড়ালে-আবডালে রাখতাম। আমার মতো একটি নীচ জাতির ছিন্নমূল বালক, যে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হচ্ছে— এ যেন গতানুগতিক মানুষের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে, একটা ভয়ংকর খাপছাড়া ব্যতিক্রমী ঘটনা। আমার সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল ছিল মারাত্মক— যা স্পর্শকাতর আর অনুভূতিসম্পন্ন বিবেককে, তা অহরহ দংশন করত। অনেকেরই প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তিগুলি, তপ্ত লৌহ শলাকার মতোই আমার বোধে এসে বেঁধে। আমার দৃষ্টিতে তারা প্রশংসা করে মুখে, যা বলছে তা, আমার কাছে পানের পিকের মতো তুচ্ছ। কথাগুলো তো ফুলের মতো মাখনের মতো নরম ও পেলব— মধুভরা শিরীষ ফুলের মতোই রমণীয় ও স্নিগ্ধ-মধুর, শ্বেত পাথরের মতো মসৃণ, তেলতেলে। কিন্তু তাদের ভেতরের জ্বালাপোড়া, অনসূয়া পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, তারা বিষকুম্ভ পায়োমুখ। তবু আমার ভাগ্য ভাল— সত্যকাম, জাবালির মতো বংশপরিচয়, জাতবর্ণ নিয়ে আমাকে সর্বক্ষণ কেউ প্রশ্ন করে না। জাত আমার নিচু কিন্তু ছাত্র ভাল, মেধাবী। এটা উচ্চবর্ণের লোকেদের নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও জন্ম যে আমার নিচু জাতে তা ভুলতে পারি কোথায়? ঘুরে ফিরে সে প্রসঙ্গ তো এসেই যায়। এ দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বলে, জাতবর্ণ জিনিসটা এমনই আসে জন্মের হাত ধরে, কিন্তু মরে গেলেও তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না— এ সামজ এমনই। আমার নিজের জীবনেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি বহুবার।

আমার জীবনপথের পথ-প্রদর্শকগণ, যাঁদের মধ্যে অনেকের নাম বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে, কিন্তু তাঁদের উজ্জ্বল মুখ, পড়ানোর অসাধারণ ভঙ্গি মনে দাগ কাটবার মতো, সুসমৃদ্ধ হওয়ার মতো জ্ঞানদান আজও আমার চেতনায় স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে কারও কারও গুরুগম্ভীর চেহারা, চোখাচোখা কথা, কেউ কেউ ফূর্তিবাজ, যৌবনের শক্তিতে ঝলমল করতেন। আবার কেউ অত্যন্ত শান্ত চিন্তাশীল হৃদয়বান। তাঁরা ছিলেন সবাই সমান দৃঢ়সংকল্প, প্রত্যয়বান। প্রত্যেকটি মুখ সম্পূর্ণ আলাদা তবু তাঁরা সবাই একই চেতনার শরিক। সেই শান্ত প্রাণময় দৃঢ়সংকল্প, গম্ভীর স্বচ্ছমুখ, গাঢ় চোখ, কোমলে কঠিনে সহৃদয়ে মিলিয়ে সে এক বিচিত্র সৃষ্টি— যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করত, আমাকে জ্ঞানে বোধে সুসমৃদ্ধ করত, আমাকে নতুন নতুন সত্য চেনাত। আমি জ্ঞানে বোধে ভরে উঠতাম।

আমার ফেলে-আসা শিকড় ছেঁড়া জীবনটার এঁদোপচা আঁধার গলিঘুপচি, ঝুলকালিময় আর সীমাহীন অনিশ্চয়তার দিকে যখন পিছন ফিরে তাকাই— বুকটার মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। এত অবহেলা, অত্যাচার, ঘৃণা, অনাহার, অনিদ্রা,

অবিচার, দুঃখকষ্ট, ঝড়-ঝাপটা, অন্তহীন বেদনা বিষাদের মধ্যেও স্মৃতির স্রোতে ভেসে আসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গভীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণময় আলোকিত মুখগুলি— যা তাঁরা নিজেরা জেনেছেন, বুঝেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন— তাই ছাত্রছাত্রীদের বোধে-চেতনায় ঢুকিয়ে দিতেন, ছাত্রছাত্রীকে শেখাতে প্রাণপাত করেছেন। ছোটবেলায় পাঠকক্ষে দেখা সেই ছবি আমার হৃদয়ে খোদাই হয়ে রয়েছে। আমার ভেতরেই আছেন তাঁরা। তাঁদের জ্ঞানের হাত ধরে আলোর সরণি বেয়ে জীবনের এতটা পথ আমি চলে এসেছি... এতটা দূর...

আলোকের পথের খোঁজে

বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের ছাত্রছাত্রীরা যখন সবে লেখাপড়া শিখে আলোর মুখ দেখতে শুরু করলাম, ঠিক সেই সময়েই উদ্বাস্তু শিবির কর্তৃপক্ষ সরকারি আদেশ জারি করল, "পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হবে। যারা বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে যাবে না, তাদের সরকারি খয়রাতি সাহায্য 'ডোল' বন্ধ করে দেওয়া হবে।" এই আদেশ বা নির্দেশ জারি হওয়ায় উদ্বাস্তু মানুষের চোখে হতাশার কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। তখন এই মহাসংকট থেকে কী করে বাঁচা যায়, তা নিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে জোর আলোচনা, পরামর্শ বিচার-বিশ্লেষণ আর উত্তেজনা চলতে থাকল।

বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে ছিলেন অসীম ঘোষ। উপাধি ঘোষ হলেও তিনি নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। নব্বই ছুঁইছুঁই বয়স কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ, বুদ্ধিজীবী গোছের লোক। একমাথা সাদা ধবধবে চুল, ভুরু দুটোও পাকা, সাদা। খুব কম কথার মানুষ, জীবনে চলার পথে নানা সংগ্রাম-লড়াইয়ে সবশক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলেও যে বিনীত অথচ নৈরাশ্যে ভরা প্রতিবাদী জেদ এখনও তাঁর ধূসর চোখ দুটোয় জেগে আছে— তা দেখলেই বোঝা যায়। জীবনের চড়াই পথে এখনও তিনি দেহ-মনটাকে আপ্রাণ টেনে নিয়ে চলেছেন।

রেল স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের অশ্বত্থগাছ তলায় অসীম ঘোষ আসতেন, বসতেন আর ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষীর মতো ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা হাতড়ে সঠিক সত্য তথ্য টেনে বের করে আনতেন। অসীম ঘোষ এক সময়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন। যশোহর সেণ্ট্রাল জেলে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বসানের জন্য বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হবে শুনে

অসীম ঘোষের ভুরুজোড়া আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে কপালটার ফ্যাকাশে হলদে চামড়াটা কুঁচকে গেল। অসহিষ্ণু গলায় চিৎকার করে উঠলেন, আরে হতচ্ছাড়ারা দেশের মানুষকে আর কোন জাহান্নামে নিয়ে যাবে রে? দেশভাগ আর স্বাধীনতার আগে যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতালাভের আশায় কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য প্রচুর দরদভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেশভাগে আর স্বাধীনতার পরও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যুক্ত পুনর্বাসন বোর্ডের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গলা তুলে বলেছিলেন, 'ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটিকে জাতীয় সমস্যা রূপে গণ্য করা হবে।' সেই মতো তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারগুলিকে আবেদনও করেছিলেন সর্বশক্তি ও সঙ্গতি একীভূত করার। ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলও এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, "দেশভাগের ফলে ভারতে আগত সমস্ত উদ্বাস্তুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা ভারত সরকারই করবে' এবং এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনকালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ভাণ্ডার সর্বদাই উন্মুক্ত রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমনকী পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার রাজ্যের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সব পরিকল্পনা করবে, সেগুলি অকুণ্ঠ ভাবে গ্রহণ করার জন্য তিনি নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এ কী কথা শুনছি? হতচ্ছাড়ারা উদ্বাস্তু মানুষদের কোথায় নিয়ে যেতে চায়? আমি কি জানি না! সব চক্রান্ত, সব ষড়যন্ত্র! মনুবাদী ষড়যন্ত্র! আমরা নিম্নবর্ণের মানুষরা ভয়ংকর চক্রান্তের শিকার। রাগে তিনি নেকড়ের মতো গর্জন করতে থাকেন।

সমবেত মানুষজন অসীম ঘোষের বাস্তব সত্যকথা শুনে তাঁকে ঘিরে বসে যান। তাঁর বলা প্রতিটি কথা মনপ্রাণ দিয়ে শোনেন আর তাঁরা যেন ক্রমশ বদলে যেতে থাকেন। উপস্থিত কেউ কেউ কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে জড়তা কাটিয়ে মাথা সোজা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীম ঘোষের মুখের দিকে তাকান আর এক অজানা ভাবনায় যেন ডুবে যেতে থাকেন। তাঁদের ভেতরে লড়াই চলতে থাকে।

উদ্বাস্তুরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ইতিহাসের সত্য কথা শোনেন। কারও কারও কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়। নিবিষ্ট মনে কেউ কেউ অসীম ঘোষের বক্তব্য আপন মনে আওড়ান। কেউ কেউ কেবলই উশখুশ করছেন— যেন কিছু বলতে চান। কেউ কেউ গর্জে ওঠবার উপক্রমণও করতে থাকেন।

অসীম ঘোষের বক্তব্য অনর্গল চলতে থাকে। তিনি আরও বলেন, নেহরু-প্রশাসন তো প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার দাঙ্গাপীড়িত ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলিকে ঠেলেঠুলে যে ভাবেই হোক পূর্ব বাংলায় ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর। পূর্ববাংলার

উদ্বাস্তু মানুষজন যখন কিছুতেই পূর্ব বাংলায় ফিরে যেতে চাইল না, প্রশাসনও জোর করে ঠেলেঠুলে তাদের পাকিস্তানের ভেতরে পাঠাতে পারল না। তখন মনুবাদীরা নিজেদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এক সুদূরপ্রসারী হিংস্র চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে। সেই চক্রান্তের কিছু কিছু তোমরা অনেকেই জানো। ভাই, আমি কিছু জেনেছি নিজে সেই দণ্ডকারণ্যে গিয়ে।

অসীম ঘোষের কথা শুনে উপস্থিত বাস্তুহারারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। অম্বরিষ, সুশীল, হারান, জগদীশ, দেবেনরা অসীম ঘোষকে ঘিরে ধরে, সঙ্গে আমিও এগিয়ে গিয়ে অনুরোধ করতে থাকি। বলি, দাদু, তুমি বলো, দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না। বলো, দাদু বলো, কোথায় দণ্ডকারণ্য? সরকার আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে? তা ছাড়া আগের দিনে সবাই কেমন অস্থির— যা আমরা জানি না তা আমাদের বলো। আমি মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অসীম ঘোষের মুখের দিকে তাকাই।

ভিড় থেকে মাথা তুলে বয়স্ক মাধব মণ্ডল বলেন, সব কিছুই আমাদের জানা দরকার। যুগ যুগ ধরে যারা আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে, তাদের সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানতে হবে। বুঝতে হবে আমাদের সব। দাদা, অসীম বলো তুমি, মূল চক্রান্তটা আমরা ভাল করে বুঝি। আমরা তো মানুষের মতো বাঁচতে চাই। বাংলার রাজপুতদের কোথায় কী ভাবে শেষ করতে চাইছে।

অসীম ঘোষ আমাদের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত ভয়ংকর জন্তু-জানোয়ারের বাসস্থান নিবিড় অরণ্যে ঢাকা দণ্ডকারণ্যে পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রথম চক্রান্তের চিন্তা কার মাথায় এসেছিল— সেটি সঠিক বলা মুশকিল। তবে এটা নিশ্চিত যে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মানুষদের সম্মিলিত সুপরিকল্পিত চক্রান্তের 'নিটফল'— এক ঢিলে অনেকগুলো পাখি মারবার প্রয়াসকে কার্যে পরিণত করতে বহু মাথা, বহুদিন ধরে এই অমানবিক, দৃশ্য কাজ করে চলেছে। ভারতবর্ষের কেবল নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতম হিংস্র ঘটনা। দেশভাগের বিষময় ফল দেশ মাতার অঙ্গের বিষাক্ত ঘা— যে ঘা প্রতিদিন বেড়েই চলেছেন রক্ত পুঁজ ঝরে চলেছে...।

অসীম ঘোষ একটু দম নেন। আগুনের মতো একটা রাগের হলকা ছড়িয়ে যায় তাঁর সারা দেহে-চোখে-মুখে। যেন আগুন জ্বলে দাউ দাউ। ফের তিনি উত্তেজিত হয়ে গলা আরও চড়িয়ে বলতে শুরু করেন, মনুবাদীরা ভারতবর্ষের

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় চিরকালই ভয় পেয়ে এসেছে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ববাংলার রাজপুত নামে খ্যাত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মনুবাদীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল— নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে ছিন্নভিন্ন করে ধ্বংস করে দেবার। মাত্র চল্লিশ বছর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার সুবিশাল বঙ্গদেশকে কেবল প্রশাসনিক ভাবে, রাষ্ট্রগত ভাবে নয়— ভাগ করতে চেয়েছিল। তখন নিম্নবর্ণের তথা নমঃশূদ্রদের উন্নয়নের বিরোধী মনুবাদীরা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে সেই প্রশাসনিক ভাগকে রদ করে দেয়। কেবল তাই নয়, বাঙালির মাতৃভূমিকে বঙ্গদেশকে, কায়েমি স্বার্থ রক্ষাকারী মনুবাদীরা তিন টুকরো করেছে— পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ আর ত্রিপুরা। আর এ দেশের মূল নিবাসী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের জালে ফেলে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিচ্ছে— যাতে আর কোনওদিন নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ফিরে আসতে না-পারে।

উত্তেজনায় আমাদের ভেতরটাও টগবগ করে ফুটছিল। আমরা সবাই অনুরোধ করলাম আর বললাম, 'চক্রান্তের জাল আরও গভীরে ছড়ানো'— এটা একটু খুলে বলুন দাদু, এখনও আমরা গোটা ষড়যন্ত্রটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি।

যাঁরা নিঃশব্দে বসে শুনছিল তাঁরা শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নিতাই সাধু তো মাথা তুলে বললেন, এই যে আমরা উদ্বাস্তুরা, ক্যাম্পে জানোয়ারের জীবন নিয়ে এঁদোপচা পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছি, আমাদের তো বাঁচতে হবে— বলুন দাদা, বলুন। আর বাঁচার মূলটাই মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি। সেটাই যদি হারাই কী নিয়ে বাঁচব আমরা।

অসীম ঘোষ আরও গভীর থেকে সত্যকে যেন টেনে বের করে আনেন— ধীরে ধীরে দণ্ডকারণ্যের স্বরূপটা আমাদের সামনে উন্মোচন করেন। তিনি বলেন, বহু পূর্ব থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এএমপি-ও সংস্থা অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর ওড়িশায় ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিস্তীর্ণ বিপদসংকুল এলাকায় খনিজ সম্পদ আহরণ সংরক্ষণ ও শিল্পায়নের চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অভাবে গোটা পরিকল্পনাই নষ্ট হচ্ছিল। এই শ্রমিক-সমস্যা সমাধানের জন্যই পূর্ববাংলার ছিন্নমূল নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষদের পুনর্বাসনের নামে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসন দিচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

অসীম ঘোষ কথা বলেন আর বিষণ্ণ মনে চারিদিকে তাকান। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কেমন একটা ক্লান্ত অবসন্ন হাসি হেসে আবার বলে চলেন, তোমাদের

মধ্যে আর ক'দিনই বা আছি, ক'দিনই-বা থাকব। তোমাদের মধ্যে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু দিন তো আমার ফুরিয়েই এল। দেশভাগের বিষময় ফল এত দ্রুত এত প্রত্যক্ষ ভাবে ফলে চলেছে, তাই সব সত্য তথ্য তোমাদের কাছে বলে যেতে চাই। কায়েমি স্বার্থরক্ষাকারী মনুবাদী দুশমনদের চক্রান্তের কবল থেকে যদি রক্ষা পাও, এই আশায়। মহিলারা চোখ মুছতে মুছতে শোনেন। লোভীর মতো মনপ্রাণ দিয়ে যেন পান করেন প্রতিটি কথা।

যাঁরা ভাবনায় ডুবে ছিলেন তাঁরাও নড়েচড়ে বসেন। কারও কারও বুকে কান্না উথলে ওঠে। সারা দেহে কারও কারও কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাসের শিসটির মতো কেউ কেউ নুয়ে যেতে থাকেন ভাবনায়। অম্বরিষ বালা অসীম ঘোষের দিকে তাতিয়ে মৃদুস্বরে বলেন, রোজ রোজ দাদু ওইখানে ওই গাছের শিকড়ের ওপরে এসে বসেন আর ওই একই কথা বলেন, মানুষ কী করে মানুষের সর্বনাশ করছে। তাতেই দাদুর সমস্ত মনপ্রাণ যেন নিঃস্তব্ধ। সংসারের অন্য কোনও ছবি দেখতে চান না। বাকি জীবনটা কী করে মানুষের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করা যায় তাই নিয়েই দাদু ব্যস্ত।

তা তো হবেই— দেশভাগে লাখো মানুষ অনাহারে মরছে রোজ। আর দেশভাগের চক্রান্তকারীরা উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এ অন্যায় অবিচার, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অত্যাচার, অমানবিক আচরণ আর সহ্য করা যায় না, চোখে দেখাও যায় না। প্রাণ আমার প্রতিরোধে, প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চায়। ইচ্ছা হয় বলেই উঠি, চলো সবাই, অন্যায় অবিচার অবহেলা ঘৃণা বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি— মরবার আগে কায়েমি স্বার্থের শিকড় উপড়ে তোলার জন্য একটা ঝাঁকুনি দিই। একজোট হই, লড়াইয়ে হাত মেলাবার শপথ নিই। যত দিন আমরা না-জানব আমরা মনে প্রাণে সবাই ভাই-ভাই, ততদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবে না। কথা আমার শেষই হতে চায় না, ভেতরে যেন আপনিই জন্ম নিতে থাকে, আর সমস্ত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মিক বন্ধনের উদ্দাম উদ্বেলিত এক নতুন ভাবনা জন্ম নেয় আমার বুকে। বাংলা ভাষা আর বাংলার সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেই শিউরে উঠি।

এখন মধ্য দুপুরে অশ্বত্থগাছের ছোট ছায়াটুকু জুড়ে গাদাগাদি ভিড় করে আছে অসংখ্য উদ্বাস্তু মানুষ। তাদের চারপাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে রোদের আগুন। আমাদের কথাবার্তার উত্তেজনাময় সুর জ্বলন্ত রোদের মন্থর সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে যাচ্ছে।

হারান বিশ্বাস অধৈর্য হয়ে বলে, অসীম দাদুর কথা শুনতে শুনতে কান

পচে গেল। একবার শুনলেই তো কলজের মধ্যে পাকা হয়ে গেঁথে যায়। তার ওপর রোজ রোজ।

অনিল বেজার মুখে বলে, কিন্তু কথাগুলির মধ্যে আমাদের মর্মান্তিক সত্যটার সমস্তই আছে। আমি দু'বার শুনেছি, হয়তো ঠিক এই কথাগুলিই নয়, তবু আরও একবার শোনবার জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের স্পষ্ট করে বুঝতে চাইছি। শত্রুকে ভাল ভাবে জানতে বুঝতে না পারলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা যায় না। আমাদের বাঁচার জন্যই সব কিছু ভাল ভাবে বুঝে নিতে হবে।

অসীম ঘোষ ধীরে ধীরে মনপ্রাণ খুলে যেন সত্য তথ্যকে সামনে এনে হাজির করেন। বলেন, দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মের জন্য-মাটিকাটা, রাস্তা তৈরি করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, চাষের জমি প্রস্তুত করা, প্রভৃতি কাজের জন্যই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাইকারি হারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য নয়। কাজ শেষ হলে যদি বাঁচে উদ্বাস্তুদের তখন বাঘ-ভাল্লুকের মুখে ছুড়ে ফেলে দেবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

আমার ভেতর যেন কথা হয়ে উঠতে থাকে, কথা না-বলে পারি না। তাই বলি, এত সব চক্রান্তের পরেও কায়েমি স্বার্থবাদীরা কিন্তু বসে নেই— বাঙালির সুউন্নত বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতিকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জালে বাঙালি উদ্বাস্তুদের আটকে-বাংলার বাইরে ছুড়ে দিচ্ছে— এ-অন্যায় এ-অবিচার কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

অসীম ঘোষ আবার মাথা তুলে বলতে থাকেন, পূর্ববাংলার নদী-নালা-খালবিলের মানুষগুলোকে কী নিষ্ঠুর ভাবে প্রায় বন্দী করে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দণ্ডকারণ্যের অনুর্বর, পাথুরে, শুকনো, সভ্যতা বিচ্ছিন্ন গভীর অরণ্যভূমি, বিপদসঙ্কুল, পরিত্যক্ত অবহেলিত, অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানে চক্রান্ত করে ফেলে রেখে আসছে— নির্বাসন দিচ্ছে— তা ভাবা যায় না। কোনও মানুষই তা ভাবতে পারে না। কিন্তু স্বার্থে অন্ধ কায়েমিদাররা সব পারে— কায়েমি স্বার্থক্ষমতা অটুট রাখতে যুগ যুগ ধরে ওরা নিম্নবর্ণের মানুষকে অন্যায় ভাবে খুন করে আসছে। আজও তাঁরা নিম্নবর্ণের মানুষদের খুনই করে যাচ্ছে।

দেবেন সুতার সামনে ঝুঁকে কঠিন গলা তুলে বলে, যা বলা হল তা বর্ণে বর্ণে সত্য— ক'টি অপ্রধান ছোট খবরের কাগজে এ সব সত্য তথ্য লিখেছে, আমি নিজে পড়েছি। অনেক উদ্বাস্তু মানুষ দণ্ডকারণ্যে গিয়ে দেখেও এসেছে। সে সব বাস্তব সত্য তথ্য আমাদের হাতে আছে। এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে

যদি ঐক্যবদ্ধ না-হই, আমরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। তাই উদ্বাস্তু মানুষের ঐক্য চাই। তা হলেই বাস্তুহারারা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবেন

কাগজ পড়ে আর কতটা বোঝা যায়। তার চেয়ে জীবন দেখলে সব কিছু অনেক তীক্ষ্ণ ভাবে বুঝতে পারি। ক্যাম্পে রেখে রেখে অনাহারে এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে দণ্ডকারণ্যের অরণ্যের ভাগাড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের মুখের সামনে— যাতে হিংস্র জন্তু জানোয়াররাই তাদের খেয়ে সাবাড় করে। সুশীল সেন যেন ভীত হয়েই একটু ভুরু তুলে বিষণ্ণ বদনে বলে আর গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

আমি গভীর ভাবে লক্ষ করছিলাম প্রত্যেকের কথায় দেবেন নির্নিমেষে চেয়ে থাকে তাদের মুখের দিকে— ক্ষুধার্ত প্রাণীর তৃপ্তিহীনতা নিয়েই সে শোনে প্রত্যেকটি কথা। মুখ বাঁকা করে সে বলে, অসহায় মানুষকে বনের পশুর সামনে ছুড়ে দেওয়া তো সোজাসুজি খুন, সেটা বরং বুঝতে পারি, কিন্তু গভীর গোপন চক্রান্ত করে তিলতিল করে অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের জবাই করা উঃ উঃ, কেন এমন বিদ্বেষ করে, ঘৃণা করে, অন্যায় ভাবে মানুষগুলোকে নির্বাসন দিচ্ছে? কেন আমাদের এমন নির্মম ভাবে পিষে মারছে ?

বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে ছিলেন ধীমান গোঁসাই— দিলখোলা, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান, ন্যায়পর মানুষ। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ। ন্যায়নীতি আদর্শের বাইরে একটি পা-ও তিনি ফেলেন না। মানুষের জন্য, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের দুঃখকষ্ট-বেদনার উপশমের জন্য জীবন-মান-প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত হয়েই থাকেন। উদ্বাস্তু শিবিরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুটে বেড়ান। বিপদে-আপদে তিনিই দেবদূতের মতো হাজির হন। বিয়ে-থা করেননি। মুক্ত মতুয়া মানুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাবান মানুষ।

ধীমান গোঁসাই বেঁটেখাটো ছোট্ট একটুকরো ইস্পাতের মতো ঝকঝকে উজ্জ্বল তাঁর শরীর। মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা কালো চুল। সে চুলে থরে থরে ঢেউ খেলানো, মাথায় সিঁথি কেটে, ঝুটো বেঁধে টিকালো নাকের সুশ্রী রমণীর মতো কোমল মুখখানায় প্রাণের লাবণ্য মাখানো। সে মুখে আমি কোনওদিন দুশ্চিন্তার সামানতম আভাসটুকুও দেখতে পাইনি। অটল, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করেন অতি সহজে, স্বাভাবিক ভাবেই।

ধীমান গোঁসাই আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী আর সুপরামর্শদাতা। পরিচয়ের সেই প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি তাঁর সহৃদয় সহানুভূতি উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রেরণা দিয়েছেন অকুণ্ঠ ভাবে। কেবল তাই নয়, এই একটি মাত্র মানুষকে

আমি দেখেছি, যিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে, উদ্বাস্তু মানুষদের সমস্যা, দুঃখকষ্ট বেদনা, নিজের মাথায় স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন।

ধীমান গোঁসাই তাঁর মায়ের বোন অসীমামাসিকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত পার হয়েছিলেন। বিধবা অসীমামাসি মা-হারা ধীমান গোঁসাইকে আপন পেটের সন্তানের মতোই মানুষ করেছিলেন। ধীমান গোঁসাইও মাসিকে মা বলে ডাকেন আর এই মাকে নিয়ে তাঁর গর্বও কম ছিল না।

আমাদের অসীমামাসি ছিলেন মতুয়াদের নেত্রী। চৌকো প্রশস্ত খাটো চেহারা, সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়েছেন, হাড়ভাঙা খাটুনি আর দেশভাগের দাঙ্গাবাজদের ঠ্যাঙানিতে শরীরটা একটু ভেঙেছে। চওড়া লম্বাটে ফোলা ফোলা মুখখানা কোঁচকানো। তাতে জ্বলজ্বল করছে অতল গভীর ঘনকালো চোখ। ডান ভুরুর ওপর দিকে একটা গভীর কাটা দাগ থাকায় ভুরুটা খানিকটা ওপর দিকে টানা। মনে হয় তাঁর ডান কানটাও বাঁ-কান থেকে কিছু নিচুতে। তার ফলে সর্বদাই তিনি যেন উদ্বেগের সঙ্গে কানখাড়া করেই আছেন— এমন একটা ভাব সারা মুখটায়। ঘন কালো লম্বা চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু'-একটি সাদার রেখা ঝিলিক মারছে। সব মিলিয়ে অসীমামাসির কোমল দরদি প্রাণময় বলিষ্ঠ চেহারায় আর গলায় একগাছা মোটা কাঠির আচারমালায় উদ্বাস্তু শিবিরের সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া, বাসনকোসন মাজা-ধোয়া— সংসারের যাবতীয় সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে-গাছিয়ে আমাদের অসীমামাসি রোজই বেরিয়ে পড়েন, তাঁবুতে তাঁবুতে খোঁজ নিয়ে চলেন— অসহায় মানুষজন কে কেমন আছেন, সহৃদয় আলাপ করেন বউ-ঝি-মা-দের সঙ্গে, তাঁদের সুখ-দুঃখের কষ্টের বেদনার সঙ্গী হয়ে ওঠেন। ছিন্নমূল জীবনের মানুষগুলিকে নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। এ কেবল অসীমামাসি একা নন, ধীমান গোঁসাইও দিনের মধ্যে কয়েকবার গোটা উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে আসতেন। প্রত্যেকটি তাঁবুর দরজা টেনে ফাঁক করে উঁকি দিয়ে তিনি দেখতেন প্রাণগুলি বেঁচে আছে কি না। তাঁর টহলের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন কে মরল, কে জন্ম নিল, কার অসুখ হয়েছে, কে শিবির ছেড়ে চলে গেছে, কে কয়দিন খাবার জোটাতে পারেনি, কার মা মারা গেছে, কার সন্তান মারা গেছে। প্রতিটি দিন মানুষদের অন্তহীন সমস্যা নিয়ে অসীমামাসি আর ধীমান গোঁসাই ছোটাছুটি করতেন। আর এই কাজে তাঁদের না ছিল ক্লান্তি, না-ছিল অবকাশ, মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়েই দুই মায়ে-পুতে মানুষের জন্য নিজেদেরকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন।

ধীমান গোঁসাই বলতেন, আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে— আমাদের জীবনে কেন এত দুঃখকষ্ট, অন্যায়, অবহেলা, অত্যাচার, অবিচার, বিদ্বেষ, ঘৃণা? জীবনের সমস্ত অধিকার থেকে কেন আমরা বঞ্চিত? দলিত জীবনের কেন এত অপচয়?

জীবনের যন্ত্রণার মূলটা তখনও আমি খুঁজে পাইনি, তাই ধীমান গোঁসাইয়ের প্রতিটি কথাই মনপ্রাণ-হৃদয় দিয়ে জানতে চাই, বুঝতে চাই, আমি বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ি নিবিষ্ট হয়ে শুনি।

গভীর বিষাদে মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ধীমান গোঁসাই হাত দুটো শিথিল ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, বিদেশি অরণ্যচারী হিংস্র আর্যরা সুদীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে এ-দেশে বসবাসকারী মূল নিবাসী ভারতবর্ষীয়দের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। আর্যগণ ভারত ভূখণ্ড বিজয়ের পর অঢেল ঐশ্বর্যময় এই নতুন উপনিবেশকে চিরদিনের মতো নিশ্চিত নিরাপদে শাসন-শোষণ করবার জন্য বিজয়ী আর্যগণ বিজিত মূলবাসী ভারতবর্ষীয়দের বিভিন্ন জাত-বর্ণে বিভক্ত করতে যুগ যুগ ধরে পদতলে দলিত করে রাখতে রচনা করেছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষণকারী সংবিধান— যার প্রচলিত নাম মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি। সেই বইয়ের অমানবিক সব সূত্রাবলি তথা আইন কানুনেই এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আজও চলেছে। তাই জাত-বর্ণ-বিদ্বেষ-ঘৃণা-ব্যবস্থা জন্মসূত্রে রক্ত সম্পর্কে বন্দি অনড়, শিলীভূত অপরিবর্তনীয়। ভারতবর্ষের মনুবাদী সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে মানুষ মানুষকে জাত বর্ণে বিভক্ত করে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে সমস্ত মানবিক অধিকার কেড়ে নিয়ে পায়ের তলায় দলিত করে দাবিয়ে রাখছে। ধীমান গোঁসাইয়ের গলার স্বরটাও যেন অন্যরকম শোনাল— আগের চেয়ে গভীর নিচু, গমগমে আর তাৎপর্যময়— প্রচণ্ড একটা শক্তি বুকের ভেতরকার আক্রোশের কথাগুলোকে যেন ঠেলে বার করে দিচ্ছে।

স্বরটা কোমল কিন্তু কঠিন চোখে একটা একগুঁয়েমির দীপ্তি নিয়ে আমি অত্যন্ত ধীরশান্ত ভাবে বলি, এত যে অন্যায় অবিচার নৃশংস গণহত্যা তার প্রতিবাদ প্রতিরোধ হয়নি এতকাল?

সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য দলিত জীবনের জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায় এমন মানুষ অনেক নেই। ছিলেন গৌতম বুদ্ধ, মনুবাদের জ্বলন্ত প্রতিবাদী শক্তি। কিন্তু তাঁকেও মনুবাদীরা ভগবান বানিয়ে ছেড়েছেন। অথচ তাঁর মতে স্বর্গ বলে কিছু নেই, চরম মুক্তিও নেই, নেই অন্য কোনও লোকে কোনও আত্মা। চতুর্বর্গের ক্রিয়ায় কোনও ফল নেই। অগ্নি হোম বেদ এবং ভস্মমাখা ঋষিরা প্রকৃতির সৃষ্টি।

সত্য হচ্ছে মানুষ, মানুষের বেঁচে থাকা। মনুবাদীরা সেই মানুষকেই জাত-বর্ণে ভাগ করে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে হত্যা করে। যুগের পর যুগ এই পীড়ন দলন ঘৃণা ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে এ দেশে।

একটু থেমে মাথাটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ধীমান গোঁসাই অর্থপূর্ণ ভাবে বলেন, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর, বুদ্ধের পথে সত্যকে চিনেছিলেন। সত্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, দলিত মানুষের মুক্তির জন্য। অথচ নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার বেলায় আমরা খুবই কৃপণ হয়ে নিজেদের চিন্তাতেই ডুবে থাকি। ইতিহাসের মহাঘটনা আমাদের ঘিরে ঘটে চলেছে, সেদিকে ফিরেও তাকাই না। ধীমান গোঁসাই কষ্টে বেদনায় ভেতরের অনুভূতি বুঝি চেপে রাখেন।

এখন একটু একটু বুঝতে পারি— বলতেও পারি নিজের কথা আর অন্যের কথাও। এখন বুঝতে শিখেছি কিনা। তুলনাও করতে পারি। আগে পারতাম না। তুলনা করার কিই-বা ছিল। আমাদের সবাই তো সেই থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড়। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই জাত-বর্ণ ব্যবস্থা অস্পৃশ্যতা ঘৃণা যতদিন এ সমাজে থাকবে— এই জীবনের কোনও আমূল পরিবর্তন হবে না। অথৈ চিন্তায় আমি ডুবে যেতে থাকি।

জীবনকে জানলাম— পুঁথি পড়ে নয়, আমার খণ্ডিত জীবনের অভিজ্ঞতার সমষ্টি থেকেও নয়, চোখের সামনে এই জলজ্যান্ত শিকড় ছেঁড়া জীবন যখন দেখলাম, তখন আর কী বাকি রইল? কী শক্তি লুকিয়ে আছে দলিত মানুষদের বুকে, ওরা যদি তা জানত! ওরা জাগলে ভারতবর্ষের চেহারাই পালটে যেত। আমাদের এখন একটাই কাজ, দলিত মানুষদের চেতনাকে জাগিয়ে দেওয়া। ধীমান গোঁসাইয়ের ভেতরে কথার পিঠে কথা জড়ো হতে থাকে। বলেন গৌতমবুদ্ধ, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, জ্যোতিরাও ফুলে, ড. বি. আর. আম্বেদকর--- তাঁদের শিক্ষা আমরা কোনওদিন ভুলব না, মনুবাদী শাসন-শোষণতন্ত্র আমাদের মাতৃভূমির সর্ব অকল্যাণের উৎস, আমরণ সেই অত্যাচারী রাক্ষুসে শক্তির কবর খোঁড়াই হবে আমাদের দিবারাত্রির স্বপ্ন, জাগরণের একমাত্র ব্রত...।

ধীমান গোঁসাইয়ের এই শেষ কথাটার একটি শঙ্কিত চেহারা নিয়ে অভিভূত করে আমাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিন্তাটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারি না, তাই শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। ইচ্ছা হয় একটা বিষম ভারী বোঝা বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দিই। কিন্তু সমস্ত চিন্তা জমাট বাঁধে— দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষতের

রক্তস্রোতে।

ধীমান গোঁসাইয়ের মুখের প্রাণপূর্ণ কথা শুনতে শুনতে আমার বুকেও জন্ম নিত নতুন কথা, গর্বে বুক ভরে উঠত— কী স্বচ্ছন্দ প্রাণময় সুন্দর কথাগুলি, শব্দগুলি তার ব্যঞ্জনা মাধুর্য চিরকালের মতো আমার হৃদয়ে প্রাণে দাগ কেটে বসে যেত।

মাঝেমধ্যে ধীমান গোঁসাইয়ের কথা বলার ফাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতাম: গোঁসাইদা, আপনার জীবনের এটাই কি মূল উদ্দেশ্য?

ধীমান গোঁসাই একটুও না-ভেবে বিশ্বাস-দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিতেন, বলতেন, আমার সমস্ত মনপ্রাণ হৃদয় ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের মঙ্গলের জন্যই সঁপে দিয়েছি ভাই। তা ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাববারও অবকাশ নেই ভাই। লড়াইয়ের সময় যখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এখন সংগ্রামই শেষ কথা ভাই। প্রাণের মায়া করে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলব না। জীবন তো একটা, তা যেন মানুষের মুক্তির জন্যই উৎসর্গিত হয়।

সত্যিই সময় ছিল না, বলাগড় উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রাম ভয়ংকর ভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেশভাগে বাংলাভাগে তাঁরা বাপঠাকুরদার চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি জমিজমা সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছেন, কিন্তু মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে কোনওমতে বেঁচেছিলেন, সেই মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, অথচ প্রশাসন-সরকার-বাঙালি উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে নৈনিতালে, আন্দামানে পুনর্বাসনের নামে নিয়ে যেতে আদেশ জারি করল। উদ্বাস্তুগণ আদেশ অমান্য করে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আবেদন করলেন। সরকার এবং প্রশাসন আবেদনে সাড়া না-দিয়ে, বাংলার বাইরে পুনর্বাসনে না-যাওয়ার জন্য, উদ্বাস্তুদের শাস্তিস্বরূপ সরকারি খয়রাতি সাহায্য 'ডোল' বন্ধ করে দিল। এমনকী উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী, স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য যে সরকারি সাহায্য-অনুদান, তা-ও সরকার-প্রশাসন বন্ধ করে দিল। সরকারি নির্দেশ পালন না-করার জন্য, বাংলার বাইরে পুনর্বাসনে না-যাওয়ার জন্য, ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ প্রশাসন নানা কূট চক্রান্তের দ্বারা, উদ্বাস্তুদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে, হয়রানি করতে থাকল। বৈরীমূলক মনোভাব নিয়ে চলতে থাকল সরকার ও প্রশাসন।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের, সরকারি, সাহায্য 'ডোল' চালু করার এবং সমস্ত প্রকার সাহায্য সহানুভূতির দাবিতে উদ্বাস্তুগণ সমাবেশ সভা, মিটিং মিছিল এবং আমরণ অনশন শুরু করে দিলেন— বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরেও

লড়াই সংগ্রাম আরম্ভ হল। ধীমান গোঁসাই এই লড়াই-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে শুধু এগিয়েই এলেন না— তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বশক্তি নিয়েই।

ঘরপোড়া ছাই বাতাসে ওড়ে

সরকারি প্রশাসন ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে খয়রাতি সাহায্য 'ডোল' বন্ধ করে দিল। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে দুঃসময়ের ঝড় বইতে থাকল। কায়েমি স্বার্থের হিংসুটে প্রশাসন 'ডোল' বন্ধ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল না। উদ্বাস্তুদের ওপর তারা নানা দমনপীড়ন শুরু করল— যাতে মানুষজন সব উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা যে অবহেলিত আর অবাঞ্ছিত তা হাতে-কলমে প্রমাণ হয়ে গেল, সরকার আর প্রশাসনের কর্মসূচি প্রকাশ হওয়ার পরে।

সেই মহাদুর্দিনে বেঁচে থাকবার শেষতম অবলম্বন সরকারি সাহায্য 'ডোল' বন্ধ হওয়ায়, উদ্বাস্তুগণ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। প্রাণ বাঁচাতে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কোনও কোনও পরিবার রাতের আঁধারে শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কেউ কেউ তাদের আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। যাঁদের আর কোনও উপায় ছিল না, তাঁরা উদ্বাস্তু শিবিরেই মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। এ রকম অসহায় মানুষের সংখ্যাই ছিল, সবথেকে বেশি।

যাতে উপোস করে মরতে না-হয়, তার জন্য উদ্বাস্তু শিবিরের বুভুক্ষু মানুষজন রুটি-রোজগারের আশায়, গ্রামেগঞ্জে ছুটে গেলেন। জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতিতে যাতে না-খেয়ে উপোস করে মরতে হয়, তার জন্যই আমি আর আমার মেজদা জয়হরি বালা, ভোরের গায়ে ঘনকালো আঁধার লেগে থাকতেই, আমরা নাকেমুখে দুটো গুঁজে ছুটে বেরিয়ে যেতাম জনমজুরি খাটতে, দূরদূর গাঁয়ে ফসলের খেতে। সারাদিন জমিতে খেতমজুর খেটে, চারআনা আটআনা কখনও একটাকা, রোজগার করতাম। সেই সামান্য পয়সায় কোনওমতে আধপেটা খেয়ে টিকে থাকতাম।

এল ফসল ফলানোর দিন, বীজবোনা চাষের সময়— যখন আকাশ-সূর্য পৃথিবীতে ঢালছে কড়া রোদ। সেই সময় মেজদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে, গ্রামের মাঠে, খেতের আলে ঘুরে ঘুরে কাজ খুঁজে বেড়াতেন।

দূর গাঁয়ের মাঠে চাষের জমিতে, ধান পাটের নধর চারা গজিয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে অসংখ্য আগাছা ঘাস— যা ফসলের ক্ষতি করে, সেই আগাছা ফালতু ঘাস নিড়িয়ে টেনে তুলে ফেলতে, খেতমজুরের চাহিদা প্রত্যেক কৃষকের ছিল।

উদ্বাস্তু শিবিরে কয়েক হাজার মানুষ, সবারই তো ডোল বন্ধ। সব তাঁবুতেই জোর অভাব, খাবার জুটছে না, কে কাকে সাহায্য করবে, একমুঠো ভাত দেবে, আধখানা রুটি ছিঁড়ে দেবে— এমন মানুষ ধারে কাছে নেই। উদ্বাস্তু শিবিরের বাইরে, গ্রামেগঞ্জে হাটে উদ্বাস্তুদের দেখলে, স্থানীয় মানুষজন মোটেই পছন্দ করে না। আর ডোল বন্ধ হওয়াতে স্থানীয় মানুষের কাছে উদ্বাস্তুরা যেন দু'চোখের বিষ। উদ্বাস্তুদের দেখলেই তারা মনে করত, কিছু একটা চাইতে এসেছে, কিছু একটা নিতে এসেছে— তাই তারা উদ্বাস্তু মানুষদের দেখলেই, খেপে যেত। তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত।

আমরা কাজের খোঁজে খেতমজুর খাটবার জন্য, যখন জমির আল দিয়ে হেঁটে যেতাম, তখন কোনও কোনও চাষি আমাদের দেখলেই খেপে যেত, যা মুখে আসত তাই গালি দিত। বলত, আরে রিপুগুলান এখানেও মরতে আসছে, যা যা এখানে কোনও কাজ নেই, সরকারের পোষ্যপুত্ররা মাঠ কুড়াতে এসেছে। এই রিপুরা ভাগ এখান থেকে। চাষিরা আমাদের তাড়িয়ে দিত।

সেদিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। দু'দিন আমাদের তাঁবুতে উনুন জ্বলেনি, ঘরে একটা দানাও ছিল না। আমরা আগের দিন খেতমজুর খাটতে গিয়ে শুধু হাতে ফিরে এসেছিলাম। তারও আগের দিন সারাদিন বৃষ্টি ছিল। এ দু'দিন কেবল জল খেয়ে কাটিয়েছি। পেটে খিদের আগুন জ্বললে কি ঘুম আসে! আমরা রাত থাকতে উঠে দুই ভাই রেললাইন ধরে হেঁটে বহুদূরে কাজ খুঁজতে চলে গেলাম। সোমরা গ্রামের মাঠে একটা ফসলের খেতের আলে দাঁড়ালাম। চাষি জমির আগাছা টেনে ছিঁড়ে আলে স্তূপ করে রাখছিল। গোল মাথা, হলদেটে মুখ, মোটা বেঁটে চাষি তাকাল। মেজদা হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, আমরা খেতে জনমজুরি খাটব বলেই ঘুরছি। আপনার খেতে কি খেতমজুর খাটাবেন দাদা? খুব ভাল করে আগাছা ঘাস নিড়িয়ে দেব। খেতের কাজ সব করার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। দাদা খুব বিনীত ভাবে আবেদন জানালেন কৃষকের কাছে।

চাষি মেজদার কথা তো শুনলই না, উলটে আমাদের দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, এই যে এত সকালে রিপুরা কী মতলবে? আশা করি তোদের কোনও শয়তানি ফন্দি নেই। যেন শুনতে না হয় স্থানীয় চাষির সঙ্গে সকালেই

কাজিয়া বাঁধিয়েছিস। তা হলে মাঠ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। কতই তো মুরোদ তোদের শুনি, তা লেজ গুটিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলি কেন? ওরে ঠেলা-খাওয়া বেজন্মার জাত— তোদের দিয়ে ভুঁইতে কাজ করাব না, দাঙ্গাবাজ ছোটজাত নমঃ, বামুন-কায়েতের জমির ইজ্জত আছে। অচ্ছুত রিপু কোথাকার, ভাগ এখান থেকে। কৃষক আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইল। ঘৃণায় জমির আলে একদলা থুথু ছুড়ে ফেলল।

মেজদার কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। এতবড় অপমানজনক কথা চাষির মুখে শুনেও। তিনি চূড়ান্ত বিনয় আর শ্রদ্ধার সঙ্গে চাষিকে ফের বললেন, দাদা, বড়দা, একথা বলছেন কেন? আমরা তো উদ্বাস্তু, দেশভাগের বিপদে পড়েই প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সহযোগিতা না-করলে আমরা কী করে বাঁচব। আপনার কাছে কাজ চাইছি, খেটে দু'টি পয়সা চাইছি। আমরা তো খাটতেই এসেছি। দেশে আমাদেরও জোতজমি খেতখামার ছিল। আগাছা ঘাস নিড়াতে আমরা খুব ভাল পারি। দাদা, আমাদের খেতে লাগিয়ে দেখুন, কেমন কাজ করি, দেখতে পাবেন।

চাষির মন ভিজল না। চোখেমুখে ঘৃণা উগরে দিয়ে বলল, অচ্ছুত ছোটজাত, তোদের জমিতে কাজ করতে দিলে আমার জাতটাই চলে যাবে। যা ভাগ এখান থেকে। আর ও সব মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। তোমরা হলে সরকারের পোষ্যপুত্র, তোমাদের দাবির তো শেষ নেই। এদেশে এসে আমাদের সমস্ত কিছুতেই ভাগ বসাচ্ছ। এই সময়ে চালের দামটা কী করে বেড়ে গেল। তোদের অন্য বাজারে কোনও জিনিসে হাতই ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। কানে আসছে সরকার তোদের জমি দিচ্ছে, বলদ দিচ্ছে, ঘরবাড়ি করার টাকা দিচ্ছে, যখন তোদের সব কিছুই হচ্ছে তবে আর আমাদের জমিতে কাজ করতে আসছিস ক্যান? যা ভাগ এখান থেকে। চাষি ফের থুথু ফেলে নিজের কাজে মন দেয়। গোল মুখ হাঁড়িমাথা চাষিটি একবার ফিরেও তাকাল না।

চাষির তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও আমার মেজদা, কোনও প্রতিবাদই করলেন না বরং উলটে তিনি ফের বিনীত ভাবে বললেন, ঘরে আমাদের একটুও খাবার নেই। আজ যা আয় করব তাই দিয়ে খাবার কিনে নিয়ে যাব। তা না হলে উপোস করে মরতে হবে। বড়দা, আমাদের আজকের দিনটা অন্তত খাটিয়ে নিয়ে দু'টি পয়সা দিন। দেখুন কী ভাবে জমির আগাছা ঘাস সাফ করে দিই। একটু দয়া করুন বড়দা। মেজদা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন।

পথে এসো বাছাধন, সরকারও তোদের ওপর খ্যাপা। ছোটজাত দেশটা তো তোরাই ভাগ করেছিস, তোরা বাঙালরা হলি ছোটজাত, অস্পৃশ্য। তোদের যে ভাল করবে, তারই সর্বনাশ করিস তোরা, আবার তোরা তো শুনছি জাতপাতের ভেদ তুলে দিতে চাইছিস। এখন মজাটা বুঝতে পারছিস তো? চাষি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে থামল।

এত সব কড়া কড়া কথা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। আমার মনটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাগ সংযত করেও চাষির কথার মধ্যেই ফেটে পড়ে বললাম, দয়া করে আপনি আমাদের জাত তুলে আর কিছু বললেন না। আমরা দেশভাগ করেছি, জাতপাতের ভেদাভেদ তুলে দিতে চাইছি— এ সব বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন। যে ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, মানুষকে অস্পৃশ্য বানায়, তাকে ত্যাগ করাই ভাল। তাকে না-মানাই মানবিকতা।

আমার প্রতিবাদে কৃষক একেবারে খেপে লাফিয়ে উঠল। বন্য রাগে কাঁপতে থাকল, তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলল, আরে পুচকে রিপু, শিকনি-পড়া বেজম্মাটাকে থামা। ওটার আস্পর্ধা তো কম না, আমার মুখে মুখে কথা বলছিস, কোন সাহসে এই বেজম্মা, একে কেন এনেছিস! যা এখান থেকে সরে যা আমার সামনে থেকে, জমির আল থেকে।

চাষির হিংস্র রাগ থেকে মেজদা আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন। প্রচণ্ড রেগে গেলে উদ্বাস্তুদের এরা খুন করতে পারে। ভয়ে আতঙ্কে বুজে-আসা গলায় যতদূর সম্ভব বিনীত ভাবে বললেন, এ আমার মায়ের পেটের ভাই, খুবই ছেলেমানুষ তো, বড়দের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় এখনও শেখেনি। তার পর স্কুলে যায় লেখাপড়া শিখছে একটু তো!

মেজদাকে কথা বলা থামিয়ে দিয়ে, চাষি বিদ্রূপ করে বলল, লেখাপড়া শিখছে বলেই তো বেয়াদপ হচ্ছে। তোরা মনে রাখিস, ছোটলোক লেখাপড়া শিখলেও বামুন হয় না, কায়েতও হয় না— বেয়াদপ হয়। ছোটজাত ছোটজাতই থাকে। যা যা, তোদের মুখ দেখাও পাপ। যা যা বেশি কথা বললে, মুখে কোদাল মেরে তাড়াব। সর এখান থেকে রিপুর দল, সর।

ফের আমি প্রতিবাদ করতে যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, মেজদা আমাকে ঠেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বললেন, ও একটা বাচ্চা ছেলে, ওর কথা ধরবেন না দাদা। ওকে ক্ষমা করে দিন। ও এখনও দুনিয়া দেখেনি, দুনিয়ার হালচালও বোঝে না।

সে দিন আমরা অন্য এক কৃষকের জমিতে খেতমজুর খেটে বারো আনা

রোজগার করে চালডাল কিনে তাঁবুতে ফিরেছিলাম, তখন সন্ধ্যা ঘুরে গিয়েছিল।

ভুঁই নিড়ানো ভুঁই রোয়া, ধানকাটার গোন পড়লে জনমজুরি খাটতে যেতাম, স্কুলে আর যাওয়া হত না। কিন্তু আমার মতো বাচ্চামানুষকে খেতমজুর নিতে অনেক কৃষকই ছিল গররাজি। জমিতে পঙ্‌ক্তির বন মেরে, ঘাস তুলে পঙ্‌ক্তি নিয়ে অন্যান্য খেতমজুরদের সঙ্গে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। ফলে আমাকে অর্ধেক খেতমজুরের মজুরি দিত। কখনও-বা আমার পঙ্‌ক্তিতে ঘাস তুলে এগিয়ে যাওয়া পঙ্‌ক্তির পিছনে আগাছা-ঘাস মালিক যদি খোঁজ করে পেত, তবে আমাকে আর খেতমজুরের মজুরি বা দাম দিত না। যদিও বা কোনও কৃষক আমাকে খেতমজুরিতে নিত, ছোটমানুষ বলে অর্ধেক মজুরি দিত— যাতে একটা ছোট্টবাচ্চারও পেট চলে না। অথচ আমাকে খাটতে হত সবার থেকে বেশি।

কিন্তু জীবন যত বেশি কঠোর হয়ে উঠত, নিজেকে তত বেশি দৃঢ় এমনকী বয়স্কর খাটুনি খাটতে, নিজেকে তামিল দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতাম। নিখুঁত ভাবে প্রতিটি আগাছা, ঘাসবনের মূলসমেত আমি নিড়ানি মাটির গভীরে চালিয়ে উঠিয়ে আনতাম। কঠোর অধ্যাবসায়, অপরিসীম পরিশ্রম করে ফসলের জমিতে আমার পঙ্‌ক্তির আগাছা ঘাস, বন মেরে সকলের সঙ্গে সঙ্গে পঙ্‌ক্তি উঠিয়ে সকলের চোখে তাক লাগিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতেও কোনও মালিকের মন উঠত না। কারণ আমি বাচ্চামানুষ বলে। এমনই ছিল আমার দুর্ভাগ্য। তা ছাড়া আমি ছিলাম নিচুজাত, উড়ো আপদ— মাগনা খাটিয়ে নিয়ে শেষে গলা ধাক্কা দিয়ে জমি থেকে তাড়িয়ে দিত চাষিরা।

স্থূলবুদ্ধি কৃষকদের মন জোগাতে ফসলের জমিতে আমার গলদঘর্ম হয়ে যেত। আমি হাঁপাতে থাকতাম। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে যেত। তবু প্রাণপণে ফসলের জমির আগাছা ঘাসবন মূলসমেত নিড়িয়ে তুলে, পঙ্‌ক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতাম সবার সঙ্গে সঙ্গে। তবু স্বার্থে অন্ধ, উদ্বাস্তু-বিদ্বেষী মালিক চাষির শ্যেনদৃষ্টির শিকার হতাম, তাদের খপ্পরে পড়তাম। নানা উদঘট আর ইচ্ছাকৃত কম মজুরি দেবার, মজুরি না-দেবার চক্রান্তে আমাকে নাজেহাল হতে হত, প্রায় প্রতিটি ফসলের খেতে। তবু হাল ছেড়ে উপোস করে মরতে যাবার মতো নির্বুদ্ধিতা করিনি। এমনই জ্বালাকার, সুযোগ সন্ধানী চাষিদের ম্যারপ্যাঁচের অভিজ্ঞতায় ভরপুর প্রতিটি দিন, আরও ভয়াবহ রূপ নিয়ে আমার সামনে হাজির হত।

সারাদিন কাঠফাটা একটানা রোদে ফসলের জমিতে, তেতে-যাওয়া গরম মাটিতে বসে, আগাছা ঘাসবন নিড়ানি দিয়ে খুঁড়ে উপড়ে তুলে, পঙ্‌ক্তি সাফ

করে বিরামহীন গতিতে চলতে হত। মাঝখানে কোনও কোনও জমির মালিক কাঠখোলায় তাজা শুকনো মুড়ি, জলখাবার দিত। আর শুকনো মুড়ি চিবোতে একটু ফুরসত পাওয়া যেত। রোদ ঝাঁ ঝাঁ মাঠের জমিতে ফসলের মাঝে বসে, একটুকরো পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে বিশগাল মোটা লালচে চালের চক্কর কাটা মুড়ি, গলাধঃকরণ করে প্রাণপণে খেটে চলতাম।

মেঘভাঙা দিন, একটু একটু মৃদু হাওয়া দিচ্ছে, রোদের কড়া তাপে তাতেও গুমোট গরম, আমরা সাতজন খেতমজুর নধর কচি ধানচারার খেতে আগাছা ঘাসবন নিড়িয়ে চলেছি। নীল আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘের চলাফেরা। মাঝে মাঝে তীব্র রোদের ফালি ঝিকমিক করে উঠছে। আবার তিরতির করে মেঘের জমাট ঢেকে দিচ্ছে তাকে। রোদে ছায়ায় ছোট ছোট হলদে সবুজ ধানচারারা যেন রংবেরং হয়ে উঠছে। রৌদ্র-আলোছায়ায় অদ্ভুত ছোপধরা খেতখানা কী অপরূপ হয়ে উঠেছে। কচি কচি নধর ধানের চারার মধ্যে ডিঙি মেরে বসে মাথা ডুবিয়ে আগাছা ঘাসবন নিড়িয়ে চলেছি একমনে। সবুজ কচিধানের চারার আর সোঁদামাটির ঘ্রাণে ভরে যাচ্ছে মনপ্রাণ।

বেঁটেখাটো রোগা শুকনো মালিক-চাষি, আল বেয়ে গুটিগুটি হেঁটে এসে আগুপিছু সাতজন খেতমজুরের পঙ্‌ক্তি বরাবর থমকে দাঁড়ায়। মালিক-চাষি পা দুটো খানিকটা ফাঁক করে যেন চলার গতি সামলে মাথা নুইয়ে, আগাছা ঘাসবন খুঁটিয়ে দেখে। লোকটার পরনে খেটো মোটা ধুতি, কোমরে একটা লালচে তেলচিটে ময়লা গামছা, ফাঁস গিঁট দিয়ে বাঁধা। খালি পা, খালি গা, মাথায় বেজির লোমের মতো ক'গাছা চুল। মেটে মেটে ছাই-ওড়া রং-চটা চেহারা। এবড়ো-খেবড়ো মুখের পেশি কোঁচকানো, কালচে ভোঁতা ঠোঁট, ছেদলা-ধরা হলদেটে দাঁত, অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের কুতকুতে ছোট চোখটা যেন ট্যারা, ডান দিকের পুরু ভুরুর খানকটা বুঝি চেঁছে-ফেলা হয়েছে। ফিনফিনে সরু গলায় ফিসফিস স্বরে লোকটা তিনবার কেশে একটি কথা সুর দিয়ে বলল, হাত চালিয়ে আগাছা ঘাসবন না-মারলে এ-ভুঁই আজ আর উঠবে না। অ্যাঃ এই হতভাগারা, টেনে আগাছা ঘাস মার না। তোরা কী খাস না কিছু ! মরাঢোনা কুতকুতে পঙ্‌ক্তি মারছিস, এই হতভাগা রিপুরা, একটু টেনে মার। এ-ভুঁইটার আগাছা-ঘাস তুলে শেষ করতে হবে। মার না টেনে। কথা বলতে বলতে মানুষটা যেন তিড়িং করে লাফিয়ে আমার পিছনের পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়াল।

একটা ঢোলক মোটা মাদুলি গলায় প্যাঁচ-দেওয়া লাল সুতোতে ঝুলে আছে লোকটার হাড় ভাসানো বুকের গর্তে। লোকটা ঘাড় বেঁকিয়ে কঠিন চোখে আমার

দিকে তাকিয়েই স্বপ্ন দেখার মতো তন্ময় হয়ে গেল, আর মোটা রুপোর মাদুলিটা দোল খেয়ে চলল, শুকনো বুকের হাড়ে ঠেকে ঠেকে।

আমার মেজদা ছিলেন খেতমজুরের পঙ্‌ক্তির প্রথমে, তিনিই নিজের পঙ্‌ক্তির আগাছাঘাস মেরে শেষ করে ফোড়ন কাটলেন, তা আর বলতে হবে না দাদা। এই তো হয়ে গেল বলে। বড়জোর আর মাত্র তিন পঙ্‌ক্তি ঘাস মারলেই, খেত পরিষ্কার ঝকঝক করবে। মেজদা ঠাণ্ডা মেজাজে, নরম সুরে লোকটাকে ভিজিয়ে দিয়ে, উলটো দিক থেকে আমার ধরা পঙ্‌ক্তির আগাছা ঘাস মেরে চললেন।

মালিক-চাষি ঘেন্না ঘেন্না করে, ভুঁইতে পা পেতে হেঁটে, আমার পিছনে আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে, মাথাছাটা আগাছাঘাস বা বাদলা ঘাসের গোটা গোঁজ খেতে রয়ে গেছে কি না।

ঘড়ঘড় করে শ্বাস ফেলে মালিক-চাষি, আমার বাঁ পাশ কাটিয়েই পিছনে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেন কুঁকড়ে সিধে তাকাল আমার মুখের দিকে। তার কঠিন দৃষ্টিতে আমি জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল লোকটার কুতকুতে ট্যারা চোখজোড়া, তিরের মতো মর্মভেদী স্থিরদৃষ্টি একেবারে আমার হৃৎপিণ্ডে বিঁধিয়ে দিয়েছে। আমার শরীরের মাংসের তলায় সাদা হাড়গুলোকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। আর আমি অসহায় অস্থির হয়ে হাতের তালুতে মাটি ঘষে চলেছি। দিশেহারা চোখের মণি জুড়ে, আগাছা-ঘাসবন আর কড়া রোদে পোড়া মাটির তাপভাপ একসঙ্গে মিলেমিশে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমার অন্তরকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ছাই করে দিচ্ছে।

মালিক-চাষি আচমকা কী দেখে, আমার পিছনের পঙ্‌ক্তিতে নিড়ানো ভুঁইতে উবু হল, উদ্ধত ভঙ্গিতে একখানা হাত খোঁড়া মাটির দিকে বাড়িয়ে ধরেছে, তার লম্বা শুকনো আঙুলগুলো আরও লম্বা হতে হতে, মাটির গভীরে ঢুকে যাচ্ছে আর হাড়ভাসা মুখের কালো কোটরে বসা চোখ দুটোর মর্মভেদী দৃষ্টির ভেতর, ঝিকিয়ে উঠছে ধমক আর দাপট। তার সন্ধানী চোখের কোনা জুড়ে তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, অবহেলা আমাকে যেন ঘিরে ধরল। আমার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

মালিক-চাষি মোথাসুদ্ধ একটা বাদলাঘাস টেনে তুলল, আমার চোখের সামনে চিকন-সরু রোগা লিকলিকে ঘাসের হলদেটে ডগাটা, বাতাসে দোলাতে দোলাতে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, ওরে হতভাগা ছোঁড়া, ঘাটের মড়া, এটা কী? এটা কী, এটা কী তোর বাবার সেটা? সব টাকা জলে গেল, এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়লেই এরা আমার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সমস্ত ভুঁইঘাসে আগাছায় ভরে যাবে। হায় হায়, আমার সর্বনাশ করে তোদের ভাল হবে না, তোরা মরতে

ক্যান আলি। ওরে হতভাগারা, এই পুঁচকেটাকে ক্যান আনলি...।

চেঁচাতে চেঁচাতে আর হেঁচকি তুলতে তুলতে হাতদুটো অস্থির ভাবে আকাশে তুলে মালিক, যা মুখে আসে তাই গালি পাড়তে থাকে। বলে, ওরে ছোটলোকের বাচ্চা, বেজম্মা, ক্যান তুই আমার সর্বনাশ করছিস। ওরে ছোটজাত বেঈমান, বেজম্মা নমো, না পোদ, কাপালি না নাপিত, তোরে ছুঁতেও ঘেন্না করে, না-হলে মেরে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়তাম। শালা তোরে আমি একপয়সাও দেব না। মালিক আমাকে তেড়ে তেড়ে আসতে থাকল মারব বলে। আর রোগা দু'খানা পা, বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে জমির এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরপাক খেতে থাকে।

আমার মেজদা ভাবগতিক দেখে, পঙ্ক্তি ছেড়ে উঠে এসে, মালিককে বোঝাতে থাকেন। গলায় বিনয় ঢেলে দিয়ে বলেন, না বড়ভাই, না বড়ভাই, তা হবে কেন! এমন দু'-একটা এলেবেলে ঘাস, সব পঙ্ক্তি খুঁজলে পাওয়া যাবে। ওটা থাকে, থেকে যায়, কেউ সবটা খুঁটে মারতে পারে না। এতে এমনকী দোষের হয়েছে? দু-একটা এলেবেলে ঘাসবন সবার পঙ্ক্তি খুঁজলেই পাওয়া যাবে, কেউ পরিপূর্ণ নিখুঁত নির্ভুল ভাবে জমি নিড়াতে পারে না। এটা ছাড়ান দাও বড়ভাই। সবার পঙ্ক্তি খুঁজলেই দু-একটা এমন এলেবেলে ঘাস পাওয়া যাবেই। এটা ছাড়ান দাও বড়ভাই। মেজদা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেন মালিককে বোঝাতে।

কিন্তু মালিক নাছোড়বান্দা। কিছুতেই বুঝতে চায় না। অযথা আনাড়ির মতো অন্যায় ভাবে ঠেলতে থাকে। তার নিজের কথা জোর দিয়ে বলে চলে।

আমার মেজদাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি উঠে গিয়ে অন্য খেতমজুরদের পঙ্ক্তিতে খুঁজতে থাকেন, এলেবেলে ঘাস।

মালিকের গাঁয়েরই এক বুড়ো, মাথার সব চুল সাদা, মুখটা থেলো, চোখ দুটো বড় ভাসা-ভাসা। সে একনাগাড়ে তিরিশ বছর ফসলের খেতে কাজ করেছে, বর্গাদার পাকাচাষি, তার আগাছা ঘাস মেরে যাওয়া পঙ্ক্তি থেকে পাঁচ-সাতটা আস্ত ভাদলা ঘাসের কাটা মাথা তখন মেজদা উপড়ে তুলে, মালিকের চোখের সামনে ধরলেন। বললেন, দেখো বড়ভাই, দেখো। অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষের পঙ্ক্তিতেও আগাছাঘাস থাকে, থেকে যায়, কেউ নিখুঁত নিড়াতে পারে না। এটা স্বাভাবিক, এটা মেনে নিতেই হয়। ভাই আমার বাচ্চা মানুষ বরং ওর চোখের জ্যোতি আরও প্রখর নির্মল। ভাই তাই আরও সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র আগাছা ঘাসকে চিনে দেখে মেরে তুলতে পারে, কি ঠিক বলিনি বড়ভাই!

মালিক আগাছাঘাস দেখে থ হয়ে গেল। নিরুপায়। কিছু সময় ঝিম ধরে রইল, তার পর ফুলো নাকের ডগাটা আকাশে উঁচু করে তুলে যেন বাতাস

শুঁকছিল। শুঁকে শুঁকে ঘাড় বেঁকিয়ে একসময় মাটির দিকে তাকিয়ে, হেঁটে এল আমার কাছে, নরম সুরে বলল, ও খোকা, বাছা, আমার কথায় কষ্ট পেয়ে, দুঃখ কোরো না, কী বলতে কী বললাম। মাঝে মাঝেই মাথাটা আমার বিগড়ে যায়— জোয়ান ছেলের শোকটা তখন বুকের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আমি দিশেহারা হয়ে যাই। কোনও জ্ঞান থাকে না। বাছা কিছু মনে কোরো না। বেফাস বললাম, কী করব কও। এই তো ভুঁই, বছর পরে মালক্ষ্মীর মুখ দেখলাম, কও— মালিক-চাষির কথা শেষ হয় না।

আমি কর্মরত ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি, মালিকও আমার দিকে তাকিয়ে অনুশোচনা জানায়। মালিক নিজেই নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিয়ে, একেবারে জল হয়ে যায়। মেজদার কাছে সরে গিয়ে শুরু করে দেয়। কলকের তামাক সেজে আগুন তুলে দিয়ে হুঁকোটা সে টানতে থাকে। ফুরুত ফুরুত শব্দ ওঠে। একগাল ধোঁয়া বাতাসে এমন ভাবে ছাড়ে— দেখে মনে হয় একখণ্ড মেঘ বাতাসে ভাসছে।

আমি তখন জিরাট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। মালিক-চাষি সে কথা শুনে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমকুড়ি খেল, সশব্দে ইস ইস করতে থাকল। হুঁকো টানা বন্ধ করে বলল, আহা আহা খোকার প্রতি বড্ড খারাপ ব্যবহার করলাম। বড় ভুল হল আমার। বাছাটাকে কেন এমন কথাটা কলাম। মালিক-চাষি বারবার ঠোঁট চাটে, 'ইস ইস' শব্দ তোলে আর অসহায় মানুষের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। জলের শ্যাওলা ডাঙায় তুললে যেমন নেতিয়ে যায়— তাকে আর শ্যাওলা বলে চেনাই যায় না। মালিক-চাষির অবস্থা তখন ঠিক তাই। লোকটা যেন নেতিয়ে গেল আর দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ বদলে গেল।

সে দিন আমরা যত সময় তার জমিতে কাজ করেছিলাম, মালিক-চাষি আমাকে আর আমার মেজদাকে তোয়াজ করে চলেছিল সারাক্ষণ আর তাতেই আমার দু'চোখের সামনে মালিক-চাষির ভেতরের খোলামেলা মানুষটাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম।

আমার বুকের মধ্যে একটা গর্ব-ভরা সুন্দর উত্তেজনা বহন করে সে দিন ফিরে এসেছিলাম বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের তাঁবুতে।

এল ফসল কাটার, ঝাড়াই-বাছাই করার সময়— চাষের মাঠে তখন প্রচুর কাজ। এ সময় কিছু বাড়তিও আয় করে রাখা যায়। তাই স্কুল কামাই করেও খেতমজুর খাটতে ছুটতাম।

কাকগাছি গ্রামের এক বামুনের একখণ্ড পাকা ধানের জমির ধানগাছ কাটা-বাঁধা পৌঁছে-দেওয়া, ঠিকা নিয়েছিলাম আমি আর অনিল ব্যাপারী, যে আমারই বয়সি। পাঁচকাঠা জমির পাকাধান কাটা, বিচুলি বাঁধা আর বোঝা বেঁধে মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ঠিকা চুক্তিতে নিয়েছিলাম দু'জনে মাত্র ছ'টাকায়।

রোয়াধান কাটায় কাস্তে চালাতে, এরই মধ্যে আমি নিজেকে এমন ভাবে রপ্ত করেছিলাম যে, নাম-ডাকের ধান কাটিয়েরাও আমার কাজ দেখে থ হয়ে যেত। হাতের কাস্তে চোখে দেখা যাবে না, আমি ধানগাছের গোছ কেটে চলেছি। গায়ের বল নয়, কৌশলই ছিল প্রধান। আড়াই প্যাঁচে বিচুলির মুঠি বাঁধা বা আঁটি বাঁধাতেও আমার জুড়ি পাওয়া যেত না। কৌশল আয়ত্ত করা ছিল আমার জন্মগত ক্ষমতা। চোখের পলকে দু'-তিন মুঠি বিচুলির আঁটি বাঁধা কোনও ব্যাপারই নয়। আসলে শক্তি বা বলের কাছে আমি ছিলাম দুর্বল, অক্ষমও। মা-মরা, বাপ-মরা, ভাগ্যহত আমার চিমটে ক্ষয়াটে শুটকো শরীরটায়, কোনওদিনই তেমন জোর-বল হয়ে উঠল না। জোর না থাকলে বুদ্ধিটা তো খাটাতেই হবে। আর যদি না সেই জীবনটা জাঁতাকলে আটকে পড়ে, তবে তো রক্ষা নেই।

ধানকাটা বিচুলির মুঠি বাঁধা শেষ, ধানসমেত বিচুলির বোঝা বেঁধে মাথায় তুলে নিয়ে মালিকের বাড়ি প্রায় আধ কিলোমিটার, মাঠ-ডাঙা পেরিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। চুক্তি যখন দু'জনার— বোঝাও সমান মতো বয়ে নিতে হবে। প্রথম খেপের বোঝাটা প্রাণপণে বয়ে, মালিকের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। দ্বিতীয় বোঝা মাথায় তুলে নেবার পর, বোঝার ওজন প্রথম ভারী ভারী ঠেকেছিল, তবু মনে হল একটু কষ্ট হলেও একেবারেই বয়ে নিয়ে, মালিকের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব। কিন্তু না, তা হল না। ভুলটা আমার ভাঙতে শুরু করল, একটু এগিয়ে যেতেই। রোয়ার মাঠটা ছাড়িয়ে গাঁয়ের ধুলোভরা মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছি, মাথায় ভারী ধানসমেত বিচুলির বোঝা।

মাথায় তোলা বোঝার ওজনটা ভারী হতে শুরু করলে, নিরেট লোহাও হার মানে। যে বোঝার ওজন আমি বইতে পারি না, তা মাথায় একবার চাপালে সরাবার কোনও উপায় থাকে না। ফাঁকি দেবারও কোনও জায়গা থাকে না, কৌশলে কাজ হয় না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও ভোঁতা হয়ে যায়। বোঝার ওজন ক্রমশ বাড়তে থাকে। বোঝা তো বোঝাই— ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির সঙ্গে শুইয়ে দিতে চায়। গাঁয়ের পথে পা দিতেই আমার মনে হল, প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায় যায়। বুকের মধ্যে প্রাণ ডানা ঝাপটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য, ছটফট শুরু করে দিল। বোঝার ভারে প্রাণের ছটফটানিতে, ঘেমে-নেয়ে মরিয়া হয়ে উঠলাম।

কিন্তু মাথা থেকে পাকা ধানের বোঝা মাটিতে ফেলবার জো নেই। ধানের মটমটে শুকনো শিষ সব মাটিতে ধুলোয় ঝরে পড়বে। বোঝার ভারে আমি দিশেহারা। সে যে কী শিহরণ, কী ছটফটানি আর অস্থিরতা শ্বাস ঘন হয়ে প্রাণ বুঝি ওষ্ঠাগত, আমার অন্তরআত্মা থরথর করে কাঁপতে থাকল— শ্বাস টানতে বুকের হাড়গোড় বুঝি বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। নীল ধস স্রোত হয়ে বয়ে যায় সারা শরীরে। মরিপড়ি মাথার ভারি বোঝা ফেলতে পারলেই দম নিয়ে বাঁচি। দম ফুরিয়ে যায় যায়। হাত-পা খিল লেগে মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে, বামুন মালিকের উঠোনের অদূরে এবড়ো-খেবড়ো ভুঁইয়ে, দুর্বাঘাসে ঢাকা, কাঁকরমাটি ভরা জায়গায়, বোঝাসুদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

শ্বাস যেন ফুরিয়ে গেছে। অস্থির হয়ে গোঙাচ্ছি-কাতরাচ্ছি— বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। ভয়ংকর একটা কিছু ঘটে গেছে, নৈরাশ্য-ভরা হাল ছেড়ে দেওয়া ভাব আর ছানাবড়া চোখে সোজা তাকিয়ে রইলাম ঝরে-পড়া ধানশিষের দিকে...মৃত্যুর শীতলতায় যেন আমি বুড়ে যাচ্ছি...ডুবে যাচ্ছি মৃত্যুর আঁধারে...।

এরই মধ্যে বামুন মালিক ছুটে এসে বাঁ-পা দিয়ে জোরসে ঘনঘন লাথি মারতে থাকে আমার কোমরে, পিঠে মাথায়। আর চিৎকার করে বলতে থাকে, ওরে বেজম্মা, ছোটজাত তোর মাকে ইয়ে করি, পারিসনে তো আসিস ক্যান, না-খেয়ে মত্তে পারিসনে, মর মর মর— লাথির পর লথি চালাতে থাকে আর ঘৃণায় পচা থুথু ছিটাতে থাকে আমার চোখমুখ লক্ষ্য করে। বামুন-মালিক লাথি, কিল, চড় দিয়ে চলেছে, মুখে চালাচ্ছে অশ্রাব্য গালাগালি।

ওরে ঘাটের মড়া, পারিস না তো আসিস ক্যান, ওরে ঘাটের মড়া রিপুর বাচ্চা— পারিস না তো অসিস ক্যান? বেঁটেখাটো অল্প চুলের মাথা, মানুষটা তিড়িং তিড়িং লাফাতে থাকে, খাটো হাত দু'খানা নাড়াতে থাকে, ট্যারা দৃষ্টি দিয়ে যেন আমার চোখে মুখে আঁচড় কাটতে থাকে। উত্তেজিত ভাব চড়িয়ে রেখেই ফের খিঁচিয়ে উঠল, ওরে ছোটজাত রিপুর বাচ্চা, ড্যাবডেবে চোখে কী দেখছিস, ওরে শুয়োরের বাচ্চা, ওঠে ঝরা ধান গুলান খুঁটে আন না, উল্লুক কোথাকার, মরতে আর জায়গা পাসনি। আন না, রিপুর বাচ্চা। মালিক বামুনের মুখের কষে থুথু গড়াচ্ছে তবু চিৎকার করে মুখে যা আসছে তাই গালাগালি দিয়ে চলেছে।

আমার বুকের, হাতের হাঁটুর তলায় অসমান মাটি যে অনেকক্ষণ আগেই সরে গেছে। এখন অপার্থিব স্রোতে ভেসে আছি। অসাড় শরীর অস্থির হয়ে

কেঁপে চলেছে। দু'হাতের মুঠিতে মাটি খামছে ধরে শ্বাস টানছি প্রাণপণে, নড়বার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই। মারের চোটে খাবি খাচ্ছি থেকে থেকে।

এই বেশ্যার বাচ্চা, কী কচ্চি কানে যাচ্ছে না, এই হতভাগা ঘাটের মড়া, ওঠ না, উঠে ঝরা ধানগুলান সরিয়ে আন না। মালিক-বামুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ছুরির ধারালো ডগাটা আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন খুঁচিয়ে চলে আর ঘৃণা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তার বাঁ হাতটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করে। মালিক-বামুন ঘাড় বেঁকিয়ে ঘৃণায় সুর চড়িয়ে বলে, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে পারিসনে, ওরে খাটাস, ওরে জান টঙকো, ওরে পেটমোটা, ধানের বোঝাটা এ দিকে টেনে আন না।

আমার সঙ্গী খেতমজুর অনিল ফের আর এক খেপ ধানের বোঝা উঠোনে ফেলে ছুটে এল আমার কাছে। থমকে দাঁড়িয়ে অনিল ব্যাপারী করুণ অসহায় চোখে আমার অবস্থা দেখতে থাকে। তা দেখে মালিক বামুন গর্জে ওঠে। বলে, ওরে রিপু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস, বাকি ধানগুলান মাঠ থেকে আন না উঠোনে, যা ধান আগে আন, তার পর পিরিত কর, আগে ধান আন মাঠ থেকে। যা যা দেরি করলি পয়সাও দেব না। মালিক ধমকাতে থাকে সমানে।

নিরুপায় অনিল ফের ছুটে যায় মাঠের খেতের বাকি ধানগুলি বোঝা বেঁধে বয়ে বাড়ি আনতে।

এ দিকে মালিক ক্ষেপে আগুন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, কিছুতেই তার রাগ পড়ে না। রাগে ফেটে পড়ে বলে, শোন ছোটজাত, পেটমোটা, একটা ধান যদি এই ঘাসে ধুলোয় পড়ে থাকে মজুরি তো পাবি না, উলটে খেসারত গুনে দিয়ে ঘরে ফিরবি। ওরে আধপোড়া শ্মশানের কাঠ— মরলি নাকি? ওরে শকুন, মড়া খাওয়া শকুন, ওঠ না, হারামজাদা, মরলি নাকি!

আমি অসহায় হামাগুড়ি দিয়ে, নিজের হাত-পা বহু কষ্টে গুটিয়ে এনে, কাঠ হয়ে বসে থাকি। ব্যথার চেতনায় ভেতরটা যেন ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে, আমার বোধটাকে জাগিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু আমি অসহায়ের মতো নির্বাক হয়ে বসে রইলাম, আমার উত্তপ্ত মাথার মধ্যে নানা রকম উলটোপালটা ভাবনা টগবগ করে ফুটতে লাগল। ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলল, ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠলাম।

আমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে, মালিক-বামুন দ্বিগুণ খেপে যায়। রাগে যে অন্ধ হয়ে নিজেই ধানের ভারী বোঝাটা ধরে টানে। কিন্তু ধানের ভারী বোঝা একটুও নড়ে না। মালিকের জিদ চেপে যায়। বোঝা তবু অনড়। মালিক যখন এমন করতে ব্যস্ত। ওদিক থেকে মালিকের বউ হন্তদন্ত হয়ে ছুঠে এল, কালো

মুটকি, বেঢপ চেহারা, ভারী থলথলে একতাল চর্বি, ট্যারা চোখ দুটো যেন জ্বালিয়ে কোমরে খাটো আঁচল জড়াতে জড়াতে মালিককে তাতাতে, সমানে চিৎকার করছে। বলছে, এই রিপুগুলান এক-একটা পরগাছার গুষ্টি, কখনই দেখবে না যে, এরা ঠিকঠাক কাজকম্ম করছে। এই অকম্মা ধাড়িগুলো জানে শুধু কাজে ফাঁকি দিতে আর মালিকের ক্ষতি করতে। এরা নেমকহারাম সব।

বামনির ভঙ্গি দেখে আমি প্রথমে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। সামনে ধানের বোঝার পাহাড়, ঝরা ধানের শিষ ছড়ানো, এ দিকে অনিল বাকি বোঝা নিয়ে ফেরেনি। এরই মধ্যে অত্যাচারীর সঙ্গী এসে গেছে। বামনি যাচ্ছেতাই নোংরা ভাষায় বকাবকি করতে থাকল।

এরপরে আর আমার পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব ছিল না। তবু যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে বললাম, কেন মিছিমিছি আমাকে দুষছেন, আমি তো ইচ্ছা করে এখানে বোঝাটা ফেলিনি, হঠাৎ বেধে পড়ে গেছি, এটা একটা দুর্ঘটনা, মানুষের বিপদ তো ঘটতেই পারে। আমি খুব বিনয়ের সুরেই বললাম, অসহায় ভাবে দু'জনার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি অজান্তেই বামুনের রাগের আগুনে ঘৃতাহূতি দিলাম। হিংস্র বিদ্রূপে বামুন আর বামনি চিৎকার করে— বামনাই জাহির করতে থাকে। বামুন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, দু'দিন ধরে এই শুটকো ছোঁড়াটাকে লক্ষ করে যাচ্ছি। এই রিপুর বাচ্চাটা আমার মুখে মুখে অনবরত জবাব দিয়ে যাচ্ছে। ছোটজাতের এত বাড়। শালা ছোটজাত দু'পাতা পড়াশুনো করে জাতে উঠতে চাচ্ছে। থু থু।

এত কথার দরকার কী কর্তা, ওর পাছায় কষে ক'টা লাথি মারলেই, মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। মারো, ওর পাছায় লাথি। বামনিবেটি তার স্বামীকে উত্তেজিত করে তুলল।

এ দিকে অনিল তখন বোঝা নিয়ে উঠোনে এসে গেছে। অনিল ব্যাপারী বোঝা উঠোনে সাজিয়ে রেখে ছুটে এসে, আমার পড়ে যাওয়া ধানের বোঝা টেনে তুলে উঠোনে নিয়ে যায়। ফিরে এসে সে খুঁটে তুলতে থাকে ঝরা শিষ। আমি তার অনেক আগে থেকেই ধানের শিষ জড়ো করছিলাম, অনিল সাহায্য করতে থাকল।

মালিক-বামুন তীব্র বকুনি শুরু করল। বলল, তোরা এখানে কাজ করতে এসেছিস না মালিকের ক্ষতি করতে এসেছিস। এই সব বন্ধ কর। আমি নিজে নিজেই করতে পারব। ওঠ, এক পয়সাও পাবি না তোরা... ওঠ বলছি। রাগে মালিক বামুন তোতলাতে থাকে...।

অমন নিষ্ঠুর হয়ো না মালিক। ইচ্ছে হলে আরও দুটো লাথি মারুন, কিন্তু আমাদের মজুরি কাটবেন না, না খাইয়ে মারবেন না। চোখের জল যেন পড়ে যায় এমন ভাবে মিনতি করে অনিল বলতে থাকে।

কিন্তু মালিক-বামুনের পাযাণ হৃদয় তাতে বিন্দুমাত্র গলল না। উলটে মালিক-বামুন আমাদের জাতবর্ণ তুলে গালি দিতে থাকল। প্রকৃতপক্ষে ঠিকা চুক্তিমতো, করণীয় সব কাজই আমরা করে ফেলেছিলাম। যে ধানের শিষগুলো ঝরে পড়েছিল উঠোনের বাইরে, তা খুঁটে খুঁটে রেখেও আসলাম আমরা। ঠিক চুক্তি মতো আমরা টাকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অপমানে ঝুলে পড়া মাথা নিয়ে অনিলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। এক থমথমে নীরবতা আমাদের মধ্যে। কিন্তু মালিক বামুনের টাকা দেওয়ার গরজ দেখা গেল না।

অবশেষে অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না-পেরে নিস্তব্ধতা ভেঙে বললাম, মালিক, আমাদের চুক্তিমতো সব কাজই তো সমাধা করলাম। কোথাও কিছু পড়ে নেই। সব ধান উঠোনে গাদা করা হয়েছে। এখন তো আমাদের টাকা দিতে, কোনও অজুহাত খাড়া করা অন্যায় হবে মালিক। বেলা ডুবে গেছে, আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাব। আমাদের টাকা দিয়ে দেন, আমাদের প্রতি অন্যায় করবেন না। আমরা বাস্তুহারা মানুষ। এই টাকাতে চাল কিনে নিয়ে গেলেই খাওয়া হবে।

আমার প্রতিবাদে মালিক-বামুন ফের ফেটে পড়ে বলল, দেখ হে ছোকরা, মনে হচ্ছে দু'পাতা পড়াশুনো করেছ বলে, ভেবো না আমাকে জ্ঞান দেবে। তোমার জেনে রাখা দরকার, ছোটজাত নমো, পোদ, নাপিত, মালো ইত্যাদি লেখাপড়া শিখলেও ব্রাহ্মণ হতে পারে না। ছোটজাত— ছোটজাতই থাকে। আর সে যতই লেখাপড়া শিখুক, বামুনকে জ্ঞান দিতে পারে না। বামুন সবার সেরা।

লাথি খেয়ে, বকুনি গালি, খেয়ে, আমার ভেতরে আগুন জ্বলছিল, তখন, তাই ইটের জবাবে পাটকেল ছুড়তে তৈরিই ছিলাম। বললাম, আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমরা উদ্বাস্তুরা সব আপনার পায়ের তলায় থাকার যোগ্য? আমরা কি সত্যিই তাই? আপনাদের মতো আমরাও কি রক্তমাংসে তৈরি মানুষ নই? মাতৃগর্ভে আপনাদের মতো আমরাও নয় মাস দশদিন ছিলাম। আমরা সবাই মানুষ, আমাদের মধ্যে মৌলিক কোনও প্রভেদ নেই...।

বক্তৃতার ঢংয়ে আমি আমার যুক্তি তুলে ধরলাম মালিক-বামুনের সামনে।

এই ছোকরা, পেটে এক ছটাক পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়ে, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না, আমার জমির ধান নষ্ট করেছিস তোরা, তোদের কোনও টাকাই আমি

দেব না। এখান থেকে সরে যা, না-হলে গ্রামের লোক ডেকে, মেরে হাত-পা বেঁধে পুলিশের হাতে তুলে দেব। যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, না-হলে ঠেঙিয়ে তাড়াব। মালিক-বামুন ধেয়ে এসে আমাদের মারতে চেষ্টা করে, তাড়াতে থাকে। আর আমরাও ভয় পেয়ে গেলাম পুলিশের কথা শুনে। মাথা নিচু করে মালিক বামুনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। কষ্টে দুঃখে অপমানে চোখ ফেটে অশ্রু নামল। আমরা দু'জনে পরস্পর কথা বলবার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। গত তিন দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই অন্যায়, অবিচার, অপমান বুকে শেল হয়ে বাজতে থাকল।

মাঠের পায়েচলার পথে, হাঁটতে হাঁটতে কেঁদে আকুল হয়ে বললাম, অনিল আমরা নমঃশূদ্র আর পৌণ্ড ক্ষত্রিয়রা কি কোনও দিন সুখের মুখ দেখতে পাব না! কী অপমানের, ঘৃণার জীবনেই না আমরা বেঁচে আছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা সারাজীবন ধরে বামুন কায়েতের অন্যায় অত্যাচার ঘৃণা সহ্য করে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বামুনরা, অন্যায় অবিচারের বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছে, ঘৃণা করছে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে— এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। না-হলে সারাজীবন আমাদেরও অন্তহীন কষ্ট, ঘৃণা, অন্যায় অত্যাচারের মধ্যেই জীবন কাটাতে হবে।

আমার ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ঘৃণায় কষ্টে ফুঁসে উঠতে দেখে, অনিল ঘুরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে, এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার দু'চোখে যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে দেখতে পেলাম— যা আমাদের জীবনকে বন্দি করে রেখেছে। অনিল বন্দি অসহায় মানুষের মতো আমার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বলল, যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা এই অন্যায়, অবিচার, ঘৃণা অপমান থেকে কী ভাবে মুক্তি পেতে পারি আমরা— সেটাই বল ভাই! আমাদের মতো মানুষের কোনও ক্ষমতাই নেই, খেয়েপরে বেঁচে থাকাটাই সমস্যা এখন। মালিকের দোরে খেটেখুটে কিছু আয় করে খুদকুড়ো কিনে খেয়েও তো বেঁচে থাকছি। সেটুকু না থাকলে উপোস করে আমাদের মরতে হবে, ভাই।

আমি খেতমজুরি খাটব না, বলছি না, খেটে খেয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। ক্ষমতা লাভের জন্য নিজেকেও তার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। অধিকার লাভ করতে গেলে ক্ষমতায় উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়, না-হলে কিছুই লাভ করা যায় না। মানুষের যোগ্য অধিকার মর্যাদা লাভ করার জন্য শিক্ষিত হতে হবে। কথা বলছিলাম আর হাঁটছিলাম আর আমার মনপ্রাণ যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। মালিক বামুনের উঠোনে যা যা ঘটেছিল তা আমার চোখে জীবনের

ভবিষ্যতের পুরো ছবিটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। চোখ ভরা জল নিয়ে হতাশা বুকে চেপে আমি ধারালো মাটির কঠিন পথে খালি পায়ে হাঁটতে থাকলাম...।

এই ঘটনা আমার শিকড় ছেঁড়া জীবনকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হল, দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষত ফের কাঁচা হয়ে উঠল। সেই দিন থেকে আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম। এই কষ্টকর হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ, আমার দ্বারা হবে না। জীবনে বোঝা টেনে আমি চলতে পারব না। লেখাপড়া শেখা ছাড়া আমার বাঁচবার কোনও পথই খোলা নেই। কিন্তু আমার চাওয়ার ওপর সব কিছু তো নির্ভর করে না। সাধের সঙ্গে সাধ্যেরও ক্ষমতা থাকা চাই। সাধ্য আমার ছিল না। রোজগার আমাকে কিছু করতেই হত, না-হলে পেটই চলত না। খেতমজুরের কাজ করতাম, জলে ভেজানো পচানো পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজ করতাম, মেলায় মেলায় হাটে হাটে ব্যবসায়ীর সাহায্যকারী হিসাবে মনোহারি দ্রব্য বিক্রি করতে যেতাম, ধানকাটা, ভুঁইরোয়া, পাতামারা, বিচুলি বাঁধার কাজ করতাম, কিন্তু রোজগার করার মতো যথেষ্ট সময় পেতাম না। আমাকে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত। সেখানেও যথেষ্ট সময় পেতাম না, পেটের চিন্তা আর রুটিরোজগারের পিছনে ছুটতে ছুটতে দিন যেত। তবুও হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেই আমাকে পড়াশুনা করতে হত।

নতুন নতুন মরশুম নতুন নতুন বিচিত্র সব কাজ নিয়ে আসত। ফসল ফলানোর সময় ভুঁই নিড়ানো আগাছা ঘাস তোলা, বর্ষায় কাদা পাকানো জমিতে পাতামেরে রোয়া। ফসলের খেত নিড়ানো, পচানো পাটের আঁশ ছাড়ানো, ধান পাকার সময় ধানকাটা, বিচুলি বাঁধা, ধানঝাড়া, পাটকাটা, আঁটি বাঁধা— অন্তহীন কাজের পিছনে ছোটাছুটি করতাম।

রাত পোহানোর অনেক আগেই গঙ্গার ঘাটের প্রথম খেয়া পেরিয়ে চার-ছয় মাইল পায়ে হেঁটে চলে যেতাম সাহেবডাঙা, সাগুেলের চর, মিলনপল্লি, সোমড়া, মধ্যডাঙা প্রভৃতি সব গ্রামের ডোবায়, কানাপুকুরে, বিলে, খালে, খানায়, মরা নদীর খাতে সারাদিন পচা কুঁই-ওঠা নোংরা জলে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে পচা পাটের আঁশ ছাড়াতাম, পাটের গাঁট বাঁধতাম। সারাদিন খাটুনির পরও কাজ শেষ হত না। ভেজা পাটকাঠির বোঝা মাথায় নিয়ে তিন-চার মাইল হেঁটে উদ্বাস্তু শিবিরে আসতাম। এ ছাড়া ঠিকে চুক্তিতে রবিবার, ছুটির দিন, খুব ভোরে স্কুলে যাওয়ার আগে কখনও বিকাল ও সন্ধ্যাটাও কাটিয়ে দিতে হত। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তবে আমার লেখাপড়া শেখা। কেবল তাই নয়, ঘরছাড়া, রাস্তায় ঘোরা কুকুরের মতো অনাহারে থেকে, অশেষ কষ্টদুঃখ অবহেলা ঘৃণা সব সহ্য করে,

তবে আমার স্কুলের পড়া চালিয়ে যাওয়া, বিদ্যা অর্জন করা...।

প্রতিবাদের আগুন জ্বলে

ক্ষুধা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবহেলা, অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের আঘাত খেতে খেতে মানুষ যখন শেষ অবস্থয় পৌঁছায় তখন সে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ক্ষুধায়, ঘৃণায়, বিদ্বেষে, অবহেলায় অন্যায় অবিচারে আর অত্যাচারের আঘাতে তার হতাশা আসে না, তার ভেতর জন্ম নিতে থাকে জেগে উঠতে থাকে প্রতিরোধ, প্রতিবাদের দৃঢ় মনোভাব, কর্মশক্তির অসাধারণ একটা জোয়ার, জীবন পরিবর্তনের জন্য নতুন পরিস্থিতি, ভাবনা, আদর্শ, সংগ্রামে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু শিবিরগুলির মানুষও ক্ষুধায় ঘৃণায়, বিদ্বেষে অবহেলায়, অন্যায় অবিচারে আর অত্যাচারের আঘাতে আগের মতো আর হতাশায় ভেঙে পড়েন না। এখন তাঁদের ভেতর জন্ম নিতে থাকে, জেগে উঠতে থাকে প্রতিরোধ, প্রতিবাদের দৃঢ় মনোভাব, কর্মশক্তির অসাধারণ জোয়ার জীবনকে বদলে নেওয়ার জন্য তাঁরা নতুন পরিস্থিতি, ভাবনা আদর্শ, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

উদ্বাস্তুদের জীবন পরিবর্তনের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি রক্ষার জন্য পশ্চিমবাংলার মধ্যে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য বলাগড় ট্রানজিট ক্যাম্পেও গড়ে উঠল ‘পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সাংসদ’-এর একটি শাখা— ‘বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি’। সমিতির উদ্যোগে, পরিচালনায় বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষজন সচেতন আলোচনা সভা, সম্মেলন, সমাবেশ থেকেই সর্বসম্মতিক্রমে দাবিসনদ তৈরি হল। তার মধ্যে প্রধানতম দাবিগুলি ছিল, উদ্বাস্তুদের খয়রাতি সাহায্য ‘ডোল’ সরকারকে চালু রাখতে হবে, যতক্ষণ না উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে এবং আশু সে ব্যবস্থা কার্যে রূপায়ণ করতে হবে। উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সবরকম সরকারি সাহায্য পুনরায় চালু করতে হবে। আর এই সকল দাবি যতক্ষণ না সরকার মানছে, ততক্ষণ বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির সদস্যগণ আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন এবং মিটিং মিছিল অব্যাহত থাকবে।

এই আমরণ অনশন ধর্মঘটের আন্দোলনে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে

পড়লাম। আমরণ অনশন আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি-পর্ব বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির নানা সম্মেলনে, সভায় কর্মী-প্রশিক্ষণ শিবিরের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকায়, ধীমান গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ, সম্পর্ক, সহৃদয়তা আরও ঘনিষ্ঠতর হল এবং উদ্বাস্তু শিবিরের আরও বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠ, নিবিড় ভাবে।

সমিতির কর্মীসভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল— 'বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি'র সদস্যাদের, আমরণ অনশন ধর্মঘটের দাবিসমূহ আবেদন পত্রে লিখে ভারত সরকার আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে দাখিল করতে হবে। আবেদন বা দাবিপত্র লেখা এবং দাখিল করার গুরুদায়িত্ব প্রথমে দেওয়া হয়েছিল সেই মুকুন্দ বিশ্বাসকে। মুকুন্দ বিশ্বাস দাবি অভিযোগ পত্রের বিষয়বস্তু সবই ঠিক করলেন, কিন্তু তিনি লেখার দায়িত্ব কিছুতেই নিলেন না। কারণ তিনি ভয় পেয়ে সরে গেলেন এই অজুহাত খাড়া করে যে, তাঁকে এবং তাঁর হাতের লেখা উদ্বাস্তু শিবিরের সুপার খুব ভাল ভাবেই চেনেন। ফলে তাঁর বিপদ হতে পারে। সুতরাং মুকুন্দ বিশ্বাস কোনও দাবি পত্র নিজের হাতে লিখলেন না এবং এই আমরণ অনশন ধর্মঘটে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণও করলেন না। তাই সেই কর্মীসভায় নতুন করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল— অনশন ধর্মঘটের দাবি-পত্রগুলি সবই আমাকে লিখতে হবে। সভায় সমবেত সদস্যগণের দাবি আমি কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলাম না। গুরুদায়িত্ব অম্লানবদনে কাঁধে তুলে নিতে হল। কারণ সেই সময়েও আমার হাতের লেখা খুবই সুন্দর ছিল। তাই দাবি-পত্রগুলি কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে লিখে দিয়েছিলাম ধীমান গোঁসাইয়ের হাতে।

প্রায় দশমাস হতে চলল বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের খয়রাতি সাহায্য 'ডোল' বন্ধ। ক্ষুধায়, দুশ্চিন্তায়, হতাশায়, অসহায়তায় কোনও মানুষের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব, পানীয় জলের অভাব, ছেঁড়া তাঁবুতে বর্ষার জলে, রাতে শিশিরের জলে মানুষ ভিজছে। অনেকেরই পরনে ছেঁড়া তেনাও জুটছে না। মানুষের দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই, অনেকেই আধপেটা খেয়ে বাঁচছেন, কেউ না খেয়ে থাকছেন, অনেকে ক্ষুধায় ধুকছেন। মানুষগুলি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকছেন, বেঁচে থাকছেন।

এরই মধ্যে আমরণ অনশন-ধর্মঘটের কর্মসূচির খবর উদ্বাস্তু শিবিরে প্রচার হতেই মানুষজন যেন বাঁচার আশায় জেগে উঠলেন। তাঁরা শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রম করতেন, আধপেটা খেয়ে থাকতেন, না-খেয়ে থেকেও কর্মশক্তির

অসাধারণ জোয়ার আনলেন জীবনে। লড়াই-সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার শিক্ষায়, সবাই শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকলেন, হতে থাকলেন জীবন-সচেতন। উদ্বাস্তু শিবিরে ঘন ঘন সভাসমিতি, মিটিং-মিছিল চলতে থাকল। গোপনে আন্দোলনের কর্মীদের কর্মশিবিরও হতে থাকল। বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে পরিবর্তনের আশায় একটা সাজো সাজো রব যেন ধ্বনিত হল।

সে দিন দেখি আমার সহপাঠী অনিল মণ্ডল ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখ তার উদ্ভাসিত, গাল দুটো যেন জ্বলন্ত আগুন। ওর আনন্দোদীপ্ত উত্তেজনার ধাক্কায় হতাশা পালিয়ে যেতে চায়। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সে বলে, জানো? আরম্ভ হয়ে গেছে! বেশ সাড়া পড়ে গেছে সবার মধ্যে। অনিশ্চয়তা, হতাশা আর হীনমন্যতার ঘেরাটোপ থেকে সব বেরিয়ে আসছেন। ওদের মুখগুলিতে আজ যেন ধারালো কুড়ুলের ধার। তাঁবুতে তাঁবুতে দল বেঁধে নানা পরামর্শ করছেন। বাঁচার পথ খুঁজছেন। মানুষ জেগে উঠছেন, মানুষ বদলে যাচ্ছেন...। অনিলের মুখের কথা যেন শেষ হতে চায় না। সে গোটা বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের পরিবর্তনের ছবিটি তুলে ধরে।

অনিলের কথার মাঝেই আমি বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল গতকাল। কাল আমার সঙ্গে হরিদাসের দেখা মুখোমুখি, তখনই বুঝেছিলাম তার মস্ত বড় লাল মুখটায় নতুন এক বার্তা। বেশ হাসিখুশি দরদ-ভরা মুখটা। ওকে দেখে মনে হল— সূর্যও এমনই দেখতে। জেগে-ওঠা প্রাণের আলো যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে চারদিকে। আর তাতেই সব চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

আমাদের দাবি যদি সরকার সত্যি সত্যি মেনে নেয়, আবার ডোল চালু হবে আর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনও হবে। অনিল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর খোঁজে। আর বাংলার ভাষা বাংলার সংস্কৃতির বাঁচবার আশা তার মুখে জাগে।

তা হবে বইকি। কিন্তু উদ্বাস্তু মানুষদের কানাকড়িরও দাম নেই ওদের কাছে। দু-দশজন উদ্বাস্তু মানুষ মরে গেলেও, ওদের কিছু যায় আসে না। তবু আমাদের লড়তে হবে, আমাদের অধিকার আমাদেরই আদায় করতে হবে। হাত-পা কোলে নিয়ে বসে বসে না-খেয়ে মরলে তো চলবে না। লড়াই করেই মরতে চাই। লড়াই করেই বাঁচতে চাই। লড়াই করেই বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি মাতৃ-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

অনিল মণ্ডল বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়ে। বলে, তা যা বলেছ ভাই, খাঁটি সত্যি কথা বলেছ। কিন্তু মন তো শান্ত হয় না, মনের দ্বিধা কিছুতেই যেতে চায় না।

দেশভাগে মানুষের মনটাও যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দৃঢ়তার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে।

তার মাঝে অম্বরিষ বালা আসে। বলে, মনে আবর্জনা জমে গেলে তাকে তো ঝেঁটিয়ে তাড়ানোরও দরকার আছে। উদ্বাস্তুদের মনে অনেক হতাশার, অনিশ্চয়তার, মেঘ আবর্জনা জমে গেছে। এ বার যদি কিছুটা উড়ে সরে যায়। আমরা একটা বাঁচার পথ খুঁজে পাব। আশার আলোয় তার মুখের রংটাই যেন বদলে দিতে থাকে...। অম্বরিষ বালা কথাটা প্রায়ই বলে। যখনই বলে, তার কোনও বিশেষ অর্থও থাকে, ভয়ানক একটা জ্বালা আর তিক্ততায় তার মুখেও ফুটে ওঠে আশার আলো, আলোর ভেতর আগুনের উষ্ণ স্পর্শও পাওয়া যায়। আর তাতেই ভেতরে চেতনার জন্ম হতে থাকে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি নিবিড় ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে বলতে উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকে যায়। আমি দু'পা বাড়াতেই দেখি আমার মেজদা তাঁবুর সামনে বসে। চোখ দু'টি মেলা আকাশে। নীল আকাশে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট সাদা মেঘের টুকরোর ওপর আর তাঁর কান পাতা নিজের বুকের মধ্যে। মাথা ভারী, শুকনো চোখে, নিদ্রাবিহীন রাত্রির জ্বালা। মনের মধ্যে তাঁর কত আশঙ্কার ঢেউ বয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ডটা যেন তাঁর তারই সমান তালে ঢিপিঢিপ করে চলেছে।

সূর্যের একটা তরুণ ছটা, তাঁবুর মটকা ডিঙিয়ে, তাঁবুর দরজায় হাসিমুখে উঁকি মারে। মেজদা সেদিকে হাত বাড়িয়ে দেন। রোদের উষ্ণ স্পর্শ লাগে ত্বকে। আর-একটি হাত দিয়ে রোদটা যেন তিনি পরখ করেন। নতুন করে বাঁচার একটা ক্ষীণ আশা চোখের কোণে এসে ধাক্কা মারে। তিনিও যেন সচেতন হয়ে ওঠেন, নতুন চেতনায় জেগে ওঠেন।

সূর্য ওপরে ওঠে। ফুরফুরে বাসন্তী হাওয়ায় সরসরতার ওপর ঝরে পড়ে তার উষ্ণতা। আলোর উষ্ণতায় উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষের মন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হয় গোটা শিবিরটার ধুলোময়লা উড়িয়ে মানুষগুলোর মুখের ক্লান্তির ছোপ ধুয়েমুছে সব বিলকুল সাফ করে দিয়ে গেল। সব কিছু যেন ঝরঝরে ঝলমলে হয়ে উঠল। ক্ষুধা ক্লান্তি আর অসহায়তার হতাশায় সমস্ত যন্ত্রণা জ্বালা ছাপিয়ে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজই জেগে উঠতে চাইছে, মানুষ গা-মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে।

খুব কাছে, কার খালি পায়ের চেনা শব্দ শোনা যায়। চোখ তুলে তাকতেই দেখি ধীমান গোঁসাই আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে তার কীসের আলো যেন জ্বলে আছে। ব্যস্ত হয়ে বলি, দাদা আপনি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরি তাঁর দিকে।

ন্যায় আর সত্য যে দিকে মরবার আগে সেই রাস্তার পবিত্র ধুলো, মানুষের পদরেণু একটু গায়ে মেখে নিই ভাইডি। ধীমান গোঁসাই একাগ্রচিত্তে বলেন, আর মনের ভেতর হাতড়ান। একটু দম নিয়ে ফের শুরু করেন তাঁর কথা, যেমন করে লেবু নিংড়ায়, তেমনি করে সরকার আমাদের সব রক্তরস নিংড়ে নিচ্ছে। কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা উদ্বাস্তুদের মৃত্যুর মুখে নির্বাসন দিচ্ছে, তাদের কোনও ভাবেই ক্ষমা করা যায় না। ধীমান গোঁসাই একঝলক আমাকে দেখে নিয়ে ব্যথিত অথচ প্রাণময় দৃঢ়স্বরে বলেন।

কী করব? শিকড় ছেঁড়া জীবনটাই তো এমনই ভাসমান। পায়ের তলায় মাটি নেই। আমি বলি আস্তে আস্তে করুণ গলায়।

মানুষকে মারার অধিকার ওরা কোথায় পেল? ওরা ওই প্রশাসন আমাদের টিপেটিপে পাইকারি হারে মারছে। এর বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ, প্রতিবাদ করতে না-পারলে তো বাঁচতেই পারব না ভাইডি! জীবন দিয়েও এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যেন ভেতর থেকে তাকে একটা-কিছু ভয়ংকর ভাবে খোঁচাচ্ছে— এমন জ্বালা নিয়ে তিনি বলেন আর নিজেকে পরিবর্তনের মতো সমৃদ্ধ করে তোলেন।

ধীমান গোঁসাইয়ের দিকে তাকালে বুকটা আমার টনটন করে ওঠে। ভয় হয়। মনে হয়— মানুষটার ভেতরে ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে, ভেতরে তাঁর ভেঙেচুরে নতুন করে কিছু-একটা গড়ে উঠছে। ফের তিনি বলতে শুরু করেন আর আমি মাথা নিচু করে মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে শুনি। তিনি তাঁর ভেতরে হয়ে ওঠা চেতনার ভাষা প্রকাশ করে যান।

মানুষের জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথে সব কিছুই উজাড় করে দিতে হয়। এমনকী নিজের হৃদয় পর্যন্ত। প্রাণের চেয়ে যা বেশি, মানুষের জন্য তাই দিতে হয়। দিতে পারলেই দেখবে তোমার কাছে যা সবচেয়ে বড় যে সত্যের জন্য লড়ছ— দেখবে তা কত বিশাল, কত মহৎ। ধীমান গোঁসাই বলেন আর নিজেকে যেন প্রস্তুত করেন।

আমিও তা মানি গোঁসাইদা। সব ঘৃণা, সব অত্যাচার অবিচার থেকে মানুষ একদিন মুক্ত হবেই আর সেই মুক্তির দিনে কারও মনে কোনও হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা থাকবে না। মানুষ সত্যকে আঁকড়ে ধরে মুক্তির আলো খুঁজে পাবে। আমি আবেগ আর উত্তেজনায় মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ধীমান গোঁসাইয়ের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আমার চেতনায় যেন ঝড় বয়ে যেতে থাকে। বুকের কাঁপুনি থামে না।

ধীমান গোঁসাই খাড়া দাঁড়িয়ে, বলিষ্ঠ কালো দেহটা থেকে পিছলে পড়ছে

আলো, মুখ নিষ্প্রভ, ঠোঁট কাঁপছে— যেন নিঃশব্দে তিনি দাঁত কড়মড় করছেন। একটু নরম সুরে আবার বলতে আরম্ভ করেন, তিন-তিনটে মাস ক্যাম্পে ঘুরে এলাম। এমনকী দণ্ডকারণ্যও গিয়ে দেখে এলাম আর আমার চমক ভাঙল। এ ভাবে মৃত্যুকে অন্যায় ভাবে মেনে নিতে পারব না। পারব না ভাইডি। মানুষের কী হাল, প্রাণে সয় না, হেথা বসে তার আন্দাজ করতেই পারবে না, ভাই। উদ্বাস্তুদের খিদে নিত্যসঙ্গী। সঙ্গে সীমাহীন অনিশ্চয়তা নিজের ছায়ার মতো পেছনে লেগে আছে অষ্টপ্রহর। একটুকরো রুটি, একদলা ভাতের পিত্যেস নেই কোথাও। গোয়ালে পশুকেও ও ভাবে রাখে না। খিদে তো টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছেই, ওদের মনুষ্যত্বকেও গিলে খাচ্ছে। মানুষের চেহারাই কী আছে ওদের? খিদের জ্বালায়, সেটা অবধি গেছে। কোনওমতে ধুকধুকিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু সে বাঁচা মরার বাড়া। পচে গলে যাওয়া— সরকারি গোলামরা শকুনির মতো ঘিরে থাকে ওদের। কী করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যের নির্বাসনে, জাহান্নামে পাঠানো যায়— তা হলেই ওদের কায়েমি স্বার্থসিদ্ধি। কী কবো ভাইডি, মানুষের অপমানে, আমার গায়ের চামড়া চড়চড় করতে লাগল, সেই অপমান আজও কলজের মধ্যে ছুরির ফলার মতো বিঁধে আছে। আজও কলজেয় বিঁধে আছে, ভাইডি। ধীমান গোঁসাই বলতে বলতে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে আর হাত কাঁপছে বেদনায়।

আমার বুকের ভেতর যেন তুফানের তোলপাড় চলে। আমারও ইচ্ছে করে, ধীমান গোঁসাইয়ের হৃদয়ের সঙ্গে, আমার হৃদয়খানিকে এক করে দিই। এক আলোক শিখায় এক সত্যে মিশিয়ে দিয়ে, আমরা জ্বলে উঠি দাউ দাউ করে, দাবানল হয়ে সমস্ত ছিন্নমূল মানুষকে জাগিয়ে দিই— তারা বাঁচার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক... জেগে উঠুক।

মরণ দিয়েই তো মরণকে জিততে হয় ভাইডি। হাজার হাজার মানুষকে বাঁচাতে অনেক জান আমাদের দিতে হবে। তোমরা যারা লেখাপড়া শিখছ তোমরাই তো আমাদের ভরসা, তোমরাই লিখবে। সে লেখাগুলি যেন টগবগিয়ে ফোটে, মানুষের বুকে আগুন জ্বেলে দেয়, লড়াইয়ের শপথ নেয়, মানুষের জন্য মানুষ যেন জীবন উৎসর্গ করে দেয়। ধীমান গোঁসাই তাঁর হাত তুলে প্রতিটি কথা অতি স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন। আর মুখখানা ক্রমশ ধারালো হয়ে উঠতে থাকে। চোখ দুটির গাম্ভীর্য বাড়তে থাকে, আর ঠোঁট দু'টি একটি কঠিন রেখায় আশ্চর্য সংবদ্ধ। মনে হয় ওঁর অন্তরে কী একটা নিঃশব্দ রাগ, নয়তো কোনও একটা কঠিন বেদনা, হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষুইয়ে দিচ্ছে...। ছিন্নমূল

জীবন নিয়ে, উদ্বাস্তু শিবিরের এঁদো-পচা পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছি আমরা। এই জীবনকে টেনে ডাঙায় তুলতে হবে— এই হল ভাইডি, আমাদের একমাত্র কাজ— ধীমান গোঁসাই নিজে যা জেনেছেন, যা শিখেছেন তাই মানুষকে জানাতে, শিখাতে প্রাণপাত করতে চাইছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আর আমি গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লোভীর মতো মনপ্রাণ হৃদয় দিয়ে যেন পান করি তাঁর বলা প্রতিটি কথা আর অন্তহীন নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলি, কোটি কোটি ছিন্নমূল জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করি।

ধীমান গোঁসাই শেষ দিকে অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন, ওরে, ওরে ভাইডি, দাঁড়া— সবুর কর, একটুখানি অপেক্ষা কর, একটু দাঁড়া রে, সব হবে... ধীমান গোঁসাই অতি দ্রুত পা বাড়িয়ে, তাঁবুর অলিগলিতে যেন মিলিয়ে গেলেন।

আচমকাই তাঁবুর আড়াল থেকে একটা চেনা গলার ডাক লাফ দিয়ে ছুটে গেল ওপাশের ছেঁড়া তাঁবুটার দরজার দিকে। ততক্ষণে পায়ের দ্রুত চলার শব্দটা তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেছে, তাঁবুর মটকার দড়িটা একটু নড়ে উঠল আর একটু কেমন যেন ফেঁসে-যাওয়া তাঁবুর খসখসে শব্দ শোনা গেল।

বলাগড় ক্যাপ উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির সদস্যদের আমরণ অনশনে বসবার আর একটা দিন সামনে, জোর কদমে চলেছে প্রস্তুতি। যেন সাজোসাজো রব পড়ে গেছে গোটা শিবির জুড়ে। প্রত্যেকটি মানুষ যেন একটা বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে— নতুন ভাবনার স্রোতে, সকলে টগবগ করে ফুটছে। আগুন হয়ে জ্বলছে। এ জগতে, জীবনে— আগুনই তো সব, কখনও আগুন দহন করে, কখনও জীবন দেয়।

চলতে ফিরতে যার সঙ্গে যার দেখা হচ্ছে পরস্পর দুটো কথা না-বলে যেন নড়তেই পারছে না। আর তো মাত্র একটা দিন। তার পর তো অনশনে বসছেই ভাই, এত ভাবনার কী আছে। একটা না একটা কিছু যে হবেই, গোলগাল, বেঁটেখাটো, মোটা চেহারার টাকমাথা লোকটা প্রতীক্ষার সময়টাকে, সংক্ষিপ্ত করতেই, ছুটে চলে গেল আরও মানুষকে এই শুভসংবাদ পৌঁছে দিতে।

সে দিক থেকে চোখ ফিরাতেই দেখি আমাদের সহপাঠী গোপাল দাশ— খাটো ঠ্যাং, ল্যাংলেঙে দু'টি হাত যেন ছুড়ে মারতে মারতে ধীরে ধীরে হেঁটে যায় দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের সেই অশ্বত্থ গাছতলার দিকে, যেন হাওয়ার মধ্যে মোমবাতিটার মতো সে জ্বলছে।

দু'পা হাঁটতেই দেখি তাঁবুর বাইরে আশামাসি, কাঁচা মাটির উনুনে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত, তার মধ্যেই ডেকে আমাকে বলল, এই ছেলে, শুনেছিস, অনশন

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই নাকি সবাইকে ধরবে ওরা। আগুন জ্বলে না, আশামাসি রাগে আকাশের সূর্যটাকেই মুখ ভেংচিয়ে চেঁচাতে থাকে। বলে, আমরাও ছাড়ব না, ঝাঁটা পিটিয়ে তাড়াব না! আসুক না ধরতে, ব্যাটাগে বলব, আগে খেতে দাও, খেতে দিতে তো পারে না, কিল মারার গোঁসাই! ছিঃ ছিঃ বেটাগে কি আর বলব। আশামাসি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে যায় তাঁবুর ভেতরে। উনুনের ধোঁয়া উঠছে গলগল করে আকাশে।

জবাব দিইনি। একটু হাসলাম। কিন্তু আমার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। একটু থেমে বাঁ হাত দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে চলতে শুরু করি অশ্বত্থগাছ তলার দিকে।

ওদিকের একটা তাঁবুর সামনে, মহাবিরক্ত স্বর শোনা গেল, সে বলছে— পুলিশ নির্ঘাত ধরবে, যে জান নিয়ে এত টানাটানি, সেই জানটাই এ বার যাবে। আবার জান-মান সবই খোয়াতে হবে। ছিলাম কোথায়, এলাম কোথায়— জান ছিল, সেটাই যাবে।

এই শিকড় ছেঁড়া জীবন, গেলেই বা কী আর থাকলেই বা কী! মরা মানুষের আবার রাত আর দিন। মানুষটা কথা বলতে বলতে আমার পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে। একজন উদ্বাস্তু। তার চোখে অদ্ভুত একটা শুকনো দীপ্তি, বুঝি মিনমিন করে জ্বলে।

একটা তাঁবুর দরজা থেকে একজন স্ত্রীলোকের চিৎকার, পা-মাড়ানো শুকনো ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ে, কী করছ? ভেবেচিন্তে কর বাবু। এখন আর একলাটি নও, তাঁবুতে মাগ-ছেলে আছে। ভুল পথে পা দিলে গোটা পরিবারটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বুঝে শুনে চল। আবেগে অবুঝ হয়ো না। সাবধানের মার নেই।

পা-কাটা সুধীরের তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতেই সে মাথা বাড়িয়ে চেঁচায়, এই যে ভাল ছেলেরা, দেখ না, তোদের কী দশা হয়! মাথাটি ইটের ওপর রেখে, ইট দিয়েই থেঁতলে দেবে, দেখবি তখন— কত ধানে, কত চাল। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। দিন গেলে বুঝবি।

কতবার শুনেছি, লোকটার বাঁ-পাটা কাটা গেছে দাঙ্গায়। সত্য-মিথ্যা জানি না। এখন কথা শুনে শিউরে উঠে থমকে দাঁড়াই। আগুনের মতো একটা রাগের হলকা ছড়িয়ে যায় আমার সারা দেহে। লোকটা কিন্তু থেমে নেই, বলেই চলেছে, পাজি, বদমাশ। দেখ না তোদের কী হয় এ বার। এই সব ভাল ছেলেদের বাড়াবাড়ির জন্যই তো আমাদের ডোল বন্ধ হল। মরণ আর কাকে বলে। লোকটা ভেতরে ভেতরে আরও গর্জাতে থাকে। মুখ বিকৃত করে আমাদের বুঝি টিটকারি

দেয়, ঘৃণাও বুঝি ছুড়ে মারে।

লোকটার মোটা ফোলা বসন্তের দাগে ভরা মুখটার দিকে চেয়ে থাকি। দেখি গাল দিতে দিতে মাথাটাই তাঁবুর ভেতরে ঢুকে যায়। গমগম শব্দ ওঠে তাঁবুর মধ্যে।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যাই। আমার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটে বিন্দু বাছাড়, সাগর সরকার, নগর ঢালি, সতীশ হাজরা, পুলিন ব্যাপারী, জগদীশ হীরা, সনাতন সিকদার, সুবল বালা, অঘোর বৈরাগী, নিতাই সর্দার, অরবিন্দ পাঠক, খোকন সুতার, শিবানী বিশ্বাস, হরিমতী মণ্ডল, শোভা দাশ, কাজল কীর্তনীয়ারা। আশাপশে কোনও কিছুর দিকেই আর লক্ষ নেই। কোনও কথাই আর কানে ঢুকাতে চায় না। ধীরস্থির পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে আগামী দিনের কর্মসূচি লক্ষ্য করে।

পথের মধ্যে মুখোমুখি দেখা হয় নটবর সাধুর সঙ্গে। মধ্যবয়সি নম্র, শান্ত মানুষ। গোল, বড় মাথা, নীল চোখ, খালি গা, বুক ভর্তি কাঁচা-পাকা লোম। সবাই তাঁকে খাতির করে তাঁর সততার জন্য। উদ্বাস্তু শিবিরে তাঁকে অনেকেই মানে-গোনে ভালবাসে।

আমি শুধাই, কাকা, অশ্বত্থতলায় যাবেন তো?

না, বাপু না, আমার ছেলের বউয়ের ছেলে হয়েছে, দেখতে যাচ্ছি ওর তাঁবুতে। দাদুভাইকে আগে দেখে আসি। তার পর দেখছি, যেতে পারি কি না। আর তো কয়েক ঘণ্টা বাকি, তারপর তো অনশনে বসছে, দেখছ তো সবাই কেমন অস্থির। তার পর নটবর সাধু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, অনুচ্চস্বরে, সব ঠিক আছ তো বাপু, ভালয় ভালয় এখন অনশন শুরু হলেই বাঁচি। নটবর সাধু কথা বলতে বলতেই চলে যান। মনটা কিন্তু পড়ে থাকে পিছনে।

নটবর সাধু চলে যেতেই নিতাই ঢালির সঙ্গে দেখা। নিতাই ঢালি হালকা চেহারার মানুষ। মাথাটা তেরছা, খাটো ঘাড়, চোখ দু'টি ধূসর সবুজ। কিন্তু লোকটা একটু লেখাপড়া জানেন। সভা সমিতিতে যান, কথা বলেন আস্তে আস্তে। দেখা হতেই তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, ছোট ভাই, কত কথাই তো শুনতে পাচ্ছি, ওসবে কান দিতে যেও না তোমরা ভাই। কিছু পেতে গেলে কিছু তো দিতে হবেই। দেখো না, রক্ত ঢেলে দিয়ে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতাম, আজ কী এমন দশা আমাদের হত? দেশটাই ভাগ হত না। স্বার্থবাদী ক'জন ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দেশটাকে কেটেকুটে ভাগ করে, যারা সর্বনাশ

করল, তারাই ক্ষমতা দখল করে রাজা হয়ে বসল। অর্জিত স্বাধীনতার চেহারাই আলাদা, প্রাণ দিয়েও দেশের, মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা করত। তোমাদের আদর্শের কথা তো আমি জানি। মানুষের জন্য কিছু করো ভাই, শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকলে হবে না। দেশটাও যে তোমাদের, তাকেও দেখতে হবে। দেশের মানুষকে নিয়েই তো দেশ। সেই মানুষের কী দুর্দশা আজ। কত মানুষ যে মরে গেল চোখের সামনে, শুধু কিছু মানুষের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে নিতাই ঢালি বলেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন দু'হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করেন।

মানুষের জন্য কিছু করা, সব থেকে কঠিন দাদা। আমরা তো কারও পাকা ধানে মই দিচ্ছি না, অথচ কত কথাই শুনতে পাচ্ছি— মিথ্যা রটিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। আমাদের শুভ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করতে কতজন মাঠে নেমে পড়েছে। আত্মঘাতীরাই সর্বনাশটা করে বেশি। ইচ্ছা হয় জোর প্রতিবাদ করি, বুঝিয়ে দিই— আমি বলি আর তাকাই মানুষটার দিকে কিছু মন্তব্য শুনবার জন্য, তাঁদের মনোভাব বুঝবার জন্যও।

মানুষ বোঝে না বলেই তো এমন আত্মঘাতী হচ্ছে। নিজেদের সর্বনাশ করছে। শিক্ষার অভাব, চেতনার অভাব। সঠিক ভাবে বুঝতে পারলে ওরাও দেখো আমাদের দলে আসবে। লোকগুলো যদি খারাপ হয়েই থাকে, সে দোষ ওদের নয় ভাই। আমরা বুঝেছি বলেই বুকটা আগের থেকে হালকা হয়ে গেছে। কায়েমি স্বার্থবাদীরা তো জীবনের শত্রু, আমাদের স্বজনদের ভুল বুঝাচ্ছে। একেবারে জীবনের গোড়ায় গিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে। ওদের চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে। এই ঠুলিটাই খুলতে হবে। তবেই দেখতে পাবে— সত্য আর মিথ্যা, ন্যায় এবং অন্যায়। তখন ওরাও সত্যের পথে আসবে, ন্যায়ের পথে আসবে।

জাত-বর্ণের ভারতবর্ষ এমনই একটি দেশ। এমনই তার সমাজব্যবস্থা— একজন নিম্নবর্ণের মানুষও ঘোর মনুবাদী। ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থা এতটাই ঘোরালো। ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হবে— এমন কোনও কথা নেই। ভারতবর্ষের জাত-বর্ণ মনুবাদ, ধর্ম, সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনই ঘোরালো যে, একজন নিম্নবর্ণের মানুষও ভয়ংকর ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়ে ওঠে। তাকে সামনে দাঁড় করিয়েই কায়েমি স্বার্থের প্রভুরা আমাদের যুগ যুগ ধরে দলিত করে রেখেছে। সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত করেছে, অবহেলা করেছে। অস্পৃশ্য-ঘৃণিত করে রেখেছে। আজকে তারাই আমাদের মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত করতে চাইছে। তোমরা এগিয়ে যাও, আমি ঘুরে আসছি। মর্যাদা, দৃঢ়তা বজায়

রেখে আদর্শে অটল থেকো ভাই। মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে বলতে নিতাই ঢালি চলে যান।

নিতাই ঢালির কথা শুনে মনটা আশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আমাদের নীতি, আদর্শ, সংগ্রামের মৌলিক কর্মকাণ্ড কেবল বোঝেনইনি, তাকে নিজের চেতনায় রপ্তও করেছেন। তাই এখন আমাদেরও বোঝাতে চাইছেন। এতটাই তাগিদ ভেতর থেকে তাঁকে ঠেলছে। নতুন আশার আলোয় তিনি এতটাই আলোকিত। মানুষটাকে দেখে কথা শুনে প্রাণটা তাই ভরে গেল। ভেতরটা শক্তিতে ভরে উঠল।

আশায় প্রাণ ভরে গেলে কী হবে, এখান থেকে সেখান থেকে, তাঁবুর ভেতর থেকে, তাঁবুর বাইরে থেকেও ছিটকে ছিটকে আসছে গালিগালাজ, শাপমণ্যি আবার কখনও কখনও আসে গুরুগম্ভীর সুচিন্তিত কথা, সুচেতনার আলো, প্রশংসা, উৎসাহ-উদ্দীপনার ধ্বনি আর প্রেরণা। আগামী দিনটার দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে আমরা চলি সামনে এগিয়ে।

চলার পথে যেতে যেতে সুধীর হালদার বলে, এ আমাদের জীবনের লড়াই, মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি রক্ষার লড়াই— এ আমাদের জীবন-মরণের লড়াই। এ সত্যের লড়াই, ন্যায়ের লড়াই। ভারতবর্ষ আমাদেরও মাতৃভূমি, বাংলাভাষা, বাংলার সংস্কৃতিতে আমাদের জন্মগত অধিকার। সরকার সেই মৌলিক জন্মগত অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চাইছে। বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে শিকড় ছেঁড়া মানুষদের মাতৃভাষা মাতৃসংস্কৃতি থেকে, চিরদিনের মতো বঞ্চিত করতে চাইচে। মনুবাদীদের ষড়যন্ত্র— এ আমরা মানব না। সুধীর হালদারের কথা শেষই হতে চায় না। সে তার প্রাণের কথা হৃদয় দিয়ে বলে চলে...।

চলমান ভিড়ের মধ্যে যেন ধপ করে পড়ে শব্দগুলো, উত্তেজিত জোর কোলাহল ওঠে। ন্যায়ের কথা বলেছে, সত্য কথা বলেছে আমাদের প্রাণের কথা বলেছে। স্বজন-বান্ধব— এ লড়াই আমাদের মুষ্ঠিমেয় ক'জনের নয়, তামাম মানুষের প্রাণের কথা। জীবনের দাবি, এ সত্য ন্যায়ের অধিকার, এ লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে। শিকড় ছেঁড়া সমস্ত মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে।

সকলের কণ্ঠ এক হয়ে মিশে শব্দের ঘূর্ণিঝড় ওঠে। আশপাশ থেকে আসা সমস্ত কথা তলিয়ে যায়। চারিদিক থেকে মানুষ আসতে থাকে, হাত নেড়ে আগুন ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে উত্তেজিত করে তোলে। ক্ষুধিত বঞ্চিত অবহেলিত ঘৃণিত জীবনে শ্রান্ত মানুষগুলোর পাঁজরার তলায় যে ক্ষোভ অসন্তোষ গুমরে আছে— আজ সেটা নাড়া খেয়ে যেন আগুন হয়ে উঠেছে। জয়ের আশা

নিয়ে, জীবনের দাবি নিয়ে, সবাই এগিয়ে যাই অনশন বেদির দিকে। দুর্নিবার এক ঐক্যবদ্ধ শক্তির টানে আমরা যেন এগিয়ে চলেছি, চলেছি...।

শিকড় ছেঁড়া জীবন আছিন্ন

বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরের মাঝখানে একপাশে ছিল একটি বড় আর লম্বা পুকুর। পুকুরের উঁচু পাড়ে শতশত তাঁবুতে উদ্বাস্তুরা বাস করেন। ওই পুকুরের পাড়ে ঢাল ঘেঁষে আমরণ অনশনের জন্য সুরক্ষিত জায়গা হিসাবে স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। বাঁশের খুঁটি গেঁড়ে তার ওপর তাঁবু টাঙিয়ে তাঁবুর আস্তরণ তুলে উঁচু করে দেওয়া হল— যাতে আলো বাতাস প্রচুর আসতে পারে। তার নীচে বাঁশের চালি পেতে তিনটি আলাদা শয্যা প্রস্তুত করা হল। শয্যা তিনটি ঘিরে পরপর আস্ত বাঁশের মজবুত বেড়া দিয়ে আটকানো হল। অনশন বেদিতে যেতে গেলে তিন দিকের আটটি প্রতিরোধ বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হবে। আর অনশনকারীদের তুলে আনতে গেলে ওই আটটি প্রতিরোধ ভেঙেই তা করতে হবে। কারণ বেড়াগুলি মানুষ সমান উঁচু। তিনদিক বাদে অন্য দিকে জলভরা ওই বিশাল লম্বা পুকুর। সুরক্ষিত স্থানেই অনশন শুরু হবে এবং আমরণ অনশন করবেন:

শ্রীধীমান গোঁসাই, পিতা— ৺ধীরেন গোঁসাই, বয়স ৪০ বছর।

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা, পিতা— ৺মণিমোহন হাজরা, বয়স ৪২ বছর।

শ্রীজগদীশ মণ্ডল, পিতা— জগবন্ধু মণ্ডল, বয়স ৪৫ বছর।

লোকচক্ষুর আড়ালে ধীমান গোঁসাইয়ের তাঁবুতে বসে আমি বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির দাবি পত্রগুলি লিখেছিলাম এবং ধীমান গোঁসাইয়ের হাতে গোপনে ইস্তাহার তুলেও দিয়েছিলাম। প্রায় সবগুলি দাবিপত্র এর মধ্যে ধীমান গোঁসাই যথাযথ সরকারি দপ্তরে দাখিল করেই দিয়েছেন।

আমরণ অনশনে বসবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সভা ডাকা আছে। অনশন বেদির সামনে ছোট স্থানটুকুতে। তার পাশেই ছিল ধীমান গোঁসাইয়ের তাঁবু। সন্ধ্যার একটু আগেই আমি হাজির হয়েছিলাম আমাদের অসীমামাসির কাছে অর্থাৎ ধীমান গোঁসাইয়ের তাঁবুতে। ক'খানা প্রচারপত্র, পোস্টার তখনও বাকি ছিল। আমি সেগুলি লিখে আগলে রেখে কারও জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আর অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় নতুন একটা চেতনায় মনে মনে যেন নিজেকে বদলে নিচ্ছিলাম।

আধো আঁধার তাঁবুর ভেতর আস্তে আস্তে ঢুকল পাতলা চুল মস্ত একটি মাথা। তার পর একটি গোলগাল দেহ কুঁজো হয়ে গলে এল। ভেতরে এসে মানুষটা টানটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোর শব্দ করে নিঃশ্বাস নিয়ে ডান হাতটা তুলে ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে ভরাট গলায় বললেন, ভয় পেয়ো না ভাইপো, আমি মুকুন্দমাস্টার, দেখতে এলাম তুমি কতদূর কী করলে। তাঁবুর ভেতর তাঁর বিষণ্ণ কোমল কথা ধ্বনি কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনি বাজতে থাকল।

আচমকা নিষিদ্ধ তাঁবুতে ঢুকতে দেখে কাউকে, প্রথমে আমি চমকেই উঠেছিলাম। তাই ভুরু দুটো আমার টান খেয়ে যেন ছিটকে উঠল উপরে।

মুকুন্দমাস্টার ভারী পা দুটো মেঝেতে ঘষতে থাকেন তার পর গলা বাড়িয়ে ফের বলেন, দাবি-পত্রগুলি লিখতে গিয়ে ভয় পাওনি তো? অথচ ভয়ংকর অন্যায় কিছু তো করছ না, ভয় পাবার কী আছে! মুকুন্দমাস্টার কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর পায়ের তলার মাটি যে খুবই আলগা, তাই যেন তিনি পা টিপেটিপে ভয় মাড়িয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি চোখ তুলি, মাথা উঁচু করে বললাম, ভয় আমি পাইনি বরং এ-কাজটা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর আমাদের দিকে রয়েছে ন্যায়। যতদিন জান আছে, মানুষের জন্য ন্যায়ের পক্ষে লড়ব। আর যাদের জন্য ওই কাজ করছি— সেই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা কিছুটা হলেও আমি পালন করতে পারলাম। কথা বলবার সময় তীব্র সহানুভূতিতে আমার হৃদয় মন প্রাণ যেন নেচে উঠল— এমন উদ্দীপনা আর উৎসাহে আমার গলার স্বরটাই পালটে গেল। বিষণ্ণ জীবনের রং মুখে মেখে মুকুন্দমাস্টার অবসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শুকনো একটা ঢোক গিললেন।

আমি আবারও চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে জোর দিয়ে বললাম, আমি গর্বিত। যে কাজটা সৎ পবিত্র এবং ন্যায় তার জন্য কোনও গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর সত্য তো চিরকালই নির্ভয়, নির্ভীক। সত্যই সর্বশক্তিমান। পৃথিবীতে মানুষ চরম সত্য। তাই সে সর্বশক্তিমান। আমি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। এতদিন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছিলাম, লুকোতে চাইছিলাম ইতিহাসের উত্তাল প্রবাহ থেকে। কিন্তু আজ আমি সত্যিকারের ছিন্নমূল জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে, নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারলাম। বাস্তব সত্য, মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলাম। আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য। দেশভাগের বলি সমস্ত মানুষের প্রাণে নিজের প্রাণ ঢেলে দেওয়া— এ যে কত বড় কাজ তা আজ হৃদয় দিয়ে বুঝলাম।

মুকুন্দমাস্টারের মাথাটা নড়ে। ক্ষীণ ভাবে হয়তো বা একটা 'হুঁ' বেরিয়ে আসে— যা আমার কানে পুরোটা পৌঁছোয় না। কিন্তু মনটা যে তাঁর পিছন পানে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর মুখ দেখে। ক্যাম্প-সুপারের খয়রাতি সাহায্য 'ডোল'-এর সঙ্গে যে অতীত ফুরিয়ে গেছে তারই দিকে তিনি এখনও তাকিয়ে আছেন। তিনি কাঁদতেও পারেন না, কান্নাও আসে না। তাঁর ঠোঁট মুখ সবই শুকনো কাঠ। হাত বুঝি থরথর করে কাঁপে। মেরুদণ্ড বেয়ে কনকনে ঠান্ডা কী যেন একটা শিরশিরিয়ে উঠছে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে চোখের নীল দৃষ্টিতে। মুখ হাঁড়ি করে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন।

ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে আর পিছনে সংসারের মার-খাওয়া মানুষ মুকুন্দমাস্টার সন্তর্পণে তাঁবুর দরজা খুলে ফাঁক করে বাইরে বেরিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন, চেনা পায়ের শব্দ তাবুর বাইরে দ্রুত দূরে সরে মিলিয়ে গেল।

একটা নিথর নিস্তব্ধতা তাঁবুর ভেতর নেমে আসে। আমার হাতের পুরনো ক্ষতচিহ্নটা এতদিন পর আজ যেন কাঁচা হয়ে ওঠে। বিরাট বহ্নি জ্বালার মতো জ্বলতে থাকে। একটা বিপুল বেদনা ভরা আনন্দ হৃৎপিণ্ডটাকে চিরে ফেড়ে ফালি ফালি করতে থাকে। কিন্তু তা বোঝবার মতো ভাষা চেতনার আলো আমি কিছুতেই খুঁজে পাইনে। বোবা ব্যথায় যন্ত্রণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাঁবুর দরজার দিকে তাকাই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঢোকেন ধীমান গোঁসাই— এ যেন অন্য মানুষ, অচেনা, পরিষ্কার মুখ, কঠিন চোখ দুটোয় কোমল আলোয় ভরা, মাথার চুলের রাশ একটা মোটা বেণিতে বাঁধা, ওষ্ঠ দু'টি নিটোল, দিব্যি গোলগাল চকচকে চেহারা, মাথাটা সামান্য একটু নুইয়ে একগাল হাসলেন। ওষ্ঠের স্নিগ্ধ হাসি আর মুখের একাগ্রতা তার চোখের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত ভালবাসায় তাঁবুর মধ্যে ঝনঝন করে বেজে উঠল, ধন্যবাদ নয় ভাইডি, তোমাকে অভিনন্দন জানাই, উদ্বাস্তু মানুষের এই বড় কাজটায় তোমার হাতের প্রাণের ছোঁয়ায় সুষ্ঠু সুন্দর হয়ে উঠল। এ পর্যন্ত কোথাও এতটুকু ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। দাদা-ভাইতে মনের ব্যাপারে আর কাজে মিল হওয়ার মতো সুখ খুব কমই জোটে। তোমার কাজের সঙ্গে আমার কাজটা যে মিলে গেল আজ এর জন্য যে কত ভাল লাগছে। কোনও ভাষা দিয়ে তা আমি বোঝাতে পারব না, ভাইডি। ধীমান গোঁসাইয়ের ঠোঁট কাঁপে।

তাঁর মুখের ভাবে আর কণ্ঠস্বরে আমার বুক আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। হৃদয়ের আলোড়ন থামিয়ে বলি, মানুষের জন্য মানুষ হিসাবে এ তো আমার দায়বদ্ধতা দাদা। মানুষের দোহাই, অত অভিনন্দন কীসের? আমার কর্তব্যকর্মই

করেছি। আমি কথা বলি আর কত ভাল লাগে যে তাঁকে।

ধীমান গোঁসাই সরে আসেন, আমার হাতটা তাঁর কম্পিত আঙুল দিয়ে চেপে ধরে গভীর নিচুস্বরে বলেন, ভাইডি, আমি ভেবেছিলাম, কখনও আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, আমার চিন্তা-চেতনা, তোমার চিন্তা-চেতনা হয়ে উঠবে না। কিন্তু আজ কাজের মাঝে আমরা চিন্তা-চেতনায় এক হতে পারলাম। এ যে কত বড় পাওয়া, তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমরা নতুন প্রজন্ম উদ্বাস্তু মানুষের দুঃখ-বেদনা কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করছ, এ যে কত বড় পাওয়া, আমরণ অনশনের পর যদি বেঁচে থাকি, সেদিন বলব। ধীমান গোঁসাইয়ের চোখের কোণে জল দেখা যায়। কথা আর বলতে পারেন না। বোবা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ধীমান গোঁসাই বলেন: হাতে আমাদের বেশি সময় নেই ভাই। যা কিছু করার এখনই তা করতে হবে। এসো ভাইডি, এগিয়ে যাই। ধীমান গোঁসাই দাঁড়ান না— আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসেন।

পাশের তাঁবুর দরজা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকি। কে একজন মাটির মেঝেতে বসে পোস্টার লিখেছন। গোল মাথায় অল্প চুল, বড় শান্ত মুখখানা সাদাসিধে। লম্বা দুই ঠ্যাং, চোখাচোখা গড়নে ঢ্যাংগা দেহটা একটু নুয়ে একমনে লিখে চলেছেন। লোকটাকে দেখতে একটু হাস্যকর। তবু সারা মানুষটার মধ্য আকর্ষণীয় কী যেন আছে— যা কাছে টানে দূরের মানুষকে।

ধীমান গোঁসাই তার কাছে সরে গিয়ে মুখ নিচু করে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, অরবিন্দু, তোমার কি শেষ হল ভাইডি?

না দাদা, এখনও তিনখানা বাকি। কালিটা ঠিক মেশানো যাচ্ছে না। শশধরকে সদরে পাঠিয়েছি। এই এল বলে। অরবিন্দ কথা বলেন আর কর্মরত অবস্থায় তাঁর গোলগাল চোখ দু'টি মেলে ধরেন আমার দিকে। আর গোল মস্ত মাথাটা ঝুঁকে রাখেন অর্ধেক লেখা পোস্টারটার ওপর, ডান হাতের তুলির সূক্ষ্ম ডগাটা একটা 'ণ' বর্ণের মাঝামাঝি এসে থমকে আছে...।

তাড়াতাড়ি শেষ করো ভাইডি, এখনও তো পুরো একটা রাত হাতে আছে আমাদের, কী বলো অরবিন্দু, এর মধ্যেই হয়ে যাবে? ধীমান গোঁসাইয়ের বুকে যেন বল আসে এমন ভাবে বলেন আর চোখ দু'টি দিয়ে তাঁবুর ভেতরটা আঁতি পাঁতি করে দেখেন...।

হ্যাঁ তা তো হবেই, আটকাবে না দাদা। ঠোঁট চেপে একটু চুপ করে থেকে ফের কাজে হাত লাগান অরবিন্দ।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমরা হাজির হই সভায়। অনশন বেদির গা ঘেঁষে একফালি নিচু ফাঁকা জমি অনেকটা রাস্তার পাশে নয়নজুলির মতো। সন্ধ্যার আকাশে ফুটে-ওটা ফালি চাঁদের সামান্য একটু ম্লান আলোয়, মানুষগুলি বসে আছেন সভা শুরু হওয়ার অপেক্ষায়। চার পাশে উঁচু ভিটেয় টাঙানো তাঁবুর মাঝে এই ছোট ফালি জায়গাটা যেন সুরক্ষিত হলঘরের মতো একেবারে নির্জনতায় ঘাপটি মেরে আছে। তার মধ্যেই মনে হল কতকগুলো অদ্ভুত মানুষ গুড়ি মেরে বসে আছেন। চারদিক থেকে তখনও চুপিসাড়ে পিলপিল করে মানুষ ঢুকছেন, ঘন হয়ে বসে পড়ছেন, খাতা-কলম নিয়ে বসে আছে অম্বরিষ, সুশীল, বিরাট, মাধবরা। সভায় যাঁরা এসে বসছেন— তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে খাতায়।

অসীমামাসি বসে আছেন সামনের দিকে। তার পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। মুখখানা যেন খাটাখাটনিতে রোগা হয়ে গেছে। চোখের পাতা ভারী, বড় বড় চোখদুটো দেখায় আধবোজা। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহিমিহি রেখা পড়েছে। সাধারণত কথা বড় একটা বলেন না, কিন্তু থেকে থেকে তীব্র আনন্দের ঝংকার ওঠে মনের মধ্যে। অসীমামাসি মুখর হয়ে ওঠেন তখন। তাঁর মুখরতায় মূর্ত হয়ে ওঠে আগামী দিনের স্বপ্ন। যেদিন শিকড় ছেঁড়া মানুষরা পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পাবে। তাঁর হৃদয়ের আনন্দের ঢেউয়ে নেচে ওঠে, আশপাশের উদ্বাস্তু শ্রোতারা।

সারারাত চোখের পাতা এক হয়নি অসীমামাসির। তাতে কী, বিশ-পঁচিশজন মহিলাকে ডেকে নিয়ে সভায় বসে আছেন, রাত পোহালেই যে কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়বে তা বুঝে নিতে। অসীমামাসির চোখ দু'টি মেলা অনশন বেদির ওপর আর কানপাতা আপনার মনের মধ্যে।

যারা সকাল হলেই আমরণ অনশনে বসবে— এখনও সমানে কাজ করে চলেছে, প্রাণ ভরে হাসছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে। এর পরে ওদের অদৃষ্টে কী যে আছে, কে জানে! তবু কেন জানি অসীমামাসির ভেতরটা আজ বড় শান্ত। শুধু শান্ত নয়, আনন্দে ভরা। প্রতীক্ষার সময়টাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য অসীমামাসিরা, পরস্পর সুখ-দুঃখের কথায় মেতে উঠেছেন।

সুরেন বাছাড় বেশ হাসিখুশি দরদে-ভরা মানুষ, বসতে বসতে বলেন, ক্যাম্পের অফিসে কাল পুলিশ এসেছিল। শুনলাম যারা অনশনে বসবে তাদের আগাম ধরে নিয়ে যাবে? তিনজনই তো হাজির আছে দেখছি।

এ সব কথা শোনবার তর আর সয় না অসীমামাসির। বলেন, এ সব কথা

ছেড়ে অনশনের কথা বললে ভাল লাগে একটু।

ও তো সব ঠিক হয়ে আছে মা। এখন আলোচনা করতে বসলে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। মনোরঞ্জন হাজরা কোমল ভাবে ধীরে ধীরে বলেন। আজ যদি আমাকে সত্যি সত্যি ধরে— যতীন, হরেন, নিরাপদ, গৌররাই অনশনে বসবে মা, তুমি ভেবো না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে অসীমামাসির। বলেন, আমার আর চিন্তা কীসের। তোরা সবাই তো আছিস রে। আমার এতগুলো ছেলে থাকতে চিন্তা করব ক্যান!

ছুটতে ছুটতে আসে সুবল। মুখ তার উদ্ভাসিত গালদুটো যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন। তার আনন্দোদীপ্ত উত্তেজনার ধাক্কায়, গোটা সভার চোখগুলোর অপেক্ষার ক্লান্তি কেটে গেল মুহূর্তে। সুবল বলে, জানো, জানো আরম্ভ হয়ে গেছে— গোটা উদ্বাস্তু শিবির জুড়ে প্রস্তুতি চলছে। প্রতিটি উদ্বাস্তু মানুষ আমরণ অনশনে বসবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকটি উদ্বাস্তুর মুখে আজ যেন সূর্যের তেজ। বিপিন, সুশীল অনিলরা সব বেরিয়ে পড়েছে, কেউ তাঁবুর ভেতর শুয়ে-বসে নেই। ওরা সব আসছে। দলবেঁধে আসছে। আশার আলো ওদের চোখেমুখে। দেখলেও প্রাণ জুড়োয়। আসুক, সবাই আসুক, সবার মনেপ্রাণে সাড়া জাগলেই তো আমাদের জয় সুনিশ্চিত হবে।

ধীমান গোঁসাই সোৎসাহে দু'পা হেঁটে অসীমামাসির খুব কাছে গিয়ে মুখ নিচু করে বলেন, তোমায় আমি কিছু বলব না মা, আমায়ও তুমি কিছু বোলো না কেমন? তোমার এত সব ছেলে আজ মুক্তির পথে হাঁটছে চাট্টেখানি কথা না!

আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে বাবা, তাই হবে। হরিগুরুচাঁদ তোদের সহায় হোন। অস্ফুট স্বরে অসীমা মাসি বলেন। আর হরিগুরুচাঁদের জীবন্ত মুখ আলো হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর মনের পর্দায়।

চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হচ্ছেন ছোট্ট জায়গাটুকু ঘিরে। এত অল্প পরিসরে এত মানুষ সমবেত হয়েছেন, ভাবাই যায় না। ব্যগ্র উত্তেজিত একটা চাপা কোলাহলে আকাশ গমগম করছে। আশপাশের তাঁবুর দরজায় দরজায় ফাঁকা জায়গায় দলে দলে মানুষের উৎসুক চোখ চেয়ে আছে, ধীমান গোঁসাই, মনোরঞ্জন হাজরা আর জগদীশ মণ্ডলের দিকে। অসীমামাসির চোখের সামনে ঝাপসা রক্তের বিচিত্র প্রবাহ খেলে যেতে লাগল।

উপস্থিত মানুষজন সকলেই ওঁদের সম্ভাষণ করেন। আজকের সম্ভাষণটা যেন একটু বিশেষ ধরনের। কানে আসে শান্ত কোমল স্বরের শুভেচ্ছাবার্তা।

তোমাদের জয় হোক, তোমাদের জয় আমাদের সকলের জয়। তোমরা জয়যুক্ত হও।

প্রিয়স্বজন, আমার আপনজন, দেশভাগের মহাসংকটে পড়ে, প্রাণ হাতে নিয়ে হাজার মাইল ছুটে এসেছি, জান মান বাঁচাতে। প্রিয় স্বজনগণ, আমরা বাঁচতে চাই, সাচ্চা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমাদের শত্রুদের— যারা আমাদের দণ্ডকারণ্যের জাহান্নামে পাঠাতে চাচ্ছে, তাদের দেখাতে হবে যত নীচে তারা আমাদের ফেলে রাখুক, যত অত্যাচার করুক, আমরা মানুষ, মানুষের অধিকার নিয়ে আমরা বাঁচতে চাই। এই বাংলায় আমরা সুষ্ঠু পুনর্বাসন চাই। ধীমান গোঁসাইয়ের সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ উঠল।

একটা গরম বাষ্পের ঝাপটা যেন আমার চোখেমুখে এসে লাগে। শরীরটা হঠাৎ বিপুল শক্তিতে ভরে উঠল। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মতো মানুষগুলি ধীমান গোঁসাইয়ের দিকে ফেরে। তাঁর কথা শোনবার জন্য অস্থির হতে থাকেন।

আমি সোজা ধীমান গোঁসাইয়ের দিকে তাকাই নির্ভীক গর্বিত প্রদীপ্ত দুটো চোখ ছাড়া কিছুই আমার চোখে পড়ে না। তাঁর বলা কথা মন প্রাণ দিয়ে শুনি:

আমরা কেন ছিন্নমূল হলাম, ভারতবর্ষ ভাগ কারা করল— এ সব প্রশ্ন আজ আর করার সময় নেই, আমাদের বাঁচার প্রশ্ন, মাথা গুঁজে জীবন রক্ষা করার প্রশ্নই বড়। আমরা বাঁচতে চাই, তার জন্যই সুষ্ঠু পুনর্বাসন চাই। মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমরা বাংলার ভেতরে সুষ্ঠু পুনর্বাসন চাই। আর তার জন্যই আমাদের আমরণ অনশন। যতক্ষণ মহামান্য সরকার আমাদের ন্যায্য দাবি না মানছে, ততক্ষণ আমরা আমরণ অনশন চালিয়ে যাব...। সত্যের জয় হবেই— এতে যার বিশ্বাস নেই, সত্যের জন্য জান দেবার যার সাহস নেই, নিজের ওপর যার ভরসা নেই, দুঃখ-কষ্ট-বেদনা অত্যাচারে যার ভয়, সে দূরে সরে যাক, আমাদের ত্রিসীমানায় যেন সে না আসে। আমাদের জয়লাভে, ন্যায্য দাবি আদায়ে যার বিশ্বাস আছে, যারা আমাদের লক্ষ্য দেখতে পায়, তারাই আমাদের সঙ্গী, আমাদের আপন-স্বজন। তোমাদের আমাদের সকলের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে আমরা জীবন দেব। সকাল থেকে আমরণ অনশন শুরু হবে। সকলে আমাদের আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন জয়যুক্ত হতে পারি। জয় হরিগুরুচাঁদ, জয় ভীম, জয় ভারত।

সহস্র বলিষ্ঠ নন্দিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি ওঠে, প্রাণ মাতানো সাড়া জাগে...। অসীমামাসি আশাপিসি উঠে এসে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। প্রাণ

আনচান করা চোখে অশ্রু ঝরে, তাঁদের হাঁটু কাঁপে, অশ্রুতে গলা বন্ধ হয়ে আসে— স্বর বেরোয় না, কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কেবল কম্পিত ওষ্ঠের ভেতর দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে— তোদের জয় হোক বাবা, তোদের জয় হোক। মাথায় হাত দিয়ে তাঁরা আশীর্বাদ করেন আমাদের প্রতি গভীরতম ভালবাসায়।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। রাত শেষ হতে আর কতটুকু-বা দেরি, কারও চোখে ঘুম নেই, অনশনে বসার মুহূর্তটা এলে বাঁচি। অনশন বেদিতে উঠবার মুহূর্তটার জন্যে চারদিকে কেবলই ছটফটানি উঠছে। ভোরের আলো ফোটবার আশায় পাখপাকালি যেমন অস্থির হয়ে ওঠে তেমনই।

এখানে সেখানে জটলা আর পোস্টারগুলো নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা। শিকড় ছেঁড়া জীবন যেন টগবগ করে ফুটছে। বসন্তের মরসুমের মতো প্রত্যেকটি শিকড় ছেঁড়া জীবনে যেন একটু রং লেগেছে, প্রত্যেকেরই মনে নতুন কিছু এসেছে যেন। কারও বা জ্বালার ওপর জ্বালা, তারা প্রাণভরে গাল দেয় অনশনকারীদের। কারও-বা মনে মনে আবছা একটুখানি কীসের আশা, কীসের ভয়। আর কারও যেন প্রখর আনন্দ-চেতনায় আলো জ্বলছে। আজকের এই বিপুল জাগরণ যে তারাই ঘটিয়েছে এই চেতনায় তারা নতুন দিনের সাড়া পাচ্ছে, আগামীর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। চোখমুখ আলো হয়ে জ্বলছে।

একটা টিনের কৌটোর পিছনে মোটাসোটা মোমবাতি লাগানো ছিল— সেটা তখনও জ্বলছিল, পুড়ছিল, পুড়ে পুড়ে সারারাত ধরে আলো দিয়ে চলেছে। ভীরু শিখাটির মিটিমিটি আলোয় দূর থেকে তাকিয়ে দেখছিলাম অনশন বেদিটা। দেখছিলাম, ভাবছিলাম আর কীসের জন্য যেন তীব্র ভাবে অপেক্ষা করছিলাম। একটা অদ্ভুত উষ্ণপ্রাণময় সুগন্ধ গোটা পরিবেশটাকে ভরপুর করে তুলছিল। আর সেই অজ্ঞাত সুগন্ধই আমাকে চাঙ্গা করে তুলছিল।

আচমকাই ধীমান গোঁসাই আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতেই ডাকলেন, এসো এসো ভাইডি। চলো আমরা এগিয়ে যাই।

ধীমান গোঁসাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁটলাম অনশন বেদির দিকে। রাতের আঁধার মুছে আলোর আভা ফুটে উঠছে পুব আকাশে— আমরা এগিয়ে চলেছি, দু'ধারে অসংখ্য মোমলাগানো হলুদ তাঁবু টাঙানো। তার মাঝখান দিয়ে সরু এক পেয়ে পথ। কোথাও গুড়ি মেরে, কোথাও দড়ি ডিঙিয়ে, কোথাও এঁকেবেঁকে এক সময় আমরা হাজির হলাম অনশন বেদির সামনে...।

পরপর তিন সারি আস্ত বাঁশের শক্ত বেড়া— তার মাঝখানে উঁচু করেই

তাঁবুর আচ্ছাদন। তার নীচে বাঁশের চটার তিনটি চালিপাতা, তিনটি আলাদা শয্যা। দু'জন অনশনকারী মনোরঞ্জন হাজরা আর জগদীশ মণ্ডল ইতিমধ্যে উঠে বসেছেন শয্যায়। ধীমান গোঁসাইও উঠবেন— তারই তোড়জোড় চলছে। গোটা পরিবেশটা চারদিকে থেকে এমন আঁটোসাঁটো, সাবধানতার সঙ্গে সুরক্ষিত করা হয়েছে— দেখে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিরাট কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে। উপস্থিত সমবেত প্রতিটি মানুষই যেন দারুণ সতর্ক এবং সুচেতনায় ভরপুর বলিষ্ঠ নির্ভীক মানসিকতা নিয়ে অপেক্ষা করছে। যে কোনও ঘটনার মোকাবিলা করতে সকলেই প্রস্তুত।

অনশন বেদিতে খাটানো তাঁবুর নীচে তিনটি শয্যা ছাড়াও তিনটি প্ল্যাকার্ড বা ঘোষণাপত্র টাঙানো— যাতে লেখা আছে তিনজন অনশনকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আর দু'খানা বড় ছবি— যার একখানা হরিগুরুচাঁদ, অন্যটিতে ভীমরাও আম্বেদকর। প্ল্যাকার্ডের ওপরে একটি চাঁচখণ্ডে পোস্টারে লেখা স্লোগান—

"বাংলা আমার মায়ের ভাষা
প্রাণ গেলেও তা ছাড়ব না,
বাংলার মাটি মোদের মাতৃভূমি
জীবন গেলেও সেথা থেকে নড়ব না।
আমরা ছিন্নমূল বাস্তুহারা
বাংলার সংস্কৃতি হৃদয় দিয়ে রাখব মোরা...।"

কী সহজসত্য-কথা, আমার নিজের মনে, চেতনায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে প্রাণে যেন বার্তা পাঠায় লড়াইয়ের শপথ, প্রাণে জাগে আশার আলো, নতুন কিছুর তীব্র প্রতীক্ষা। কোথাও বাঁচার ভীরু আশা, কোথাও-বা বহু দিনের সঞ্চিত আক্রোশের বাঁধভাঙা জোয়ারের জল। আজ বিপুল কী একটা নতুন অনুভূতি জেগেছে বুকে, সাধারণ মোটা কথা দিয়ে তা বোঝানো যাবে না। প্রশাসনের ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবহেলা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সূর্যের আলোয় ঘুমভাঙা অজগরের মতো ফুঁসে ওঠে সে ভাষায়।

ব্রাহ্মমুহূর্তে শত শত মানুষের শুভেচ্ছা নেমে এল। অনশন বেদিতে উঠে বসলেন ধীমান গোঁসাই। তূর্য নিনাদে শাঁখ বাজল, মায়েরা পরপর তিনবার উলুধ্বনি দিলেন গোটা পরিবেশটা একটা নতুন আলোয় ভরে উঠল।

বাঁশের বেড়ার বাইরে জনতা চোখে-মুখে জ্বলন্ত কৌতূহল জ্বালিয়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখছেন অনশনকারীদের— অনশনকারীদের দলনেতা ধীমান গোঁসাই নতুন পোশাক পরে নির্দিষ্ট শয্যায় উঠে বসেছেন আসনপিঁড়ি

হয়ে। ধবধবে সাদা কাপড়ের একটা খুঁট গায়ে জড়ানো, গলায় আচারমালা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাথায় লম্বা চুল চূড়া করে বাঁধা। জগদীশ মণ্ডলের পরনে সাদা কাপড়, শরীরের আগামাথা ফ্যাকাশে, উঁচু কপাল জুড়ে এলোমেলো চুল ঝুলে আছে। ব্যথাভরা চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন ওই বেদির ছবির দিকে। কালচে ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে নড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে গোটা মানুষটাই শিকড় ছেঁড়া মানুষের জীবন্ত অসহায়তার প্রতিমূর্তি আর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। মনোরঞ্জন হাজরা পোশাকআশাকে ছিমছাম, দোহারা চেহারা। কথা বলতে গেলে তার কব্জিশুদ্ধ হাতখানা ওঠানামা করে। মাথায় থাক থাক চুল যত্ন করে আঁচড়ানো। চোখ-মুখ-নাক দেখলে মনে হবে— খানিকটা গোরুর মতো চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত জীবনটাকে মরিয়া হয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন। তাঁর কটা ভুরুর তলে ছোট্ট চোখজোড়া একটু ভাসানো। মুখখানায় বসন্তের দাগ, মানুষটাকে আরও বেশি অসহায়তার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। মানুষটা যেন হাসতে হাসতে কাঁদছেন। পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে আবেদন করে চলেছেন, বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও...।

অনশন বেদিতে প্রদীপ জ্বলছে, ধূপের সুগন্ধ বাতাসে ভাসছে, ফুলের গন্ধে গোটা পরিবেশটা ম-ম করছে, ঝিরঝির করে বয়ে আসছে ভোরের বাতাস। পুকুরের জলের ওপর দিয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া— গোটা অনশন বেদিটা যেন পবিত্রতার প্রদীপ শিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, নতুন একটা আলো ছড়াচ্ছে।

অনশনকারীদের সহৃদয় শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে শত শত মানুষের ভিড় সারাদিন ধরে লেগে রইল। একদল মানুষ দেখে দেখে চলে যাচ্ছেন, আবার নতুন একদল মানুষ এসে হাজির হচ্ছেন— অনশনকারীদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অনশন শুরু থেকেই অনশনকারীগণ কথা বলা বন্ধ করেছেন। এখন তাঁরা হয় ইশারায় বোঝাচ্ছেন অথবা কাগজেকলমে লিখে জানাচ্ছেন।

এই আত্মত্যাগের আরাধনায়, মহান ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনশনকারীদের অভিনন্দনের ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রত্যেকে যেন আশার আলো বুকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছেন। অনিশ্চয়তা অবহেলা অত্যাচার তার বিদ্বেষের ঘৃণায় ভেঙে-পড়া উদ্বাস্তুদের অন্তরে আশার আলো উদ্দীপনা উৎসাহ ফুটিয়ে তুলতে কর্মকর্তাদেরও চেষ্টার কোনও ত্রুটিই চোখে পড়ে না। যাঁরা অনশনে আছেন তাঁরা যেন মানুষের কল্যাণে, মঙ্গলের জন্য প্রকৃতির কাছে প্রার্থনারত আর পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁদের প্রাণময় সত্তা নিবেদিত, উৎসর্গীকৃত।

পৃথিবীতে আরও একটা নতুন দিন নেমে আসছে— অনশনকারীদের চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। ফর্সা হয়ে আসছে পুব আকাশ, উষ্ণ হয়ে উঠছে দশদিক—

পরিবর্তনের ছাপ দিকে দিকে। যখন প্রকৃতি প্রাণের আর বনবন করে ঘুরে চলা পৃথিবীর সব কিছুই বদলে যাচ্ছে, মুহূর্তে মুহূর্তে পিছু হটছে আঁধার, আমারও অন্তরাত্মায় জাগছে সাড়া, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ঘাসে বাতাসে আকাশে প্রতিটি প্রাণের সাড়ায় ঘোষিত হচ্ছে দিনের অমোঘবার্তা।

পুব দিকে বেড়ার গা-ঘেঁষে পাঁচজন লোক সারি সারি বসে আছেন। আরও দশজন পাশাপাশি ওপাশ ঘিরে আছেন। দ্বিতীয় বেড়ার বেষ্টনীর মধ্যে মায়েরাও বসে আছেন অনশনকারীদের আগলে। ছোট ফাঁকটার মুখ আটকে চারজন যুবক নির্ভীক বসে আছে। পুব-পশ্চিম-উত্তর— তিন দিকই সুকঠিন, সুরক্ষিত। অনশন সমিতির প্রতিটি মানুষই যেন ধরে নিয়েছেন তাঁদের জয় সুনিশ্চিত।

অনশন চত্বরের বাইরে বেড়ার গা-ঘেঁষে উঁচু মাটির মঞ্চে বিশ-পঁচিশজন মানুষ সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছেন— অনশনকারীদের স্বপক্ষে গম্ভীর আর মোটা গলায় স্লোগান হচ্ছে দাবির সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখা হচ্ছে— উদ্দীপনার উৎসাহে নতুন ভাবধারাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন প্রতিটি মানুষ।

চলমান ভিড় থেকে কে একজন গাঁক গাঁক শব্দে বলল, তা হলে এতদিনে আমরা সত্যিকারের মানুষের পরিচয় দিতে পারলাম। সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠলাম। আমাদের মায়ের ভাষা আর মায়ের সংস্কৃতিকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।

আর একজন তাকে সমর্থন করে আরও দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করলেন, তা তো বটেই, তা তো বটেই। মুখ বুজে বেশি সময় কেউ মার খায় না, এক সময় না এক সময় তার ধৈর্য টুটে যায়ই, সে ঘুরে দাঁড়ায়। বুড়ো মানুষটা তার লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ক্ষোভের আগুন যেন জ্বেলে দিলেন।

একজন যুবকের গলা শোনা গেল, আরও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, উদ্বাস্তুরাও ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র, এ দেশে বেঁচে থাকবার অধিকার তাদের অমোঘ।

একটা অজানা উত্তেজনা প্রতিবাদের আগুন বুকের ভেতর আমার পাক খাচ্ছে— বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাঁজরার তলায় হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। আগুনের মতো ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মনের গভীরে হৃদয়ের উষ্ণমণ্ডলে নতুন নতুন শব্দরা চেতনায় তেজোদীপ্ত কথারা সব জন্ম নিচ্ছে— যা সকলকে সব কিছুকে বুকে টেনে নেবার প্রেরণা দেয়। ভাষার আগল খুলে দেয়। মানুষকে মানুষের মতো দাঁড় করায় জগতের সামনে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির মানুষজনই কেবল এই গুরুদায়িত্ব বহন করছেন এমন মনেই হচ্ছে না। বরং শিবিরে প্রতিটি মানুষই এই অনশনের অবিচ্ছেদ্য শরিক হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে। মনে মনে

তাঁরাও যেন দাবি আদায়ের অনশন করছেন, সহমর্মী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এমনই ভাবে দিন কাটে, রাত আসে, রাত ফুরিয়ে দিনের উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবী ভরে যায়। পালা করে দল বেঁধে পাহারা দেওয়া হয় অনশনকারীদের। তিনটি তাজা প্রাণ অনাহারে নির্জীব থেকে আরও নির্জীব হয়ে পড়ছেন প্রতিদিন। মানুষের জন্য উৎসর্গীত নিষ্ঠাবান যুবকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ব কর্তব্য দিন দিন বেড়েই চলে। তবু সরকারের টনক কিছুতেই নড়ছে না, অনশনকারীদেরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উদ্বাস্তুদের ন্যায্য দাবি না-মেটালে তাঁরা তিলে তিলে সর্বসমক্ষে অনশনে জীবন বিসর্জন দেবেনই। অটল-অচল স্থির বিশ্বাসে প্রতিটি প্রাণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলো হয়ে জ্বলছে...।

হারাধন, অম্বরিষ, সুশীল, হরেন, নিতাই আর আমি পাহারা দিচ্ছি অনশনকারীদের। মায়েদের মধ্যে অসীমামাসি, গৌরীদি, শোভাবউদি, আশাপিসি, মালতীবউদি, সুমিতা মণ্ডল, তুলসী সুতার, কণা পোদ্দার, বাঁশি কাঞ্জিলাল, সীমা সরকাররা। তাঁরা ঘেরা বেড়ার ভেতর সারারাত জেগে বসে পাহারা দিচ্ছেন।

স্লোগান বক্তৃতা আলোচনা সব সময় হচ্ছে। সমবেত উদ্বাস্তুরা সবাই নির্বাক হয়ে শুনছে। তারা অনুভব করে অনশনকারীদের ঘিরে কী যেন ভাবছে ওরা। অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠছে বুকের মধ্যে। সুশীল যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না— ভেতরের উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। বলতে থাকে, নতুন জীবন চাই আমরা, একেবারে আলাদা জীবন, সত্যের, ন্যায়ের জীবন চাই, বাঁচতে চাই। বাংলার কোলে সুষ্ঠু পুনর্বাসন চাই, মায়ের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চাই।

কপাল কুঁচকে মন দিয়ে শুনছে সবাই। সনাতন সাধু প্রাণ ঢেলে দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। বাংলার বাইরে বাঙালি উদ্বাস্তুদের যারা বাঘ-ভাল্লুকের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তারাই তো দেশটাকে ভাগ করেছে... দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষতে অন্তহীন রক্ত ঝরছে...। স্বাধীনতার জন্য আমরাই আগাম রক্ত ঢেলেছি। আজ আমরাই অনিশ্চয়তার স্রোতে ভেসে চলেছি। ছিন্নমূল স্বজন, আপনজন সব আসুন, একসঙ্গে দাবি আদায় করি। যতদিন না আমরা মনে প্রাণে জানব যে, আমরা সবাই ভাই, ততদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবে না...।

মাঝেমধ্যে কেউ কেউ এসে আলোচনা করেন, যে সব কথা কানে আসে, তার মধ্যে প্রাণ বা আবেগ থাকে না।

শুকনো কাঠখোট্টা কথায় মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর কেউ কেউ প্রাণে নাড়া দেওয়ার মতো কথা বলে, মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে শোনে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ঐক্যবদ্ধ চেতনায় জেগে ওঠে।

আমাদের জয় যখন হাতের মুঠোয় এসে যাবে যাবে করছে— ঠিক তখনই আচমকা একদিন উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত পরামর্শ, অবিচলিত সুরক্ষার বাহিনী, কঠিন ঘেরা বেড়া— সব কিছুই চোখের পলকে ওলোট-পালট হয়ে গেল।

সে দিন শরতের মেঘলা আকাশ। ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশের অনেক নিচু দিয়ে ভেসে চলেছে। উদ্বাস্তু শিবিরের মাথার ওপর একখানা ফ্যাকাসে খণ্ড মেঘ দাঁড়িয়ে হয়তো পথের ক্লান্তি দূর করছে। মেঘের পাণ্ডুর ছায়া পড়েছে অনশন বেদির আচ্ছাদনের তাঁবুর ওপর। ছায়া আর রোদের খেলা চলেছে সেই সকাল থেকে। মেঘ ভাঙা গরমও পড়েছে তেমনই। বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সেই দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়। অনশন বেদির আশেপাশেও বহু মানুষ আছেন পাহারায়।

এমন সময় দুপুরের খাবার খাওয়ার একটু আগেই, হঠাৎ একটা রেলগাড়ি অসময়ে চুঁচড়া থেকে ছুটে এসে বলাগড় রেল স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। ওই রেলগাড়িতে কোনও যাত্রী নেই। গোটা রেলগাড়িটাই আধা-সামরিক বাহিনীতে ঠাসা। তাদের সংখ্যা দুই থেকে আড়াই হাজার তো বটেই, তার বেশিও হতে পারে।

কী ঘটনা ঘটতে চলেছে, তা আঁচ করার আগেই, গোটা উদ্বাস্তু শিবির সামরিক কায়দায় ঘিরে ফেলল আগত সশস্ত্র বাহিনী। মুহূর্তের মধ্যে যে যে-ভাবে, যে দিকে পারল ছুটে পালাল, আত্মগোপন করল, লুকিয়ে পড়ল, কেউ কেউ কোনও উপায় না-পেয়ে নিজের তাঁবুতেই আশ্রয় নিল।

যুদ্ধকালীন জরুরি তৎপরতায় আধা-সামরিক বাহিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকে গেল। একদল অনশন বেদির দিকে চলল— ট্রেচার, জলের বালতি, গ্লাস, গামছা, কোদাল, কুড়ুল, শাবল, ডাক্তার, ওযুধপত্র, ব্যাণ্ডেজের কাপড়, স্যালাইনের সরঞ্জাম, খাটিয়া, দা, কাস্তে, সেবিকা, দড়ি এবং সব কিছুই সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্রবাহিনীর বাঘা বাঘা অফিসার-সহ।

চোখের পলকে সব প্রতিরোধ, সুরক্ষাবাহিনী, বেড়া, অভিযোগ উড়ে গেল। অনশনকারীদের তুলে নিয়ে গেল 'মেডিক্যাল টিম'— নির্বিঘ্নে, বিনা বাধায়।

তার পর চলল চিরুনি তল্লাশি, অভিযান, ধড়পাকড়। ছেলে-বুড়ো-জোয়ান কাউকেও বাদ দিল না। এমনকী ক'জন বয়স্কা মহিলাকেও বেঁধে নিয়ে রেলগাড়ির কামরায় তুলল। যাকেই সন্দেহ হল তাকেই ধরে বেঁধে সেই বিশেষ রেলগাড়িতে তুলে নিল। এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধ জয় শেষ হয়ে গেল।

এতকাল পরেও, সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা মনে পড়লে, আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাই— আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা, তাঁবুতে তাঁবুতে খুঁজে খুঁজে হাতকড়া পরিয়ে, অসহায় উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে টেনে হিঁচড়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে, নির্বিচারে আঘাত হানছে, ভারী বুটের কঠিন আঘাত হানছে পিঠে, কোমরে। আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের ধূসর ঢেউ, গোটা উদ্বাস্তু শিবির তছনছ করে চলল। ইস্পাতের দাঁতের মতো ঝলমলে বেয়নেট গুলো বাগিয়ে, তারা এগিয়ে যেতে লাগল। একটা নিষ্ঠুর কাঠিন্য তাদের চোখেমুখে, ভারী বুটের কঠিন আঘাত খটখট করে বাজে মাটিতে মানুষের বুকে পাঁজরে। হঠাৎ ঘটে-যাওয়া ঘটনার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যখন, তখন আর পালানোর কোনও সময় নেই, সুযোগও নেই। সুতরাং যা হবার তা হবেই। তবু সাবধানের মার নেই— আপ্তবাক্য সম্বল করে নিজের তাঁবুতে গিয়ে পড়তে বসে গেলাম। তাঁবুর দরজা দিলাম ভেতর থেকে বন্ধ করে।

তাঁবুর বাইরে ভারী ভারী বুটের কর্কশ নিষ্ঠুর শব্দ শুনতে পাই— পড়ায় মন বসে না কিছুতেই। তবু একটা লিখিত খাতার পাতায় চোখ রেখে বিড়বিড় করে পড়ে চলি অথবা সময় কাটাই, তাড়া-খাওয়া খরগোশের মতো ঘাপটি মেরে থাকি নিরুপায় হয়ে।

আধা-সামরিক বাহিনীর এক জোয়ান, তাঁবুর ঝোলানো পর্দা ফাঁক করে কড়া সুরে ডাকে, এই খোকা কী করছ এখানে? এদিকে এসো দেখি। এসো, বেরিয়ে এসো।

অনেকগুলো কড়াকঠিন চোখ একসঙ্গে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে। আমার হাতে পড়া-লেখা খাতাটি হাতে নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। আধা-সামরিক বাহিনীর বড় অফিসারই হবেন, আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে পড়ে দেখেন এক মুহূর্ত। গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে বার দুই আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নেন, তার পর গভীর সহানুভূতি আর আন্তরিকতা নিয়ে বললেন, যাও খোকা, পড়ো গিয়ে যাও...।

আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা মুহূর্তে অন্য দিকে চলে গেল। আমি নিশ্চিন্তে তাঁবুর ভেতর ফিরে গিয়ে ফের পড়তে বসলাম এবং একটা কথা হাজারবার মনে পড়তে থাকে, সেই আমি ওই আধা-সামরিক বাহিনীর বড় অফিসারকে বলেছিলাম, স্যার আমি পড়াশুনা করছি। এই দেখুন আমি কী পড়ছি...।

খাতা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে আধা-সামরিক বাহিনীর অফিসারটি কী এমন

আত্মিক সত্যের পরিচয় পেল, যা কিনা প্রভাবিত করল তাকে। আমাকে বিনা বাক্যে মুক্তি দিল— আমাকে ধরল না। উপরন্তু সহৃদয় হয়ে আমাকে পড়তেও বলে গেল।

এর থেকেও আরও বড় বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম সেদিন আমি। আমার খাতাটায় লেখাছিল ভূগোলের আর ইতিহাসের ক'টি প্রশ্ন এবং উত্তর। মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো সুন্দর হাতের লেখায় জ্বলজ্বল করছিল। সেই লেখার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম অথবা ভাবছিলাম না— একটু আগে ঘটে-যাওয়া ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, আমার বুকের ভেতর তোলপাড় তুলে দিয়েছিল, যা কিনা ওই আধা-সামরিক বিভাগের অফিসারটির সহৃদয় ন্যায়পর প্রাণের দরজা খুলে দিয়েছিল, আমাকে ধরেও ছেড়ে দিয়েছিল! কোন আত্মিক মনুষ্যত্বের জাগরণে তার হৃদয় কোমল হয়ে উঠল!

আমার ভেতরে যখন নতুন আলোর হোমশুদ্ধির শিখায় বদলে যাচ্ছিল, তখনই আবার ভারী ভারী বুটের তীক্ষ্ণ শব্দে আমার চমক ভাঙল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর দরজার পর্দা টেনে ফাঁক করে হুংকার দিয়ে উঠল একজন আধা-সামরিক বাহিনীর বন্দুকধারী জোয়ান। এই কী রে হতচ্ছাড়া, কী করছিস তুই? আয় এ দিকে আয় ছোড়া...। আয় এ দিকে আয়।

আধা-সামরিক বিভাগের চারজন জোয়ানের ভাবগতিক দেখে মনে হল আমাকে টেনে কষে বেঁধে হিড়হিড় করে নিতে পারলেই খুশি হত তারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন জোয়ানদের কাছে না ছিল দড়ি, না ছিল হাতকড়া। তাই বাধ্য হয়ে একজন জোয়ান আমার ঘাড় ধরে টেনে নিল দু'জনের মাঝখানে।

আত্মিক শক্তির প্রতীক ওই খাতাটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে এলাম। অনেক অনুরোধ করলাম, কাকুতিমিনতি করলাম— কোনও কিছুতেই ওরা ছেড়ে দিল না। জোয়ানরা আগুপিছু দু'জনে আগলে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল বলাগড় রেল স্টেশনের দিকে।

আমার পরনে ছিল একটা হাফপ্যান্ট আর একটা হাতাকাটা গেঞ্জি। খালি পা, সারারাত জেগে অনশনকারীদের পাহারা দিয়েছি। শুকনো শরীর, মাথায় একমাথা ধুলোবালি মাখা উশকো-খুশকো চুল হাওয়ায় উড়ছে। কঠিন অসুখ থেকে উঠবার পর মানুষ যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, আমার অবস্থা ছিল তখন ঠিক তেমনই। একজন জোয়ান একটি থাপ্পড় মারে আমার মুখে।

চারিদিকে তাকাই, কিন্তু শূন্যদৃষ্টি, দেখি না কিছুই! শুধু একটার পর একটা চিন্তা ফুলকির মতো জ্বলে জ্বলে ওঠে মনের মধ্যে। একটা জোয়ানের হাতের

কঠিন আঘাত পড়ে ফের আমার মাথায়।

ছুটে পালিয়ে যাই... দুঃখে-কষ্টে-বেদনায় ভাবি।

সঙ্গে সঙ্গে আরও উজ্জ্বল হয়ে আরেকটা চিন্তা জ্বলে ওঠে, সত্যকে দু'পায়ে দলে মানুষকে অপমান করব?

কথাটা যেন আমার না, পরের। যেন কারও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।

মনের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে— যন্ত্রণায় অপমানে ছুটে পালাতে চাই— নিজের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে, এই ছোট্ট জীবনে যতটুকু জেনেছি তার কাছ থেকে। কী যেন একটা প্রতিকূল শক্তি আমার কাঁধে বুকে চেপে বসেছে। আমাকে টেনে নীচে নামাচ্ছে। রগের শিরাগুলি আমার ফুলে উঠে দপদপ করছে। মাথায় চুলে গোড়া থেকে ছুটছে আগুন। প্রতিবাদের প্রতিরোধের অনির্বাণ আগুন।

আধা-সামরিক বিভাগের জোয়ানরা অগুনতি উদ্বাস্তু মানুষকে বেঁধে নিয়ে চলেছে রেলগাড়িতে ভরতে। বলাগড় রেল স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে তখন পঞ্চাশ-ষাটজনকে বেঁধে নিয়ে চলেছে পশ্চিমমুখো রেলগাড়িতে ভরবে বলে। আমাকেও সেই ভিড়ের মধ্যে ঘাড় ধরে ঠেলে দিল একজন জোয়ান। মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিলাম। প্রাণপণে বুকে বল বেঁধে সমস্ত ক্ষুদ্র দুষ্টু চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নিজেকেই ধমক দিয়ে উঠি, তুমি না স্বেচ্ছাসেবক, সুরক্ষা বাহিনীর একজন, ছিঃ, লজ্জা করে না নিজেকে ছোট, ক্ষুদ্র ভাবতে?

শত শত নিরস্ত্র মানুষগুলোকে জোয়ানরা আঘাত করছে, বুটজুতো দিয়ে লাথি মারছে, টেনে হিঁচড়ে রেলগাড়িতে তুলছে, গালাগাল দিচ্ছে... আর ভাবতে পারলাম না, এ কী কাণ্ড...।

নিমেষে সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে যায়। সাহসে বুক ভরে ওঠে, এরপর কী হবে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের। ভেতরে ভেতরে ঘেমেনেয়ে উঠছি। জীবনে বিরাট কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এখন উপায়? নিজেকে বারবার প্রশ্ন করে আঁতকে উঠি? আমার অন্তরাত্মা বুঝি চোখ মেলে তাকায়, খোলা দু'চোখে দেখতে পাই, সহানুভূতির দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলে যায় আমার। আধা-সামরিক বিভাগের সেই বড় অফিসারটির মুখ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো খেলে যায় চিত্তের আকাশে। কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে মনটা শক্ত হয়ে ওঠে। বুক ধড়ফড়ানি শান্ত হয়ে আসে। আমার খাতায় লেখা পড়ে যিনি আমাকে পড়তে বলে তাঁবুতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন, একটু আগে সেই বড় অফিসার ভিড়ের আগে হাঁটছেন। বিরাট এক মানুষ, প্রশান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে মাথা উঁচু রেখে এগিয়ে চলেছেন...।

আচমকাই কিছু বোঝার আগেই বুঝি আমার বিবেক আমার সত্যে গড়া সত্তা, চেতনার আলো আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল, সেই বড় অফিসারটির কাছে। যিনি একটু আগে আমাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। আমি যন্ত্রচালিতের মতো সেই মহান মানুষটির প্রায় গা-ঘেঁষে চলতে চলতে, বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম, স্যার, স্যার, দেখুন এরা আবার আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। এখন আমি কী করব স্যার। হাতের সেই খাতাটা তখনও আমার হাতে ধরা আছে।

বড় অফিসার চলতে চলতে আমার দিকে, হাতে ধরা খাতার দিকে একপলক তাকালেন, আমার মুখে চোখে দৃষ্টি রেখে বললেন অথবা আদেশ করলেন, সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় আর দীপ্তিতে ভরপুর— তুমি ফিরে যাও খোকা, কে তোমাকে ধরে এনেছে? যাও তুমি তাঁবুতে যাও, পড়াশুনা করো।

মুখে টুঁ শব্দ করলাম না, সম্মতিসূচক ঘাড়টি কাত করে উলটোদিকে ঘুরে হাঁটতে থাকলাম। ধরাপড়া শত শত উদ্বাস্তু মানুষদের বেঁধে নিয়ে পশ্চিমমুখো চলেছে আধা-সামরিক বিভাগের জোয়ানরা। গুণে গুণে তাদের রেলের কামরায় ভরে চালান দেবে সেণ্ট্রাল জেলে। আমি অবিশ্বাস্য ভাবে তাদের ভেতর দিয়ে একা একা উলটো দিকে পুব দিকে হাঁটছি মাথা উঁচু করে। নিজেরই বিশ্বাস হয় না— এটা কী ভাবে সম্ভব? আজও আমি ভাবি আর বিস্ময়ের কিনারা পাই না।

সত্যিই কি আমি সেদিন হেঁটে পার হয়ে এসছিলাম! চলমান আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের পেরিয়ে? না-উড়ে এসেছিলাম সমস্ত বাধা অতিক্রম করে? এর হদিস আজও খুঁজে পাইনি।

খেলার সঙ্গীরা, সহপাঠীরা, চেনাজানা পরিচিতরা— যাদের ধরে নিয়ে চলেছে আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা, তারা আমাকে এই ভাবে খাতা হাতে উলটো দিকে হাঁটতে দেখে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে দেখছে আর চমকে উঠছে...।

সমস্ত কিছু পেরিয়ে বলাগড় রেল স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে, রেললাইন পার হব বলে পিছনে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। দেখি ওদিক থেকে অসীমামাসিকে মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে রেলগাড়ির দিকে। আধা-সামরিক বাহিনীর পাঁচজন বন্দুকধারী জোয়ান আর একজন ক্যাম্পসুপারের কর্মচারী। একজন জোয়ান অসীমামাসির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারে। অসীমামাসি রেললাইনে বেধে একটা চোট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েন। ফের লালমুকো জোয়ানটা মস্ত বড় থাবাটা দিয়ে মাসির ঘাড়টা ধরে টেনে তুলে, প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে দিতে চিৎকার করে, হাঁট মাগি হাঁট, সমস্ত নষ্টের গোড়া এই বুড়ি মাগি। উদ্বাস্তুদের খেপিয়েছে। হাঁট বুড়ি মাগি, পিছন থেকে

একটা লাথি পড়ে মাসির কোমরে। অসীমামাসি কঁকিয়ে কেঁদে ওঠেন, বাবারে, আমারে মারিস নে, আমার ছেলেটাকে নিয়েছিস, আমায় ছেড়ে দে। ব্যথায় বেঁকে যায় মাসির কোমর, পিঠ, বুক। কে শোনে কার কথা, জোয়ানটা ফের হুংকার ছাড়ে, চল, মাগি চল।

অসীমামাসীকে পিছন থেকে বুট দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে রেল-কামরার দিকে নিয়ে চলল জোয়ানরা। আমার চোখের সামনে বোঁ বোঁ করে সব ঘুরছে। সব আঁধার ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ের কালো মেঘ ধেয়ে আসে, ছেয়ে ফেলে আমাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মেঘের বুক ফেড়ে হৃদয় জ্বলে ওঠে। অসীমামাসির ব্যথা আমার বুকে এসে বাজে। আমাদের জীবন একটা আস্ত আঁধার, শিকলি বাঁধা কুকুরের মতো আমরা উদ্বাস্তুরা কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতের মুঠোয় বাঁধা। বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে— দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের ভেতর আটকে পড়া অসহায় মানুষের মতো আমি আমার হাত কামড়াই, মাথার চুল মুঠো করে টেনে ছিঁড়ি, কুৎসিত স্থূল কথাগুলোর আক্রোশের ছোবলে আমার ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। জোয়ানদের পাশে হেঁটে চলা লোকটাকে চিনতে কষ্ট হয় না। ক্যাম্প সুপারের অফিসের সেই একচোখ কানা বামুনটা, উদ্বাস্তু মানুষদের যে ঘৃণা করে। এক চোখের ধারালো ছুরির মতো দৃষ্টির ফলাটা দিয়ে অসীমামাসিকে বিঁধতে লাগল। ক্যাম্প সুপারের কর্মচারী বামুনটা অসীমামাসির পিঠে ঘাড়ে আঘাত করে ধাক্কা মেরে ঠেলে নিয়ে চলল নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে।

বুকের মধ্যেকার অস্বস্তিকর অনুভূতিটা প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করি, কিন্তু চেপে দেব কী— ব্যথা, কষ্টের তীব্র অনুভূতিটা আমার কলজেটাকে ধীরে ধীরে পিষে যেন শক্ত করে ফেলে। বুক ধড়ফড় করা যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়তে থাকল, ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকল গলার কাছে, সারাটা মুখ বিশ্রী বিষাদে বিস্বাদে ভরে গেল। অসীমামাসির অপমান আমার, হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মারতে থাকল। ছুটে গিয়ে কিছু একটা করার জন্য ছটফট করতে থাকি, বুকের মধ্যে চাপা প্রতিবাদ উথলে ওঠে— হাত পা বাঁধা নেকড়ের মতো গর্জাতে থাকি, বিস্ফারিত দু'চোখে ধকধক করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে...।

অসীমামাসিকে জোয়ানরা ধাক্কা দিয়ে রেলগাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, ক্যাম্প সুপারের কর্মচারী বামুনটার বিদ্বেষে খুশি-ভরা কণ্ঠ শোনা যায়, খুব তেল হয়েছে, বুড়ি মাগির, ঠিক সাজাটি হয়েছে। মর দজ্জাল, ডাইনি বুড়ি, মর মর। একদলা থুথু লোকটা ছুড়ে দেয় রেললাইনে।

আমার আচ্ছন্ন চেতনার তটে এসে ঘা দেয় দাঙ্গার স্মৃতি— দেশভাগের

বিষাক্ত ক্ষতটা ফের কাঁচা হয়ে ওঠে। চোখ থেকে অশ্রুর বদলে যেন রক্ত ঝরতে থাকে, আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি...।

ছাইচাপা আগুন ধিকিধিকি জ্বলে

বিশেষ রেলগাড়ির কামরায় আমরণ অনশনকারীদের তো তুলে নিলই, সঙ্গে কয়েক শত উদ্বাস্তু মানুষদের মেরে ধরে রেলের কামরায় টেনে তুলে আধা-সামরিক বিভাগের জোয়ানরা রেলগাড়ি চড়ে চুঁচড়োর দিকে চলে গেল। একটা যুদ্ধ জয়ের গৌরব নিয়ে তারা ফিরে গেল।

বলাগড় রেল স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায়, কত সময় যে আমি অটল পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলাম তা আর বলতে পারব না। দেহে মনে অশেষ ক্লান্তি নিয়ে ঘোরের মধ্যে যেন রেললাইন পেরিয়ে এলাম। খানিক আগেই যা ঘটে গেল তার স্মৃতি কুয়াশার ঘন জালের মতো আমার সমস্ত চেতনা ছেয়ে রইল। চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে থাকল অসীমামাসির ডুকরে কেঁদে ওঠা, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখটা। ধীমান গোঁসাইয়ের ব্রোঞ্জের মতো প্রাণময় প্রেরণার উজ্জ্বল সহৃদয় চোখ দু'টি।

হাঁটতে গেলেই আমার পায়ের পাতা এলোমেলো এখানে সেখানে পড়ছে, তবু প্রতি পদক্ষেপে চমকে উঠে যেন পা দিয়ে হাতড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে আমি এগিয়ে চললাম, শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করা উদ্বাস্তু শিবিরের দিকে। অথচ মনপ্রাণ পড়ে থাকে পিছনে— দেশভাগে, দাঙ্গায় শত শত মাইল হেঁটে-আসা পথে, আমরণ অনশনের সঙ্গে যে অতীত ফুরিয়ে গেল তার দিকে। বুক জ্বলে যায়, প্রাণ পুড়তে থাকে দাউ দাউ করে। কাঁদতে পারি না, কান্না আসে না, হৃৎপিণ্ডটা যেন পুড়ে কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে— ঠোঁট মুখ জিব সব কাঠ। আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপে আর মেরুদণ্ড বেয়ে কী যেন একটা শিরশিরিয়ে উঠেছে বুকের ভেতর। আমি কারও জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়িনি, তবু দুঃখে-কষ্টে-বেদনায় কলজেটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ধিকিধিকি জ্বলছে আক্রোশের আগুন। আর তার তেজে বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে ওঠে, চোখজোড়া কুঁচকে ওঠে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। জ্বালাপোড়া চোখদুটো চারদিকে কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

যারা লুকিয়েছিল, তারা বেরিয়ে এসেছে। যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা

ফিরে এসেছে। অশ্বত্থগাছ তলায় একদল মহিলা রেগে চিৎকার করছে, ক্ষোভ প্রকাশ করছে। ওদিকে ক'জন মা কান্না জুড়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে উদ্বাস্তু মানুষ ছুটে আসছে। আগুন ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে উত্তেজিত করছে। দুঃখে-দুঃখে, কষ্টে-কষ্টে না-খেয়ে থেকে থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষগুলোর পাঁজরার তলায় গোপনে যে অসন্তোষ, জ্বালাপোড়া গুমরে আছে আজ সেটা নাড়া খেয়ে আগুন হয়ে উঠছে। জটলার ঠিক মাথার ওপর উঠেছে ধুলো আর ঝুলকালির কালো মেঘ। শুকনো অথচ ঘর্মাক্ত মুখগুলো জ্বলে উঠছে, গাল ভিজে গেছে চোখের কালো জলে, কালো চোয়াল শক্ত, মুখের মধ্যে ঝলকে উঠছে চোখ আর হলদে দাঁত। নিভে যাওয়া মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে, আমি সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাই না।

কান্না, আর্তনাদ, গোঙানি, চেঁচামেচি, কথা কাটাকাটি, অভিযোগ, ক্ষোভ টিপ্পনি শোনা যায় ভিড়ের মধ্যে। ধপ করে পড়ে শব্দগুলো, উত্তেজিত কোলাহল ওঠে, আমাদের ভাল কে চায়? কেউ কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে? একজন প্রশ্ন করে। না, কেউ না, কেউ না, ওরা আমাদের ঘৃণা করে, অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। ভিড় থেকে প্রতিধ্বনির মতো কে একজন বলে ওঠে, কেউ না কেউ না...।

আমরা সবাই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু,— যতদিন না আমরা মনেপ্রাণে জানব আমরা সবাই ভাই ভাই, এক পরিবারের মানুষ, একজোট হয়ে দাবির লড়াইয়ে হাত মেলাবার শপথ নিচ্ছি, ততদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবে না, এই ভাবেই মার খেতে হবে— কার গলার স্বর বেজে চলে ক্ষোভ নিয়ে। একটা কর্কশ গলায় চিৎকার ওঠে, আসল কথায় এসো, আমরণ অনশনে কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু না। একসঙ্গে তিন-চারজন প্রতিবাদের ধমক দেয়। বলে, ফোড়ন কেটো না বলছি— ভাল হবে না, মুখ ভেঙে ভোঁতা করে দেব। ক'জন গলা বাড়িয়ে বলে, সবই মানুষের মধ্যে, মানুষের জন্যই সব, সেই মানুষের ওপর অন্যায় অবিচার, ঘৃণা কেউ মেনে নেবে না। মানুষ, এই হল চরম সত্য— চেতনার যথার্থ আলো। তাই তো জীবন ডাক দেয়— মানুষকে, বারবার। ভিড়ের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠ শোনা যায়। বাঙালি হয়ে বাঙালির সর্বনাশ করছে, নেকড়ে নেকড়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে— কার গলা শোনা গেল, বেশ উত্তেজিত গলা। মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি দিয়েও সব বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাচ্ছে না— কে যেন বলে। একজনের মুখ কালো হয়ে ওঠে। স্বরটা কেমন অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা— এক কোদালে এত আবর্জনা উঠবে না। তাই অনেক কোদাল চাই। ঝুড়ি বালতি চাই। হিংসার

বিদ্বেষের আবর্জনার স্তূপ জমে গেছে...।

শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। কষ্ট সইতে হবে, রক্ত দিয়ে কথা ভেজাতে হবে— না-হলে এমনই হবে। সব সুরক্ষা, বেড়া, স্বেচ্ছাসেবক এক ফুঁতেই উড়ে গেল— কার ক্ষোভ বাতাসে ভাসে। এত যে কথা, এত যে বোঝানো, সব কি হাওয়ায় উড়ে গেল? কোনও চিহ্ন নেই কোথাও? একটা অস্থিরতায় মানুষটার বুক আন্দোলিত হয়। হতাশার সুর ভাসতে থাকে বাতাসের বুকে...।

বহুদিনের তৃষ্ণার্ত মাটি এই ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতে কিছুই হবে না। সব শুষে নেবে শুকনো মাটি। গলায় কফ জড়িয়ে গেছে, জ্বালাধরা চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে, বেরিয়ে আসে অগ্নিবাণী। এত আলোচনা, বক্তৃতা, সভা-সমিতি মনের ভেতর কিছুই ঢোকেনি, একেবারে কলজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে— না-হলে বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে, কার ক্ষোভ ঝরে পড়ে। নিভে-যাওয়া মুখখানাও যেন চুপিচুপি বলে, একটু সবুর করো ভাই, আজ বোঝোনি, কাল বুঝবে! হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, ভাই। বেঁচে থাকতে গেলে তো বুঝতে হবেই— সহানুভূতির স্বর শোনা যায় আশেপাশে।

ও দিকে এক মা চিৎকর করে কাঁদছে, আমাকে কেন নিয়ে গেল না। সর্বনেশেরা আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে মা ফের কান্না জুড়ে দেয় চিৎকার করে...।

হল তো আমরণ অনশন, খুব হয়েছে— এ বার চলো দণ্ডকারণ্যে। ছেলে পচুক জেলে। কথা শেষ না-হতেই ওদিক থেকে চাপা গর্জন ওঠে, টুটি ছিঁড়ে নেব না বেইমানদের।

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোবা হয়ে যায়। অপ্রস্তুতের মতো হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো 'আর করবে না গোছের মুখ করে' সরে যায় দূরে, লুকোতে চায় ভিড়ে। অন্যদিক থেকে একটা কঠিন দৃষ্টি ধারালো ছুরির মতো বিঁধতে থাকে সরে-যাওয়া লোকটার পিঠে। আমরা কী ভাবে বেঁচে আছি— হামাগুড়ি দিয়ে এতটা এগিয়ে এসেছি তো অনেক দূর যেতে হবে। মানুষ যে যার মতো ফিরতে থাকে তাঁবুতে। দঙ্গল ভেঙে যায়। ঐক্য হয় বিচ্ছিন্ন।

আমরণ অনশনকারীদের তুলে নিয়ে গেল তো, সঙ্গে বহু মানুষকেও ধরে নিয়ে গেল— মানুষ এ বার খেপে গেছে। হরিদাস বিশ্বাস ওদিকে একা একাই চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, স্বর যেন বেরোয় না। কেবল ক্ষীণ ভাবে মাথা নড়ে। তার পর তিনি ঝিমিয়ে পড়ে থাকেন তার স্বভাব মতো।

আমার অন্তরের পাতা দুঃসময়ের বাতাসে থরথর করে কাঁপতে থাকে, মনে

নাড়া দেওয়ার মতো চুরমার হয়ে যাওয়া দৃশ্যগুলি চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরে। আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ধ্বংসের প্রতিমূর্তিগুলি, মাতৃভাষা মাতৃসংস্কৃতির বিকৃত চিহ্নগুলি।

হরিদাস বিশ্বাস দোহারা চেহারার মানুষ। অল্প বেঁটে, মুখে দাড়ি গোঁফ পাতলা, কপালটা ঢিবির মতো উঁচু। চিন্তা করতে ভালবাসেন, দুর্বল হৃদয় নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। দু'দিন আগেও মানুষটা স্মৃতির ঝাঁপি খুলে নিজের জীবনে ঘটা দাঙ্গার ঘটনা অকপটে বলে যেতেন। পুব বাংলায় দাঙ্গায় নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকে কী করে বেঁচে এসেছেন, সেই বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনা বলে তিনি বেঁচে থাকার প্রেরণা পেতেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে যখন বলতেন, রামদার কোপের তলা থেকে মাথাটা ছিটকে টান দিয়ে পগারপার হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন— তখন তাঁর ওই শরীরটার ভেতর দিয়ে যেন লালরক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে যেতে দেখা যেত। একটা ভীরু কাঁপুনি চোখের ডালি উপচে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ত। আর তা দেখে আমার শরীরের লোমকূপের গোড়া যেন খিঁচুনি দিয়ে উঠত। তবু সেই ভয়াবহ দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী রক্তস্রোতে ভাসা মানুষটার প্রতি দরদে সহানুভূতিতে আমার অন্তরাত্মা নুয়ে পড়ত। আমি মনপ্রাণ হৃদয় দিয়ে তাঁর জীবনকথা শুনতাম। তিনি 'মা-নুষ, মান আর হুষ' শব্দদু'টি এমন ভাবে ভেঙে চিবিয়ে উচ্চারণ করতেন, তিনি যেন ঘেন্নায় বমি করতে পারলেই সুস্থ হতে পারেন। দলাদলা থুথু ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন, হিংস্র জন্তুদের থেকেও হিংস্র মানুষের মুখোশ পরা সাক্ষাৎ নরকের কীট...। কথা বলতে বলতে হরিদাস বিশ্বাস ক্ষেপে উঠতেন। অনাহার, অবহেলা তিক্ততা, অনিশ্চয়তা আর নৈরাশ্যের মুহূর্তে জীবনের জয় সুনিশ্চিত করতে মানুষটি লিখতে শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী আর তার গাল ভরা নাম দিয়েছিলেন 'ভিটেহারার রোজনামচা'।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দম নিয়ে ফের তিনি বলতে শুরু করতেন, বাবার মুণ্ডুটা ধড় থেকে রামদার এক কোপে কেটে দাঙ্গাবাজরা উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে, মাকে টেনে নিয়ে কচুবনে চিৎ করে ফেলে একদল অত্যাচার শুরু করল আর একদল স্বাস্থ্যবতী যুবতী দিদিকে উঠোনে চিৎ করে ফেলে ছিঁড়ে খেতে থাকল। আঃ আঃ ধানের ডোলের মধ্যে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আঃ আঃ কষ্টে দুঃখে অসহায় হতাশায় তাঁর কলজেটা বুঝি ফেটে চৌচির হতে থাকে। ওরে, সোনাভাই, শোন, বললে আমার বুকের অসহ্য জ্বালাটা খানিকটা জুড়োয়, আমার অন্তরাত্মা সোয়াস্তি পায়। কথা বলতে বলতে হরিদাস বিশ্বাস কাঁপতে থাকেন, কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়েন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একসময় হাউ হাউ করে কান্না

জুড়ে দেন। সে কান্না কিছুতেই থামানো যায় না। তখন একমাত্র ওষুধ, অবিরাম মাথায় জলঢালা। জল ঢেলে ঢেলে নাকাল করে ফেলা। তার পর একসময় ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

এ ঘটনা যে কত শতবার ঘটেছে তাঁর জীবনে তার হিসাব নেই। আর যখনই এ ঘটনা ঘটে আর তখনই উদ্বাস্তু জীবনের দিকে তাকালে আমার ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠে— আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, একটু আগে ঘটে-যাওয়া ঘটনা আর দেশভাগ-দাঙ্গা-হিংসা-প্রতিহিংসা আকাশছোঁয়া নিষ্ঠুরতা, লোভ-লালসা, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা— ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আর এই হরিদাস বিশ্বাস তারই জ্বলন্ত পরিণাম, সেই মানুষটাকে আজ মেরে হাত-পা ভেঙে ফেলে রেখে গেছে বলাগড় রেল স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। হরিদাস বিশ্বাসের মতো তুচ্ছ মানুষটাকে মারতে কার হাত সরল? ভাবতে গেলেই ধাঁকা লাগে। নিজেদের কায়েমি স্বার্থ আগলাতে যারা নিরীহ অসহায় নিঃস্ব আধপাগলা মানুষকেও মেরে হাত-পা ভেঙে আধমরা করে দিচ্ছে, কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

দূরে তাকাতেই দেখি হরিদাস বিশ্বাসের বউ, আমাদের কালোবউদি তাঁর স্বামীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীর কাছে গিয়ে কালোবউদি জোরে জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। ঘোমটা খোলা অল্প চুলের ছোট মাথাটি নিচু করে বলেন: ভগবান দেখবেন, কার ন্যায়, কার অন্যায়। কষ্টে দুঃখে তিনি আর কথাই বলতে পারেন না, কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমস্ত ঘাড়টাই তার লাল হয়েও ওঠে। কঠিন ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলে ওঠে...।

মিনিট খানেক চুপ করে থাকেন কালোবউদি। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, এই মানুষটা এই মানুষটার জন্যই তো আমার জীবন— কালোবউদির গলার স্বরটা যেন গভীর থেকে উৎসারিত হয়। তাঁর মুখ কেঁপে ওঠে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের বড় বড় ফোঁটা।

আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মাথা তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাই হরিদাস বিশ্বাসের দিকে, আমার মনে আশঙ্কার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। গলার দরদ ঢেলে দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলি, থাকগে, কালোবউদি, চলো দাদাকে নিয়ে তাঁবুতে চলো। কালোবউদির আরও কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলো, তোমাকেও কি অপমান করেছে, কালোবউদি?

হ্যাঁ, বড় কষ্ট ভাই, আমাকেও বেঁধে নিয়ে গেলেই ভাল হত। তোমার দাদার ওই কষ্ট আর আমাকে দেখতে হত না। কালোবউদির চোখে জল গড়ায়। বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করে। ব্যথাটা অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস

ফেলে ফের সান্ত্বনা দিয়ে বলি, চলো, চলো কালোবউদি। তাঁবুতে চলো।

দাদাকে দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে যাই। আমার দশা তো দেখছ, কী যে হয়ে গেল। মুহূর্তে আমার চেহারা চোখা হয়ে উঠল। নাকটা ক্ষোভে কাঁপতে থাকল। মনে হল আমার ভেতরে ভয়ংকর একটা কষ্ট আমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। কালোবউদি মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ছিটকে দাঁড়ান আমার দিকে তাকিয়ে। ভয়ের কাঁপুনি সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: হ্যাঁরে, ভাই, ওরা তোকে মারধোর করেছে? শুনেছি ওরা মানুষের গায়ের মাংস টেনে ছেঁড়ে। হাড়গোড় ভেঙে দেয়। ঘৃণা তো করেই, মাংস ছিঁড়ে খায়। উঃ ভাবতে পারি না, কী সাংঘাতিক। কালোবউদি ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকেন। সব কথা বলতে পারেন না, তো তো করে তোত্‌লাতে থাকেন।

মানুষের মনকে ওরা ভাঙে। নিষ্ঠুর ভাবে নোংরা হাতে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে। সেটা যে আরও ভয়ংকর খারাপ কালোবউদি। আমাকে মারেনি, ধরেও নিয়ে যায়নি, কিন্তু মনপ্রাণ ভেঙে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে গেল, এ-ক্ষত সারা জীবনেও শুকোবে না, কালোবউদি। ডাঙায় তোলা মাছের মতো আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলি আর ঝুঁকে দেখি:

এখানে-সেখানে জটলা। আমরণ অনশন, ধরপাকড় নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা আর জীবন যেন টগবগ করে ফুটছে। অথৈ চিন্তা বুকের ভিতর তোলপাড় করে। হাত নেড়ে বোবা ব্যথায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকান কালোবউদি। তার পর ধরাধরি করে আমরা দু'জনে হরিদাস বিশ্বাসকে তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। হরিদাস বিশ্বাস সুস্থ হতে থাকেন আর আমি টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে নিজেদের তাঁবুতে পৌঁছেছিলাম সে দিন ভাঙাচোরা এলোমেলো ছন্নছাড়া মানুষের মতো।

আমার আলুথালু চেহারা আর হাতে একখানা খাতা দেখে মেজবউদি সেবাদাসী ছুটে এসে তাঁবুর দরজা খুলে দিলেন, আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, সত্যি সত্যি তোরে ছেড়ে দিল ভাই! সত্যি? মারেনি, ধরেনি? সবাইকে জেলে নিয়ে গেল, আর তোকে ছেড়ে দিল! তুই ফিরে এলি ভাই, ভগবান রক্ষা করুন— মেজবউদির কোমল চোখ দুটো মিটমিট করে। স্নেহের মৃদু হাসিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমাকে ধরেও ছিল, আবার ছেড়েও দিয়েছে। কেন যে ছেড়ে দিল তা আমি নিজেও জানি না বউদি। নিজের সাফল্যের কথা মনে পড়ে আর বুকের মধ্যে শান্ত আনন্দ উথলে ওঠে। সলজ্জ ভাবে আমি নিজেকে সামলে নিই।

প্রত্যেকটি তাঁবু দু-তিনবার খানাতল্লাশি করেছে। তোর দাদা তো শ্রীপুর বাজারে বিড়ি বাঁধতে গেছে, অনেক রাতে বাড়ি ফিরবে। তার জন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল। বাঁচা গেল আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে যায়নি। উচ্ছ্বসিত হয়ে মেজবউদি বলেন আর খাবার গোছানোর জন্য তাঁবুর ভেতর পা বাড়ান। তাঁর পিছনে পিছনে আমিও যাই। বলি, না বউদি না, এখন আর কিছু খাব না। খাবার ইচ্ছাটাই যে মরে গেছে বউদি। কী কাণ্ডটা যে ঘটে গেল আজ। এরপর কী যে হবে এই আমাদের ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। সামনে ঝুঁকে স্বরটাকে নিচু করে আমি বলি।

নিঝুম রাত— গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা যেন নিঃশব্দের আঁধারে ডুবে আছে। আমার চোখে ঘুম আসে না। মনটা থাকে পিছনের পানে পড়ে— ধীমান গোঁসাই আমরণ অনশনের সঙ্গে যে অতীত ফুরিয়ে গেল তারই দিকে। গোটা আমরণ অনশন প্রস্তুতিটা, অনশনপর্বটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কান্না আসে না, হৃৎপিণ্ডটা যেন কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে। হৃদয়টা অবধি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ঠোঁট মুখ কলজেটাও শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপে। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা জ্বালাপোড়া শিরশিরিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে কামড়ে ধরে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। ঠাণ্ডা বিমর্ষ তাঁবুর খুপরির মধ্যে আমি হাঁপাতে থাকি অবিরাম।

রাতের আঁধার কাঁপিয়ে ভারী বুটের সেই কর্কশ শব্দ তাঁবুর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। তাঁবুর দরজায় ঝাঁকানি দিয়ে হুমকি দিয়ে চিৎকার করে বলে,— ক্যাম্প সুপার অফিসে সবাইকে ডাকছে, শুনতে পারছ। চলো, তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলো। ক্যাম্প সুপারের অফিসে হাজিরা দিয়ে দাও।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে— ঘুমের ঘোরেই হয়তো মেজদা জয়হরি বালা, সাড়া দিয়েছিলেন তাই শুনেই ভারী বুটের কর্কশ শব্দ দূরে চলে যায়।

কান খাড়া রেখে শুনতে পাই— পাশের তাঁবুর দরজা ঝাঁকিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি চলে। আক্রোশের সঙ্গে তীক্ষ্ণ শব্দ রাতের আঁধারে ভাসিয়ে পাঁচজন কি ছয়জন পুলিশ— প্রত্যেকটি তাঁবুর দরজায় ঝাঁকানি দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষদের প্রতি আদেশ নির্দেশ জারি করে যাচ্ছে। যাতে ক্যাম্প-সুপারের অফিসে তারা হাজিরা দিতে যায়।

ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্কসাইড ক্যাম্পের সেই দুর্যোগের রাতটা যেন সামনে এসে দাঁড়ায়। কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মেজদার বুকে পিঠে কোমরের বুটের আঘাতের রক্তাক্ত ক্ষতগুলি— ভয়ে আমার বুকটার মধ্যে হিম স্রোত বয়ে যায়। দম বন্ধ করে, কান খাড়া রাখি— পাছে মেজদা ঘুম থেকে উঠে ক্যাম্পসুপারের

অফিসে যান। সেদিনের মতো মেজদাকে আবার যদি মারে... খুব যদি অত্যাচার করে ভেবে কাঁটা হয়ে থাকি। চোখে আর ঘুম আসে না। নিদ্রাহীন রাত আর কাটতেই চায় না। সারারাত জীবনের আগাপাশতলা ভেবে ভেবে ঘেমেনেয়ে স্মৃতির স্রোতে ভাসতে থাকি...।

না, মেজদা যাননি ক্যাম্পসুপারের অফিসে। অনশনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের তো রেলগাড়ির কামরা ভরে নিয়ে গেছে চুঁচড়োর জেলা জেলে। বাকি যাঁরা ক্যাম্পের তাঁবুতে এখনও আছেন, সেটাই পরীক্ষা করতেই ক্যাম্পসুপারই উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশ পাঠিয়েছিল। যে সব উদ্বাস্তু সে দিন রাতে ক্যাম্পসুপারের অফিসে গিয়েছিলেন, থানায় হাজিরা দিতে যেতে হয়েছিল।

পরের দিনটাও যেন পায়ে পাথর বেঁধে চলল। দিন আর কাটতেই চায় না। সন্ধে হয়, তার পর রাতও আসে। বাইরে বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস। মোমলাগানো হলদে তাঁবুর ওপর তার রিমঝিম কান্না। ছেঁড়া তাঁবুর ফাঁক দিয়ে সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে তছনছ করে দিয়ে যায়। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে— মাটির মেঝে ভিজে ভিজে কাদা হয়। কাঁথা মাদুর জবজবে। বৃষ্টির বিষণ্ণ টিপটিপ ফোঁটা গা মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তাঁবুটা যেন অদ্ভুত ভাবে দুলছে আস্তে আস্তে। গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটা একটা নিথর মৃত্যুপরী— মানুষের বেঁচে থাকার সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ কে যেন মৃদু ঘা দিল তাঁবুর দরজায়। একবার দু'বার— এরকম তো হামেশাই ঘটে উদ্বাস্তুদের তাঁবুতে। আমারও ঘটেছে আগে বহুবার। কিন্তু আজ প্রাণটা যেন চমকে উঠল। একটা অচেনা ভয় দলা পাকিয়ে উঠল মনের ভেতর। যন্ত্রচালিতের মতো তাড়াতাড়ি তাঁবুর দরজা খুলে দাঁড়াই। দেখি, সামনে সেই হারান মণ্ডল, সঙ্গে আর একজন পিছনে দাঁড়িয়ে— মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

অসময়ে এসে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম নাকি? সরাসরি হারান মণ্ডল জিজ্ঞাসা করে। তার গলার স্বরটা উদ্বিগ্ন, মুখখানা দীপ্তিহীন। এ রকমটা আগে ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তার কথার জবাব দিই। বলি, না, ঘুমাইনি। তার পর অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকি। হারানের বিধ্বস্ত মুখের দিকে কিছু একটা খুঁজি।

হারানের সঙ্গীটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। মাথায় চাপানো তেলচিটে ময়লা গামছাখানা সরিয়ে কাঁধে রাখে। বেঁটেখাটো মোটাসোটা আঙুলের হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বহুদিনকার পরিচিতের মতো সহজ ভাবে বলে, আরে, আরে যতীনদা যে, আমায় চিনতেই পারলে না। সুশীল বিশ্বাস মৃদুস্বরে বলে বিস্মিত হয়ে।

হঠাৎ কেন জানি মনটা আমার খুশি হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি বলি, আরে,

সুশীল তুমি! হ্যাঁ হ্যাঁ, যতীনদা আমি! দীর্ঘদিন চুল-দাড়ি না-কাটা কুৎসিত চেহারাখানা শুকিয়ে একেবারে দড়ির মতো হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে। সত্যি চিনতে কষ্ট হয়। চোয়াল-ভাসা মুখটা নাড়িয়ে সে সাঁই সাঁই করে নিঃশ্বাস ফেলছে আর বুকের মধ্যে উঠছে একটা ঘড়ঘড় বিশ্রী আওয়াজ। আর তাতেই তার মুখটা যেন বেঁকে আছে একদিকে।

ভুরুর নীচ দিয়ে তাকিয়ে হারান এবং সুশীল একসঙ্গে বলে, আমরা কালকেই দণ্ডকারণ্যে চলে যাচ্ছি, যতীনদা, লড়াই করে আর টিকে থাকতে পারলাম না। দাদা, মাগ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আর বাঁচার কোনও পথ খুঁজে পেলাম না। কাল চলে যাব তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম। একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম বাঁচার, কিন্তু পারলাম না। না, যতীনদা, মায়া আর বাড়াব না। যেতেই যখন হবে দেরি করে তো কোনও ফল হবে না।

আমার কানে যেন কথাগুলো ছুঁচ ফোটাল, মুখ শুকিয়ে গেল। ঢোক গিলে সুশীলের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওর হাতটা জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, তাতে কী হয়েছে, একটু বসে যাও ভাই।

সুশীল আমার হাতটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে তাতে নিজের হাতটা বোলাতে লাগল। বলল, আমাকেই যেতে হবে। সেটাই তো উচিত। সুশীল বলে আর ছলছল চোখে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার হাতটা ছেড়ে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুশীল আমার হাত ছেড়ে খানিক সরে দাঁড়ায়।

তোদের আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু আমার যে কষ্ট হয়। একসঙ্গে এতদিন থাকলাম, আন্দোলন করলাম, তুই তো জেলও খেটে আসলি, বাঁচার সমস্যা কিন্তু আমাদের আজও গেল না। কী করব বল। আমি যে তোদের সকলকে নিয়ে বাঁচতে চাই ভাই। কথা আটকে যায় গলায়। সরে যায় সুশীল, হারান।

সুশীল বলে, ভালবাসা পায়ের বেড়িও হতে পারে...

কথাক'টি যেন শেলের মতো বুকে বাধে। চমকে উঠে বলি, সুশীল, আর বলিস না ভাই। ভয় হয়, পাছে আরও কঠিন কথা বলে সুশীল। তাই আবেগ, উত্তেজনা চেপে চুপ করে থাকি। বড় বড় চোখগুলি আঁধার হয়ে, আমার মুখের ওপর গেঁথে যায়। পাথরের ফাটলের মধ্যে আটকে পড়া গিরগিটির মতো অসহায় প্রাণে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যায়। পিছনে ফিরে তাকানোর সাহসই যেন ওদের হয় না।

তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে মনের ব্যথার এককোণে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদি। চোখের জলের ধারায় বুঝি বুকের

তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে— এমন দুর্বলতায় ঘাড়টা নুয়ে যেতে থাকে আমার আর স্মৃতিজালে জড়াতে থাকি নিজেকে।

শিকড় ছেঁড়া জীবনের পাতা একটা-একটা করে ঝরে যাচ্ছে। প্রতিদিন খবর আসছে বলাগড় ক্যাম্প বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতির সদস্যরা এক-এক করে উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছে— কেউ দণ্ডকারণ্যে, কেউ আন্দামানে, কেউ অন্ধ্রপ্রদেশে, কেউ অমরকোটে, কেউ রায়পুর। যে যেখানে পারছে ছুটে পালিয়ে বাঁচার লড়াই লড়ছে। ভাঙছে তো ভাঙছে— বলাগড় উদ্বাস্তু শিবির প্রতিদিন ভাঙছে। রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে সরে পড়ছে সব।

কেউ উদ্বাস্তু শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচছে, কেউ-বা মরে গিয়েও জীবনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাচ্ছে। একজন দু'জন করে প্রতিদিন বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরে মানুষ মরছে। দেশভাগের আর ভিটেহারার মর্মজ্বালা সয়ে এখানে মরে বাঁচছে সব।

সকালবেলা সংবাদ রটে যায়— বাদল হালদার তাঁবুর মধ্যে মরে পড়ে আছে। তাঁবুর কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বাদল হালদারের নুব্জ দেহটা। ডান কাঁধের ওপরে হেলে আছে খালি মাথাটা, ডান হাতটা পিঠের নীচে আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো মাটি খিমচে আছে। শিকড় ছেঁড়া জীবন মাটি খিমচে ধরে মরে পড়ে আছে।

আমি ছুটে গিয়ে বাদল হালদারের দিকে তাকাই— ক্লান্ত ভাবে পা ছড়িয়ে যেন বসে আছে, একটা চোখ ঝাপসা ভাবে তাকিয়ে ওই দিকে। ঠোঁট দু'টি ফাঁক, যেন অবাক হয়ে হাঁ করে আছে মানুষটা। জিভটা একদিকে খানিকটা বেরিয়ে আছে। ওর রোগা টিংটিঙে দেহটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। অনাহারে অবহেলায় শরীরের হাড়গুলো সব দামড়া দামড়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মাটির মায়া তবু ছাড়তে পারেনি, জন্মভূমি বাংলার মাটি খামচে ধরে মরে গেল।

কে একজন চাপা গলায় বলে, দেখছ রক্তটক্ত নেই, না-খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কবে থেকে ডোল বন্ধ, কী করে বাঁচবে বলো তো মানুষ! কষ্টে তার গলা যেন বুজে আসে।

দেশভাগ আমাকে ভিটেছাড়া করল, এখন তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছে! আর একজনের তিক্ত কঠিন গলা শোনা যায়।

প্রতিদিন হতাশার ঘনকালো আঁধার গোটা উদ্বাস্তু শিবিরটাকে যেন গিলে খাচ্ছে আর মানুষ ছটফট করে মরে যাচ্ছে, মরার হিড়িক পড়ে গেছে যেন চারদিকে।

বাদল হালদারের মৃত্যুর দু'দিন বাদে সকালবেলা দেখি বলাগড় ক্যাম্প সুপারের অফিসের সামনে চারখানা লরি দাঁড়িয়ে। আর সেই লরিতে উঠে বসে আছে ক'টি উদ্বাস্তু পরিবার। খবর রটে যেতে সময় নিল না। আটাশ দিন আমরণ অনশনকারীদের সরকার জোর করে তুলে নিয়ে গেল, সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছিল প্রায় সাড়ে চারশো মানুষ। যারা জেলে আটকা পড়ল তারা সরকারের কাছে জবানবন্দি দিল, 'তারা দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনে যাবে।' আর তাতেই তারা মুক্তি পেল। যে সকল উদ্বাস্তু পরিবার জবানবন্দি দিয়ে মুক্তি পেয়েছে তাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য লরি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গী সহযোদ্ধা সুশীল এবং হারানও সেই জবানবন্দির দলে ছিল। প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে বলাগড় ক্যাম্প বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতির অনেক সদস্যের মন ভেঙে গেল। হতাশার আঁধারে তারা মুখ লুকাল, কেউ কেউ দণ্ডকারণ্যে বাংলার বাইরে যাওয়ার জন্য ক্যাম্প সুপারের অফিসে আবেদনপত্র জমা দিয়ে এল। বলাগড় ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির সদস্যদের ঐক্য, আন্দোলন, মনোবল কিছুই আর থাকল না। ভালমতোই ভাঙন শুরু হয়ে গেল। এই ভাঙন কেবল বলাগড় উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ ছিল না— গোটা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরেই চলল। সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য— নমঃশূদ্র আর দলিত মানুষদের ঐক্য এবং জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনায় তারা সফল হল। তাদের যুগ যুগ ধরে বয়ে আনা কায়েমি স্বার্থরক্ষার সুব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিল।

আংরাইল উদ্বাস্তু শিবিরে সপরিবারে ছিলেন আমার বড়দি গৌরী মণ্ডল, তাঁরা আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যের কোরাপুটে পুনর্বাসনের নামে নির্বাসনে গেলেন। আমার বড়মামা এদেশে টিকতে না পেরে পূর্ব বাংলায় ফিরে গেলেন সপরিবারে। আমাদের যশোহর জেলার অনেক পরিচিত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের নামে হারিয়েই গেলেন। পূর্ব বাংলার অসহায় নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের কত পরিবারকে কোথায় কোথায় পাঠানো হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকারের কোনও দপ্তরেই ছিল না, রাখেওনি অবহেলায়, ঘৃণায়, বিদ্বেষে।

আমাদের তাঁবুর খুব কাছে ছিলেন সনাতন সিকদার। বয়স্ক শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ। মাথার চুল সবই সাদা, এমনকী ভুরুদুটোও সাদা। কথা বলতেন খুব ধীরে ধীরে। তিনি প্রায় বলতেন, উদ্বাস্তুদের জীবনটা যদি একটু অন্যরকম হত, মানুষগুলোর একটু বুঝসুঝ থাকত, তা হলে প্রত্যেকেরই এই বাংলায় পুনর্বাসন হত। কিন্তু তা হবার নয়— যতদিন না আমরা মনেপ্রাণে জানব যে আমরা

সবাই ভাই ভাই। উদ্বাস্তু দলিত এক পরিবারের মানুষ এক জোট হয়ে দাবির লড়াইয়ে হাত মেলাবার শপথ নিচ্ছি, ততদিন আমাদের অধিকার ফিরে পাব না। আমাদের মানবিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাব না। শত্রুকে দাবাতে যদি চাই তবে আমাদের শপথ নিতেই হবে।

সনাতন সিকদারকে নিরীক্ষণ করে দেখি। যে পথে ধীমান গোঁসাই গেছেন, গেছেন আরও অনেক উদ্বাস্তু মানুষজন, রাতের আঁধারের সেই পথখানি আমার চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

বয়স্ক দীনদাস মিস্ত্রি সনাতন সিকদারের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন, ও সব কথা বলে আর কী হবে? যা হবার তো হয়েই গেছে। মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। হতাশায় তার মুখে কথাই জোগায় না, বিস্ফারিত দুই চোখে তাকিয়েই থাকেন যেন ভেতরে কোনও চৈতন্য নেই।

যে ক'দিন আছি, বলি, না বলে যে বাঁচি না। সনাতন সিকদার চারদিকে তাকান। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কেমন একটা অবসন্ন হাসি হেসে আবার বলে চলেন, এই যে এই ভাল ছেলেরা, এদের দেখে আমার কী মনে হয় জানো? এরাই একদিন আমাদের দুশমনদের ঘৃণার অত্যাচারের শোধ নিতে পারবে। ছিন্নমূল জীবনের পথে যারা শেষ হয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কায়েমি স্বার্থের প্রভুদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে, সেই সব হতভাগ্য মানুষদের হয়ে এরাই প্রতিশোধ নিতে পারবে। এই আশার আলোটুকু বুকে নিয়ে যদি মরেও যাই তবু শান্তি পাব। কথা বলতে বলতে সনাতন সিকদার হারিয়ে যান নিজের স্মৃতির মধ্যে। তাঁর কথার জবাব কেউ দেয় না। ধীরে ধীরে মানুষটা চলে যান আপন তাঁবুতে।

সুবল মণ্ডল নড়েচড়ে বসেন। তার দিকে তাকিয়ে বলেন, এসে বসো এখানে। আর ওই একই কথা— মানুষ কী করে মানুষের অধিকার লাভ করবে, তাতেই ওঁর সমস্ত প্রাণ নিবদ্ধ। সংসারের আর কোনও ছবিও দেখেননি, যেন অন্ধ হয়ে গেছেন। বুকে পাথর বেঁধে বেঁচে আছেন।

আমি কথা না বলে থাকতে পারি না। একটু সরে গিয়ে চিন্তিত ভাবেই বলি, দেখার আর কী-ই-বা আছে, বলুন তো? দেশভাগে লাখো লাখো মানুষ মরছে। বাঁচার কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছে না। আর নতুন কী আছে দেখার!

ওর কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল ভাই। একবার শুনলে এমনিতেই তো কলজের মধ্যে গেঁথে যায় পাকা হয়ে। তার ওপর রোজ রোজ— আনন্দ

ঘটক আমারই সমবয়সি ধীরে ধীরে বলে। আর সবুজ চোখদুটোয় অস্বস্তির কালোমেঘ জমতে থাকে।

ওর কথায় আমাদের জীবনের সব কিছু ধরা পড়ে— সুবল মণ্ডল বেজার মুখে বলেন, আমি তো বহুবার ওর মুখে ওই একই কথা শুনেছি। কিন্তু তবু এক সময় দ্বিধা হয়, সত্যিই তো আমরা সবাই অন্ধ। কেউ খিদের তাড়সে, কেউ কায়েমি স্বার্থ রক্ষায়। এই যা তফাত তাই এক সময় ইচ্ছা হয় বলে উঠি, এসো ভাই সব, একটা কঠিন ঝাঁকানি দাও নিজেদের। একেবারে মরণপণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো অধিকার আদায়ের লড়াইতে।

আমার কিন্তু সারা চিন্তা জুড়ে থাকে ছিন্নমূল জীবনের গোটা ব্যাপারটা। ঝাপসা আলোয় জ্বলে ওঠে আরও এমনই কত ঘটনার বাস্তব ইতিহাস যা আমার হৃৎপিণ্ডটার ছটফটানি বাড়িয়ে দেয়। প্রচুর জল পেলে উর্বর মাটির গভীর তলাকার বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়। তেমনই এই জীবনের বাস্তব স্পর্শে আমার মনের ভাবনারাও অনায়াসে অঙ্কুরিত হয়ে অবিলম্বে ডালপালা পাতা মেলে ভাষার ফুল ফুটে ওঠে। চেতনায় যেন আলো জ্বলে ওঠে।

ফের ফসলের খেতে খেতমজুর খাটতে যাই, শত বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে জিরাট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে যাই, পড়াশুনা চালিয়ে যাই মনপ্রাণ দিয়ে, এই ভাবি। দৃঢ় অবিচলিত থাকি আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভে একেবারে ঠাসবুনোট করা অনুশীলনে জীবনকে টেনে তোলার কর্মোদ্যোগে।

আলোচনা সভা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে থাকি। বলাগড় রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জ্বলছে বাতি। আকাশে জ্বলছে অসংখ্য তারা। সেই তারার আলোয় পথ হাঁটি একা একা। আমার বুকেও এক অজানা আলো ঝলমল করে ওঠে, তার আমেজে উষ্ণ হয়ে উঠি, পথ চলি...। শিকড় ছেঁড়া জীবনের পথে হাঁটি, আশার উষ্ণ আলো বুকে...।

অথৈপাথারে শিকড় ছেঁড়া জীবন

অন্তর অসাড় করে দেওয়া এক দুঃখের কুয়াশার ভেতর দিয়ে দিন কাটছে আমার। আশার কোনও আলোই সেখানে ঢুকতে পারে না। ভুলে থাকবার জন্যে প্রাণপণ খাটতাম। যখন যা পেতাম সেই কাজই করতাম। পচা পাটের আঁশ ছাড়ানো, কাদা পাকানো ভুঁইতে পাতো রোয়া, ভুঁই নিড়ানো, ধানকাটা, বিচুলি বাঁধা, ধানঝাড়া

এমনকী মোট বোঁচকা পেলে রেল স্টেশনে কুলির কাজও করতাম। এই কাজ করতে গিয়েই মুকুন্দ বিশ্বাসের বড় ছেলে রথীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। রথীন বিশ্বাস মোটাসোটা চেহারা, বুকটা স্বাভাবিক থেকে বেশি চওড়া, কাঁধদুটো মাংসল, খয়েরি রঙের দুটো চোখ, মুখটা দুধের হাঁড়ির মতো গোলগাল প্রশস্ত।

রথীনদের ছয়টি ভাইবোন নিয়ে বড় পরিবার, দুটো তাঁবুতে সংকুলান হত না। তাই রথীন এক সময় থেকে, আমার সঙ্গে একই তাঁবুতে, একই শয্যায় শুতে আরম্ভ করল। কিন্তু আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত খুবই কম। সকাল হওয়ার আগেই আমি বেরিয়ে যেতাম পচা পাটের আঁস ছাড়াতে। ভাগীরথী নদী পেরিয়ে, সেই দূর দূর গাঁয়ের পচাখানায়, কানাপুকুরে মজা ডোবায়, মরানদীর খাদে আর রথীন আট-ন'টা অবধি ঘুমিয়ে কাটাত। তার পর উঠে খেয়ে যেত রিকশা চালাতে। রথীন ফিরত রাত একটা-দেড়টা। সারাদিন গাধার মতো খেটে সন্ধ্যায় আমি ফিরতাম তাঁবুতে, মাথায় ভারী পাটকাঠির বোঝা নিয়ে। খেয়েদেয়ে পড়াশুনা করে এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম। সারাদিন কঠোর খাটুনি আর অসীম ক্লান্তির পর অঘোরে ঘুমিয়ে থাকতাম, কখন রথীন আসত, শুতো, তা আমি টেরই পেতাম না।

রথীন লেখাপড়ার ধার ধারত না। নাকের নীচে গোঁফের কালো রেখা গজিয়ে ওঠায় খেলো মুখটা গভীর বিষাদে ভরে থাকত। অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে ওর বাবা সারাদিন মাটি কেটে জনমজুরি খেটেও দু'বেলা পেট ভরে খাবার জুটাতে পারত না, তখন রথীনের রোজগারটাই ছিল ওর বাবার বড় ভরসা। রাত একটা-দেড়টা অবধি রিকশা টেনে রথীন ভালই আয় করত। রথীনের উরু দুটো ছিল অস্বাভাবিক মোটা, চওড়া আর বলিষ্ঠ। মাথার চুল আঁচড়াতো কপালের সামনে জড়ো করে। ওর পায়ের পাতাও ছিল বেশ চ্যাপটালো শক্ত আর মোটসোটা। মাসেল কাঁধের ভেতর, অনেকখানি বসে-যাওয়া ঘাড়টা, একটু খাটোই ছিল। সাদা মণি ভাসা চোখ দুটোতে কষ্টের আর বিষাদের কড়া ছাপ স্পষ্ট ফুটে থাকত। হয়তো অর্ধাহারের পর বেশি পেট ভরে খাবার জন্যই রথীনের পেটটা বেঢপ হয়ে ফুলে থাকত। আবার ঘুমাতেও পারত নাক ডেকে— অঘোরে বেহুঁশ হয়ে।

মাঝেমধ্যে দিনের বেলায়, রথীনের সঙ্গে কখনও মুখোমুখি দেখা হলেই কুশল বিনিময়ের মতো আলাপ হত। বলতাম, রথীন তুই ওটাই করবি? সত্যি তোর জন্যে দুঃখ হয়। লেখাপড়া একদম ছেড়েই দিলি? আর বুঝি ও-পথ মাড়াবি না?

রথীন কথা না-শুনতে পাবার ভান করত, নিজের কথা না-বলে আমার কথাই বলত, তোরা লেখাপড়া কর না, এমন ভাবে বলত, রথীন যেন আমাকে চিনতেই পারত না।

আমি তাই বললাম হ্যাঁ রে রথীন, তুই আমাকে যেন চিনতেই পারলি না? তুইও আমাকে চিনতে পারলি না। সে বলে আর তেরছা ভাবে তাকায়।

তা তুই আমাকে চিনতে পারলি না কেন? একই তাঁবুতে তো আমরা একই বিছানায় শুই।

চিনব কী করে বল? তোর চেহারাটা একবার জলে ঝুঁকে দেখ গে, তা হলেই বুঝবি, চিনতে পারলুম না কেন? তোর গায়ের জামাটা তো পচা পাটের রং আর প্যান্টের পেছনটা বাঁদরের পাছার মতো লাল। পাগুলো পচা জলে পচে গেছে। হাতের আঙুলে জল ঘেঁটে হাজা। তোর এই চেহারা দেখে এখন কেউ বলতে পারবে, তুই সেভেনে পড়া আমাদের যতীন। ঠিক যেন রোগাপটকা চাষার চেহারা। আর তোর গায়ের গন্ধ? বলদের চোনার মতো। রথীনের কথা শুনে আমার মুখটা কালো হয়ে গেল। ধরাগলায় বললাম, এখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, লাঙল-ধরা চাষা হব না তো কী ব্যারিস্টার হব রে?

তা হলে অতদূর পড়াশুনা করে তোর আর আমার তফাত কী রইল রে? তোর চেয়ে বরং আমিই ভাল আছি। রথীন মুখ বিকৃত করে বলল।

কী করে? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি। ওর মুখের দিকে তাকাই...।

দেখ, তুই স্কুল ছেড়েছিস ক্লাস সেভেনে উঠে আর আমি স্কুল ছেড়েছি ক্লাস টু পাস করে। তা হলে আমি হাতে পেলাম পাঁচটি বছর। সেই তখন থেকে আমার পেটটা আমি চালাচ্ছি। আর তুই তো সেই দাদাবউদির ঘাড় ভেঙে বোঝাই হয়ে রইলি। স্কুলে পড়ছিস, আবার পচা পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছিস। তা হলে তোর, আমার ভেতর ফারাক কোথায়? স্কুলে পড়ে চাকরি পেলে, স্কুলে পড়ার একটা অর্থ হয়, নয়তো এমনি হাগলেও যা, পেট ছাড়লেও তা। সত্যি কি না বল? রথীন আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে।

তা কেন হবে রে? ক্লাস সিক্স অবধি পড়ে তো অনেক কিছু শিখলাম।

সেটা তোর মাঠের কাজে, পাট বাছায় কোন কাজে লাগে? তার চেয়ে স্কুলে না-গিয়ে গোড়া থেকেই খেতের কাজে লাগলে, মাঠের কাজের হালচাল এখন যা জানিস, তার চেয়ে ঢের বেশি জানতিস। এখন তোর না-হল এদিক, না-হল ওদিক। তুই অথৈ জলে ডুবে আছিস...।

কথা বলতে বলতে ট্রেনের যাত্রী এসে গেল। রথীন রিকশায় যাত্রী তুলে

নিয়ে চলে গেল যেন সম্রাট চলেছেন ময়ূরপঙ্খিতে চড়ে এমনই ভাব। পিছনে একবারও ফিরে তাকাল না। আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম সে দিকে।

দুর্যোগময় অতীত আর আঁধারের অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে ঢাকা মানুষদের নিয়ে আমাদের কলরবমুখর উদ্বাস্তু শিবিরের কোনও কিছুর প্রতিই, রথীনের কোনও কৌতূহল, আগ্রহ উৎসাহ ছিল না। দিনের মধ্যে ওই একবারমাত্র খেতে আসত তাদের তাঁবুতে আর রাতে শুতে আসত আমার তাঁবুতে। যেন লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ালের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে, সে উদ্বাস্তু শিবিরে চলে আসত— দেখলে মনে হত কোনও-এক কালো আঁধারের গহ্বরের দিকে সে যেন পা বাড়িয়েই আছে। অথবা ভেতরে ভেতরে সে কিছু-একটা জ্বালিয়ে নিজে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ক'দিন বাদেই আমি আবিষ্কার করলাম— রথীন সম্পর্কে যা ভাবছিলাম তা সত্যি। বলাগড় রেলস্টেশনের মুখে, পাথরভাসা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায়, রোজই একটা মেয়ে এসে দাঁড়ায়। বেঁটেখাটো নাদুস-নুদুস গা-গতর, গোলগাল আস্ত একটি তরমুজ, গোল মুখ, ভোঁতা নাক, থেলো স্তনদুটো টেনে উপরে তুলে বাঁধা। রথীন রিকশা চালিয়ে চলে যেত— মেয়েটি ডেবাডেবা চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকত। সে মুখ টিপে হাসত, চোখ মারত। একগাদা কালো কোঁকড়া চুল, মাথাটা মস্ত বড় দেখাত। চোট্টি কপালে ঝুলে থাকত কোঁকড়া কটা চুল। প্লাস্টিকের সস্তা পুতুলের মতো ফোলা ফোলা গালে হাসিতে টোল পড়ত। ঘুম ঘুম চোখে মিটমিট করে তাকাতে তাকাতে, সে কানের পাশ থেকে গোছা গোছা চুল সরিয়ে দিত বারবার। তার খাটো বাঁ হাতখানা উঠত আর উঁচু স্তনদু'টি ছুঁয়ে নামত। তার ভেতর একটা নতুন উত্তেজনা, দেহ কাঁপিয়ে গনগনে আগুনের মতো যেন জ্বলে উঠত।

রাস্তার ধারে ধুলোতে চড়াই পাখি স্নান করছে। বাতাসে উড়ছে রেণু রেণু কণা। ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে চড়াই দম্পতি প্রেম ভালবাসায় বিভোর। একফালি রোদে দাঁড়িয়ে মেয়েটি নিজের খুশিতেই হাসছে আর সোহাগে ঢলে পড়ে বলছে, এই, এই, তুমি আর একটু দাঁড়াও না। দেখো না তোমার জন্যে কী এনেছি। বলেই মেয়েটি আঁচলের তলা থেকে হাতে ধরা একটা পাকা বিচিকলা দেখাল। হলুদ বেশ নধর কলাটি।

একদম সময় নেই, খুব তাড়া আছে, যেতে হবে। রথীন বলে আর রিকশায় যাত্রী তুলে চলে যায়।

দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও না। হাতের ভঙ্গিতে মেয়েটি কী যেন সংকেত দেখায়

আর দু'পা এগিয়ে যায়।

বিকালে আসব। রথীন বলে আর একটা আধুলি মেয়েটিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয়। ঝন করে রাস্তায় শব্দ ছড়ায়। মেয়েটি শব্দ লক্ষ্য করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আধুলিটা ছোঁ মেরে তুলে ব্লাউজের সামনের ফাঁকে ছেড়ে দেয়।

রথীন রিকশা টেনে এগিয়ে যায়। ট্রেন ধরতে ব্যস্ত মানুষ পথে চলতে, সে দৃশ্য দেখে মুচকি হেসে চলে যায়। মেয়েটি লজ্জাহীনার মতো পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি নিয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলে, ঘামে ভেজা বগল দেখিয়ে মাথা বুক নাচিয়ে, চোখের কোণে হেসে চলে যায় তাঁবুর ভেতরে।

এ-দৃশ্য আমারও নজরে পড়ে। দেখেও দেখি না। রথীনকে একদিন জিজ্ঞেস করতে সে বলে: ও কিছু না, ও কিছু না ভাই। মেয়েটি এমনই দাঁড়ায়। রথীন ফুঁ দিয়ে সব বাতাসে উড়িয়ে দেয়। আমার কিন্তু রথীনের এই প্রণয় ব্যাপারে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতি কুঁকড়ে সংকুচিত হয়ে আসত। জীবনের তীব্র আকর্ষণের একটা আভাস পেতাম, যার তুলনা কোনও পরিবারের বাড়িতে মেলে না।

এক রাতে তুমুল বৃষ্টি শেষে— একটু দেরি করে তাঁবুতে ফিরছি। গাঢ় আঁধারে কোলের মানুষও দেখা যায় না। ঠাওর করে চেনাও যায় না। পা হাতড়ে, হাত হাতড়ে পথ চলছি। স্টেশনের মুখে আঁধারে হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠির আগুন, দপ করে জ্বলে উঠে, নিভে গেল। মনে হল কিছু যেন আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে সরে গেল— আমি টের পাবার আগেই।

পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই— চলার পথেই হবে, শুকনো জামাকাপড়ের খসখস বিশ্রি আওয়াজ কানে এসে বাজে। ফিসফিস মধুর আলাপ। কানটা খাড়া রেখে পা ফেলতেই থমকে দাঁড়াই। পথ নয়, অপথে কি কু-পথে একটা রিকশা দাঁড় করানো, তার পিছনে ঘন আঁধারে একজোড়া মানুষ পরস্পরকে নিবিড় ঘনিষ্ঠ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নদীর কুলকুল ধ্বনিতে, উপচে-পড়া ঢেউয়ের শব্দে, ভেঙে যাচ্ছে যেন পাড়, বাতাসে অসহ্য দাপাদাপি আর একটা অচেনা দুর্গন্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরে। চাপা চুমু খাওয়ার মৃদু শব্দ তখনও আঁধার সাঁতরে জীবনের গান গেয়ে চলেছে...।

দাঁতে জিভ কেটে দু'পা পিছনে সরে আসি, চমকে উঠে নিজেকেই শুনিয়ে বলি: হায়, এ পথ তো আমার নয়, ইচ্ছা করেই একটা কাশি দিয়ে সাড়া দিই। ছায়ার মতো দুটো মূর্তি আঁধারে দ্রুত আলাদা হয়ে সরে যায়, আলগা হাওয়ায় চেনা গলার চাপা ফিসফিস কথার অস্ফুট আওয়াজ শুনি। এটা তো রথীনেরই স্বর, ওদিকে, উৎকণ্ঠিত গলায় সোহাগী উচ্চারণ: ট্রেন আসতে ঢের দেরি, একটু

থাকো না। জিভ নাড়ার আর চুমু খাওয়ার অস্পষ্ট শব্দ বাতাস ভারী করে।

আস্তে, ব্যথা পাচ্ছি ...দাও ...আবেগ-উত্তেজনার ঢেউ ভাঙছে...আশ্লেষে...।

নিষিদ্ধ জগতের তখন কিছুই বুঝিনে, জানিও না, তবু মনে হল বাতাসে আঁশটে গন্ধ— মাতাল হয়ে ঢেউ তুলছে আর আনন্দের শিহরন ছড়িয়ে দিচ্ছে— যেন প্রাণময় স্ফূর্তির জাগরণে, প্রকৃতিও জেগে উঠেছে নিজস্ব স্বভাবে...।

এই যে অসংগতি জীবনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, অথচ প্রাণকে জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। নিজস্ব ধারাতেই ওরা গড়ে তুলেছে আর এক জীবন। সে জীবন যেমনই হোক তার মধ্যে আছে অমোঘ এক মানবিক আবেদন, দুঃসাহসী, বেপরোয়া আশ্লেষ। তাই ওদের জীবনও মাঝে মাঝে আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে যেত। আর আমিও খুশি হয়ে উঠতাম যখন দেখতাম— ওরা শত কষ্টে, কত দুঃখেও এ কথা ওরা মনপ্রাণ দিয়ে মেনে নিচ্ছে, স্বীকার করছে যে, জীবনটা খুবই বিশ্রী। দুঃখের অভাবের বেদনার অনটনের কিন্তু তাকে সুন্দর সুখের করে তুলতে হবে আপন দেহমন্দিরে। আর তখনই আমি সরে আসতাম আমার নিজের জীবনের মুখোমুখি, জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে প্রতিজ্ঞায়। প্রতিজ্ঞা সফল করতে হলে লেখাপড়া শিখতেই হবে। তার জন্য যদি মরেও যাই— তাও আমার কাছে পরম পাওয়া হবে। ক্লাস ফাইভের পরীক্ষায়, ক্লাসের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাশ করায় বই কেনবার জন্য বাইশ টাকা পেয়েছিলাম সরকারি অনুদান। তাই দিয়ে আমি একটা জামা আর একটা প্যান্ট কিনে বাকি টাকা দিয়ে ক'খানা ক্লাস সিক্সের বই কিনেছিলাম। বইগুলোর দিকে তাকালেই দুঃখে-কষ্টে-বেদনায় আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। আমি স্কুলে যেতে পারছি না, পড়াশুনাও করতে পারছি না— অভাব অনটনের জন্য। খাবারও জুটছে না সব দিন। এ সব ভাবলেই বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে...।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ক্লাস সিক্সের পড়া স্কুলের বাইরে পড়াশুনা করে তৈরি করব। প্রতিদিন ভোর না-হতেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে যাব, ফসলের সময় চাষির খেতে ফসল কাটব, চাষের সময় ভুঁই নিংড়াব, কাদা পাকানোর সময় পাতো রোপার কাজ করব, ফসল কাটার সময় ধান কাটব, পাট বাছবার সময় পাটের আঁশ ছাড়াব— সারা বছর জনমজুরি খেটে পেটের ভাত জোগাড় করব। বছর শেষে হেডমাস্টার মাননীয় যামিনী দাসের হাতে-পায়ে ধরে বাইরের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দেব। দশম শ্রেণি অবধি হয়তো এ ভাবে জনমজুরি খেটে পড়াশুনা চালানো যেতে পারে।

সারাদিন মাঠেঘাটে মজুরি খেটে রাতে তাঁবুতে রাত জেগে বই পড়ব, কিন্তু কেরোসিন তেল জোটে না। তাই উপায় বের করলাম— শেষরাতে উঠে কলাগড় রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাতির আলোয় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া তৈরি করতাম। গোপনে গোপনে আমার পড়াশুনার সাধনা চলল। সময় একদম নষ্ট করতাম না। মাঠেঘাটে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর যেটুকু সময় পেতাম, সেটুকু সময় মনপ্রাণ দিয়ে পড়তাম। এই অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে অপুষ্টিতে অনাহারে অনিদ্রায় আমার বুকের হাড়গুলি চামড়া ঠেলে স্পষ্ট ভেসে উঠল। চোখের কোণে কালি জমে গেল, শরীর দুর্বল হয়ে গেল। অথচ আমাকে দেখার, বাঁচাবার— মা ছিল না, বাবাও ছিল না। কী ভাবে যে বেঁচেছিলাম আমি নিজেও তা জানি না। তবু আমি বেঁচেছিলাম জীবনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

বার্ষিক পরীক্ষা যখন খুব কাছে এসে গেছে— একদিন আধবেলা মাঠে খেটে আমি জিরাট কলোনি হাইস্কুলের হেডমাস্টার যামিনী দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিলাম। বললাম, স্যার, আমি উদ্বাস্তু, কলাগড় ক্যাম্পে থাকি। আমার মা নেই, বাবাও নেই। দাদার সংসারে থাকি। কেউ আমাকে লেখাপড়া শেখাতে চায় না। জমিতে জনমজুরি না খাটলে আমাদের খাওয়া জোটে না। এই ভয়ংকর অভাবের জন্য ক্লাস ফাইভের পরীক্ষায় সারা তালুকের মধ্যে আমি ফাস্ট হয়ে, ক্লাস সিক্সে উঠেও স্কুলে আসতে পারিনি। মাঠেঘাটে কাজ করতে করতে আমি ক্লাস সিক্সের পড়া তৈরি করছি। আমি এখন ক্লাস সিক্সের বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে চাই। আপনি স্যার বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দিন। হাত জোড় করে হেডমাস্টারের সামনে ভাঙাচোরা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম...।

হেডমাস্টার যামিনী দাস বৈষ্ণব মানুষ, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর নিজের মাথার টিকিটা ধরে ভাবলেন। আমার চোখেমুখে তাকালেন, আমার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে আরও কাছে ডাকলেন। পিঠে হাত রেখে আশ্বাসে উজ্জ্বল দুটো চোখ মেলে বললেন, খুব ভাল, বাবা যতীন, তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা খুলে বললে— আমি খুব খুশি হলাম। আমি সহ-প্রধান শিক্ষক শান্তিময় শীলদাস মহাশয়কে তোমার দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তোমাকে সব রকম সাহায্য করবেন। তিনি সহ-প্রধান শিক্ষককে ডেকে স্কুলের খাতায় নাম নথিভুক্ত করতে বললেন।

এ ভাবে যে সহজে অনুমতি মিলল তা নয়। হেডমাস্টার মহাশয় বললেন, যতীন বাবা, তুমি পরীক্ষায় বসলে পাশ করতে পারবে, তোমার পড়াশুনাও ঠিক আছে। তবু তোমাকে যে ক'টা দিন আরও একটু কষ্ট করে স্কুলে আসতে

হবে। অন্তত দশ-পনেরো দিন তুমি স্কুলে এসে ক্লাসে বসো। মাস্টার মহাশয়দের সঙ্গে পরিচয় হবে, পড়াশুনা আর প্রশ্ন-উত্তর সম্পর্কে তোমার ভাল মতো জ্ঞান হবে— তাতে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে তোমারই সুবিধা হবে। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হবে, তোমাকেও শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ভাল ভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে।

পরীক্ষার আর মাত্র একমাস বাকি। স্কুলের সকলেই বার্ষিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। যা পড়েছে সারা বছর, যা স্কুলে শিখেছে শিক্ষকদের কাছ থেকে তা আবার ভালমতো ঝালিয়ে নিচ্ছে। আমি আর কী করব, হেডমাস্টারকেই বা কী বলব— একটানা এতদিন স্কুলে আসা আমার পক্ষে যে প্রায় অসম্ভব। কারণ মেজদা শ্রীপুর বাজারে এই ক'দিন হল সবে বিড়ি বাঁধা শিখছেন বেগার খাটছেন, শিখতে পয়সা লাগে না, কিন্তু মজুরিও পান না তিনি বিনা পয়সায় এক দোকানদার দাদাকে বিড়ি বাঁধা শিখিয়ে দিচ্ছেন— এটাই তো অনেক বেশি। দাদা-বউদির হাতে যা টাকাপয়সা ছিল, তা সবই খরচ করে খাবার জোগাড় করা হচ্ছে। এই সময় যদি আমি মাঠেঘাটে কাজ না করে স্কুলে যাই, পরীক্ষা দিই— দাদা-বউদি তো রাজি হবে না কিছুতেই। উলটে তাদের আশ্রয়ে থাকাই যাবে না। কারণ এর মধ্যে মেজবউদি দু'দিন বলেছে, এ ভাবে এখানে এই ক্যাম্পে না খেয়ে সবাই একসঙ্গে মরা যায় না, মানুষ এ ভাবে বাঁচতে পারে না। তুমি যতীন বনগাঁয় দাদার কাছে চলে যাও। তাঁরও তো দায়িত্ব আছে তোমাকে খেতে-পরতে দেওয়া। তিনিও তোমাদের এক মায়ের পেটের ভাই। বাবার সম্পত্তি সহায় সম্পদ যা ছিল তার ভাগ নিয়েছে। তুমি যাও তাঁর কাছে গিয়ে থাকো। আমরা তোমাকে আর রাখতে পারব না। খেতে-পরতেও দিতে পারব না।

মেজদাদাও একদিন ডেকে বলল, চারজনের খাবার জোটানোর মতো ক্ষমতা আমার নেই ভাই। তুই বড়দার কাছে বনগাঁয় চলে যা, ভাই। এ ভাবে না-খেয়ে চললে আমরা চারটি প্রাণীই শেষ হয়ে যাব। বড়দার কাছে তুই ভাল থাকবি। আমরাও এখানে কোনও মতে দুটো খেয়ে বেঁচে থাকব। এই ক্যাম্পে আমরা আরও ছ'মাস থেকে দেখব— যদি সরকার থেকে ব্যবস্থা না করে আমরাও বনগাঁয় চলে যাব। তোকে বাঁচাবার জন্যই পাঠাচ্ছি ভাই বনগাঁয় বড়দাদার কাছে। মেজদাদা পরিস্থিতির চাপে পড়ে শুকনো গলায় কঠিন কথাগুলি সে দিন শুনিয়েছিল। হেডমাস্টারের ঘরের সামনে আকাশের নীচে যখন দাঁড়িয়ে এত সব কথা আমি ভাবছি, তখন আমি ভাবনায় ঘেমেনেয়ে যাচ্ছি কেবল, কিন্তু আমার চোখে বা চেতনায় স্পষ্ট কোনও বেঁচে থাকবার পথ দেখতে পেলাম

না। হতাশার গাঢ় কালো আঁধার বুকে নিয়ে গোমড়া মুখে উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে এলাম— যেন পরাজিত বিধ্বস্ত মানুষ।

এ দিকে মাঠে চাষিদের জমিতে পাতো রোপার সময়— কাজে না গেলে উপোস করে থাকতে হয়। দু'দিন পরপর ঘোষেদের কাদা পাকানো জমিতে পাতো রোপার কাজ করলাম। মাঝখানে একদিন মরিয়া হয়ে স্কুলমুখো ছুটলাম। ক্লাসের পিছনে লুকিয়ে বসে পড়ানো শুনি, পারতপক্ষে শিক্ষকের সামনে মাথা তুলি না, সহপাঠীদের কাছ থেকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই।

বি. বিশ্বাস স্যার একদিন ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বললেন, এ দুনিয়ার মানুষে মানুষে যে তফাত, সেটা নির্ভর করে তার মাথার ওপরে— জ্ঞান বুদ্ধি আর চেতনার উপরে। কেউ বুদ্ধিমান কেউ বোকা, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞান— একেবারে নিরেট গবেট। সাচ্চা বই পড়লেই তবে মানুষ চালাক-চতুর, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান হয়। তাই বই পড়তে হবে— বইই এই পৃথিবীর মনুষ্য-সভ্যতা, সংস্কৃতিকে গড়ে তুলছে। আর সব সুশিক্ষিত মানুষই স্বশিক্ষিত।

'সব সুশিক্ষিত মানুষই স্বশিক্ষিত'— কথাটা আমার মনে জ্ঞানে চেতনায় চিরকালের মতো দাগ কেটে বসে গেল। এই মহামন্ত্রকে আমি সেদিন থেকে মনে মনে, প্রাণের আলোয় মেলে ধরে জপ করি, আর বই পড়ি, যে মুহূর্তটুকু পাই সেই মুহূর্তটুকু বই পড়ি। মনপ্রাণ দিয়ে সাধনা করি নিজেকে সমৃদ্ধ করি, বই পড়ি। আলো জ্বালাবার পয়সা নেই। ঘুম থেকে জেগে উঠে বলাগড় রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাতির আলোয় গিয়ে বসতাম— যদি দুটো অক্ষর পড়তে পারি, যদি একটু চেতনার আলো জ্বালাতে পারি। নিজেকে গড়ে তুলতে পারি মানুষের মতো মানুষ, দশজনের মধ্যে একজন। যে মানুষ সমাজকে কিছু দিতে পারে, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পাঠকক্ষে বি. বিশ্বাস স্যার প্রায় বলতেন, পড়। পড়ে যা। হৃদয় দিয়ে পড়ে যা। একটা বিষয় যদি একবার পড়ে বুঝতে না পারিস, তবে সাতবার পড়। সাতবার পড়েও যদি বিষয়বস্তু রক্তের স্রোতে চেতনায় রপ্ত করতে না পারিস, তা হলে সতেরবার পড়বি। যতক্ষণ চেতনার দরজা খুলে, বোধের সবুজ আলোয় স্নান করে, জ্ঞানের সাধনায় সুসমৃদ্ধ হবি, ততক্ষণ মনপ্রাণ দিয়ে অনুশীলন করে যাবি। 'মন্ত্রের সাধনা কিংবা শরীর পাতন'।

শ্রেণিপাঠ্যবই খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা বিষয়বস্তু পড়ে হৃদয়ঙ্গম করে শেষ করতে থাকলাম। আমার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল। অনুভব করলাম এই না-খেয়ে থাকা, মরাঢনা নিঃস্ব আমিও এক অসাধারণ জীবপ্রবাহের অংশ

বিশেষ। এই প্রাণময় সুচেতনার আলোয় আমার অন্তর পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলল অদম্য উদ্দীপনা, উৎসাহ, জ্ঞানলাভের তীব্র তৃষ্ণা আর আকাঙ্ক্ষা। তাই রাত তিনটের সময় উঠে, দিনের আলো ফুটে ওঠা অবধি মনপ্রাণ দিয়ে পড়তাম। পড়ে পড়ে গদ্য-পদ্য সব গোগ্রাসে গিলে সব মুখস্থ করে বোধে গেঁথে রাখতাম। খিদের রাতে যখন ঘুম আসত না, তখন গোগ্রাসে গেলা বিষয়বস্তু মনে এনে জাবর কাটতে কাটতে এক সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।

প্রায় পনেরো দিন ধরে বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা চলল। পরীক্ষার জন্য মাঠে মজুরিখাটার কাজও বন্ধ হল। সংসারে খাবারে প্রচণ্ড টানাটানি, অভাবের সংসারে অশান্তি জাঁকিয়ে বসল। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের পেটে মরা-খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার মধ্যেই আমি না-খেয়ে অনাহারে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। কেউ উঁকি দিয়েও দেখে না, ডেকেও জিজ্ঞেস করে না, খেয়েছি বা না-খেয়েছি। শেষ তিনদিন নির্জলা উপোষ করেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করলাম। শেষ করে ফিরছি। মনে হল পায়ের তলায় মাটি নেই, শূন্যে উড়ে যাচ্ছি।

বর্ষাকাল। মাঠে ঘাটে জমিতে কাদা পাকানোর পর রোপার কাজ শুরু হয়নি। কত তাঁবুতে কত মানুষ অনাহারে আছেন। আমরাও অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসে খিদেয় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষরাতে ক্যাম্পের নলিনী বিশ্বাস এসে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে ডাকছে, এই যতীন, ওঠ ওঠ। চল, সোমরা ঝাপানের বাগানে তাল কুড়াতে যাই। জেগে দেখি, ফর্সা নলিনী অনাহারে কালি হয়ে গেছে। শুকনো গলায় সে ফের বলে, অনিল, নিরাপদরা কাল আট-দশটা করে তাল কুড়িয়ে এনেছে। চল। এক্ষুনি ট্রেন আসবে। চল। ঝাপানের বাগান থেকে তাল কুড়িয়ে আনি। তালের গোলা খেয়েও বাঁচা যায়।

নলিনীর এক কথাতেই রাজি হয়ে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। বিনা টিকিটে গাড়ি চড়ে যাচ্ছি, ভয়ে ভাবনায় কখন যে সোমরা স্টেশন এসে গেছে খেয়ালই করিনি। দেখি নলিনী প্ল্যাটফর্মে নেমে আমাকে ডাকছে, যতীন যতীন, নেমে আয় শিগ্‌গির। ডাক শুনে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্ল্যাটফর্মে ধারালো মোরামে লাফিয়ে পড়লাম। ধারালো মোরামে হাঁটুর হাতের তালুর মাংস চামড়া ছিঁড়ে প্ল্যাটফর্মে থেকে গেল। হাতে হাঁটুতে রক্তঝরা নিয়েই গেলাম ঝাপানের তাল বাগানে, ছুটে ছুটে দু'জনে তাল কুড়িয়ে চললাম। হাঁটুতে হাতের তালুতে সমানে রক্ত ঝরে চলেছে।

নলিনী বলল, এটা সাপেদের আস্তানা। পাকা তাল জড়িয়ে সাপ থাকে। সাবধান, বিষধর সাপরাই এখানে রাজত্ব করে। ভয়ে ভয়ে তাল কুড়িয়ে আমি

ছয়টি তাল পেলাম। নলিনী পেল আটটি। অনাহারীরাই কেবল এখানে তাল কুড়ায়। পেটের খিদে মরণকেও জয় করে। জখম হাঁটু হাত তবু তাল কুড়াচ্ছি। পেটের খিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঢোক গিলে পেটের খিদেয় আগুন ঠাণ্ডা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ট্রেনে চড়ে ফের ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

পাকাতাল ভেঙে তালের গোলা তৈরি হল। প্রচণ্ড খিদেয় পাকাতালের গোলাও অমৃত খেলাম বলে মনে হল। পরীক্ষার ফল বেরুলে তাই নিয়ে বনগাঁয় যাব— দাদাবউদিকে এই কথা বলে রোপা লাগানোর জন খাটতে বেরিয়ে গেলাম কুণ্ডলিয়ার গ্রামে। কাদাপাকানো ভুঁইতে পোতো রোপার কাজে লেগে গেলাম।

উদ্বাস্তু শিবিরে আবার বেঁচে থাকার আন্দোলন যেন প্রাণের অনির্বাণ বহ্নির মতো জ্বলতে শুরু করেছে। মাটির বুক থেকে উঠছে আগুন, জীবনের অমোঘ তাড়নায় আমি তার শরিক হয়ে যাই।

জীবনও তো তাই চায়— ন্যায়ের আর সত্যের আগুন কে নেভাবে? কার সাধ্যি আছে? হ্যাঁ, শিকড় ছেঁড়া জীবনও চায় জয় হোক ওই অগ্নিশিখার। অনাহারের জীবনে বিষাদ ছাওয়া ভালবাসা আগুনের ফুলকির মতো ঝিলমিলিয়ে ওঠে আমার গোল চোখের তারায়। আমার কচিপ্রাণটুকু খিদের মুঠোর চাপে, নিস্তেজ হয়ে গেলেও, বুকের মধ্যে রক্তস্রোত জীবনের প্রতি ভালবাসার আনন্দের এক নিঃশব্দ শান্ত উষ্ণ স্রোত বয়ে চলে। আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়— যেন নতুন সবুজ চোখের তীব্র আগুনে আমিও চাঙ্গা হয়ে উঠি...।

আঁধারে উচ্ছল স্রোতে

খিদে, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবহেলা, অবিচার আর অত্যাচারের শেষ অবস্থায় পৌঁছে শিকড় ছেঁড়া উদ্বাস্তু মানুষজন ঘুরে দাঁড়াতে, প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ করতে গড়ে তোলেন নানা সংগঠন, সমিতি ও সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির এবং কলোনিতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' বা 'ইউসিআরসি'। এই সংগঠন মূলত জবরদখল কলোনিতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রজা সোসালিস্ট পার্টির (পিএসপি) নেতৃত্বে গঠিত হয় 'সারা বংলা বাস্তুহারা সংসদ'। মেঘনাথ সাহার নেতৃত্বে আরএসপি গঠন করে "পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটি"। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর সিপি আই-এর নেতৃত্বে ক্যাম্পবাসী

উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করত 'বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ'। এই সকল সংগঠনের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন এগিয়ে চলল গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ অবধি পশ্চিমবঙ্গে দেশ হারিয়ে যে সকল মানুষ এসেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নব্বই শতাংশ ছিলেন নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন এবং এই সকল মানুষজন এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা এবং ময়মনসিং জেলা থেকে। শিবিরবাসী নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকেই তাঁদের নেতা রূপে গ্রহণ করলেন এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ওপর সম্পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপন করলেন। এমনকী উদ্বাস্তু আন্দোলনে যোগেন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক বড় ঘটনা হিসাবেই গণ্য হল।

'সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদ'-এর উদ্যোগে বাগজোলা ক্যাম্পে একটি উদ্বাস্তু সম্মেলন আহ্বান করেন কর্তৃপক্ষ। উক্ত সম্মেলনে যোগেন্দ্রনাথের উপস্থিতি কামনা করে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুগণ কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি মহাদেব ভট্টাচার্য এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হেমন্তকুমার বিশ্বাস যোগেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে যোগেন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে প্রকাশ্য সম্মেলনে ভাষণ দেন, উদ্বাস্তু আন্দোলনে এক নতুনমাত্রা যুক্ত হয়।

বাগজোলা সম্মেলনে স্থির হয় যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সংসদের সঙ্গে একযোগে উদ্বাস্তু আন্দোলন করবেন। ক্রমে আন্দোলন এগিয়ে চলতে চলতে এক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময় 'পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ' নামে একটি স্বতন্ত্র উদ্বাস্তু আন্দোলনের সংস্থা গঠিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই সংস্থার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদের উদ্যোগে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে এক ঐতিহাসিক ক্যাম্প-উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

উদ্বাস্তু আন্দোলনের কর্মকর্তাগণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের সমস্ত ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভব বলে দাবি করেন এবং সেই মতো পশ্চিমবঙ্গের অনাবাদী উর্বর জমির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের নিকট দাখিল করা হয়। কৃষিযোগ্য অনাবাদী উর্বর জমি আছে— চব্বিশ পরগনা জেলার হাবরা থানার 'নাওলা বিল'-এ ব্যারাকপুর থানার 'ভর্তি বিল'-এ 'ধাপামানসুর' মৌজায়, 'যাত্রাগাছি-ঘুণি'

মৌজায়, ক্যানিং থানার হেড়োভাঙায় 'ঝড়খালি মৌজা'য়, 'হিরণ্ময় মৌজা'য় এবং সন্দেশখালি থানার 'মরিচঝাঁপি' মৌজায়, মুর্শিদাবাদ জেলার 'কান্দি' মৌজায় এবং বেলডাঙার 'কালান্তরের মাঠে'। এত সব জমি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জমির বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেন। যোগেন্দ্রনাথ এই সকল অনাবাদী কৃষিযোগ্য উর্বর জমির তালিকা সরকারের সামনে রেখেই উদ্বাস্তু আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলেন। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ ও অপর উদ্বাস্তু সংগঠনের পক্ষ থেকে পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলি কার্যকরী করার দাবি নিয়ে প্রবল গণ-আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কাজ শুরু করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সভাপতিত্বে কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে মহাসমারোহে পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ ও অন্যান্য উদ্বাস্তু আন্দোলনের সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক ক্যাম্প-উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি ও প্রকাশ্য সম্মেলনে বলাগড় উদ্বাস্তু শিবির থেকে হারাধন বিশ্বাস, অম্বরিষ বালা, ধীরেন হালদার, সুনীল দাস, সুধীর দাস, মনোরঞ্জন হালদার, মালতী ঢালি, শোভা সুতার এবং আমি যতীন বালা অংশগ্রহণ করি। আমাদের সঙ্গে আরও ছিলেন— নিখিল পোদ্দারের ছেলে অনিল পোদ্দার, সুবল সরকারের মেয়ে সুমিতা সরকার, সত্যরঞ্জন ভৌমিকের ভাই সীতানাথ ভৌমিক। এঁরা প্রত্যেকেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ছাড়া বিরাট মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী সরলা মণ্ডলও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রায় পনেরো হাজার উদ্বাস্তু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবং এদিনের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সমবেত উদ্বাস্তুদের সর্বসম্মতিক্রমে দাবি করা হয়— পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সমস্ত শিবিরবাসী উদ্বাস্তু পরিবারদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হবে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলার বাইরে প্রেরণের সরকারি নীতির পরিবর্তনের জন্য সত্যাগ্রহ-সহ কারাবরণ করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদ ও অপর উদ্বাস্তু সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে তা কার্যকরের জন্য অনশন, কারাবরণ, গণ-আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে। প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের এই ঐতিহাসিক সম্মেলন ঘিরে এখানে সেখানে জটলা আর পোস্টারগুলো নিয়ে চলে উত্তেজিত আলোচনা। দাবি আদায়ের আন্দোলনে যেন বসন্তের মরসুমে জীবনে একটু রং লাগল, প্রত্যেকটি মানুষের মনে নতুন আলো। মৃত্যুর আগে জীবন যেন টগবগ করে ফুটছে। কারও বা জ্বালার ওপর জ্বালা। তারা প্রাণ ভরে গাল দেয় এই জঞ্জালগুলোকে। কারও বা মনে মনে আবছা একটুখানি কীসের আশা, কীসের ভয়। কারও মনে প্রখর আনন্দ। আজকের বিপুল জাগরণ যে তারাই ঘটিয়েছে এই চেতনায় গর্বিত হয়ে ওঠে।

আমার আর হারাধনের চোখে তো ঘুমই ছিল না একমাস আগে থেকে, পাঁচ-ছয় এমনকী সাত বছরের এই কচুরিপানা, যারা জীবনের অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণায় জীবন যাদের ওষ্ঠাগত তাঁদের মধ্যে মিছিল মিটিং সভা-সমাবেশ করতে করতে আমাদের চেহারা আরও ক্লান্ত, শুষ্ক, গলা কর্কশ তবু বিরতি ছিল না। হারাধনের পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো তার মুখখানা রোগা হয়ে গেছে। চোখের পাতা ভারী, তার বড় বড় চোখদুটো দেখায় আধবোজা। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহিরেখা পড়েছে। সাধারণত কথা বড় একটা বলে না, কিন্তু থেকে থেকে তীব্র আনন্দের ঝংকার ওঠে মনের মধ্যে। ও মুখর হয়ে ওঠে তখন। ওর মুর্খতায় মূর্ত হয়ে ওঠে আগামী দিনের স্বপ্ন— যেদিন পশ্চিম বাংলার মাটিতে পুনর্বাসন পাবে, মাতৃভাষা, মাতৃ-সংস্কৃতির জয় হবে, ওর হৃদয়ের আনন্দের ঢেউয়ে নেচে ওঠে, উদ্বাস্তুরা— আমাদের বন্ধু, সঙ্গী আর সহযোদ্ধারাও।

সম্মেলন ঘিরে আশার আলো, তবু সুশীল বিষণ্ণ মনে বলে, আমাদের কানাকড়িও দাম নেই ওই ওদের কাছে, যারা আমাদের ঠেলে ফেলতে চায়— বাংলার বাইরে জনহীন অরণ্যে, শ্বাপদের মুখে, পাহাড়ি অঞ্চলে, মৃত্যুর মুখে...।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলি থাক, সুশীল, ও সব কথা আর না। এখন নতুন করে ভাব, দাবি আদায় আর আন্দোলনে জয়ের চিন্তা কর, বাংলাভাষা আর বাংলার সংস্কৃতি-মাতৃসংস্কৃতির কথা ভাব— যাতে আমরা তা জীবনে অটুট রাখতে পারি।

মন থেকে ক্লিষ্ট অনুভূতিটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শোভামাসি আস্তে আস্তে বলেন, ভালই তো হল রে, যত আবর্জনা জমে ছিল, ফুঁ দিতেই সব উড়ে গেছে, এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমরা বেরিয়ে আসতে পারলাম— এটাও কম কিসে! উদ্বাস্তু আন্দোলন এতে দানা বাঁধতে পারবে।

অম্বরিষ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ে। বলে, ঠিক কথাই বলেছ মাসি, কিন্তু তবুও মন শান্ত হয় না। চারিদিকের অবস্থা যা তীব্র হয়ে উঠছে, তাতে একটা বড় রকম সংঘর্ষ অনিবার্য। মানুষের মুখে সহ্যশক্তি মিলিয়ে যাচ্ছে, তার জায়গা

নিচ্ছে অসন্তোষ আর বিরক্তি, ক্ষোভ ও অধীর প্রতীক্ষা। চারিদিকেই তো শোনা যাচ্ছে ধারাল, ঝাঁঝালো কথা আর নতুন কিছুর উত্তেজনা।

কথাটা প্রায়ই শোভামাসি, ধীরেন ছাড়াও অনেকই বলাবলি করে। যখনই বলে তার কোনও বিশেষ অর্থ থাকে, ভয়ানক একটা জ্বালা ও তিক্ততা ফুটে ওঠে প্রত্যেকের চোখেমুখে, চেতনা জ্বলতে থাকে আগুনের শিখা হয়ে আর তাতেই পুড়তে থাকে সবাই।

সকাল থেকে ফ্যাকাশে নীল আকাশ, ছোট ছোট গেলাপি সাদা মেঘের টুকরো ছড়িয়ে আছে যেন গুলির আওয়াজে ভয় পাওয়া পাখির দল। শোভামাসির চোখ দু'টি খোলা ওই মেঘগুলির ওপর আর কানপাতা আপনার বুকের মধ্যে। মাথা ভারী, শুকনো চোখে নিদ্রাহীন রাত্রির জ্বালা। মনের মধ্যে এক বিচিত্র প্রশান্তি। হৃপিণ্ড সমান তালে টিপটিপ করে চলেছে।

সুধীর বলে, সূর্য উঠেছে, আবার মেঘও আছে আকাশে, ভারী চমৎকার তো! এমন দিনে অনুভূতিটা যেন ডালপালা মেলে ফুলে ফলে আলোয় আনন্দে ভরে উঠতে চাইছে। চেতনা সুদীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠতে চাইছে। আমি বলি কী, ওঁচা শান্তির চেয়ে জবরদস্ত লড়াই ঢের ভাল, আজ তাই আর মেঘটেগের দরকার নেই, রোদটাই চাই আমরা, কড়া ঝাঁঝালো ফসল ফলানো রোদ চাই— যাতে অঙ্কুরিত হয় বীজ, আলোয় ভরে যায় আর পৃথিবীতে যাতে নতুন প্রাণের সাড়া জাগে...।

ঠিক তাই, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। হাওয়া উঠে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রতিনিধি সম্মেলনে ঢুকতে ঢুকতে প্রাণভরে হাসছে সবাই, ঠাট্টা তামাশা করছে। যে ওদের কপালে কী আছে কে জানে! তবু কেন জানি, আমার ভেতরটা বড় শান্ত। শুধু শান্ত নয়, আনন্দে ভরা। নতুন কিছুর জন্যে দুলছে, ভুরু কুঁচকে ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখি প্রাণপণে।

ছুটতে ছুটতে আসে মনোরঞ্জন। মুখ তার উদ্ভাসিত, গাল দুটো যেন জ্বলন্ত আগুন। আনন্দদীপ্ত উত্তেজনার ধাক্কা তার মিনিট গোনার ক্লান্তি কেটে গেল। সে বলে সবার মুখেই আজ যেন করাতের ধার। সবার মধ্যেই বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। অন্ধকার থেকে সব বেরিয়ে আসছে আলোয়। চোখগুলোর দৃষ্টি যেন ইস্পাতের ফলা, কী যে হবে রে আজ ভাবলেই কলজেটা টাটায়...।

ব্যগ্র, উত্তেজিত একটা চাপা কোলাহলে আকাশ যেন গমগম করছে। দলে দলে মানুষ জড়ো হচ্ছেন প্রকাশ্য সম্মেলনে। পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করছেন। আর আজকের সম্ভাষণ যেন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঁধভাঙা বন্যার

মতো দলে দলে মানুষ ছুটে আসছেন, ওই যে নেতানেত্রীরাও আসছেন। আপন স্বজনের সান্নিধ্যে হৃদয় খুলে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আপন-স্বজন করে নিচ্ছেন, মনেপ্রাণে একাত্ম হয়ে উঠছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ের দুয়ার যেন খুলে গেছে জীবন রূপ পাচ্ছে, নতুন আলোয়। তারই জ্যোতিতে প্রতিটি মানুষ যেন তারার মতো আলো বিচ্ছুরণ করছেন। তাতেই পরস্পরকে চিনে নিচ্ছেন আপনস্বজন বলে সঙ্গী সহযোদ্ধা হিসাবে।

সূর্য উপরে ওঠে। ফুরফুরে বাসন্তী সরসতার ওপর ঝরে পড়ে তার উষ্ণতা, উড়ন্ত মেঘের দলের ডানা এসেছে ঝিমিয়ে। ধীরে ধীরে আলসে আবেশে ভেসে চলেছে তাদের ফিকে ছায়া, রাজপথ, মোটরগাড়ি, ঘরবাড়ি আর মনুমেন্ট গম্বুজের চূড়ার ওপর দিয়ে মানুষকে আচ্ছন্ন করে। মনে হয় সমবেত সমস্ত মানুষগুলোর মুখের ক্লান্তির ছোপ ধুয়ে মুছে সব বিলকুল সাফ করে দিয়ে গেল। সব কিছু যেন ঝরঝরে ঝলমলে হয়ে উঠল— সমবেত মানুষজনের মনপরানের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে, জাগরণ হচ্ছে মানুষের... চেতনায় জ্বলে উঠছে আলো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ নিচ্ছে মানুষ...।

জমায়েত মানুষদের জটলায় হারাধনের চেনাগলা শুনতে পেলাম, যেমন করে লেবু নিংড়ায় তেমনি করে ওরা আমাদের রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। এ অবিচার, এ অন্যায় কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

একসঙ্গে অনেকেই গর্জন করে ওঠেন চাপা ক্রোধে। বলেন, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। এইটুকু যদি উদ্বাস্তু মানুষ এতদিন প্রাণ দিয়ে বুঝত তা হলে আমাদের আজ এমন দশা হত না। এই ভাবে না-খেয়ে তিলেতিলে মরতে হত না।

মঞ্চে তখন নেতা সুরেলা কণ্ঠে বলে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের এক মাসেরও বেশি সময় যাবত আমরণ অনশন ধর্মঘট নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, দণ্ডকারণ্যের অরণ্যে উদ্বাস্তু পুর্বাসনের সরকারি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে খুবই অনাগ্রহী। এমনকী ক্যাশডোল বন্ধ করে দেওয়ার পর, অশেষ অসুবিধা এবং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট, অবিচার, অন্যায় ঘৃণা বিদ্বেষ ভোগ করলেও উদ্বাস্তুগণ দণ্ডকারণ্যে যেতে আরম্ভ করেনি। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিবাদ হিসাবে একমাসের ও অধিক সময় ধরে তাঁরা আমরণ অনশন করেছেন। এই ভয়ংকর অমানবিক অবর্ণনীয় অবস্থার আরও অবনতি রোধের জন্য, শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারি নীতি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ রাখছি। ন্যায্য দাবি এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষের মূলনিবাসী আদিবাসী হিসাবে মৌলিক মানবিক অধিকার জানাচ্ছি, দাবি জানাচ্ছি...।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন সমর্থনসূচক শব্দ করে উঠলেন। দেশভাগের বিষাক্ত ক্ষতে এখনও পুঁজরক্ত ঝরছে, উদ্বাস্তু মানুষদের বুকেও দগদগে ঘা, সে ঘা থেকে পুঁজরক্ত রস গড়াচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসন ছাড়া সে ঘা শুকাবে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সমস্ত শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন চাই আমরা।

ভেতরের উত্তেজনায় সারা শরীর আমার ঘামে নেয়ে গেছে, ভুরু কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে। মনের মধ্যে এলোমেলো কথারা সব আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে ছিটকে ওঠে আর হাতখানা আমার যেন আপনা থেকে কীসের ইশারায় নড়ে। ভেতরের যন্ত্রণার কথাগুলো চিৎকার করে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা অদম্য বাসনা অগ্নিশিখার মতো ধকধক করে জ্বলতে থাকে। আজন্ম নিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সঙ্গী, সহযোদ্ধা বাংলা বর্ণমালা রক্তে অগ্নিপ্রাণে জ্বলে ওঠে...।

যখন সভায় জোর বক্তৃতা চলছে, সমবেত মানুষজন তন্ময় হয়ে আগামী কর্মসূচিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে শুনছেন, ঠিক তখনই দশজন লাঠিধারী পুলিশ ভিড়ের দিকে ছুটে এল। হাতের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে আর চিৎকার করতে করতে বলে, হতভাগারা ভাগ এখান থেকে, ভাগ, ভাগ এখান থেকে। যতসব হাড়হাভাতে রিপুর দল, এখানে মরতে এসেছে। ভাগ সব, ভাগ। বলতে বলতে তারা আরও এগিয়ে যেতে থাকে...।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিরক্ত হয়ে পুলিশকে পথ করে দিল কেউ কেউ। কয়েকজন সরে গিয়ে পথ করে দিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল আর বক্তৃতা শুনতে থাকল মনপ্রাণ দিয়ে। ওদিকে কেউ বিরক্ত হয়ে গর্জাতে থাকল ভেতরে ভেতরে, ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো।

একটা জোর চেনা গলা শোনা গেল, শালা চামচারা, দ্যাখ না লাঠি হাতে ছুটে আইচে রে ...প্রভুর আদেশ তামিল করতে, ছুঁচোরা এঁটোকাটা খেতে জুটেছে।

সুধীর রাস্তার মাঝখানে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা। দু'জন পুলিশ মারমুখী লাঠি হাতে তাড়া করল তাকে। সে একদিকে সামান্য একটু সরে দাঁড়াল, কিন্তু ভয়ংকর রুখে দাঁড়াল, যুদ্ধে উদ্যত ষাঁড়ের মতো প্রচণ্ড প্রতিবাদী ভঙ্গিতে। চরম কঠিন হয়ে উঠল তার চোখমুখের চেহারা...।

সেই মুহূর্তে অম্বরিষ দ্রুত ছুটে গিয়ে সুধীরকে সরিয়ে নিল, পাছে গণ্ডগোল বাধায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সে শান্তধীর স্বরে বলল, আরে সুধীর, তুমি বলেছিলে না যতীনের সঙ্গেই থাকবে, সে কথা কি ভুলে গেলে? এখন দেখি তুমি একলাই হাঙ্গামা বাধাতে চাইছ। এ-কী করছ তুমি! ধৈর্য ধরো, দাবি আদায় করতে হবে,

বাংলায় পুনর্বাসন নিতে হবে, মাতৃভাষা, মাতৃ-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

সুধীর মুখে একটু ম্লান হাসি মাখিয়েই বলল, বড্ড ঘাট হল, মেজদা। কিন্তু অবস্থা যা ঘটছে, তাতে নিজেকে সামলে রাখাই দুষ্কর। দ্যাখ না শালা পুলিশরা, গণতন্ত্রের টুটি ছিঁড়ে নিতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। ভারতবর্ষ যেন ওদেরই একমাত্র বাপের সম্পত্তি। আমরা যেন এ-ভারতবর্ষে জন্ম নিইনি। মানুষ মিটিং-মিছিলও করতে পারবে না। এ দেশটা কী মগের মুল্লুক নাকি।

ভেতর থেকে সর্বাঙ্গ ছেয়ে কেমন একটা নতুন উত্তেজনা, ভাবনা, চেতনা জেগে উঠেছে আমার। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ বেদনায় মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। অস্থির হয়ে উঠে, পা পা এগিয়ে যাই ভিড় ঠেলে, ভিড়টা যেন ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছে সামনে-পিছনে-দুলছে সমানে...। কীসের এক অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে সমবেত উদ্বাস্তু মানুষ। তীব্র উত্তেজনায় গোটা বায়ুমণ্ডল কাঁপছে। কেউ কেউ বাঘের মতো গজরাচ্ছে, কেউ কেউ বা অন্যমনস্ক হয়ে এদিক-ওদিক করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কী করবে তা ঠাওরাতে পারছে না, কেউ বা অতি বাহাদুরির ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের চাপা কোলাহলে পুরুষেরা বিরক্ত হয়ে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিচু স্বরে গালিগালাজ উঠছে। পাঁচমিশেলি এই নিরন্ন জনতার ভিড় আক্রোশের চাপা গর্জনে ফেটে পড়তে চাইছে, কীসের এক উত্তেজনায়, চারিদিক থমথম করছে... কীসের প্রতীক্ষায়?

নিচু চাপা স্বরে একজন স্ত্রীলোক বলেন, ভাইরা, তোমরা সব নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলো। সাবধান! হুঁশিয়ার ভাইসব।

ভিড় থেকে একটা রনরনে জবাব আসে, অনেক অনেক সয়েছি, আর না, প্রতিবাদী হতে হবে, সম্মুখসমরে নামতে হবে, না-হলে কিছুতেই কিছু হবে না। এ শিকড় ছেঁড়া জীবনের কোনও পরিবর্তনই হবে না।

খুব কাছে অম্বরিষের বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে স্বর শান্ত, স্থির প্রত্যয়জনক। সে বলল, প্রিয় স্বজনগণ, আমাদের সহযোদ্ধাদের বিপদের মুখে ফেলে আমরা কিছুতেই যাব না। আমাদের থেকে ওদের অনেক বেশি বুদ্ধি, বেশি হিম্মত। ভারতের মূলনিবাসী, ওরাই তা প্রমাণ করবে, প্রয়োজনে আমরা জান দেব। আমরা সবাই জান দেব। তবু বাংলাভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ছেড়ে যাব না।

চিৎকার করতে করতে চারিদিক থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে নীল পতাকা উড়িয়ে মিশে যায় ভিড়ের সঙ্গে। আগে উদ্বাস্তু শিবিরে সংকীর্ণ স্থানে গলা চেপে যে স্লোগান দিয়েছিল, আজ এই পথের বুকে আকাশের তলায় সেই

স্লোগানের বাঁধন মানে না। ফুলে ফেঁপে উঠছে স্লোগান অসংযত বেগে, নির্ভীক প্রতিধ্বনি তুলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে বেজে উঠছে বজ্রকঠিন সাহসিকতা, আগামী দিনের সুদীর্ঘপথের পারে, ডাক দিচ্ছে শেকড় ছেঁড়া মানুষকে, সত্যিকারের জানিয়ে দিচ্ছে, তাদের এই রক্তঝরা দুখের পথ। স্লোগানের শিখায় জ্বলে গেল ভয় আর পুড়ে ছাই হয়ে গেল অজানার আশঙ্কা সব...।

সব কোলাহল ছাপিয়ে পুলিশের বাঁশি বেজে ওঠে। কালো কুৎসিত শব্দ বাতাসে ভাসে। আরও পুলিশ আসছে। গোটা ভিড়টা শিউরে উঠল। একদিকে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা হঠাৎ উঠে দাড়ালেন। মুহূর্তের জন্য সব স্তব্ধ আর সতর্ক। জোর বক্তৃতা চলছে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভরাট গলা শোনা গেল, প্রিয় স্বজনগণ, আমার আপনজন, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলার সংস্কৃতি আমাদের প্রাণ, প্রাণ ছাড়া দেহ বাঁচে না। বাংলার মাটি ছেড়ে গেলে আমাদের বাঙালি অস্তিত্বই শেষ হবে। লুপ্ত হবে তার আবহমান কালের ঐতিহ্য। বাংলা ছেড়ে আমরা যাব না...।

একটা গরম বাষ্পের ঝাপটা লাগে আমার চোখে, শরীরটা হঠাৎ শক্তিতে ভরে উঠল— একলাফে মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াই... চুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মতো সবাই ফেরেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দিকে। আমি আমার মনপ্রাণ দিয়ে প্রিয় নেতার দিকে তাকাই। নির্ভীক, গর্বিত প্রদীপ্ত দুই চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কেবল কানে শুনছি, প্রাণেমনে বাজছে, মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি থেকে বাঙালিকে উপড়ে নিলে তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে...।

প্রিয় স্বজনগণ, আমার আপনজন, আমরা মাতৃভাষা মাতৃসংস্কৃতি রক্ষার জন্য প্রাণ দেব জীবন দেব, তবু বাংলার ভূমি বাংলাকে ছেড়ে যাব না, সমস্ত শিবিরবাসী উদ্বাস্তু মানুষদের বাংলায় সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হবে। লক্ষকণ্ঠে বেজে ওঠে একই শব্দ, একই ভাষা, একই প্রাণের আকুতি। ফের শোনা যায় বজ্রকণ্ঠের প্রাণ মাতানো শব্দরাশি: মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি বাংলায় আমাদের জন্মগত অধিকার, আমরা জান দিয়ে সে সংস্কৃতি, সে ভাষা রক্ষা করব। এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে এই অভিমত ঘোষণা করছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য জমির অভাবহেতু উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বাসনের জন্য বাংলার বাইরে ও অরণ্যময় দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করতে হচ্ছে, সরকারের এই যুক্তি ও ঘোষণা জনমতকে বিভ্রান্ত করবার একটা অপকৌশলমাত্র। ল্যাণ্ডরেকর্ড দপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ তদন্তে প্রকাশ, চাষযোগ্য অনাবাদী উর্বর জমি পশ্চিমবঙ্গে যা আছে, তাতে গোটা

পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী সমস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন সম্ভব এবং পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই পশ্চিমবঙ্গেই ছিন্নমূল বাঙালি উদ্বোস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছি আমরা...।

ওই দিকে ভিড়ের ওই কোনায় মহাবিরক্ত স্বর শোনা গেল, পুলিশ ধরবে, নির্ঘাত ধরবে, এ বার আর জান নিয়ে বাছাধনদের ক্যাম্পে ফিরতে হবে না...। কী করছ, ভেবেচিন্তে করো, এখন আর একলাটি নও, মাগ ছেলে আছে তাঁবুতে, তা ভাবো। এক সাংবাদিক গোছের কেউ ঘৃণা ছুড়ে দিয়ে বলে, চিৎকার করে, অ্যাই যোগেন বালি মোল্লা, পাজি বদমাশ, ছোটজাত দেখ না, তোর কী হয়! দেওয়ালে মাথাটি থেঁতলে দেব। দেখবি তখন! ওরে মুসলমানের পা-চাটা, ফের ফিরে যা তোর সাধের পাকিস্তানে... এই যোগেন আলি মোল্লা আবার এখানে বিষ ছড়াচ্ছিস ক্যান? যা...

সুধীর চেঁচায় আমরা আমাদের মাতৃভাষায় স্লোগান দেব, গান গাইব, আমাদের সব বিশ্বাসের প্রকাশ, সব প্রাণের প্রকাশ বাংলা ভাষায়, বাংলা সংস্কৃতিতে, আমরা বাংলা ছেড়ে যাব না। মরতে হয় বাংলার মাটিতেই মরব, বাংলা মায়ের কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলব।

চিন্তিত ভাবে কথা বলে সুপদ মণ্ডল, আমি আমাদের আদর্শের বাইরে এক পাও দেব না। আরে যতীন, তুমিও তো এসেছ দেখছি, তুমিও ভিড়ে পড়েছ, বিদ্রোহীদের দলে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, হাসিমুখে সে আমার মুখের দিকে প্রাণমন দিয়ে তাকায়, বিস্ময় প্রকাশ করে।

ন্যায় আর ধর্ম যে দিকে, আমার মাতৃভাষা, আমার মাতৃসংস্কৃতি সেই দিকেই আমি মরবার আগে সে রাস্তার ধুলো একটু গায়ে-মাথায় মেখে নিই, আমি বলি আর এগিয়ে যাই সামনে। আমার মুখের দিকে প্রাণমন দিয়ে সবাই তাকায়, বিস্ময় প্রকাশ করে।...

সভা শেষে বিরাট মিছিল কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার বাসগৃহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। দুর্নিবার একশক্তির টানে, প্রাণের উল্লাসে হাজার হাজার অগ্নিশিখার মতো মানুষ ধেয়ে চলেছে। মিছিলের ঠিক মাথার ওপরে ধুলো আর ঝুলকালির মেঘ, ঘর্মাক্ত মুখগুলি জ্বলে উঠছে গাল ভিজে গেছে চোখের কালো জলে, কালো কালো মুখের মধ্যে ঝলকে উঠছে, চোখ আর দাঁতগুলো। চারদিক থেকে তখনও মানুষ ছুটে আসছে। হাত নেড়ে জনগণ আগুন ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায়, পরস্পরকে উত্তেজিত করছে। নতুন প্রাণের আশা জাগিয়ে তুলছে। সামনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর আশপাশে আমরা ক'জন হাতে

নীল পতাকা, হাঁটছি অগণিত ছিন্নমূল মানুষ... কণ্ঠে তাদের ধ্বনি ওঠে, উদ্বাস্তু জনগণ— জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা, মাতৃ-সংস্কৃতি, বাংলার ভূমি বাংলার প্রাণ, ছাড়ব না, ছাড়ব না। ছিন্নমূল জনতা যেন ফুলেফেঁপে উঠছে— যারা নীল পতাকার মর্ম বোঝে তারা ঠেলাঠেলি করে এসে নীল পতাকাকে ঘিরে ধরে হাঁটতে থাকে। শোভামাসি, মালতী, সুধীর, অম্বরিশ, হারাধন আমার পাশাপাশি হাঁটে। একদল উজ্জ্বল চোখ, সদ্য যৌবনে পা-দেওয়া যুবক, সহস্র বলিষ্ঠ নন্দিত কণ্ঠে প্রাণমাতানো সাড়া দেয়— বাংলা ভাষা, বাংলা-সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি আমাদের প্রাণ, বাংলার ভূমি আমরা ছাড়ব না, শিকড় ছেঁড়া জীবন জিন্দাবাদ...

নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বজ্রকণ্ঠে বলে চলেছেন, আমরা ভারতবর্ষের মূলনিবাসী, মুক্তকণ্ঠে সমস্ত ভারতবাসীকে স্পষ্ট করে জানানোর সময় এসেছে, এখন আর চুপ করে থাকলে চলবে না। দেশভাগের জন্য আমরা দায়ী নই। আমরা দেশভাগ চাইনি। যারা কায়েমি স্বার্থরক্ষা করতে, কায়েমি স্বার্থ অটুট রাখতে দেশকে ভাগ করেছে, বাংলাকে ভাগ করেছে, আজ তারাই আমাদের বাংলার বাইরে জোর করে ঠেলে পাঠাতে চাইছে। বাঙালি তথা নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে, ধ্বংস করে দিতে চাইছে, তার অখণ্ড ঐক্যশক্তিকে, শেষ করে দিতে চাইছে, আমরা তা কিছুতেই হতে দেব না, আমরা মরণপণ লড়ে যাব তার বিরুদ্ধে...।

মিছিল থেকে শত সহস্র কণ্ঠে গর্জন ওঠে, ঠিক ঠিক কথাই বলেছে, তথ্য সত্য আর ন্যায়ের কথা বলেছে। অনেকগুলি মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ঝলসে উঠল আগুনের শিখার মতো, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ ওঠে, শিকড় ছেঁড়া মানুষ মূলনিবাসী জিন্দাবাদ। বাংলা আমাদের মাতৃভূমি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলার সংস্কৃতি আমাদের মাতৃসংস্কৃতি, জীবন গেলেও ছাড়ব না। প্রাণ দেব তবু বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে যাব না। আমরা জাতবর্ণ মানি না, মানুষের জাত হয় না, মানুষের বর্ণ হয় না— মানুষ, মানুষই, আমরা জাত-বর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ঘৃণা করি। বাংলার দলিত আদিবাসী নিম্নবর্গের আর নিম্নবর্ণের সমস্ত মানুষজন ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অত্যাচারে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলার মুসলমানরা আমাদের স্বজন, আপনজন। ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই জাত-বর্ণ বিদ্বেষ, ঘৃণার সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছে, তাদের কায়েমিস্বার্থ রক্ষা করতেই, মাতৃভূমি বাংলাকে ভাগ করেছে। মুসলমানরা আমাদের শত্রু নয়, পুলিশরাও আমাদের শত্রু নয়, দলিত শ্রমজীবী মানুষ আমাদের স্বজন, আপনজন— সমাজ সত্য, ইতিহাসের তথ্য— ওদের খুলে

দেখাতে হবে, ওদের চোখের সামনে ঐতিহাসিক তথ্য সত্য খুলে দেখাতে পারলে, জীবন সত্যটা ওরা বুঝতে পারলে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত হবে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দৃঢ়কণ্ঠে সত্য তথ্য বলে চলেন...।

যোগেন্দ্রনাথের কথাগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠছে, তিনি বলছেন, স্বজন, আপনজন, আমাদের সমাজ সত্য আমাদের আপনস্বজনদের সঠিক দেখিয়ে দিতে পারলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে, তাদের চেতনার চোখ খুলে যাবে, দেশভাগের জন্য কারা দায়ী, তারা তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে, ঐতিহাসিক প্রকৃত সত্যটা তাদের দৃষ্টিগোচর হবে...

বাংলামায়ের কোল আমরা ছাড়ব না, আমরা বঙ্গভূমি ছেড়ে যাব না— শোভামাসি বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি তোলেন। শোভামাসির হাত সুশীল আর যেন কে শক্ত করে ধরে থাকে। তাঁর হাতদুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে। অশ্রুতে তাঁর বেদনার্ত গলা যেন বন্ধ হয়। কম্পিত ওষ্ঠের ভেতর দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে: ওরে, ওরে আমার সোনার ছেলেরা আমার প্রাণের প্রাণ, চল বাবা, আমরা এগিয়ে যাই। বাংলা মায়ের নামে শপথ নিই। বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি প্রাণ গেলেও ছাড়ব না— বাংলাভাষা জিন্দাবাদ, বাংলার সংস্কৃতি জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা বাংলা ভাষার জন্য, জান দেবার সাহসে ভর করে এগিয়ে চল...।

সুধীরের বসন্তের দাগওয়ালা চওড়া মুখখানায় একগাল হাসি। শোভামাসির মুখে উজ্জ্বল প্রাণের আবেগ দেখে কী যেন বলে সে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়— হাতের নাগালে আর কাউকে না পেয়ে, শোভামাসির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মাগো, তোমরা যখন মিছিলে চলে এসেছ, আমাদের পাশে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করতে নেমেছ, মাগো তখন আমাদের জয় সুনিশ্চিত। মায়ের শক্তিকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এই বাংলায় আমরা পুনর্বাসন পাব। এ আমাদের ন্যায়ের দাবি, জন্মগত অধিকার। বাংলামায়ের ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি মাতৃ-সংস্কৃতি— আমাদের রক্ত মাংসে প্রাণে হৃদয়ে জড়িয়ে আছে... সে আবেগে, আনন্দে, হাসিতে উচ্ছ্বসিত সুখে, শোভামাসির গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, বলে মাগো, মায়ের ভাষা আমরা ভুলতে পারব না। মাতৃ-সংস্কৃতি ছাড়তেও পারব না— বাংলা মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃ-সংস্কৃতি জিন্দাবাদ...।

অম্বরিষের কোমল সুরেলা গলা জনতার কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে, প্রিয় স্বজনগণ, আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে হাজির হয়েছি, আসল লক্ষ্য আমাদের বহুদূর, আসল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন, বঙ্গভূমির অখণ্ডতা, বাংলাভাষা

আর বঙ্গ সংস্কৃতি রক্ষা। কিন্তু বঙ্গমাতার সন্তানদের ওপর বিচ্ছিন্নতার নিষ্ঠুর খড়গ যখন নেমে আসে, তখন তো তার প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ করতেই হবে। তাই বলি বাংলাভাষার জন্য বঙ্গসংস্কৃতির জন্য, মাতৃ-সংস্কৃতির জন্য— জান দেবার সাহস যাদের নেই, নিজের ওপর যাদের ভরসা নেই, দুঃকষ্টের ভয় যারা পায়, তারা তফাত থাক। মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ওপর, মাতৃসংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতির ওপর যাদের বিশ্বাস আছে, আমাদের লক্ষ্য যারা দেখতে পায় তারাই শুধু এগিয়ে আসুক। আমরা মাতৃভাষা আর মাতৃ-সংস্কৃতি জড়িয়ে ধরে রাখতে, প্রয়োজনে জান দেব। প্রাণ দেব, তবু বাংলা ছেড়ে যাব না।

দীর্ঘদিন শিকড় ছেঁড়া মানুষ উদ্বাস্তু থাকায়, সমবেত স্বজনের সান্নিধ্যে আশায়, আকাশের নীচে পায়ের তলায়, তারা শক্তমাটি খুঁজে পেয়েছে, তাই আজ নির্ভীক, বজ্রকঠিন সাহসিকতায় আগামী সুদিনের সূর্যোদয়ের পথে, ডাক দিয়ে যাচ্ছে মানুষকে দুঃখের রক্তঝরা পথের যাতে অবসান হয়, তার জন্য প্রতিটি মানুষ, প্রাণের শিখায়, জ্বালিয়ে যাচ্ছে নতুন আশার আলো— ঐক্যবদ্ধ শক্তির শপথ, এগিয়ে চলার দৃঢ় অঙ্গীকার, বাংলাভাষা, মাতৃভাষা আর মাতৃসংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতির জয়, বাংলা ভাবাভাবি, মানুষের জয়...।

কে একজন কাকে খুঁজে চলেছে ভিড়ের ভেতর, তার ভয়ার্ত মুখেও আজ সুখের আভা। চিৎকার করে আপনজনকে ডাকছে, ওরে আনন্দ বাবা, তুই কোথায় আছিস বাবা, শিগগির আয়, তোর মা তোকে খুঁজে পাচ্ছে না। ভয়ে তার কাঁপছে গলাটা, ভাবনায় নুয়ে যাচ্ছে মাথাটা। মিছিল তবু এগিয়ে চলেছে। স্লোগান আছড়ে পড়ছে বাতাসের বুকে...।

শোভামাসি অভয় দিয়ে বলেন, আছে, সবাই আছে, কেউ হারাবে না, ভিড়ের আড়ালে আছে, পঞ্চাশ লক্ষ লোকের ভিড়ে কে কোথায় ছিটকে আছে, ভিড়ের আড়ালে আছে। ভয় নেই, প্রথমে আমিও ভয় পেয়েছিলাম এই মহামিছিল, বিশাল সমাবেশ, এত মানুষ এক ঠাঁই হলে, দু-একজন তো এদিক-ওদিক হবেই রে বাছা। আমার ছেলেটা ভিড়ের ভেতর কোথায় মিশে আছে, কে জানে?

ডাকাতের দল যেন, এই দ্যাখ না, লাঠি বন্দুক নিয়ে পুলিশ হাজির, কখন তারা মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ধড়পাকড় শুরু করবে, আমার একটিমাত্র ছেলে। ওই তো বলভরসা, সে যদি জেলে যায়, না-খেয়ে অনাহারে শুকিয়ে মরব আমরা, হায় হায় আমি কনে গিয়ে খুঁজব তারে, এই মানুষের মহাসমুদ্রে, হায় হায়— কার কান্নাঝরা গলা যেন আছড়ে পড়ে মিছিলের স্রোতে। মিছিল তবু এগিয়ে বীরদর্পে চলে।...

এই তো আসবার পথে, এখানে দেখলাম সেই লম্বা রোগা মেয়েটিকে, হঠাৎ সে তার হাড্ডিসার লম্বা হাত দিয়ে, শোভামাসির হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে আবেগে বলে ওঠে, মাসিমা, শুনুন গো, একটু শুনুন, আমার ভাতারকে খুঁজছি আর দেরি করলি, ক্যাম্পে ফিরতি পারব না গো, সেই বর্ধমানের — কাকসা ক্যাম্প থেকে আসছি। যেতে হবে তো অতটা দূর। কথা বলতে বলতে হাড্ডিসার লম্বা মহিলা, মিলিয়ে গেল মিছিলের স্রোতে।

মিছিলের পাশেপাশে হাঁটছিলেন একবয়স্কা মহিলা, মুখখানা কচি মেয়ের মতো, মাথাটা লম্বাটে, তাতে বড় খোঁপা বাঁধা, বেঁটেখাটো পিটানো স্বাস্থ্যের প্রশস্ত শরীর, দুপা জোরে এসে বলেন, আমরাও তো যাব সেই রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে, কম দূর তো না। বেটাটারে রেখে এসেছি তাঁবুতে একা, তবু সবাইকে তো সঙ্গে নিয়ে যাতি হবে, এয়েছি যে জন্যি সেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কিছু একটা, শুনতি না পাল্লি মন তো শান্ত হচ্ছে না। শুধু মুখি ফেরবো, তা তো আর হয় না, শেষ কথা শুনি যাই.. মহিলা ফের ভিড়ে মিশে যান।

শোভামাসি নিম্নকণ্ঠে অভয় দিয়ে বলেন, ভয় কী বাছা, এ যে উদ্বাস্তু মানুষের কাজে এসেছ, একবার ভেবে দেখো। মানুষের জন্যই তো মানুষ জীবন দেয়, প্রাণ দেয়— আমার ঠাকুরদাদা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনটাই দিয়ে দিয়েছিলেন। দেশের মানুষ কী তা কোনওদিন ভুলে যাবে? কখনও ভুলবে না, মানুষের মনেই তো মানুষ বেঁচে থাকে।

কী সহজ সত্য— শোভামাসির নিজের মনেই যেন বিদ্যুতের আলো খেলে গেল। সেই মেয়েটি তখনও শোভামাসির হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে, শোভামাসিও তাকিয়ে দেখেন তার মুখের দিকে— একটা বিস্ময়ের হাসি খেলে যায় তার চোখের তারায়। আবার সে বলে, আমার ঠাকুরদার মতো কত শত বীরশহিদ দেশের জন্য প্রাণ না দিলে, আমরা কি পেতাম স্বাধীনতা আজ?

চলতে চলতে দ্রুত-পায় ছুটে এল হরষিত ঢালি, সারা মুখে তার বসন্তের দাগ, চুলগুলো সব কটাকটা, দুটো চোখের বিস্ময় তখনও কাটেনি। মনে একটু স্বস্তি নিয়ে সে বলে, আজকের সভায় সমবেত এত মানুষ দেখে, সত্যি প্রাণে একটু বলভরসা এল, হয়তো দণ্ডকারণ্যের অরণ্যে গিয়ে মরতে হবে না। এই পশ্চিম বাংলায় আমাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবে। ভাষা সংস্কৃতি ছাড়া মানুষ কী বাঁচে রে! জলের মাছকে ডাঙায় তুললে তার যেমন অবস্থা হয়— নদীনালা খালবিলের পূর্ববঙ্গের মানুষগুলোকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দিলেও তাই হবে। পাহাড়ি শুকনো ডাঙায় পড়ে মানুষগুলো ছটফট করে মরবে। পূর্ব বাংলার

নদীনালা খাল বিলের মানুষকে, দণ্ডকারণ্যের পাহাড়ি অরণ্যে পুনর্বাসন দিলে, তারা যে ঝাড়ে বংশে মরবে— এটুকু সবাই বোঝে, তবু জলজীবী মানুষগুলোকে পাহাড়ি ডাঙায় তুলে মারতে চায়— এ যে কী সূক্ষ্ম চক্রান্ত, একটি ঐতিহ্যশালী শক্তিশালী বাংলার রাতপুত খ্যাত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভয়ংকর, অমানবিক, নৃশংস ষড়যন্ত্র। হরষিত ঢালির ভেতরের কষ্ট তার চোখে জল ভরে দেয়। সে ভাবতে পারে না, বুকের ভেতর তার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে প্রাণ যেন তার পুড়ে অঙ্গার হয়। সে বদলে যেতে থাকে।

দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষ উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের মতো মিছিল করে আসছে, মানুষ দেখে বুকটা আমার নেচে ওঠে উল্লাসে, মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবর্গ তখনও ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়ে চলেছেন, প্রাণে প্রাণে লড়াইয়ের শপথে। কারও প্রাণে আবছা আনন্দ নতুন কিছুর প্রতীক্ষা, কারও মনে বা জ্বলন্ত কৌতূহল জ্বালিয়ে দিচ্ছে, প্রতিবাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ মন কারও গড়ে দিচ্ছে, আবার সবারই মনে প্রাণে যেন ভীরু আশা কোথাও কারও বা বহুদিনের বঞ্চনার ঘৃণার অবহেলার অত্যাচারের সঞ্চিত আক্রোশের বাঁধভাঙা জোয়ারের জল, কূল ছাপিয়ে উঠছে...।

মিছিলে আগত মানুষজনের চোখ সম্মুখের দিকে। কার যেন একটা উল্লাসের চিৎকার ধ্বনি শোনা যায়— আজ বিপুল কী একটা অনুভূতি জেগেছে বুকে, সাধারণ মোটা কথা দিয়ে তা বোঝানো যাবে না, মানুষজন তাই পরস্পর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়— এক এবং অভিন্ন হয়ে উঠেছে। একজন তাই গলা বাড়িয়ে বলছে, আমার বাড়ি যশোহর, তোমার বাড়ি ফরিদপুর, তার বাড়ি নোয়াখালি, কেউ ত্রিপুরা, কেউ ঢাকা, কেউ-বা খুলনার, বরিশালের, এ সব ভুলে যাও ভাই, এখন আমরা সবাই উদ্বাস্তু মানুষ, বাংলায় পুনর্বাসন চাই— আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি আমাদের প্রাণ, দেখছ না মানুষজন বেনোজলের মতো ছুটে আসছে, মেয়েপুরুষ বৃদ্ধবৃদ্ধা— সবাই বেরিয়ে এসেছে, কী এক চঞ্চলতা সকলের চোখে মুখে, মাটির টানে, মায়ের ভাষার টানে— মানুষ ছুটে আসছে, অগণিত মানুষ যেন আগ্নেয়গিরির বুক ফেটে বেরোনো লাভা, স্রোতের মতো বইছে, আর এক নতুন বিশ্বাসের অগ্নিশিখায়, প্রতিটি মানুষ জ্বলছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে উত্তাপ, প্রাণময়তা। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছে, মায়ের ভাষা, বাংলাভাষা, প্রাণ গেলেও ছেড়ে যাব না, বাংলার সংস্কৃতি মাতৃসংস্কৃতি, প্রাণ গেলেও ছেড়ে যাব না। মাতৃভাষা বাংলা জিন্দাবাদ...।

মাতৃ-সংস্কৃতি জিন্দাবাদ...।

মাতৃ-সংস্কৃতি জিন্দাবাদ— সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মিছিল এগিয়ে যায় বীরদর্পে।

রাস্তার মাঝখানে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর বাড়ির পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে এক গোঁয়া রক্তের পাঁচিল, খাঁকি রঙের পোশাক-পরা মানুষের প্রাচীর। মানুষগুলোর যেন মুখ নেই। প্রত্যেকের কাঁধের ওপর জ্বলজ্বল করছে— বেয়নেটের তীক্ষ্ণ হিংস্র হিম হাসি, কুৎসিত তাচ্ছিল্য। সেই নির্বাক নিশ্চল পাঁচিলটার হিংস্র হিম চেহারা দেখে শিকড় ছেঁড়া মানুষজনের মিছিলটা থমকে দাঁড়ায়, শোভামাসির হাতে নীল নিশান কাঁপতে থাকে, শোভামাসির বুকের ভেতরটাও জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে— যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দাঁড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, প্রিয়স্বজন, আমার আপনজন, সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও বিকল্প পথ নেই। আমাদের সারাজীবন তো পড়ে রয়েছে— মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি হারিয়ে আমরা বাঁচতে চাই না। যদি মরতেই হয়— দেশজননীর বুকেই মরব, স্বজন-আপনজন এসো আমরা এগিয়ে যাই। তিনিও এগিয়ে যান।

আবহাওয়া থমথমে, অধীর প্রতীক্ষায় আন্দোলিত, শোভামাসির হাতের নীল পতাকা তখনও কাঁপছে, চারদিক যেন ঘুরছে, ভাসছে, কাঁপছে। সারা বাতাস গমগম করছে টেলিগ্রাফের তারের মতো একটা চাপা গুঞ্জন, ওদিকে কোথায় যেন বুকফাটা আর্তনাদ ওঠে আহত পশুর মতো। হঠাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব— যেন ওপর থেকে ঝরে পড়ে স্তব্ধতার স্বচ্ছ মেঘখানি, গোটা ভিড়টাকে আচ্ছন্ন করে দিল। আমরা চারজনমাত্র হারাধন, মনোরঞ্জন, মালতী আর আমি ভিড় থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়লাম। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকলাম আর বজ্রকঠিন গলায় স্লোগান দিতে থাকলাম, মাতৃভাষা মাতৃসংস্কৃতি জিন্দাবাদ, বাংলার মাটিতে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হবে। জীবন দেব তবু বাংলা ছেড়ে যাব না। বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি জিন্দাবাদ, বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি প্রাণ গেলেও ছেড়ে যাব না...।

বাংলা ভাষা বাঙালির প্রাণ— মরে গেলেও ছাড়ব না।

বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃ-সংস্কৃতি— বাঙালির প্রাণ, জীবন দেব তবু ছেড়ে যাব না— যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সংকল্পকঠিন কণ্ঠে, উদাত্ত রবে ঘোষণা করেন আর শতসহস্র কণ্ঠে ওঠে তার প্রতিধ্বনি, বাংলা ভাষা, বাঙালির প্রাণ, মরে গেলেও ছেড়ে যাব না। বাংলার সংস্কৃতি বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে যাব না। যাব না, যাব না।

বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃ-সংস্কৃতি বাঙালির প্রাণ, জীবন দেব, ছেড়ে যাব না। ও-ধার থেকে কে যেন ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে, শালা রিপুর দল আবার

স্লোগান দিচ্ছে। নিজেদের মরাকান্না কেঁদে নিচ্ছে। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না। দেখি টেকোমাথা, খেলোমুখ ঘৃণায় আমাদের দিকে পচা থুথু তাচ্ছিল্য ছুড়ে দিচ্ছে আর পুলিশদের তাতাচ্ছে...। পুলিশ লাঠি উঁচু করে মারমুখী হয়ে এল, মার, মার শালাদের, হাড়হাভাতে ভিখিরিগুলোর দল সব জোচ্চোর। মার শালাদের। রুক্ষকণ্ঠের জোরালো হিংস্র আওয়াজ আছড়ে পড়ছে। সমবেত জনতার মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কঠিন প্রতিজ্ঞায় দু'হাত বুকে চেপে ধরে তাকাই চারধারে— আমার তীক্ষ্ণ চোখ দু'টির দৃষ্টি বিঁধে থাকে শোভামাসির মুখের ওপর। শিহরন খেলে জ্বলে ওঠে চোখ, ভুরুজোড়া তার কাঁপতে থাকে যেন ডানা মেলে চোখ দুটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিশান হাতে মানুষ এগিয়ে আসছে, জনগণের মিছিল এদিক-ওদিক দুলছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে আর আমার বুকের তলা থেকে আগুনের ফুলকির মতো, উছলে ওঠে নতুন বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত সেই প্রাণের প্রাণ। বাংলাভাষা, জন্মভূমি জননীর বুক থেকে উঠছে বুঝি প্রেমের অনির্বাণ আগুন, কে নেভাবে সে আগুন। কার সাধ্য আছে। নীল পতাকা আকাশের পটে অগ্নিশিখার মতো কাঁপতে থাকে দীপ্ত হয়ে...।

পুলিশদের ধূসর ঢেউ দুলিয়ে, সারাটা পথ আগলে দাঁড়িয়ে ইস্পাতের দাঁতের মতো ঝলমলে বেয়নেটগুলো বাগিয়ে ধরে তারা এগিয়ে আসতে লাগল— একটা নিষ্ঠুর হিংস্র কঠিনতা তাদের চোখেমুখে সমস্ত অবয়বে...।

শোভামাসি তাড়াতাড়ি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের খুব কাছে সরে আসেন। অশ্বিনী আর আমি তক্ষুনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে আড়াল করে সামনে দাঁড়াই...।

যোগেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে বলেন, একপাশে সরে যাও তোমরা, দেখি না পুলিশ আমাকে কী করে। এদিকে সরে যাও তোমরা। আস্তে হাত দিয়ে তিনি আমাদের সরিয়ে ফের সামনে এগিয়ে যান।

খুদে অফিসার হাত তুলে হুকুম দেয় শুকনো কণ্ঠে, তফাত যাও, তফাত যাও, হাঁটু না-বেঁকিয়ে সোজা পা উঁচুতে তুলে মার্চ করে সে এগিয়ে আসতে থাকে। তার বুটের তলায় কঠিন আঘাত খটখট করে বাজে মাটির ওপর আর সে বিদ্বেষের ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ছিটিয়ে হুংকার দেয়, তফাত যাও, তফাত যাও...।

পুলিশ অফিসারের পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে ভারী পায়ে চলেছে ঢ্যাঙা একটা লোক। তার কদমছাঁট চুল, মোটা একজোড়া পাকা গোঁফ, লাল লাইনিং দেওয়া ছাই রঙের দীর্ঘ কোট, চওড়া পাতলুনের ওপর হলদে জোব্বা। লোকটা হাঁটে পিছনে হাত রেখে। ওপরে তোলা ধাঁকড়া ঝুঁকে জোড়ার তলায়, কুতকুতে চোখদুটো

স্থির হয়ে আছে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দিকে— যেন তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টি দিয়ে নেতাকে চেখে চেখে দেখছে আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। কী কুৎসিত চেহারা!

নেতা গভীর আন্তরিকতায় বলে চলেছেন, প্রিয় আপনস্বজনগণ, তোমরা কিছুতেই ভয় পেয়ো না। কিছুতেই না, আর বেশি ভয়ংকর কী আছে বলো তো। যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছ তার চাইতে কী কঠিন অবস্থা আছে! যে অত্যাচার অবহেলা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রতিদিন কলজেটাকে, বুকের ছাতিটাকে, কুরেকুরে খাচ্ছে তার চাইতে... কী কঠিন অবস্থা জেলখাটা?

হে স্বজন, আপনজন, এক হও, এক হও। সব মানুষ এক হয়ে গড়ে তোলো এক বিরাট শক্তি— যা জীবনকে বদলে দিতে পারে, শিকড় ছেঁড়া প্রাণ মাটিতে শিকড় বসাতে পারে...।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার বুকের ভেতর জ্বলে ওঠে আপনস্বজনদের মুখ— একটার পর একটা চিন্তা, আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে ওঠে মনের মধ্যে চেতনার আলোয়।

আমার ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে— যেন সূক্ষ্ম আগুনের তন্তু দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ শতছিন্ন করে দিচ্ছে— পেছনের ধাক্কায় টলে সামনে এগিয়ে চলি কিছু না ভেবে। যেন কোনও জ্ঞানচৈতন্য নেই...। ভাষা সংস্কৃতির অমোঘ টানে শিকড় ছেঁড়া মানুষ চলেছে প্রাণের জোয়ারে...।

নীল ঝাণ্ডা উঁচু রেখে এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রগামীর দল, শিকড় ছেঁড়া আপন স্বজনগণ। ওদিক থেকেও এগিয়ে আসছে ধোঁয়াটে রঙের মানুষগুলোর নিরেট ঢেউটাও সঙিন উঁচিয়ে...।

কাছে— আরও কাছে মুখোমুখি... নীল আকাশের নীচে মুখগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— বিকৃত চাপা মুখ— রাস্তাটার আড়াআড়ি সমস্তটা জুড়ে সারি বাঁধা হয়ে আছে, রং-বেরংয়ের চোখগুলি দিয়ে যেন এলোমেলো ফুটকিকাটা, নোংরা সংকীর্ণ একটা লাইন। স্বজনমানুষগুলির বুকের দিকে তাক করে ধরা রয়েছে বন্দুকগুলো। সঙিনের নির্মম ইস্পাতের ফলাগুলি ঝকমক করছে...

আমার দু'চোখ দেখে চলেছে অজস্র জিনিস। বুকটা একটা চাপা প্রচণ্ড চিৎকারে, প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। দু'হাতে কঠিন ভাবে বুক চেপে তাকে থামাই। নির্ভীক এগিয়ে যাই। বাতাসে ভাসছে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের স্বচ্ছ কণ্ঠ— বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি।

আচমকা কঠিন দীপ্তিতে ইস্পাতের ফলাগুলি ধেয়ে এল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল— ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা চত্বরটা। মানুষের এলোমেলো ছোটাছুটি,

সন্ত্রস্ত কণ্ঠের চিৎকার, আর্তনাদ আছড়ে পড়ল। কার শঙ্কিত করুণ গলা শোনা গেল— আপনস্বজন বান্ধবগণ, তোমরা চলে যাও, সবাই চলে যাও। ভাই নিতাই, শিগগির পালিয়ে এসো। আশাবউদি ফিরে এসো, শোভামাসি নীল ঝাণ্ডা ছেড়ে দাও, এ দিকে দাও আমি লুকিয়ে রাখছি। যতীন আর একপাও এগোবে না, চলে এসো। নীল পতাকা ফেলে দাও শোভামাসি। নীল পতাকা আকাশের পটে অগ্নিশিখার মতো কাঁপতে থাকে দীপ্ত হয়ে, সঙ্গে সংকল্প কঠিন কণ্ঠধ্বনি।

মুহূর্তে গোটা এলাকাটা যেন রণক্ষেত্রের রূপ দেয়। বৃদ্ধ অফিসার মাটিতে কঠিন বুটের গোড়ালির আঘাত হেনে হুকুম দেয়, গ্রেফতার করো। গ্রেফতার করো, গ্রেফতার...।

পুলিশ ছুটে আসে। মারমুখী একজন পুলিশ ছুটে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আমার বুকে কঠিন আঘাত করে দূরে সরিয়ে দেয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের হাতে হাতকড়া পরাতে যায় আর একজন পুলিশ, চারজন পুলিশ সঙিন উঁচিয়ে চারপাশে ঘিরে ধরে চলতে থাকে।

হাত তুলে পুলিশকে থামিয়ে দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, হাতকড়া দরকার হবে না। কোথায় যেতে হবে চলো। ফের তাঁর সংকল্পকঠিন কণ্ঠে ওঠে মাতৃভাষার শপথ উদাত্ত রবে ঘোষণা...। বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, বাঙালির প্রাণ...।

চারজন সঙিনধারী পুলিশ যোগেন্দ্রনাথকে ঘিরে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ বেষ্টনীর দিকে। নীল ঝাণ্ডা কেঁপে ওঠে, তার পর পড়ে গিয়ে পুলিশের ধূসর ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওদিকে তখন জোর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুড়ছে, ধড়পাকড় শুরু হয়ে গেছে। জনতা ছোটাছুটি করছে, রোগে কঠিন, অনাহারে শুকনো চিন্তাক্লিষ্ট মুখগুলি অদৃশ্য হচ্ছে— কেউ এগিয়ে আসছে, কেউ পিছনে সরছে, কেউ মারমুখী ধেয়ে আসছে— বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি ছাড়ব না। কার বিষণ্ণ কণ্ঠে শোনা যায়—! ওঃ। মার ওকে, ক্রুদ্ধকণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়।

কেউ চাপা কণ্ঠে চমকে উঠে বলে, দ্যাখ কেমন হুকুম দিচ্ছে। পায়ে পায়ে একজন করে খসছে। পথটা যেন তেতে উঠেছে। ওদিক থেকে কে যেন ঝাঁজালো কণ্ঠে বলে ওঠে, দেখ না শালারা, ছোটজাতরা আবার স্লোগান দিচ্ছে। মার, ওকে মার, মুণ্ডটা ছিঁড়ে নে— ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়।

খবরদার আর একপাও এগোবে না— কার নির্দেশ বাতাসে ভেসে ওঠে। পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছে।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে আমি চারধারে তাকাই, নিশান নিয়ে ক'জন শিকড়

ছেঁড়া মানুষ এগিয়ে চলেছে তা দেখে ছত্রভঙ্গ জনতা ফের দল বাঁধছে। জনতা যেন এদিক-ওদিক দুলছে। উঠছে জনতার কণ্ঠে জোর ধ্বনি স্লোগানের,

বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি আমাদের প্রাণ।

জান দেব, তবু বাংলামায়ের কোল ছেড়ে যাব না।।

বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির প্রাণ— জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জান দেব, তবু বাংলা ছেড়ে যাব না।

আহত অবলা প্রাণীর মতো শোভামাসির বুকফাটা আর্তনাদ ওঠে। পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের আড়ালে আলো ঢেকে তিনি পুলিশের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে যোগেন্দ্রনাথের চওড়া বলিষ্ঠ আর অগ্নিময় মুখ দেখতে চেষ্টা করেন। যোগেন্দ্রনাথের নির্ভীক উন্নত শির দেখেই তাঁর কলজেটা যেন জ্বলে ওঠে সহস্র শিখায়। কণ্ঠে জাগে ধ্বনি— বাংলাভাষা, মাতৃভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, মাতৃসংস্কৃতি, জান দেব তবু ছেড়ে যাব না।

আচমকা কে যেন শোভামাসির মাথায় কঠিন আঘাত হানল। অন্ধকার চোখে শোভামাসি তাকিয়ে দেখেন— সামনে খুদে অফিসারের বিকৃত লালমুখটা ট্যারা চোখে বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা উগরে দিচ্ছে। বলছে, খুব হয়েছে, ডাইনি মাগি। ভাগ এখান থেকে, ডাইনি মাগি ভাগ...।

আমি ছুটে গেলাম শোভামাসিকে রক্ষা করতে। খুদে পুলিশ অফিসার তেড়েমেড়ে ছুটে এসে এক থাপ্পড় মারল আমার মুখচোখ জড়িয়ে। বলল, ভাগ ছোটজাতের বাচ্চা, ভাগ বলছি, ভাগ। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা-বিদ্বেষের খুশিভরা কণ্ঠ শোনা গেল: যা ভাগ, ছোটজাত নমোর বাচ্চা, যা ভাগ এখান থেকে, ঘৃণার সঙ্গে মাথায় ঘুষির আঘাত হানে বারবার। খুব হয়েছে, ছোটজাতের বাচ্চা।

মাথা ঘুরতে থাকে আমার। চোখের সামনে নীল কালো হলুদ ধূসর সব, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। রক্তের লবণাক্ত স্বাদে মুখ ভরে যায়...। দৃষ্টি মাটিতে ফেলতেই দেখি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাওয়া নীল পতাকাদণ্ডটা পুলিশ অফিসারের পায়ের কাছে পড়ে আছে। তখনও একটা খণ্ডে জড়িয়ে আছে একটা টুকরো, শোভামাসি নিচু হয়ে হাতে তুলে নিলেন সেটা। তক্ষুনি পুলিশ অফিসার তাঁর হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে ফের মাটিতে ফেলে দিয়ে বুট জুতোর নীচে ফেলে ইচ্ছামতো দলে দিয়ে হাঁকে, এই ডাইনি মাগি ভাগ এখান থেকে। শোভামাসিকে মারতে উদ্যত হয় পুলিশ অফিসারটি। তার পর থুথু ছিটিয়ে, মুখ বিকৃত করে শোভামাসির চুলের মুঠি ধরতে যায় সে...।

শোভামাসিকে টেনে সরিয়ে আনতে ছুটে যাই আমি। মাসির হাত ধরতে

যেতেই সহসা খুদে পুলিশ অফিসার লাথি মারে আমার কোমরে। শোভামাসি-সহ আমি পড়ে যাই রাস্তার ওপর। পুনরায় লাথিমারার আগে উঠে দাঁড়াতেই আমাকে ঘাড় ধক্কা দিয়ে দুরে ঠেলে দিয়ে পুলিশ অফিসার হুংকার দেয়, ভাগ ছোটজাত নমোর বাচ্চা, ভাগ। ফের বাহাদুরি দেখাতে এসেছে— ভাগ ছোটজাতের বাচ্চা। ভাগ শালা নমোর বাচ্চা, ভাগ...।

পুলিশ অফিসার ছুটে গিয়ে শোভামাসিকেও ধাক্কা দিয়ে ফুটপাতে ঠেলে দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হুংকার দেয়, ভাগ ডাইনি মাগি, আর শয়তানি দেখাতে হবে না, যা ভাগ এখান থেকে।

অতিদূর থেকে বাতাসে যেন ভেসে আসছে, শিকড় ছেঁড়া অপনস্বজন, আজ যা ঘটল একবার নির্ভয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখো— আমাদের আপনস্বজনরা, প্রাণের প্রাণ আপনজনেরা বাংলাভাষা, মাতৃভাষার জন্য, বাংলার সংস্কৃতি— মাতৃসংস্কৃতি জড়িয়ে বেঁচে থাকবার জন্য পশ্চিম বাংলায় পুনর্বাসনের জন্যে পথে বেরিয়েছে। শিকড় ছেঁড়া জীবন চায় না তারা। তারা নতুন জীবন চায়। সত্যের জীবন, বাঙালি জীবন, ন্যায়ের জীবন চায়।

পুলিশের ধূসর ঢেউ দুলিয়ে রাস্তা মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে...। সামনে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হুকুম গর্জে ওঠে, বন্দুক তোলো, আগে বাড়ো...।

পাঁজরার তলায় আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, আগুনের মতো জ্বলছে। মনের অতি গভীরে, চেতনার আলোয় নতুন নতুন তেজোদীপ্ত কথাগুলি সব জন্ম নিচ্ছে শব্দরা সব হয়ে উঠছে— যা সবাইকে, সব মানুষকে, যা সব কিছুকে বুকে টেনে নেওয়ার ভাষা— আমারই বাংলা ভাষা আমার জিভের আগল দিলে খুলে বাঞ্জনায়, প্রেরণায় সহজের সুর লাগল:

বাংলাভাষা বাঙালির প্রাণ, প্রাণ দেব, জান দেব তবু বাংলা ছেড়ে যাব না।

বাংলার সংস্কৃতি মাতৃসংস্কৃতি জীবন দেব, জান দেব, তবু বাংলা ছেড়ে যাব না— বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির জীবন সত্য।

শতসহস্র বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বাংলাভাষা, বাঙালির প্রাণ-ঐক্য, জীবন দিয়েও রক্ষা করব...। নির্বাক হয়ে সবাই শুনছে আর অদম্য চেতনায় শিকড় ছেঁড়া জীবন যেন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছে— লেলিহান আগুন হয়ে জাগছে সব, বীরদর্পে এগিয়ে আসছে শিকড় ছেঁড়া জনতা...।

সামনে থেকে কান ফাটানো হুকুম গর্জে ওঠে, বন্দুক তোল।

নেমে এল বন্দুকগুলো একটা ঢেউ-খেলানো লাইনে। অগ্রগামী নীল পতাকার দিকে তাদের ইস্পাতি ঘৃণা ছুঁড়ে দেয়। বলে, আগে বাড়ো।

রাস্তার শেষে শূন্য ময়দানের পথ আগলে দাঁড়িয়ে পাতলা একসারি পুলিশ। তারও ওদিকে কতকগুলো ধূসরমূর্তি টলতে টলতে এগিয়ে আসছে জনতার মিছিলের দিকে। ওদিকে ঘন ঘন গুলি ছুঁড়ছে পুলিশ। ছত্রভঙ্গ জনতা। মারমুখী একদল, অন্যদল পিছু হটছে— এলোমেলো চিৎকার, শোরগোল শোনা যায়। জনতার আর্তনাদ ভেসে আসে বাতাসে। ওদিকে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়— বাঙালির প্রাণ, বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ছাড়ব না...।

আমার রগের শিরাগুলো ফুলে দপদপ করছে। মাথার চুলের গোড়া থেকে ছুটছে আগুন। একবার ভাবি ফিরে যাই মিছিলে। আবার প্রাণপণে বুকে বল বেঁধে ঝেড়ে ফেলি ক্ষুদ্র চিন্তা— সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যাই সামনের দিকে।

বাতাসে ভেসে আসে মনোরঞ্জনের স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর, আমরা শিকলি বাঁধা কুকুরের মতো থাকি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতের মুঠোয়। আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আঁধার রাত ছাড়া আর কিছুই না।

চাপা সাড়া আসে ভিড় থেকে, ঠিক বলছ, ঠিক বলছ।

দে তো ছোট্, নিচু জাতের মুখটা ভোঁতা করে দে তো! পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে করতে হাঁকে— এই সব রিপুর দল হটে যা, হটে যা এখান থেকে। সরে যা। নেহাত অনিচ্ছায় একটু ফাঁক হয় ভিড়। কিন্তু দেশভাগে, দাঙ্গায়, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, অত্যাচারে শিকড় ছেঁড়া জীবনের স্রোতে পরস্পর থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন এই উদ্বাস্তু মানুষগুলি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। গভীর অভিনিবেশে তাঁরা অগ্নিময় মাতৃভাষার বাণী শোনে। জীবনের অমোঘ তাড়নায়, অন্যায় অবিচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এদের অনেকেই হয়তো, এমনই বাণীর আর ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রতীক্ষায় ছিল।

আমার খুব কাছাকাছি যারা ছিল, তারা সব নিঃশব্দে অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাদের প্রাণময় উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগে আমার গায়ে। অগ্নিময় ভাষা হয়ে ওঠে মনে। সরে যাও খোকা, সরে যাও, পালাও, দেখো না এক্ষুনি গুলি ছুড়বে, ধরে জেলে পুরবে— সরে যাও। যে সমস্ত চিন্তায় জোর আমি নিজেই অনুভব করেছি। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে সে সব কিছু মাতৃভাষায় কথা হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু কণ্ঠে তো আমার জোর নেই। ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলা আছে শুধু, বুকে দারুণ কষ্ট হতে থাকে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, ভুরু কাঁপছে, ভেতরের অসহ্য জ্বালায় ঠোঁট নড়ছে। মনের মধ্যে কথাগুলি সব পুনরায় আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে ছিটকে ওঠে। চিৎকার করে কথাগুলোকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার অদম্য, অমোঘ বাসনা, ছটপট করতে থাকে। বাতাসের বুক চিরে ধ্বনি ওঠে। বাংলার ভাষা... বাঙালির ঐক্য...

বহু শিকড় ছেঁড়া জীবনের দীপ্তকণ্ঠ এসে মেশে এই ধ্বনির সঙ্গে। দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় সেই নির্ঘোষ— বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির জীবন সত্য...

পুলিশ ছুটে আসে আমার পিঠে ঘাড়ে, মাথায় কঠিন আঘাত হেনে হুংকার দিয়ে বলে: হেই, শালা নমোর বাচ্চা, মুখ বন্ধ করবি, না ঘুষি মেরে মুখ ভেঙে দেব? মুখ বন্ধ কর... চারদিকে থেকে খুশিভরা বিদ্বেষ, ঘৃণার চাপা সাড়া আসে। খুব হয়েছে, নমোর বাচ্চার, যেমন কুকুর ঠিক তেমনই মুগুর। মার শালার নিচু জাত রিপুদের। মার মার মার মার, মেরে মাথা ফাটিয়ে দে।

মাথা ফেটে বুঝি রক্ত ঝরছে, রক্তের লবণাক্ত স্বাদে আমার মুখ ভরে গেছে। পা টলছে। আচ্ছন্ন চেতনার তটে এসে গভীর ঘা দেয়। জনতার এলোমেলো উত্তেজিত চিৎকার ওঠে, খবরদার ফের যদি ওর গায়ে হাত দিয়েছ তো!

দে, দে, দে, রিপুর বাচ্চাটাকে কষে মার দে। মুখ ভোঁতা করে...।

জনতার মিছিল থেকে ফের কার কণ্ঠ ভেসে আসে: যে বিদ্বেষ ঘৃণা অবহেলা অত্যাচার অন্যায় অবিচার প্রতিদিন কলজেটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার চাইতে...

রিপুর বাচ্চার মুখটা ভেঙে দে, দে কষে মার দে।

শিকড় ছেঁড়া জনতার উত্তেজিত চিৎকার আছড়ে পড়ে। সাবধান, ওর গায়ে হাত দেবে না, অন্যায় যদি করে থাকে জেলে দাও। ওর গায়ে হাত দেবে না...। দূর থেকে কঠিন কণ্ঠ ঘোষণা করে। কে শোনে কার কথা। পুলিশ ছুটে এসে আমাকে প্রচণ্ড মারতে থাকে। আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে নিষ্ঠুর ভাবে।

চিৎকার, আর্তনাদ, হুইসলের কঠিন শব্দ, গুলির শব্দ, শোরগোল-চেঁচামেচি— সব মিলে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ওঠে চারপাশে। আমার পায়ের তলা থেকে জমি সরে যায়। বুটের আঘাতে আমি মুখ থুবড়ে পড়ি কঠিন রাজপথের ওপর।

রক্তে ভেসে যায় কপাল, মুখের ভেতরটা ফের রক্তে ভরে যায়... তীক্ষ্ণ আঘাতে কান বধির, গলা আটকে দম বন্ধ হয়ে আসে... হাঁটু অবশ, তবু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই... দুঃসাহসী দুই চোখে আমার তখনও ধকধক আগুন জ্বলে...।